বাউল ফকির কথা

সুধীর চক্রবর্তী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বাউল ফকির কথা' রূপের আড়ালে অরূপরতন সন্ধানের এক উজ্জ্বল উপাখ্যান। এই বইয়ের প্রতিপাদ্য আজকের বাংলায় বাউল-ফকিরদের প্রকৃত অবস্থান ও সাংসারিক অবস্থা, তাঁদের জীবনের ছন্দ, বাণী আর সুরের উৎস সন্ধান। বাংলা সংস্কৃতির নির্মাণে বহু বিচিত্র গৌণ ধর্মাচারীদের কাহিনি ও তাঁদের নারীজীবনের বর্ণবিভায় উদ্ভাসিত অন্তরমহল মরমি লেখনীতে ব্যক্ত হয়েছে।

9 788177 568363

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বাউল ফকির কথা' রূপের আড়ালে অরূপরতন সন্ধানের এক উজ্জ্বল উপাখ্যান। এই বইয়ের প্রতিপাদ্য আজকের বাংলায় বাউল-ফকিরদের প্রকৃত অবস্থান ও সাংসারিক অবস্থা, তাঁদের জীবনের ছন্দ, বাণী আর সুরের উৎস সন্ধান। সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো যাবতীয় জ্ঞাতব্য সারণি, বিস্তৃত তথ্যপঞ্জি ও ফকিরদের আত্মকথন— সেইসঙ্গে সংগৃহীত বাউল ও ফকিরি গান, স্বরলিপি ও আলোকচিত্র সম্ভারে অপরূপ এই রচনা ও তার প্রকাশগত শৈলী। বাংলা সংস্কৃতির নির্মাণে বহু বিচিত্র গৌণ ধর্মাচারীদের কাহিনি ও তাঁদের নারীজীবনের বর্ণবিভায় উদ্ভাসিত অন্তরমহল মরমি লেখনীতে ব্যক্ত হয়েছে।
বাউল-ফকিরদের দেহতত্ত্বের রহস্যময় আয়নার বিচ্ছুরণ এ বইকে স্বাদু ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। আবু তাহের ফকিরের লেখা 'ফকিরি-নামা' এবং লোকসংগীত বিশেষজ্ঞ দিনেন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে লেখকের আলাপচারি উল্লেখ্য সংযোজনে সমৃদ্ধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুধীর চক্রবর্তীর জন্ম ১৯৩৪। জীবিকায় বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক। অবসর গ্রহণের পরে দু'বছর ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগের অতিথি অধ্যাপক এবং এখন অতিথি অধ্যাপক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ও হাবড়া শ্রীচৈতন্য কলেজের স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগে। বারো বছর ধরে সম্পাদনা করেছেন বার্ষিক সংকলন 'ধ্রুবপদ'। গবেষণাকর্ম, মৌলিক রচনা ও সম্পাদনার কাজে খ্যাতিমান। ভালবাসেন গান আর গ্রাম। কৃষ্ণনগর আর কলকাতায় উভচর বাসিন্দা। রবীন্দ্রসংগীত, বাংলা গান, লোকধর্ম ও সমাজ নৃতত্ত্ব, নিম্নবর্গের সংস্কৃতি, গ্রাম্য মেলা মহোৎসব, মৃৎশিল্প, চালচিত্রের চিত্রকলা, লালন ফকির প্রভৃতি নানা বিচিত্র বিষয়ে তাঁর প্রণিধানযোগ্য বই আছে। তা ছাড়া আছে আখ্যানধর্মী বেশ ক'টি সুখপাঠ্য বই। পেয়েছেন শিরোমণি পুরস্কার (১৯৯৩), আচার্য দিনেশচন্দ্র সেন পুরস্কার (১৯৯৫), নরসিংহদাস পুরস্কার (১৯৯৬) এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক (২০০২) আর 'বিশিষ্ট অধ্যাপক' খেতাব (২০০৭)। 'বাউল ফকির কথা' বইয়ের জন্য পেয়েছেন ২০০২ সালের আনন্দ পুরস্কার এবং ২০০৪ সালের সর্বভারতীয় সাহিত্য অকাদেমি সম্মান।

....

প্রচ্ছদ সৌরীশ মিত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাউল ফকির কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাউল ফকির কথা

সুধীর চক্রবর্তী

আনন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০১
প্রথম আনন্দ সংস্করণ আগস্ট ২০০৯
তৃতীয় মুদ্রণ জুলাই ২০১২

© সুধীর চক্রবর্তী

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-81-7756-836-3

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪ থেকে মুদ্রিত।

BAUL FAKIR KATHA
[Philosophy]
by
Sudhir Chakraborty
Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রীঅমিয়কুমার বাগচী
শ্রীমতী যশোধরা বাগচী
সৌমিত্রেষু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য বই

গভীর নির্জন পথে
নির্জন এককের গান: রবীন্দ্রসংগীত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয়সূচি

আত্মপক্ষ

১

সূর্য আর শিশির ২১

আয়নামহলের কথা ৩৩

গোপ্য সাধনার ত্রিবেণী ৬৩

দেহের দেহলী ১০৮

সাধনসঙ্গিনীর রহস্যলোক ১৫০

ফানা থেকে বাকা ১৭১

ফকিরদের সঙ্গে দ্বিরালাপ ২১৬

ফকিরের আত্মকথা ২৩০

পুরুলিয়ার 'সাঁধু' গান ২৫৩

২

জেলাওয়ারি বাউল পরিচিতি ২৫৯

ফকিরদের পঞ্জি ২৭৯

বাউল গানের নানাবর্গ ২৮২

বাংলা ফকিরি গানের স্বর্ণসঞ্চয় ২৯৫

বাউল-ফকিরি গানের স্বরলিপি ও স্বরলিপি প্রসঙ্গে ৩২২

বাউল-ফকিরি গানের সুর প্রসঙ্গে আলাপচারি ৩৪৯

পশ্চিমবঙ্গের বাউল, ফকির ও গায়কদের আর্থ-সামাজিক পরিচয় সারণি ৩৫৫

নির্দেশিকা ৩৬১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মপক্ষ

'বাউল ফকির কথা' প্রথম প্রকাশিত হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি সংস্কৃতি কেন্দ্র' থেকে ২০০১ সালের মার্চে। অচিরে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ পায় ২০০২ সালের সেপ্টেম্বরে। ইতিমধ্যে ২০০২ সালে বইটি অর্জন করে আনন্দ পুরস্কার। পরে ২০০৪ সালে পায় সাহিত্য অকাদেমি সম্মান। এরপরে দীর্ঘদিন বইটি দুষ্প্রাপ্য ছিল। এবারে ২০০৯ সালে বইটি প্রকাশিত হল আনন্দ পাবলিশার্সের পক্ষ থেকে। এ ব্যাপারে লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের সচিব প্রদীপ ঘোষ লিখিত অনুমতিদানে আমাকে বাধিত করেছেন। নবমুদ্রণে বইটির আকারপ্রকার ও বিন্যাস অনেকটা বদলে গেছে, কিছুটা বর্জিত হয়েছে, কিছু যোজিত হয়েছে। প্রচ্ছদ ও আলেখ্যশোভন অন্তর মহলের নতুন ভিস্যুয়াল-ঔজ্জ্বল্য নবসংস্করণকে সমৃদ্ধ করেছে। আনন্দ পাবলিশার্সের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

বাংলার বাউল-ফকিরদের নিয়ে এতাবৎকাল যে সব লেখালিখি বা বইপুস্তক বেরিয়েছে, অনেকের ধারণা তথা অভিযোগ যে সেগুলি প্রধানত সাহিত্যগন্ধী কিংবা তত্ত্বগর্ভ। এইসব সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন বাস্তব সামাজিক অবস্থান ও অবস্থা, তাঁদের নিজস্ব আচরণ ও বিশ্বাসের জগৎ, তাঁদের গানের সুর ও সংগীতের মূল্য, তাঁদের প্রতিবাদের প্রক্রিয়া ও বিদ্যমান সমাজাদর্শের প্রত্যাঘাত— এ ধরনের পুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে গেলে তাঁদের সম্পর্কে যে বিস্তৃত ব্যক্তি-তথ্য ও নিরপেক্ষ সারণি থাকা একান্ত আবশ্যিক, আগেকার অন্বেষকরা সে বিষয়ে তেমন ভাবেননি। এর জন্য আমরা অভাববোধ করতে পারি, শোচনা করতে পারি, কিন্তু পূর্বজ সন্ধানীদের দোষারোপ করতে পারি না। ইতিহাসতত্ত্বে যেমন গত দু'-তিন দশক ধরে নিম্নবর্গ-চেতনা বা সাব অলটার্ন দৃষ্টিকোণ এসে তল-থেকে-দেখা ইতিহাসকে উন্মোচন করছে, তেমনই নবলব্ধ ভাবনা সূত্রে বাউল-ফকিরদের সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিকোণ থেকে খুঁজে নেবার নতুন দিশা যদি কেউ প্রয়োগ করেন তবে বিষয়টি সম্পর্কে ভাববাদের ধূসরতা কেটে যেতে পারে— অবতীর্ণ হতে পারে এমন সব নতুন পর্যবেক্ষণ ও দ্বান্দ্বিক বিন্যাসের ছক যা পালটে দিতে পারে আমাদের বহুদিন পোষিত ধারণাকে। তাই বলে আগের জানাটাও মূল্যহীন হয়ে পড়ে না।

আমি নিজে সত্তরের দশকের কিছু আগে থেকে, কোনওরকম মেথোডলজির বাধ্যতা না নিয়ে, একেবারে নিজের মতো করে গ্রামবীক্ষণ এবং গৌণধর্মী নিম্নবর্গের কয়েকটি উপাসক সম্প্রদায় সম্পর্কে সরেজমিন প্রত্যক্ষণে মন দিই তাঁদের অবস্থানে গিয়ে। সেই কাজ আলতোভাবে বা আলগা ঢঙে গ্রাম্য মেলায় যাওয়া, একটা দুটো গান সংগ্রহের আত্মতৃপ্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে শহরের মননজীবিতায় ফিরে আসা নয়— আমি তাঁদের মধ্যে থেকে, রীতিমতো বসবাস করে অর্থাৎ তাঁদের আহার-সংস্কার-ধূলিতল ও বেদনাতুর জীবনপ্রবাহের অচ্ছেদ্য শরিক হয়ে সবকিছু জানতে বুঝতে চেয়েছি, তাঁদের সঙ্গে বসে তাঁদের গান গেয়েছি। তার ফলে হয়তো গানের ভিতর দিয়ে পৌঁছতে পেরেছি তাঁদের ভাবসত্য ও জীবনবীক্ষণের অনন্য সরণিতে। সেই গানের আবার কত না ধরন, কত না গায়নশৈলী! ক্রমে ক্রমে আমি বুঝতে পেরেছি আসল গান তাঁদের অব্যক্ত সংলাপ, তাঁদের সাংকেতিক তত্ত্বনির্দেশ। সে গানের ক্রম আছে, কোন গানের জবাবে কোন গান, গুরুর সন্নিধানে তারও শিক্ষা এবং দীর্ঘ প্রস্তুতি আছে। গানের ভিতরের দ্ব্যর্থ এবং অভিসন্ধিত অর্থ বুঝতেও লাগে গুরূপদেশ। আরও আশ্চর্য যে, বাস্তবে দেখেছি, রাঢ়ের বাউল যে-গানটি গাইছেন ঝুমুর অঙ্গের গায়কীতে, সেই একই গান কুষ্টিয়াতে শুনতে পাচ্ছি ভাঙা কীর্তনের ধাঁচে। সেই একই গান আবার উত্তরবঙ্গের বাউলদের গায়নে কিছুটা ভাওয়াইয়া অঙ্গের কাঠামোকে অঙ্গীকার করে নিচ্ছে। শুধু এখানেই বিচিত্রের মর্মবাঁশির শেষ নয়, একই গায়ক সিলেট অঞ্চলের হাসন রজার গান আমাকে শোনান দু'-রকম করে। প্রথমে শান্ত করুণ অন্তর বিন্যাসে— তারপরে ঝোঁক দিয়ে দিয়ে তালের স্পন্দে ছন্দিত করে, যেন কিছুটা হালকা লীলা বিলাসে।

বাংলার নিজস্ব লোকায়তের এমনতর অন্তর্গোপন স্বভাব কেবল তো সুরে বা ঠাটে নেই, আছে সেই জীবনযাপনের দ্বন্দ্বে-ছন্দে, দার্শনিকতায়, সারল্যে ও স্ফূর্তিতে। গানের বেদনার অভিঘাতে যখন আশি-পেরোনো বলহরি দাস বা সত্তর-পেরোনো সনাতনদাস বাউল স্বতই নাচতে থাকেন তখন গানের রূপ ও রস অন্য এক মাত্রায় আমার সামনে প্রতীত হতে থাকে। নাচে-গানে-মেশা একটা আলাদা নৃত্যনাট্যের বাউল-অন্তঃপুর তখন ঝলকে ওঠে— সেই ঝলক দুর্লভ ও বিরলপ্রাপ্য— যেন পাথর আর লোহার সংঘর্ষে চকমকির মতো চকিত ক্বচিৎ স্ফুরণ। বেশ মনে পড়ে, একবার মুর্শিদাবাদের কুমীরদহ গ্রামে এক ফকিরি গানের আসরে, রজনীর নিস্তব্ধ মধ্যযামে, অন্তত আট-দশ জন ফকির তাঁদের গানের তুরীয় অন্তর্লোকের অবগাহনে কেমন উৎক্ষিপ্ত হয়ে নাচছিলেন— মাঝে মাঝেই তাঁদের শরীর ঊর্ধ্বে উঠে যাচ্ছিল নৃত্যবিক্ষেপে। আত্মমগ্ন কিংবা আত্মহারা সেই নাচের উন্মাদনা দেখে কে বলবে যে এইসব ফকির তাঁদের এমন সংগীত-প্রেমের জন্যই গ্রামের গোঁড়া ধর্মসমাজের নির্দেশে নিন্দিত— নিজ গ্রামেই নির্বাসিত। মৌলবাদী ধর্মগুরুর ফতোয়ায় তাঁদের শীর্ণ একতারাও দণ্ডপ্রাপ্ত, তাঁদের কণ্ঠ গানের অপরাধে বিড়ম্বিত।

এই রকম নানা অভিজ্ঞতায় স্নাত হতে হতে পুরো সত্তর দশকটাই কেটে গেছে। শুধুই শুনে যাওয়া আর দেখে যাওয়া। কেবলই অঞ্জলি ভরে গান সংগ্রহ করা— লোকতাত্ত্বিকদের কাছে বারেবারে গিয়ে বোঝার চেষ্টা সেসব গানের গূঢ় সত্য। এমনভাবে অকাতরে পাওয়া যেসব অনুভব আর দিশা, তারই আলোয় আশির দশকে বছর তিনেক ধরে আমি লিখে ফেলি যে-সন্দর্ভ বা তত্ত্ববিশ্বের আখ্যান, তা নানা খণ্ড-শিরোনামে 'এক্ষণ' ও 'বারোমাস' পত্রে প্রকাশিত হয়ে এলিটিস্ট বিজ্ঞজনকে নাড়া দেয়। শেষমেষ রচনাগুলি দুই মলাটের বাঁধন মেনে 'গভীর নির্জন পথে' নামে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে পুস্তকাকার লাভ করে প্রকাশ পায় ১৯৮৯ সালে। সে বই এখনও এই ২০০৯ সালেও, একই রকম জনাদর পেয়ে চলেছে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রপত্রিকার খুব অনুকূল আলোচনার ভাগ্য অর্জন করেছে। এতদিনকার অনুন্মোচিত যৌন-যোগে রহস্যময় অন্তর্গূঢ় বাউল জীবন সম্পর্কে প্রাঞ্জলভাবে জানতে পেরে পাঠকদের অনেকে যেমন চমৎকৃত ও চমকিত হয়েছেন, তেমনই কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন বইটি রোমান্টিক, অর্থাৎ স্বকল্পিত। সেটা অবশ্য নিন্দাছলে প্রশংসাই, কারণ এমন আলো-আঁধারি দোলাচলের মরমি জীবনকে নিছক কল্পনায় ফুটিয়ে তোলা, সে তো সপ্রতিভ সৃজনশীলতার আরেক উচ্চারণ। যাই হোক, এমনতর সমাদরে-সংশয়ে দিন কাটছিল, কিন্তু বাউল ফকিরদের বিষয়ে আমার অন্বেষণ আর অনুসন্ধিৎসার ক্ষান্তি ঘটেনি। সেই থেকে, কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, নিছক কৌতূহলে কিংবা বলা উচিত গভীর লোকায়তের টানে, বছরের পর বছর ঘুরেই চলেছি। ইত্যবসরে লালন শাহকে নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বই লেখা এবং পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও মহোৎসব নিয়ে ধারাবাহিক রচনার কাজ সাঙ্গ হল। বাউল ফকিরদের নিয়ে নতুন করে কোনও আলাদা বই লেখার পরিকল্পনা বা মশলা ছিল না। ১৯৯৪ সালে এসে গেল কলেজীয় অধ্যাপনার শেষে অবসরের দিন। ভাবলাম, এতদিনে এসেছে সেই প্রত্যাশিত সময়, এবারে নিজের মতো পড়াশুনা করে কাটবে দায়হীন দিনগুলি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগে সপ্তাহে দুটি দিন অতিথি-অধ্যাপকের লঘু দায়িত্বের আনন্দে বেশ কাটছিল অনুসন্ধানী তরুণ সহকর্মীদের সান্নিধ্যে। হঠাৎ এসে গেল নতুন আহ্বান। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের তৎকালীন সচিব চন্দনকুমার চক্রবর্তী ১৯৯৬ সালে আমাকে ভার নিতে বললেন পশ্চিমবঙ্গের বাউল ফকিরদের নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সরেজমিন তথ্যানুসন্ধানের প্রকল্প রূপায়ণের গুরু দায়িত্বের।

প্রথমে মনের মধ্যে একটা প্রতিরোধ এসেছিল সরকারি ছকের কৃত্রিম পদ্ধতি কিংবা পূর্ব নির্দেশিকার বাধ্যবাধকতার কথা ভেবে। সরকারি সমীক্ষাপত্র বিষয়ে, এদেশে, নানা কারণে, একরকম অনীহা ও বিরূপতা আছে। সম্ভবত সেগুলি প্রায়ই হয়ে পড়ে কেঠো বিবরণ কিংবা কেজো প্রতিবেদন। সরেজমিন গবেষণা, যাকে ভদ্রভাষায় বলে ক্ষেত্রসমীক্ষা—(বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত একটি বইতে বলা হয়েছে 'মাঠ গবেষণা') যার ভিত্তি হল মৌখিক ঐতিহ্যের সঙ্গে বর্তমানের মেলবন্ধন, তার সিদ্ধি বেশ কঠিন। সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যেপে কাজের বিশাল পরিধি, ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন ও বহুমুখী, এমন প্রকল্প-রূপায়ণ আয়াসসাধ্য। তাই দ্বিধা জেগেছিল।

কিন্তু আগ্রহ ও উত্তেজনাও জাগরূক ছিল, কারণ সচিব মহাশয় প্রথমেই জানিয়ে দিয়েছিলেন প্রকল্পের কাজে কোনও খবরদারি বা পূর্বকল্পিত সরকারি ছক থাকবে না, কাজটা করা যাবে স্বাধীনভাবে। অবশ্য একটা ব্যক্তিগত কৌতূহলও ছিল— সত্তর দশকে নদিয়া-মুর্শিদাবাদ-বর্ধমান ঘিরে যে-জনপদে বাউলফকিরদের ঘনিষ্ঠভাবে একদা পর্যবেক্ষণ করেছিলাম নিজের খেয়ালে, দু'দশক পরে তাদের পরিবর্তন ও নতুন সমাজ কাঠামোয় তাদের ভূমিকা জানবার আগ্রহ জাগল। এই ক'দশকে আমাদের দেশে নিম্নবর্গ, লোকধর্ম ও মরমিয়া সমাজ সম্পর্কে জনসাধারণের উৎসাহ এবং জানবার আগ্রহ ইতিমধ্যে অনেক পরিমাণে বেড়ে গেছে— প্রণিধানযোগ্য বেশ ক'টি বইও বেরিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে ও বাংলাদেশে। দেশি ও বিদেশি গবেষকরা গ্রামে-গঞ্জে-নগরে অনেক সক্রিয় হয়ে উঠেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেমনই গ্রামীণ সমাজে নানা রূপান্তরের লক্ষণ আর নগরায়ণের ছাপ পড়েছে অনেক প্রগাঢ়ভাবে। এই ধরনের রূপান্তর আর গ্রামিক দৃশ্যপট জানতে এবং সেই পরিপ্রেক্ষণীতে নতুন করে লোকায়ত শিল্পী সমাজকে বুঝতে চাওয়া স্বাভাবিক। সহসা সেই সুযোগ এসে গেল, অবশ্য এসে গেল ব্যাপক প্রসারণে— কারণ এবারে অনুসন্ধানের ক্ষেত্র-পরিসর হয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গব্যাপী, যার একটা প্রধান অথচ উপেক্ষিত-অনালোকিত অংশ হল ফরাক্কা পেরিয়ে বিশাল উত্তরবঙ্গ।

এটা নিশ্চিতভাবে নির্ণীত হল যে, বীরভূম-বাঁকুড়া-মুর্শিদাবাদ-নদিয়া পশ্চিমবঙ্গের এই চারটি জেলা বাউলফকির অধ্যুষিত। বর্ধমান-মেদিনীপুর-পুরুলিয়ায় বাউলদের কিছু সন্ধান মিললেও দুই চব্বিশ পরগনা-হাওড়া-হুগলি বাউল সমাবেশের দিক থেকে দীন। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের বাউলদের বসতি, সমাবেশ ও সংখ্যা নিঃসন্দেহে মালদহ-কোচবিহার-দার্জিলিং-জলপাইগুড়ির চেয়ে বেশি।

এইবারে সমস্যা দেখা দিল বাউল ফকিরদের শনাক্তকরণ নিয়ে। রাঢ়ের বাউল আর উত্তরবঙ্গের বাউল একেবারে আলাদা— গানের বিষয় ও গানের ঠাটে, গায়নে, এমনকী বাউলের অঙ্গবাসে। বীরভূমের ফকিরদের জীবনযাপনের ছকের সঙ্গে নদিয়ার ফকিরদের কোনও মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। পূর্ণদাসের গানের অঙ্গ যে বাউলনৃত্যবিভঙ্গ তার সঙ্গে বাঁকুড়ার সনাতনদাসের নৃত্যশৈলী সম্পূর্ণ পৃথক। প্রতিতুলনায় উত্তরবঙ্গের বলহরি দাসের নাচ একেবারে অন্য ধারার। নদিয়ার চাকদা-র ষষ্ঠী খ্যাপা আবার ভিন্নতর কৌশলে নাচেন। বীরভূমের ফকিরদের গানে বেহালা সঙ্গত আর নদিয়ার ফকিরদের গানে দোতারা ও আনন্দলহরী ব্যবহার দু'ধরনের দ্যোতনা আনে। সূক্ষ্মবিচারে আরও নানাবর্গের পার্থক্য চোখে পড়ে। যেমন বাউলের সাধনসঙ্গিনীদের ভূমিকা। রাঢ়ে বা নদিয়ায় যত্রতত্র তাদের সহজেই দেখা যায়, উত্তরবঙ্গে তারা বিরলদৃষ্ট। আরেকটা গুরুতর প্রশ্ন হল, সমাজ এদের কেমন চোখে দেখছে। উত্তরবঙ্গে বাউলরা গৃহীত, রাঢ়ে তারা সমাজজীবনের সম্পৃক্ত, নদিয়ায় তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অথচ মুর্শিদাবাদে তারা অত্যাচারিত ও বিপন্ন।

এ জাতীয় বহুতর দ্বান্দ্বিকতা ছাড়াও অন্য কয়েকটি সমস্যা ছিল। প্রথমত, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ ঘিরে নিম্নবর্গের উপাসক সম্প্রদায়দের জীবন ও চর্যা বিষয়ে কোনও সামগ্রিক কাজ আগে কখনই হয়নি এবং হয়তো একজন একক ব্যক্তির পক্ষে তা সম্পন্ন করা অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, এ ধরনের কাজে কোনও পূর্বকল্পিত মডেল ও মেথডোলজি প্রয়োগ করা অনুচিত। লক্ষ করেছি, ইতিপূর্বে এ জাতীয় প্রয়াসে নানা অসম্পূর্ণতা থেকে গেছে। যেমন ধরা যাক, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সুবৃহৎ গ্রন্থ 'বাংলার বাউল ও বাউল গান'। উদাহরণীয় এই বইতে একজনের রচনা অন্যের নামে মুদ্রিত হয়েছে, সরেজমিন গান সংগ্রহের প্রমাণ কম, উত্তরবঙ্গের বাউল গীতিকাররা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছেন। তেমনই মানস রায়ের লেখা 'Bauls of Birbhum' বইতে সমাজ-নৃতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করতে গিয়ে লেখক মূল প্রতিপাদ্যকে গুলিয়ে ফেলেছেন, বহুক্ষেত্রে বাউলদের শনাক্ত করতেই ব্যর্থ হয়েছেন। বৈষ্ণব রীতি ও আচারকে তিনি বাউল আচরণবাদের থেকে আলাদা করতে পারেননি। শক্তিনাথ ঝা-র বহু শ্রমলব্ধ 'বস্তুবাদী বাউল' বইটি মুর্শিদাবাদকেন্দ্রিক। এখানে সংকটের এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুন মাত্রা যুক্ত হল। আসলে 'বীরভূমের বাউল' কিংবা 'মুর্শিদাবাদের বাউল-সমাজ' কথাগুলির দ্যোতনা স্পষ্ট নয়-- কারণ বাউলদের সমাজগত বা গোষ্ঠীগত অবস্থিতি যখন জেলার সীমায় বলয়িত করে আমরা ধরতে চাইব তখন মনে রাখা চাই যে আমাদের জেলাগুলির সীমা প্রধানত প্রশাসনিক, যাকে বলে Administrative Boundary। প্রত্যক্ষভাবে গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরতে ঘুরতে বেশ বোঝা যায়, নদিয়া-মুর্শিদাবাদের বাউলফকিরদের নানা বিষয়ে প্রচুর মিল এবং তাদের জেলাগত কোনও সীমায় বিশ্লিষ্ট করা সমীচীন নয়। আবার এটাও দেখার যে নদিয়ার বাউল ফকিরদের একটা অংশ ভাবে ভাষায় চলনে অনেক বেশি সম্পৃক্ত বাংলাদেশের কুষ্টিয়া-যশোহরের সঙ্গে। তেমনই দিনাজপুর বা জলপাইগুড়ির বাউলগায়করা প্রধানত রংপুর-পাবনা-রাজশাহী থেকে বাস্তুহারা হয়ে এসে এক নতুন ধারার পত্তন করেছেন— কারণ দিনাজপুর-জলপাইগুড়ি-কোচবিহার অঞ্চল মূলে বাউল ঐতিহ্যের সঙ্গে কোনওদিন যুক্ত নয়। এখানে গড়ে উঠেছে এক নবসমাজ এবং অন্য ধরনের বাউল গায়ক সম্প্রদায়। গড়ে উঠেছে নতুন উৎসুক শ্রোতৃসমাজও।

সরেজমিন কাজ করতে গিয়ে আরেকটি অভিজ্ঞতা অবশ্যম্ভাবী— তা হল সাধক-বাউলদের সঙ্গে গায়ক-বাউলদের আলাদা করতে না-পারা। যে বাউল গায়, সে বিশ্বাসে ও আচরণে একবারেই বাউল নয়, এমন সংখ্যা এখন পর্যাপ্ত। ফকিরিয়ানার স্বেচ্ছাগৃহীত দরিদ্র জীবন আর ফকিরি গান গাওয়ায় কোনও ভেদ নেই কিন্তু মঞ্চে আমন্ত্রিত হয়ে এমন অনেকে এখন ফকিরিগান গাইছেন যিনি পোশাকে ফকির কিন্তু সামাজিক পরিচয়ে হয়তো সচ্ছল কৃষিজীবী। গত কয়েক দশকে বাউল গান এত পেশাদারি হয়ে গেছে যে বহু বেকার যুবক-যুবতী তার টানে মঞ্চে উঠছেন এবং কণ্ঠলাবণ্যে ও গায়নকৌশলে আসর মাত করছেন। তাঁদের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য যশ ও অর্থ— বিকল্প জীবিকা। যাঁরা আরেকটু তৎপর আর করিতকর্মা তাঁদের লক্ষ্য বিদেশের মঞ্চ, বিদেশিনী ও ডলার। এর কোনওটিই অলীক স্বপ্ন নয়—বাস্তব। এসব জটিলতা এড়াতে যেটা করা উচিত, আমার পদ্ধতি ছিল সেটাই, সরাসরি নানা জায়গায় বাউল ফকিরদের জীবনের মধ্যে ঢুকে পড়া।

এটা সত্যি যে বাংলার বাউল ফকিরদের অন্তরঙ্গ জীবন পরিচয় উদ্‌ঘাটন করতে গেলে এমনভাবে প্রশ্নাবলির বিন্যাস করতে হবে যা প্রশ্নকারীর দীর্ঘ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে প্রণীত। কোনও বাঁধা ছকে (Set Pattern) সেই প্রশ্নাবলি গাঁথলে অভীষ্ট তথ্য না মিলতেও পারে। প্রশ্নের লজ্জে সমষ্টিগত জিজ্ঞাসা (Macro) আর ব্যষ্টিগত জিজ্ঞাসা (Micro) নানাভাবে আনতে হবে। প্রশ্ন করতে করতেই বোঝা যাবে বাউল ফকিররা এক অর্থে বিচ্ছিন্ন আবার এক অর্থে খুব সম্প্রদায়গত। সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব এবং সমাজবিজ্ঞানের নানা সূত্র প্রশ্ন-প্রণয়নে কাজে লাগানো যায়। আমার তা ছাড়াও বিশেষ ঝোঁক ছিল সাংগীতিক কিছু তথ্য উন্মোচনের।

আমরা পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের কয়েকশো লোকশিল্পী এবং আচরণবাদী বাউল ফকিরদের মধ্যে চার বছর পরিক্রমা করেছি। এখানে 'আমরা' বলতে আমি নিজে এবং তার সঙ্গে বেশ ক'জন প্রকল্প-সহকারী। এই পদ্ধতিতে যেসব উত্তর তথা জৈবনিক তথ্য উঠে এসেছে তা যেমন চমকপ্রদ তেমনই বৈচিত্র্যবহুল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখা যাবে, একক ব্যক্তির মধ্যে দিয়ে উন্মোচিত গৌণধর্মীদের অনুবিশ্ব যেমন চমৎকৃতিতে ভরা তেমনই দ্বন্দ্বে-ছন্দে স্ববিরোধে স্পন্দিত। হয়তো দেখা যাবে যিনি শিষ্যদের কাছে মান্য ও প্রবীণ বাউলতাত্ত্বিক তিনি পেশাগতভাবে পাগলের চিকিৎসক। বীরভূমের পটুয়ার সন্তান জাতিবিদ্যা চর্চার ফাঁকে গাইছেন বাউল গান। ব্রাহ্মণতনয়া নিছক গানের সম্মোহনে বরণ করেছেন ইসলাম ধর্ম, একজন ফকিরকে তাঁর জীবনসঙ্গীরূপে পেতে। আবার অন্য এক নারী শুধু গানের প্রতি অনুরক্তির কারণে পতিপরিত্যক্তা। দ্ব্যণুক (Binary opposites) সম্পর্কের বেশ কিছু নমুনা পাওয়া যাচ্ছে। যেমন একজন মারফতপন্থী ফকির বিশুদ্ধ ইসলামি নামাজ রোজাতেও বিশ্বাস করেন। রোজা-নামাজ-বিরোধী একজন ফকির প্রতিবছর রমজান মাসে রাতটহলিয়ার কাজে কিছু কিছু উপার্জন করেন। বাউলরা স্বভাবত নিরুপাধি এবং খ্যাতিবিত্তের বিপরীত পথের পদাতিক অথচ প্রশ্নাবলির শেষে নিজের নামসই করতে গিয়ে একজন নিজের বিশেষণ দিয়েছেন 'বাউলরাজা' ও 'ভাবরত্ন'। একজন বাউল-গায়ক আচরণে ও বিশ্বাসে তান্ত্রিক— বেতার ও দূরদর্শনের শিল্পী কিন্তু জীবিকায় দেবাংশী। বাউলদের সাধনা প্রধানত জন্মরোধের অথচ প্রচুর বাউল অতিপ্রজ। কেউ কেউ নির্মমভাবে স্ত্রী ও সন্তান ত্যাগ করে বিদেশিনী নিয়ে সাধনা করছেন। কেউ আবার একের পর এক সাধনসঙ্গিনী নিয়ে পর্যায়ক্রমে কায়াবাদী। এর বিপরীত উজ্জ্বল উদাহরণও আছে। যেমন গরিব ঘরের কুমারী মেয়ে বাউল গেয়ে বাবার সংসার চালাচ্ছেন। এমন বাউল বা ফকির আছেন যাঁরা নির্বাস— একেবারে চালচুলো নেই। কৃষিকাজ করেন বা মৎস্যজীবী এমন বাউল গায়ক আছেন বেশ ক'জন। হাড়ি বা ডোমবংশ-সম্ভূত বাউল খুঁজে পাওয়া গেছে। সাঁওতাল বাউলও দুষ্প্রাপ্য নন যিনি নিজে গান রচনা করতে পারেন না কিন্তু জনপ্রিয় বাউল গান সাঁওতালি ভাষায় অনুবাদ করে গান করেন।

এই পথে কাজ করতে গিয়ে প্রত্যক্ষ ব্যক্তির মধ্যে দিয়ে প্রচ্ছন্ন সমাজকে কীভাবে যেন ছুঁয়ে ফেলি। যে বাউলদের কোনও জাতি বা গোত্র থাকা উচিত নয়, আশ্চর্য যে, তাঁদের অনেকে নিজের গোত্রপরিচয় দিয়েছেন 'আলম্বায়ন' এবং 'অচ্যুতানন্দ' বলে। পূর্ব বা পুনর্জন্মে যাঁদের বিশ্বাস থাকার কথা নয়, বাস্তবে কিন্তু অনেকে তাতে রীতিমতো বিশ্বাসী। অনেকে একজনের কাছে মন্ত্র দীক্ষা নিয়েছেন আর সংগীতশিক্ষা নিয়েছেন আরেকজনের কাছে। বাউল ফকিরদের গরিষ্ঠসংখ্যার কাছে প্রিয় গীতিকার লালন শাহ। অনেক বাউল আবার সক্রিয়ভাবে গণসংগঠনের সঙ্গে জড়িত। ব্যক্তিগত জীবনে অমর্যাদা ও অপমানের কথা অনেকে বলেছেন, সেই সঙ্গে সাধারণ শ্রোতাদের কাছে প্রসার প্রতিষ্ঠার কথাও জানিয়েছেন। প্রশ্ন-সারণি থেকে বেশ বোঝা যায় ডুগি-একতারা বাজিয়ে নিরাভরণ কণ্ঠবাদনে এখনকার শিল্পীরা সাদামাটা গান গাইতে আর রাজি নন, নানা যন্ত্রানুষঙ্গে বেশবাসে ও চমকে তাঁরা গান পরিবেশনে তৎপর। অনেক বাউল বা ফকির অনুমিত কারণে তাঁদের মাসিক আয় কত তা জানাননি। বেশির ভাগই তাঁদের মাসিক আয়, তিনশো থেকে সাতশো টাকা বলে জানিয়েছেন। তা সত্যি হলে বলতে হবে আমাদের লোকশিল্পীরা দরিদ্রতম। চার ছেলে চার মেয়ে স্ত্রী ও নিজে এমন দশজনের পরিবারে গান গেয়ে উপার্জন পাঁচশো টাকা— কেমন করে তাঁরা বেঁচে আছেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এত নৈরাশ্যের মধ্যে আর অতলগর্ভ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করেও তবু পশ্চিমবঙ্গের বাউল ফকির সমাজ দুর্মর জীবনপ্রত্যয়ে বলিষ্ঠ। তাই তাঁদের কণ্ঠের গান কেউ কেড়ে নিতে পারেনি। দেখা গেছে মুর্শিদাবাদের কোনও কোনও গ্রামাঞ্চলে মৌলবাদীদের অত্যাচারে নিপীড়নে তাঁরা অতিষ্ঠ এবং জর্জরিত। একতারা ভেঙে, আখড়া পুড়িয়ে, দাড়িগোঁফ মুণ্ডন করে, একঘরে বানিয়েও তাঁদের মতাদর্শ আর গানের সরণি থেকে ভ্রষ্ট করা যায়নি। এখনও গান রচনা করছেন তাঁরা। আলাদাভাবে বেশ ক'জন প্রতিবন্ধী বাউলকে আমরা পেয়েছি— শরীরের প্রতিবন্ধ পেরিয়ে যাঁরা গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন। তেমনই আত্মবিশ্বাসী নানা বয়সের গ্রাম ও মফস্‌সলের নারীদের সাহচর্য আমাদের চমকে দিয়েছে যাঁরা সমাজপরিত্যক্ত কিংবা বিধবা কিন্তু বাউল গান তাঁদের জীবিকা ও জীবনের রসদ জুগিয়ে চলেছে। এমন প্রবীণ বাউল সাধক তথা গায়ককে তাঁর আশ্রমে গিয়ে আবিষ্কার করেছি, বেশ ক'বার বিদেশ ভ্রমণ করেও যিনি শান্ত ও অচঞ্চল। সরকারি স্বীকৃতি, রাষ্ট্রীয় সম্মান ও আর্থিক পুরস্কার পেয়েও অবিচলিত। অমল মাধুকরী ব্রতধারীকে দেখেছি। এমন তাত্ত্বিক সাধক খুঁজে পেয়েছি যিনি আপন মনে এঁকে চলেছেন বাউল তত্ত্বের মূল দর্শন ও সত্য তাঁর বর্ণময় চিত্রধারায়।

পাঠক ও অন্বেষীদের একথা জানাও দরকার যে, বাউল ফকিরদের ঐতিহ্য এখনও নতুন পদাতিকে সমাচ্ছন্ন। অনেক ছেলেমেয়ে এ পথে আসছেন। হয়তো প্রাচীনদের মতো মগ্নতা বা আত্মদীক্ষার শমতা নেই তাঁদের, হয়তো কিছুটা প্রদর্শনকামী তাঁরা, গান পরিবেশনে উদ্‌গ্রীব ও চঞ্চল কিন্তু তবু সচেষ্ট ও প্রতিভাবান। এমন অনেকের গান আমি ক্যাসেটে ধরে রেখেছি। ভবিষ্যতে তাঁদের অনেকে নামী শিল্পী হবেন সন্দেহ নেই।

এতদিন বাঙালি গবেষকদের অন্বেষণ ও সমীক্ষা ছিল অনেকটা একমুখী— প্রবন্ধে আখ্যানে চিত্রকলায় চলচ্চিত্রে ও কাব্যে বাংলার বাউলদেরই শুধু তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। আমার লক্ষ্য তাই প্রথম থেকেই ছিল ফকিরদের স্বতন্ত্র উন্মোচনের দিকে। সেইজন্য প্রস্তুত বইতে, জেলাওয়ারি বাউলদের তালিকার সঙ্গে বাংলার ফকিরদের একটি পঞ্জি যোগ করেছি। সেই সঙ্গে আছে দুজন ফকিরের আত্মবিবৃতি এবং একজনের আত্মকাহিনি। বীরভূম অঞ্চলে কর্মরত আমার প্রকল্প-সহকারী লিয়াকত আলি বহুদিন ফকিরদের মধ্যে রয়েছেন, এক ফকির বংশের কন্যাকে জীবনসঙ্গিনী করেছেন, তাই তাঁর সংগৃহীত ও বিশ্লেষিত তথ্যগুলি খুব কাজে লেগেছে। দায়েম শাহ এবং মহম্মদ শাহ-র রচিত ফকির গানের সম্ভার তাঁর সংগৃহীত এবং এ বইতে সংযোজিত। বীরভূমের বাউলদের মধ্যে বহুদিন সঞ্চরণকারী আদিত্য মুখোপাধ্যায় অশেষ পরিশ্রমে কাজ করেছেন প্রকল্প-সহকারীরূপে। মুর্শিদাবাদে কাজ করেছেন তরুণ লোকশিল্পী ও উৎসাহী যুবা নাজমুল হক। নদিয়া, বর্ধমান ও অন্যান্য বহু জায়গায় প্রকল্প-সহকারী ছিলেন জয়ন্ত সাহা। বাউল ফকিরদের অগণিত আলোকচিত্র ও ডকুমেনটেশনের কাজে তাঁর উদ্যম স্মরণীয়। এই সূত্রে স্বতন্ত্র উল্লেখের দাবি রাখেন উত্তর দিনাজপুরের সুভাষগঞ্জের তরণীসেন মহান্ত। সমগ্র উত্তরবঙ্গের বহু অজানা বাউল গানের শিল্পী ও গীতিকার বাউলের জীবনতথ্য ও আলোকচিত্র তাঁর আন্তরিক সংগ্রহ। তিনি নিজে একজন আচরণবাদী ও বাউলশিল্পী বলেই তাঁর কাজে বাড়তি দরদ ও নিষ্ঠা লক্ষ করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেছে। উত্তরবঙ্গ থেকে সংগৃহীত অজস্র গানের পাণ্ডুলিপি থাকবে ভবিষ্যতের সমীক্ষার জন্য।

এই অনুসন্ধান নতুনভাবে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে সারা পশ্চিমবঙ্গের বাউল ফকির সমাজকে জানতে আর বুঝতে। সেই অনুভব থেকে বই লেখার সময় খেয়াল রেখেছি যাতে এটি নীরস বস্তুপুঞ্জ বা কেঠো বিবরণে ভারাক্রান্ত না হয়। এ বইয়ের প্রতিটি তথ্য বাস্তব ও জীবনস্পর্শী। ডকুমেনটেশনের প্রয়োজনে অজস্র বাউল ফকিরদের প্রত্যয় ও জীবিকা যেমন কাজে লেগেছে তেমনই সরাসরি তাঁদের জীবন পরিবেশ ও যাপনের উষ্ণতা আমাকে পদে পদে সমৃদ্ধ করেছে। এইসব অনুসন্ধান ও ভ্রমণে কেউ কেউ সঙ্গী হয়েছেন কখনও কখনও, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অবশ্য ছিলাম নিঃসঙ্গ। আলোকচিত্রকররূপে সঙ্গে গিয়ে মূল্যবান সহযোগিতা করেছেন রংগন চক্রবর্তী, দীপঙ্কর কুমার, সত্যেন মণ্ডল, জয়ন্ত সাহা, সঞ্জয় সাহা ও অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। আগেকার দুটি সংস্করণে ব্যবহৃত অনেক ছবি বর্জিত হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিকভাবে এবারকার নব সংস্করণে অনেক নতুন আলোকচিত্র যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের নাম অজয় কোনার, অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়, জয়ন্ত সাহা, তরণীসেন মহান্ত, দীপঙ্কর কুমার, দীপঙ্কর ঘোষ, রংগন চক্রবর্তী, ল্যাডলি মুখোপাধ্যায়, সত্যেন মণ্ডল, সঞ্জয় সাহা, সুগত চট্টোপাধ্যায় ও সুরজিৎ সেন। তাঁদের ধন্যবাদ! বেশ ক'টি জেলার তথ্য-আধিকারিকরা সাহায্য করেছেন বাউলদের জেলাওয়ারি পঞ্জি প্রণয়নে। ব্যক্তিগতভাবে আশ্রয় ও পরামর্শ দিয়ে কৃতজ্ঞ করেছেন বাঁকুড়ার ছান্দার গ্রামনিবাসী বন্ধু উৎপল চক্রবর্তী ও পুরুলিয়ার বন্ধু শ্যামাপ্রসাদ বসু। জিয়াগঞ্জের অধ্যাপক শ্যামল রায়, বড় আন্দুলিয়ার রামকৃষ্ণ দে, কোটাসুরের আদিত্য মুখোপাধ্যায়, মেদিনীপুরের সমীরণ মজুমদার ও দিব্যাংশু মিশ্র, ফকিরডাঙ্গার লিয়াকত আলি, সিউড়ির বাবলি ও প্রভাত সাহা এবং অমর দে, দুবরাজপুরের অনুপম দত্ত-র কাছে নানা সূত্রে ঋণ স্বীকার করি। বাউলফকিরদের নিজেদের ডেরা, পর্ণকুটির, আখড়া ও আশ্রমের চৌহদ্দির বাইরেও তাঁদের অন্যভাবে বারেবারে পেয়েছি নানা মেলা ও মহোৎসবে। সে সব জায়গায় তাঁদের মনের আগল খুলে যায়। ঘোষপাড়া, অগ্রদ্বীপ, শেওড়াতলা, জয়দেব-কেঁদুলি ও পাথরচাপুড়ির বার্ষিক সমাবেশে বহু বছর ধরে বহু তথ্য আহরণ করেছি, যা হয়তো অন্যভাবে পাওয়া যেত না। ১৯৯৬ সালে লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত বর্ধমানের গুসকরায় সমবেত ৪৮ জন বাউলের ওয়ার্কশপ ও সেমিনারে যোগ দিয়ে তাঁদের সান্নিধ্যে মজার মজার উপকরণ পেয়েছি। সেখানে নানা বর্গের ও নানা জেলার অনেক বাউলের সমাবেশ ঘটেছিল।

কাজটি যখন অর্ধপথে তখন সচিব চন্দনকুমার চক্রবর্তী অন্যত্র বদলি হয়ে যান এবং সচিবের দায়িত্ব নেন লোকসংস্কৃতিমনস্ক মরমি মানুষ প্রদীপ ঘোষ। তাঁর উৎসাহ আর সহযোগিতা আমাকে বিশেষভাবে প্রেরিত করেছে। বাউল ফকিরদের জেলাওয়ারি বর্ণানুক্রমিক তালিকা প্রণয়নের কষ্টসাধ্য অথচ সতর্ক কাজটি করেছেন আমার স্ত্রী নিবেদিতা চক্রবর্তী। আলোকচিত্র বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করেছেন প্রদীপ বিশ্বাস।

বইটির বিন্যাস সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা দরকার। এর স্পষ্টত দুটি ভাগ। প্রথম ভাগে আছে বাংলার বাউল ফকিরদের অতীত ও বর্তমানকে মিলিয়ে আমার বক্তব্য— যার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথ্যভিত্তি সরেজমিন সন্ধানজাত বাস্তব মালমশলা। এই অংশ লিখতে অনেক প্রাক্তন সূত্র বা তথ্যেরও সাহায্য নিয়েছি কিন্তু গড়পড়তা গবেষণা বইয়ের মতো পাদটীকা বা উল্লেখপঙ্ক্তিতে কণ্টকিত করিনি। করতে চেয়েছি এক সুখপাঠ্য প্রতিবেদন এবং বিশ্লেষণবহুল উদ্‌ঘাটন ও অবলোকন। দ্বিতীয় ভাগে আছে একজন ফকিরের আত্মকথা, দুজন ফকিরের আত্মবিবৃতি ও আমার প্রাসঙ্গিক ভাষ্য। তারপরে আছে একজন ফকিরের পদ্যে রচিত তত্ত্বসন্দর্ভ। এগুলি অনুসন্ধানসূত্রে সংগৃহীত। তারপরে আছে তিরিশটি ফকিরি গান আর ষোলোটি বাউল গান এবং অন্ধবাউলের রচিত একটি গান। এগুলি প্রধানত মৌখিক সূত্রে সরাসরি সংগৃহীত। বইয়ের পরবর্তী অংশে আছে দশটি গানের স্বরলিপি, যার কিছু বাউল কিছু ফকিরি— উৎসাহীজনেরা এগুলি চর্চা করলে বাংলার বাউল ও ফকিরিগানের বেশ ক'টি শৈলীর আস্বাদ পাবেন। সবশেষে আছে বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো ফকিরদের তালিকা এবং জেলাওয়ারি বাউলদের তালিকা এবং সেইসঙ্গে বাউল ফকিরদের আর্থ-সামাজিক পরিচয় সারণি। এইসব তালিকা সম্পর্কে দুটি স্বীকারোক্তি মনে রাখতে হবে। এক, এই তালিকা সম্পূর্ণ ও ত্রুটিমুক্ত নয়— অর্থাৎ এর বাইরে আরও বেশ কিছু বাউল ফকির থাকতে পারেন। দুই, তালিকার অন্তর্ভুক্ত দু'-চারজন ব্যক্তি তালিকা প্রণয়নের পরে প্রয়াত যেমন উত্তরবঙ্গের বলহরি দাস, নবাসনের হরিপদ গোঁসাই এবং নদিয়ার ষষ্ঠী খ্যাপা। আরও কেউ কেউ হয়তো মরলোকে নেই কিন্তু সে তথ্য জানা যায়নি। তিন, এ বইয়ের যাবতীয় ব্যক্তি-তথ্য ও পরিসংখ্যান ২০০২ সালের। তার পরিমার্জন বা পরিবর্ধন এখন আর করা সম্ভব নয়।

সব মিলিয়ে 'বাউল ফকির কথা' বইটি পশ্চিমবাংলার বাউল ফকিরদের সাম্প্রতিক অবস্থানের বিশ্বস্ত রূপরেখা উপস্থাপিত করতে প্রয়াসী। নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনায় এবং গৌণধর্মীদের প্রকৃত সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত নির্ণয়ে এই আগ্রহী রচনা কিছু তথ্য, তত্ত্ব ও জিজ্ঞাসা সংযোজন করতে পারলে পরিশ্রম সার্থক হবে। উজ্জ্বল হয়ে উঠবে লৌকিক সাধক ও লোকশিল্পীদের মুখশ্রী। তাঁদের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

৮ রামচন্দ্র মুখার্জি লেন
কৃষ্ণনগর ৭৪১ ১০১

সুধীর চক্রবর্তী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূর্য আর শিশির

বাংলার বাউলদের নিয়ে প্রথম সদর্থক রচনা ও অনুকূল মত-মন্তব্য পাওয়া গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের লেখায়। তাঁর মন একই সঙ্গে দেশজ প্রসঙ্গ আর আন্তর্জাতিক সংরাগে সাড়া দিতে পারত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের নিজস্ব নির্মাণে তথা বন্দিশে ভারতীয় রাগ সংগীত ও প্রতীচীর গানের ধারার সঙ্গে আনুপাতিক মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন লোকগান ও দেশজ কীর্তনের। তাঁর বিশিষ্ট মনের গঠনে একাধিক উপাদান মিশেছিল। তাই বিশ্ববোধের সঙ্গে লোকায়নের সহবাস তাঁর চৈতন্যে ছিল নিতান্ত স্বাভাবিক। আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়ানো ছিল তাঁর ঘোষিত অনুজ্ঞা, কেননা বিশ্বাস ছিল একমাত্র তাতেই বুকের মধ্যে বিশ্বলোকের জাগবে সাড়া— অথচ আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সৃষ্টি করার আততি ছিল প্রবল। সারা জীবনের যে-ধ্রুবপদ বাঁধতে চেয়েছিলেন বিশ্বতানের ছন্দে তার মধ্যে একতারার মান্যতাও ছিল সুসংগতভাবে। তাই আপন প্রতিভার বিপুল কিরণে ভুবন আলোকিত করার পরেও তাঁর মন স্পর্শ করতে চাইত শিশিরবিন্দুর অন্তর্গত আকুতিকে। এই দিক থেকে ভাবলে স্পষ্টতর হবে তাঁর আন্তর সত্য, যা মালা হতে খসে পড়া ফুলের একটি দল-এ লগ্ন হতে চাইত কিংবা ধূলিতে অবলীন ভ্রষ্ট ফুলের ধন্যতাকে বুঝতে চাইত। সেই সত্যবোধ আমাদের জানাতে চেয়েছিল, যার জন্ম ধূলিতলে তার অন্তর হতে পারে নিরঞ্জন অকলঙ্ক। জেনেছিলেন যেখানে থাকে সবার অধম দীনের থেকেও দীন সেইখানেই ঘটে প্রার্থিতের পদপাত।

তা হলে আশ্চর্যের কী আছে যখন দেখি নিরুপাধি অমানী বাউলদের তিনিই প্রথম শ্রদ্ধা আর ভালবাসার সঙ্গে হাজির করলেন বিশ্বমঞ্চে? বাউলদের অন্তরতম সত্যের অনুভব তাঁকে এতটাই উদ্বেল করেছিল যে তাদের রচনা সংগ্রহ ও প্রকাশে তিনি হয়েছিলেন কুণ্ঠাহীন। ঐতিহ্যের পথে চলমান এই মুক্ত সাধকদের চর্যা আর তাঁর সত্যানুসন্ধান মিশে গিয়েছিল এক বিন্দুতে। তারপরে নানা রূপান্তরের বাঁকে রবীন্দ্রজীবন ও রচনাবলি এগিয়ে গেছে বিচিত্রগামিতার সাগর সংগমে। কিন্তু তাঁর প্রদর্শিত দিশা নিয়ে বাউলদের জীবন ও গানকে পরবর্তী প্রজন্ম যে যথাযথ মান ও মর্যাদায় সম্পূর্ণভাবে উদ্‌ঘাটন বা বিশ্লেষণ করতে পেরেছেন তা মনে হয় না।

উদ্‌ঘাটন ও বিশ্লেষণের এই অক্ষমতার কারণ কি? সবচেয়ে বড় কারণ বাউলদের সঙ্গে 'ভদ্রলোক'দের অপরিচয় ও অবস্থানগত লক্ষযোজন ফাঁক। গ্রামিক জীবনের সঙ্গে স্বাভাবিক মুক্ত ছন্দে গাঁথা বাউল ফকিরদের স্বরূপ ও অন্তর্জীবন ভদ্রশ্রেণির নাগরিক অনুসন্ধানের সূত্রে কীভাবে সঠিক উন্মোচিত হতে পারে? তা ছাড়া তারা তো স্বভাবত ও আচরণগতভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজে একটা সূক্ষ্ম আড়াল রচনা করতে চায়। চেষ্টিত অন্তরাল সৃষ্টি করে যুগল সাধনায় গড়ে তোলে এক রহস্যময় ও গোপ্য কায়াবিশ্ব। রবীন্দ্রনাথকে এই জায়গায় এসে আধুনিক জিজ্ঞাসুদের মতো প্রতিহত হতে হয়নি— কারণ তিনি বাউলদের নিয়ে কোনও সরেজমিন সন্ধান করেননি। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের ধারায় বা সমাজ-নৃতত্ত্বের বিদ্যাচর্চার অনুক্রমে তাদের বুঝতে চাননি। তাদের প্রচ্ছন্ন গোষ্ঠীজীবন, একক অথচ সংহত সমাজ, যা একই সঙ্গে মরমি অথচ প্রতিবাদী, তাকে তিনি অনুধাবন করতে পারেননি। বাউলগানকে তাই তাঁর মনে হয়েছিল একক মানুষের আন্তরিক উচ্চারণ বলে।

তাঁর পরবর্তী কালের সন্ধানীদের বীক্ষায় বাউল চর্চা কঠিনতর হয়ে পড়েছে— অর্থাৎ রবীন্দ্রপরবর্তী অনুসন্ধানীদের পক্ষে বাউল গান কোনও ভাবময় উচ্ছ্বাসমাত্র নয়। অনেকটাই তা যাপনগত বাস্তব আর মুক্তমনের নর-নারীর যুগল সাধনাজাত অনুভবের স্ফুরণে ইহবাদী। এ গানে আছে আচরণগত বিশ্বাসের সত্য, যা পরিপার্শ্বের প্রতিকূলতায় টলে না বরং উচ্চবর্ণ ও সাম্প্রদায়িক ধর্মের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করতে পারে। সেইদিক থেকে বাউল ও ফকিররা একক অথচ নিঃসঙ্গ নয়। তার বিশ্বাসের ভিত্তিতে আছে প্রেমানুভূতির অস্মিতা, গুরুর বাক্যে নিষ্ঠা এবং বহুদিনের পরম্পরাজাত পথ। তাদের পথচলা সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়। বেদান্ত, সাংখ্য, তন্ত্র, সিদ্ধযোগী আর সহজিয়াসেবিত সমৃদ্ধ ও নিজস্ব এক লোকপথ তার সামনে মেলা রয়েছে। সেই পথকে যে খুঁজে পায়, তাকে আর সামাজিক সমুন্নতির আড়াআড়ি পথটি খুঁজতে হয় না— তার আকর্ষণ ও কুহক তাকে টানে না। সে হয়ে ওঠে সামাজিকতামুক্ত মানুষ, লজ্জা-ঘৃণা-ভয়ের উর্ধ্বে উঠে সে 'existing order of things'-এর পরিমণ্ডল ভেঙে এগিয়ে চলে অন্তরের পাথেয় নিয়ে।

আধুনিক বীক্ষায় লোকায়ত সংস্কৃতি সেইজন্য অনুধাবন করা কঠিন। সেই সংস্কৃতি প্রথমত অন্তর্গুপ্ত ও আত্মময়— কিছুটা বা অস্পষ্ট ও অপরিচিত— গ্রামে গ্রামে সুদূরবর্তী। তারা তো আমাদের কাছে আসবার প্রয়োজন বোধ করে না, তাই আমাদের যেতে হয় তাদের কাছে, সেই অভিযাত্রা আমাদেরই আত্মানুসন্ধানের স্বার্থে, শিকড়ের খোঁজে। গবেষকের তথ্যসন্ধানের চেয়ে মরমির অন্তর্দৃষ্টি তার মূল পাথেয়।

পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ক্ষিতিমোহন, মনসুরউদ্দিন, উপেন্দ্রনাথ বা অন্য সব সংগ্রাহকদের মাত্রার তফাত অনেকটা। বাউল গান হঠাৎই এসে পড়েছিল রবীন্দ্র মানসে, স্বচ্ছ দর্পণের মতো তাঁর সমুৎসুক মনে তা সঙ্গে সঙ্গে ছায়াসন্নিপাত করেছিল। তার অকৃত্রিমতা ও অন্তঃসঞ্চারী ভাবলোক তাঁর চেতনায় অনুরণন তুলেছিল, তিনি তাদের স্বপক্ষে কলম তুলে নিয়েছিলেন। চিহ্নিত করেছিলেন তাদের উচ্চারণের মৌলিকতা। কিন্তু এর পরের ধাপে তিনি যাননি। জানতে চাননি তাদের জীবন পরিবেশ, গুরূপদেশের গূঢ়তা, প্রতিবাদী সত্তার স্বরূপ কিংবা ক্ষুৎকাতর দৈনন্দিনের বার্তা। বাউল গান থেকে চুইয়েপড়া অমৃতলোকের বার্তাতে তাঁর পিপাসার্ত মন ভরেছে। তাঁর পরবর্তী সন্ধানীদের সামনের পথ কিন্তু ছিল উপলকীর্ণ। তাদের পদে পদে প্রতিহত হতে হয়েছে নানা দ্বান্দ্বিক সমস্যায়। কে বাউল, কে বৈষ্ণব, কে সহজিয়া? বাউলপন্থা আর ফকিরিপন্থার তফাত কোনখানে? এইসব মগ্ন অন্তর্দীপ্ত সাধক গানের শব্দসংকেতে যা বলেছেন তার প্রকৃত 'text' কী? নানা অঞ্চলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছড়ানো ছিটোনো বাউল আর ফকিরদের মধ্যে বিশ্বাস আর গানে কি প্রচুর পার্থক্য নেই? বাউল গানের সংগীতিক ছাঁদ বা সুরকাঠামোর আঞ্চলিক পরিমণ্ডল কি বেশ আলাদা নয়? যে যৌন-যৌগিক সাধনা গুরুনির্দেশিত, সেই গুরুতে গুরুতে কতখানি ভেদ আছে, তা বুঝতে গেলে ব্যাপক পরিভ্রমণ জরুরি নয় কি? সবচেয়ে বড় কথা, এই বর্গের গান সহজপ্রাপ্য নয়। যা সহজপ্রাপ্য তাতেও কোথাও কোথাও ভেজাল আছে।

ভেজাল প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ। একটা সময় ছিল যখন গ্রাম সমাজের প্রান্তিক মানুষরূপে বাউল ফকিররা বেঁচেবর্তে থাকত মাধুকরী করে। নিজেদের আখড়ায় নিজেদের মতে সাধনভজন করত, গান গাইত। গ্রামসমাজ তাদের সমাদরও করত না, ঘৃণাও করত না। তারা কৃষিজীবী ছিল না, জমিজিরেতে তাদের কোনও আগ্রহ ছিল না। তাই কোনওরকম সংঘাত সংগ্রামে তাদের অংশ ছিল না। শান্ত, ভক্তিমান, উচ্চাশাহীন এমন মানুষদের কেই বা শত্রু হবে? কিন্তু পট পালটে গেল গত তিন দশকে। এ বর্গের রহস্যমাখানো গান হঠাৎ হয়ে উঠল ভোগ্যপণ্য, বিশেষত শহরবাসী মধ্যবিত্তদের। তারা এসব গানে খুঁজে পেল সমাজসত্যের দ্যোতনা আর উচ্চবর্গের শোষণ দমনের প্রচ্ছন্ন ইতিহাস। লালন আর দুদ্দু শাহ-র গানে, পাঞ্জু শাহ বা হাসন রজার বাণীময়তায়, রশীদ-জালাল-দীন শরৎ-যাদুবিন্দুর উচ্চারণে খুঁজে পেল মধ্যবিত্ত ভাবনার সঙ্গে সমঞ্জস নানা সারকথা। জাতপাতবিরোধী বাউল গানের টেক্সট রাজনীতিসচেতন মানুষের পক্ষে ব্রহ্মাস্ত্র হয়ে উঠল। ক্রমে এ পথেই ঢুকে গেল সদ্যতনকালের ভেজাল গীতিকার। বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তারা লালন কিংবা অন্যের ভণিতার আড়ালে চালিয়ে দিল ব্যক্তি বা দলের ফরমান। লালনের নামে বহুপ্রচারিত এমন একটি গান এইরকম :

AMARBOI.COM

এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে
সেদিন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান
জাতি গোত্র নাহি রবে।
শোনায়ে লোভের বুলি
নেবে না কাঁধের ঝুলি
ইতর আতরাফ বলি
দূরে ঠেলে না দেবে।
আমীর ফকির হয়ে একঠাঁই
সবার পাওনা খাবে সবাই
আশরাফ বলিয়া রেহাই
ভবে কেউ নাহি পাবে।
ধর্ম কুল গোত্র জাতির
তুলবে না গো কেহ জিগির
কেঁদে বলে লালন ফকির
কে মোরে দেখায়ে দেবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লালনের নামের আড়ালে কোনও আধুনিক সাম্যবাদীর স্বপ্নাদ্য রচনা এ-গান তাতে সন্দেহ নেই— উদ্দেশ্যও স্পষ্ট। হিন্দুমুসলমানবৌদ্ধখ্রিস্টান সকলকে নিয়েই গানের শরীর গড়ে উঠেছে, ভাবা হয়নি যে লালনের সময়ে (আঠারো-উনিশ শতকের সন্ধিকালে) জাতিভাবনার এত বিস্তার ছিল না, অন্তত প্রত্যন্ত গ্রামে। মুসলমানের বর্ণভেদ প্রসঙ্গে আশরাফ-আতরাফ বিভাজন লালনের কালে পল্লিগ্রামে থাকা কি সম্ভব? আর আমির ফকির সবাই যে যার পাওনা পাবে এমন সাম্যচিন্তা তো অভিনব, তবে স্বপ্নহিসাবে সুন্দর। লালনের শত শত গান যাঁদের নাড়াচাড়া করবার সুযোগ হয়েছে তাঁরা মানবেন যে এত দুর্বল রচনাশৈলী ও এমন খেলো অন্ত্যমিল (*রবে, দেবে, পাবে, দেবে*) লালন-গীতির কোথাও থাকতে পারে না। সবচেয়ে কাঁচা কাজ হয়েছে 'কেঁদে বলে লালন ফকির' পদটি লেখা। লালন তাঁর কোনও পদে কখনও 'লালন ফকির' শব্দটি লেখেননি। তা ছাড়া সিরাজ সাঁইয়ের নাম নেই কেন? এত সব খুঁত বিচারের পরে আরও দুটি তথ্য বিচার্য থাকে। দুই বাংলার কোনও মান্য লালনগীতি সংকলনে এ-গানটি নেই এবং কোনও পরম্পরাগত গানের আসরে সাধক বা প্রখ্যাত গায়ক বাউল-ফকিরের কণ্ঠে গানটি কেউ শোনেননি। তা হলে?

এখনকার গবেষকদের মধ্যে যাঁরা বাউল ফকিরদের আখড়া বা আস্তানায় গিয়ে সরাসরি যোগাযোগ করেন তাদের সঙ্গে, সমাজ-অর্থনীতিগত অবস্থান বুঝতে চান, এমনকী দু'-চার দিন বসবাসও করেন তাদের দরিদ্র জীবনের শরিক হয়ে, তাঁদের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা হয়। অভিজ্ঞতার তারতম্য ঘটে বেশ বড়রকম। দুটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ দিতে পারি। বীরভূমনিবাসী আদিত্য মুখোপাধ্যায় বহুদিন ধরে গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরে বাউল সঙ্গ করেছে, কেঁদুলির মেলাতেও সে সাম্বৎসরিক যাত্রী। তার ব্যক্তিগত ধারণা যে বেশ ক'জন গায়ক-বাউল (অন্তত বীরভূমের) বিদেশি-বিদেশিনীর পাল্লায় পড়ে নষ্ট ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। তাদের গানের ভাব এবং কণ্ঠ সম্পদ ম্লান হয়ে যাচ্ছে, তারা গ্রস্ত হয়ে পড়ছে শ্বেতাঙ্গিনীদের দেহগত কামনায় ও অর্থলালসায়। বিদেশ যাত্রার মোহে তারা বিবাহিতা স্ত্রীদের ত্যাগ করছে বা উপেক্ষা করছে। আদিত্য এমনতর অনেক বাউলের নামধাম জানিয়ে শেষমেষ ক্ষোভ প্রকাশ করেছে :

> বর্তমানের বাউলরা অবশ্য পূর্ণদাসের সম্মান ও প্রচার-প্রতিপত্তির দৌলতে ভারতীয় সংস্কৃতিকে ক্রমশই বিকিয়ে বেড়াচ্ছেন বিদেশের বাজারে। সাহেব-মেম এবং এদেশীয় শিক্ষিত দালালরা চিবিয়ে যেমন খাচ্ছেন বাউলের মাথাটা, তেমনি একইভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিকে দেউলিয়া করে ছাড়ছেন বিদেশের চোখে। গরীব বাউলদের বা গায়কদের দোষ দেব না ততখানি। কারণ ক্ষুধার্তের কাছে ভাতের থালা অনেক মূল্যবান। সুতরাং বাউল হলেও যে মানুষ, তার গাড়ি-বাড়ির লালসা থাকতে দোষ কোথায়?

আদিত্য-র বাউল সমীক্ষার দৃষ্টিকোণের বিরুদ্ধতা করে গবেষক শক্তিনাথ ঝা বলেছেন সম্পূর্ণ উলটো কথা। তাঁর অভিজ্ঞতা ও অবলোকনও উপেক্ষা করা যায় না। তাঁর ধারণা :

> বাউলদের জীবনযাপন প্রণালী, মানুষকে আপন করার পদ্ধতি, বাদ্যযন্ত্রগুলি, বেশ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গানের তাল ও পরিবেশন রীতি বিশিষ্ট। এগুলি এক শ্রেণীর বিদেশী শিল্পী ও গবেষকদের আকর্ষণ করে। দরিদ্র বিদেশী পর্যটকরা রাঢ়ের বাউলদের ঘরে অল্প টাকায় থাকে এবং প্রতিদানে নিজেদের দেশে বাউলদের আশ্রয় ও সামান্য উপার্জনের ব্যবস্থা করে দেয়। বাউলদের গানবাজনা শেখেন অনেকে। এগুলি আত্মীকরণ করেন অনেকে। (নীরবতার) এক লোকনাট্যের সন্ধান পান বাউলদের মধ্যে অনেকে।... ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার প্রতীক হিসাবে ওরিয়েন্টালিজমের সূত্রেও এক শ্রেণীর নারী ও পুরুষ বাউলদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন।

এবারে শোনা যেতে পারে লিয়াকত আলির অভিজ্ঞতা। সে যে শুধু সন্ধানী বিদেশিনীদের সঙ্গ করেছে তাই নয়, হয়েছে তাদের ভ্রমণসঙ্গী ও বন্ধু। বাউল অনুরাগী বহু বিদেশি যুবতী ও যুবককে সে জানে। তার ভাষ্য হল :

সিরিয়া কায়ারমা মেয়েটি কবি। ভীড় হট্টগোল গান বাজনায় সে উজ্জ্বল অংশ নেয়। সময়ে আবার একেবারে নির্জনে থাকে। বিশ্বনাথ দাস বাউলের বাড়ি তার বন্ধুদের স্থায়ী ঠিকানা। সে ওখানে থাকলেও আবার শুধু আলাদাভাবে একা থাকার জন্য শান্তিনিকেতনে নিয়েছে এক ভাড়াঘর।... বাউলরাও এর ঘরটার কথা জেনে গেছিল। ফলে কেউ না কেউ এসে যেত। চলত গানবাজনা ও ফুর্তি।

সিরিয়া কায়ারমার বিবরণ পড়লে অবশ্য তাকে কোনওভাবে শক্তিনাথ ঝা-কথিত 'দরিদ্র বিদেশী পর্যটক' পর্যায়ে ফেলা যায় না। তার অর্থবিত্ত এতটাই যে লিয়াকতকে নিয়ে প্রয়াগ, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, হৃষিকেশ, দিল্লি, আগ্রা, ঘুরিয়ে আজমীর শরীফ গেছে। সর্বত্র থেকেছে হোটেলে। লিয়াকত বুঝতে পারে :

AMARBOI.COM

সবাই শুধু শুধু ঘুরতে আসে না। যেমন জনির সেক্সোফোনে বাউল গানের সুর বাজানো শিখে নিতে আসা। পিটারও এসেছিল একই উদ্দেশ্যে বেহালা নিয়ে।... বাউলের গুপ্ত সাধনার প্রতি বিদেশিনীদের সেরকম আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না। যদি থাকত তবে তারা বাউল গায়কদের পিছু পিছু না ঘুরে সেই গোপন ক্রিয়া জানে বলে যারা খ্যাত সেই বাউল সাধুদের সঙ্গে ঘুরত। কিন্তু কার্যত কোন বিদেশিকেই কোন সাধুকে আশ্রয় করে ঘুরতে বা থাকতে দেখিনি। আসলে তারা গুহ্য সাধনা নয়, গায়ক বাউলদের গান ভাব নৃত্য ও আনন্দমত্ততাকেই ভালবেসেছে। তবে রুচি ও প্রকৃতি অনুযায়ী— এক এক বিদেশিনী এক এক বাউলকে বেছে নেয় মাত্র।

আদিত্য, শক্তিনাথ আর লিয়াকত তিনজনই দক্ষ সংগ্রাহক ও বাউলপ্রেমী— অভিজ্ঞতাও ঈর্ষাজনক। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সাম্প্রতিক কালের অর্থাৎ গত কয়েক দশকের বাউল ও বিদেশিনীর প্রসঙ্গ তাঁরা একেকভাবে দেখেছেন। এখনকার বাউল-ফকিরদের নিয়ে তথ্যভিত্তিক সরেজমিন অনুসন্ধানের এটি এমন সংকট যা কখনও প্রাক্তন গবেষকদের ভোগ করতে হয়নি। তার প্রধান কারণ, তাঁদের কালে এত রকম এবং এত বিচিত্র চরিত্রের সন্ধানী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলেন না। অভিজ্ঞতার বলয়ও নানা জেলায় বিস্তৃত ছিল না। এখন সারাবছরে বহুরকম মেলা, মচ্ছব, দিবসী বা সাধুগুরু সেবার অনুষ্ঠান হয়। তার হদিশ এবং বহুক্ষেত্রে নিমন্ত্রণ এসে যায় আমাদের কাছে। বাউল ফকিররাই তার হদিশ দেয়। এইভাবে হয়তো সোনামুখি থেকে খয়েরবুনি, সেখান থেকে নবাসন, আমরা একেক আখড়ায় সাধুসঙ্গের উৎসবে হাজির হই। ফাল্গুনে ঘোষপাড়া, চৈত্রে অগ্রদ্বীপ, শেষচৈত্রে পাথরচাপুড়ি, জ্যৈষ্ঠে আড়ংঘাটা এই ক্রমে এসে যায় বাৎসরিক মেলা ও সেই সুবাদে একত্রে থেকে বাউল ফকিরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুযোগে তারা একে একে খুলে ফেলে তাদের নিষেধের বেড়া। নিশীথের নিভৃতে বলতে থাকে নিজেদের কথা, নানা নারীসঙ্গিনীর সঙ্গে সাধনার কথা, এমনকী দুঃখ দারিদ্র্যের কথা, ব্যক্তিগত সমস্যার কথা। কেউ কেউ সংযত থাকে আত্মভাষণে, অনেকে হয়ে ওঠে গদগদভাষী। অনেক লঘুচিত্ত প্রচার-পিয়াসী যুবক বাউল, বেশ বুঝতে পারি, অনেক কথা বলে ফেলে বানিয়ে বানিয়ে। এখন আবার সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে নারীসাধিকা, বাউল গায়িকা আর পেশাদার নানা গীতিকার। বাউল নয় যারা তারাও এখন বাউল গায়, বাউলতত্ত্ব আওড়ায়।

আরেকটা সমস্যা এই যে, 'বাউল' কথাটা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে এক Generic সংজ্ঞা। সবাই আসতে চাইছে বা বিবেচিত হচ্ছে বাউল বলে। যথার্থ বাউল কে, কী তার জীবনাচরণ, তার করণকারণ, কী তার অঙ্গবাস, সে সব কে নির্ণয় করেছে? একটু ঘনিষ্ঠ বিচারে হয়তো দেখা যাবে কেউ কর্তাভজা, কেউ পাটুলি স্রোতের সহজিয়া, কেউ জাতবৈষ্ণব, কেউ সাহেবধনী, কেউ মতুয়াপন্থী, কেউ যোগী— কিন্তু সকলেই ঢুকে গেছে বাউলের সর্বজনীন পরিচয়ের গৌরবে— কারণ বাউলদের গ্রহণীয়তা সমাজে আজকাল খুব ব্যাপক। কুষ্টিয়া অঞ্চলের ফকিররা সাদা আলখাল্লা ও তহবন্দ পরে, বাবরি রাখে, কিন্তু নিজেদের বলে বাউল। আবার পশ্চিমবঙ্গের ঝুঁটি বাঁধা গেরুয়াধারীরাও বাউল। শক্তিনাথ ঝা একটু রসান দিয়ে জানিয়েছেন :

> শান্তিনিকেতনকেন্দ্রিক বীরভূমে ভদ্রলোক এবং বিদেশীদের কাছে বাউল খুব আকর্ষণীয় ও সম্মানীয় বলে বিবেচিত হয়। তাই এ অঞ্চলে চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ, অধ্যাপক, শিক্ষক বহুজন বাউল বলে পরিচয় দিয়ে বিদেশী এবং ভদ্রলোকদের চোখে পড়তে চায়। এখানে বাউল হিন্দু এবং বিশিষ্ট সাজে সজ্জিত। মুসলমান গায়কেরা এখানে ফকির।... আর এ অঞ্চলের জাত-বৈষ্ণব গায়কদের ধারণা যে তারাই যথার্থ বাউল। অন্যেরা অন্যায়ভাবে বাউল সাজছে।

তাঁর পরিবেশিত আরেকটা সংবাদ বেশ মজার। লিখছেন,

> জনৈক ডোম সম্প্রদায়ভুক্ত বোলপুরের গায়ক জার্মানীতে গান করতে গেলে, সুরীপাড়ানিবাসী বিশ্বনাথ দাসের পুত্র গায়ক আনন্দ দাস মন্তব্য করেন, 'আমরা তিন চার পুরুষ ধরে আসল বাউল, ওরা হালের সাজা বাউল।'

সাজা বাউল এবং শিক্ষিত শ্রেণির রচিত বাউল গান বাংলায় অবশ্য বহুকাল ধরে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লালনের মতো যথার্থ বাউল যখন জীবিত ছিলেন তখনই কাঙাল হরিনাথ ফিকিরচাঁদি ঢঙে বাউল গান লিখে এক বিশেষ সাংগীতিক মোড়কে সেগুলি সাজিয়ে গাইতেন এবং দল বেঁধে গেয়ে বেড়াতেন বহু জায়গায়। সেই ঐতিহ্য এখনও আছে। বাউল সাধনা করেন না, গানেও তত্ত্ব নেই, অথচ হালকা চালের অনেক গান লিখে বেশ নাম করেছেন এমন অনেক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বাউল গান আমার সংগ্রহে আছে।

কিন্তু এটাও বিশেষভাবে লক্ষ করবার বিষয় যে, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে জেলাওয়ারি সমীক্ষা করলে মোটামুটি কয়েকটি অঞ্চলে বাউলদের স্বাভাবিক বংশানুক্রমিক হালহদিশ মেলে— কোনও কোনও জেলায় বাউল পাওয়া দুর্লভ। যেমন জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, দিনাজপুরের অনেকটা। হাওড়া, দক্ষিণবঙ্গ, হুগলি ও উত্তর চব্বিশ পরগনায় বাউল সাধক প্রায় নেই, কিছু পেশাদার গায়কের সন্ধান মেলে। মেদিনীপুর ও পুরুলিয়ায় যাকে বলে বাউল ঐতিহ্য বা পরম্পরাগত শ্রেণি, তা নেই। বিচ্ছিন্ন কিছু সাধক বা গায়ক রয়েছেন। তবে বাউল সম্মেলনে বা সরকারি বদান্যতার গন্ধ পেলে অনেকে এসে পড়েন। জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরে নিজের নাম পঙ্‌ক্তিভুক্ত করবার ব্যাপারে তাঁদের উৎসাহ ও সক্রিয়তা দর্শনীয়। পেশাদার ঝুমুরশিল্পী আমাকে বাউল বলে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হননি। মেদিনীপুরের একজন গণসংগীতশিল্পী তাঁর লেখা বাউল গান আমাকে পাঠিয়েছেন। সে গানগুলি তিনি গেয়ে থাকেন। শ্রোতারাও তারিফ করেন।

বাউল গানের অনুসন্ধানে গিয়ে পুরুলিয়ায় 'সাধুগান' নামের একরকম গান পেয়েছি যা ভাবের দিক থেকে শান্তরসাশ্রিত ও নির্বেদমূলক। বাউলগানের কোনও কোনও পর্যায়ের সঙ্গে সাধুগানের বেশ কিছু মিল পাওয়া যায়। দেহতত্ত্ব, সহজসাধনা ও বৈরাগ্য— বাউল গানের এমনতর বিষয়গুলি সাধুগানের উপজীব্য। আসলে বাউল ফকিরদের গানের সীমানা নির্ধারণ কোনওভাবেই প্রশাসনিক জেলাসীমার নিরিখে করা যায় না। বরং অঞ্চল নির্ধারণ সহজতর। যেমন ধরা যাক রাঢ়বঙ্গ। বীরভূম-বর্ধমান-মুর্শিদাবাদ ঘিরে প্রসারিত বাউলদের সবচেয়ে সম্পন্ন অঞ্চল, ফকিরদেরও। পশ্চিম সীমান্ত রাঢ়ের বাঁকুড়া জেলার বহু অঞ্চল বাউলদের বসবাসে সমৃদ্ধ, কিন্তু এ অঞ্চলে আচরণবাদী বা গায়ক ফকির প্রায় নেই। নদিয়া-কুষ্টিয়া-পাবনা-যশোহরে বহুদিনের ঐতিহ্যগত এক বাউলফকির পরম্পরা ছিল, আজও আছে। মুর্শিদাবাদ আর নদিয়ার গ্রামাঞ্চলে হিন্দুমুসলমান সমাজসাম্য বিস্ময়কর রকম সজীব। সরেজমিন সমীক্ষায় দেখা যায়, এই অঞ্চলে হিন্দু মুসলমানের ভাবের লেনদেন খুব বেশি— বাউল ও ফকিরের মর্মমিলন উদাহরণীয়। গানরচনার সজীব ধারা এখানে এখনও বহমান, অতীতদিনের বহু বিখ্যাত গীতিকারও এই ভূমিখণ্ডের সন্তান। সাধক বাউল ও ফকির এখনও নদিয়া-মুর্শিদাবাদে সবচেয়ে বেশি। গায়কদের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞদের সংখ্যা এ অঞ্চলে লক্ষণীয়। নদিয়া জেলার ক্ষেত্রে আলাদাভাবে দেখা যাবে, খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত কিছু মানুষ বাউলবিশ্বাসেও স্পন্দিত। তাঁদের গানে অন্য এক সমাজ-সত্যের চেহারা ফুটে ওঠে— জেগে ওঠে উদার ও অনাবিল গ্রাম্য লোকায়তের স্বস্তিকর প্রতিবেশ। মুর্শিদাবাদেই সম্ভবত সবচেয়ে বেশিসংখ্যক বাউলফকির আছেন এবং তাঁদের অস্তিত্বের সংকট সবচেয়ে তীব্র। প্রধানত জনবিন্যাসের কারণে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার চাপে এ-অঞ্চলের মারফতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফকিরদের তিন দশক ধরে নির্যাতিত হতে হচ্ছে মৌলবাদীদের হৃদয়হীন অনুশাসনে। নদিয়া বা বীরভূমেও মৌলবাদীদের চাপা অসন্তোষ আছে কিন্তু জনবিন্যাসের কারণেই সম্ভবত তার উৎকট প্রকাশ নেই। উত্তরবঙ্গের চিত্র এ সবের তুলনায় অনেকটা অন্যরকম। মালদহ জেলায় বাউলদের সন্ধান মিলেছে তবে উল্লেখযোগ্য নয়। উত্তরবঙ্গের ব্যাপক জনপদে দেশবিভাগের আগে বাউল ফকিরদের যে চলমানতা ছিল তা এখন বহুলাংশে ক্ষীণ। পাবনা-রংপুর-দিনাজপুর ঘিরে প্রধানত লালনপন্থীদের ব্যাপক বসবাস ছিল। দেশবিভাগের অমোঘ আঘাতে সেই জনপদ এখন বিপন্ন ও বিচ্ছিন্ন। কিন্তু বাস্তুহারা বেশ কিছু সাধক ও গায়ক এ পারে চলে এসে প্রথম কিছুদিন নীরব ও বিভ্রান্ত ছিলেন। দিনাজপুর, রায়গঞ্জ, কোচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলে এ বর্গের গান ও গায়কসমাজ কোনওদিন ছিল না, ফলে গড়ে উঠেনি বাউল গানের মরমি শ্রোতৃসমাজ। তারপর গত দুই দশকের নিরন্তর প্রয়াসে এখন উত্তরবঙ্গেও পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর গীতিকার ও গায়ক এবং সারারাত ধরে গান শোনার বিপুল শ্রোতার সমাবেশ। লক্ষ করা যায়, উত্তরবঙ্গের বাউলবর্গের গান মূলত বিচারমূলক তত্ত্বগর্ভ। হালকা গান বা বাজনা-গানের শিল্পী সেখানে দুর্লভ। চটকদারি পরিবেশনরীতি বা উৎকট বেশবাস সেখানে প্রচলিত নেই। গানের পরিবেশ অনেকটা শুদ্ধ ও শান্ত, ভক্তিনম্র। বাউলদের মধ্যে মঞ্চে ওঠার বা বিদেশযাত্রার তেমন কোনও ত্বরা নেই, সুযোগও নেই, তাই নিজেদের মধ্যে লড়াই কম। প্রত্যন্ত জেলাবাসী উপেক্ষিত উত্তরবঙ্গব্যাপী বাউলদের ব্যাপারে এ-দিককার মধ্যবিত্ত গবেষক ও পত্রপত্রিকার উৎসাহ কই? তাঁদের সম্পর্কে তাই কোনও প্রতিবেদন পাওয়া কঠিন।

ফকিরদের সম্পর্কে প্রকৃত আঞ্চলিক অনুসন্ধান সবে শুরু হয়েছে। আজকালকার নানা ধরনের লোকায়ত গানের আসরে আর মেলায় কিছু কিছু ফকিরি গান শোনা যাচ্ছে। গড়ে উঠছে ফকিরি গানের গায়কবাদক। তাঁদের কখনও বিদেশে নিয়ে যাবার কথা ভাবা হয়নি, কারণ তাদের গ্ল্যামার নেই। প্রধানত ভিক্ষাজীবী কিছু ফকিরকে আমরা দেখতে অভ্যস্ত, গায়কহিসাবে তাদের মান খুব উঁচু নয়। আসরে সাধারণত তারা লালনের গান গায়, কিন্তু তাত্ত্বিক অর্থে ও গায়নরীতিতে লালনগীতি প্রধানত বাউল ঐতিহ্যবাহী, তাই ফকিরি গানের নামে লালনের গান শোনানো বেশ স্ববিরোধী। অথচ রাঢ়বাংলায় বেশ কিছু উচ্চস্তরের ফকির আছেন এবং মৌলিক ভাবনার ফকিরি গান দুষ্প্রাপ্য নয়। সে সব গানের সংগ্রহ কাজ কয়েক বছর হল চলছে। এ ভাবেই পাওয়া গেছে কবু শা-র গান, মহম্মদ শা-র গান এবং দায়েম শা-র গান— তিনজনেই বীরভূম জেলার। সে জেলার পাথরচাপুড়ির দাতা বাবার মেলায় বাংলার বহুরকম ফকির আসেন, গানের আসর বসে। মুর্শিদাবাদ আর নদিয়াতে বেশ ক'জন ফকিরি গানের গায়ক রয়েছেন। ঘুড়িষা-ইসাপুরের গোলাম শাহ গায়করূপে খুব জনপ্রিয়। তিনি নিজেই কবুল করেছেন মাসে কুড়ি-পঁচিশটা প্রোগ্রাম করেন, হাজার পাঁচেক টাকা মাসিক রোজগার— তাতে খুব ভালই চলে যায়। তবে সকল গায়কের এমন সচ্ছলতা নেই। আজকাল মহিলা মুসলিম গায়িকারাও ফকিরি গানে চলে আসছেন পেশাদারি চালে। ফকিরি সাধনা মূলত ভাবের সাধনা, তাতে জপধ্যান জিকিরের কাজ, দমের ক্রিয়াকরণ প্রধান। প্রকৃত ফকিররা তেমন ভ্রমণশীল নন, যে-যার ডেরাতেই ডুবে থাকেন নিবিষ্ট হয়ে। দু'-একজন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাজানো ফকির গায়ক দেখেছি, বিশেষত বর্ধমান জেলায়। পরনে ঝকমকে সিল্কের চুস্ত্ ও শেরওয়ানি, ভেলভেটের জ্যাকেট, মাথায় জরির-কাজ করা বাঁকানো তাজ। গানে অবশ্য কোনও গভীরতা নেই।

বাউল বলতে 'বীরভূমের বাউল' শব্দবন্ধটি কিংবদন্তির মতো প্রসিদ্ধ। এই প্রসিদ্ধির একটা বড় কারণ স্থান-মাহাত্ম্য— একদিকে জয়দেব-কেঁদুলির মেলা, আরেকদিকে শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা। আরেকটি কারণ ব্যক্তিমাহাত্ম্য— যার মূলে নবনীদাস আর তাঁর প্রখ্যাত পুত্র পূর্ণদাস। জয়দেবের পৌষ সংক্রান্তির মেলা, অন্তত আমার অভিজ্ঞতায়, সবচেয়ে বৃহৎ পরিসরের মেলা, যেখানে বহুকাল ধরে বহু বাউল সাধক ও গায়ক সম্প্রদায় আসছেন। এখানে বাউলের আসরে গান শোনেননি এমন মধ্যবিত্ত বাঙালি খুব কম। এমনকী কলকাতা ও অন্যান্য বড় শহর থেকে প্রচুর বাউল রসিক ও ছাত্রছাত্রী জয়দেবে যান— লেখক, শিল্পী, অভিনেতা, বাস্তুকার, অধ্যাপক ও সাংবাদিকদের পক্ষে কেঁদুলি বাৎসরিক মুখবদলের পীঠস্থান। অবাধ গঞ্জিকাসেবন এবং গানের আসরের আকর্ষণ অনেককে টানে ঠিকই কিন্তু খাঁটি বাউল গানের এ এক নির্ভরযোগ্য সত্র। সাহেব-মেমদের মেলায় ইতিউতি দেখা যায়। মধ্যরাতে বাউলের সঙ্গে নৃত্যরতা উর্ধ্ববাহু বিদেশিনী দৃশ্যহিসাবে অভিনব সন্দেহ কী! কিন্তু তবু বলবার কথা থাকে কিছু। মনোহরদাস, ত্রিভঙ্গ খ্যাপা, নিতাই খ্যাপা, রাধেশ্যাম থেকে এমন কোন বাউল বা প্রসিদ্ধ সাধক ছিলেন যাঁরা কেঁদুলি আসেননি! নবনীদাস বাউলও এখানে আসতেন। বহুদিন এখানে থেকে প্রয়াত হয়েছেন সুধীরবাবা। এখনও স্থায়ীভাবে থাকেন অনেকে। কেঁদুলির সুনাম এতটাই পরিব্যাপ্ত যে, সারা ভারতের বহুতর উপাসক সম্প্রদায়ের সাধক এখানে এসে ধন্য হন। বাংলার বাউলের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠাভূমি হিসাবে কেঁদুলি সবচেয়ে সজীব কেন্দ্র। ঘটনাচক্রে রবীন্দ্র পরিমণ্ডল ও শান্তিনিকেতন কেঁদুলির অনতিদূরে। প্রসিদ্ধির সেটাও একটা উৎস।

রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত কখনও জয়দেব-কেঁদুলি যাননি, কিন্তু ক্ষিতিমোহন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু, রামকিঙ্কর ও শান্তিদেব ছিলেন বহুবারের যাত্রী। সেকালে বাস ছিল না, তাঁরা গোরুর গাড়িতে যেতেন। বীরভূমের বাউলদের প্রসিদ্ধি অর্জনে রবীন্দ্র পরিকরদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বড় ভূমিকা নিয়েছে। বরাবরই শান্তিনিকেতনের আশ্রমে বাউলরা হন স্বাগত। সেই নবনীদাসের আমল থেকে শান্তিনিকেতনের গুণী আশ্রমিকবৃন্দ আর গুণগ্রাহী ছাত্রছাত্রীরা বাউলদের পরিপোষণ করেছেন। কলাভবনের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীরা এঁকেছেন প্রচুর বাউল প্রতিকৃতি। বাংলার বাউলদের আজকের যে-প্রবল জনাদর তার মূলে অনেক কারণ আছে— অন্যতম একটি কারণ বঙ্গীয় শিল্পীদের আঁকা গত আট দশকব্যাপী বাউল চিত্রকলা। নন্দলাল, রামকিঙ্কর, সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীর খাস্তগীর, সোমনাথ হোর থেকে কলাভবনের নবীনতম শিল্পী এঁকে চলেছেন বাউলের স্কেচ ও পোর্ট্রেট। কলাভবনের ছাত্র বীরভূমের প্যাটেলনগরের পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় সারাজীবন ধরে শত শত বাউল চিত্র এঁকেছেন, যাতে বাউলজীবনের বিচিত্র রূপাবলি ধরা আছে। আকাশের দিকে একতারা তুলে ধরে বিচিত্রবেশী নৃত্যপর ভাবোন্মাদ এই গায়ক সম্প্রদায় আমাদের রূপের তাপসদের কতটা উদ্‌বেল করেছে তার বিন্যস্ত দৃশ্যকল্প

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বভারতীকেন্দ্রিক শিল্পীদের চিত্র রচনায় পাওয়া যায়। বঙ্গ সংস্কৃতিতে ও বাংলাগানে বাউলদের চিরকালীন অবদানের মতো শিল্পীদের আঁকা বাউল চিত্রাবলিও আমাদের ভিসুয়াল ঈসথেটিকসের গৌরবময় অর্জন।

বাউল আর শান্তিনিকেতন এক সুদীর্ঘ যুগলবন্দী এবং তার সূচনা রবীন্দ্রনাথ থেকে। বোলপুরের আশেপাশে বাউলদের পাড়া আছে। নবনীদাস প্রায়ই আসতেন গুরুদেবকে গান শোনাতে, কিছুদিন সেখানে বসবাসও করেছিলেন, কিন্তু কোথাও স্থিতু হওয়া তাঁর স্বভাবে ছিল না। তাঁর সময় থেকে শান্তিনিকেতনের কলাভবন আর সংগীত ভবনে আজও বাউলরা আসেন অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীদের গান শোনাতে— স্থানটি তাঁদের প্রিয়, কারণ রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সম্মাননীয়।

রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক উৎসাহ ছিল পৌষমেলাকে ঘিরে গড়ে তোলা গ্রামীণ সংস্কৃতির উজ্জীবন। প্রথম থেকেই সেখানে বাউলদের যাতায়াত ছিল। এখন তো সেখানকার বাউলের আসর এলিটিস্টদের সগর্ব উপস্থিতি ও শ্রোতারূপে অংশগ্রহণে খ্যাত ও প্রচলে পরিণত। পৌষমেলার মঞ্চে উঠে গান করতে পারা যে-কোনও বাউলের জীবনের বহুলালিত স্বপ্ন। পৌষমেলাতে এদেশের প্রচার মাধ্যম সবচেয়ে সক্রিয় দেখেছি। ভিডিও ক্যামেরা সর্বদা সচল সেখানে, দূরদর্শনের নানা চ্যানেল কলকাতা তথা বঙ্গবাসীদের সামনে উদ্‌ঘাটিত করে শান্তিনিকেতনের মঞ্চে বাউলগান ও নাচের রঙ্গ। এতসব ঘটনার যোগফল হল 'বীরভূমের বাউল' নামক কিংবদন্তির জন্ম ও বিকাশ

তার জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। কিন্তু সেখানকার গানের আসর পরিচালিত হয় বড়ই অবিন্যস্তভাবে। তবু পৌষমেলার মঞ্চ বাউলদের কাছে কতটা গর্বগৌরবের তা বোঝা যায় সনাতনদাস বাউলের মতো খ্যাতিমান প্রবীণতম শিল্পীর জবানিতে। তিনি স্বীকার করেন শান্তিনিকেতনই তাঁর স্বীকৃতি আর প্রতিষ্ঠার উৎস। সেখানে যাবার আগে সনাতনদাস বাউলকে,

> কেউ চিনত না। এটাই তো বড় কথা। শান্তিনিকেতনে তো আমি বাংলা '৫৮ সালে যাই;
> ৫৮-৫৯ সালে অ্যাটেণ্ড করি। দু'বছর হেঁটেই গিয়েছিলাম।
> শান্তিদেব ঘোষ একবার বঙ্গসংস্কৃতিতে পাঠালেন। বললেন, সনাতন তোমাকে আরও লোক চিনতে পারবে; কলকাতায় যাও, বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে গান করগা। তো সেই পরপর কয়েকবারই বঙ্গ সংস্কৃতিতে আমি যোগদান করি। শান্তিবাবু আমার অনেক সাহায্য করেছেন। একবার বেনারসে পাঠিয়েছিলেন বঙ্গীয় সমাজে। এবং লণ্ডনের থেকে যখন খবর এলো যে, আমরা বাউল সংগীতের দল আনতে চাই— ওই শান্তিনিকেতনেই প্রথম খবর আসে। তো, আপনারাই নির্বাচন করে দেন যে, বাউল গান— সত্যিকার বাউল গান এবং নাচ কে ভালো পারে, এই সেই লোক।
> শান্তিনিকেতন থেকে কণিকা ব্যানার্জি, শান্তিদেব ঘোষ এঁরা আমাকে ডাকলেন, যে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাঁটি বাউল গান গাইতে হবে লণ্ডনে— সনাতন, তুমি পারবে? তা যদি আপনারা যোগাযোগ ঠিকমতো করতে পারেন, আমি যেতে পারি। ওটা হল চুরাশি। তার আগে ঘুরে আসে পূর্ণ্য আরও সব লোকজন নিয়ে।

লম্বা উদ্ধৃতি ব্যবহার করলাম এটা বোঝাতে যে এদেশের বাউলের উত্থানে, এমনকী সনাতনদাসের মতো গুণী শিল্পী, সাধক ও পারফরমারকেও অপেক্ষা করতে হয়েছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এলিটদের সহায়তা পাবার জন্য। সেই সঙ্গে সংযোগ যথারীতি শান্তিনিকেতনের। তার আগে তাঁকে কেউ চিনত না। প্রথমে শান্তিনিকেতন, সেখান থেকে কলকাতার ভদ্রলোকদের সান্নিধ্য ও সমাদর, অবশেষে লন্ডনের খ্যাতিস্বর্গ। আরোহণের এই ক্রমিক বিন্যাসে গ্রামীণ বাউল গিয়ে পড়েন বিশ্বপরিচিতির বৃহৎ বৃত্তে। বাঁকুড়ার খয়েরবুনি আশ্রমের প্রত্যন্ত অবস্থান তাঁকে কি প্রার্থিত যশ ও ভাগ্য এনে দিত? একেই বলে স্থান-মাহাত্ম্য ও রবীন্দ্রমহিমার সদাব্রত। অথচ অজানা অচেনা এই সনাতনদাস এককালে পায়ে হেঁটে সেখানে পৌঁছেছেন।

কিন্তু অনেকেই তো যেতে পারেননি— নিতান্ত ভৌগোলিক দূরত্বই তার কারণ। আর একটা কারণ লোকায়ত মানুষের সংকুচিত স্বভাব। নইলে উত্তরবঙ্গের বাউল বলহরি দাস তত্ত্বজ্ঞ বা গায়ক হিসাবে কম কীসে? মুর্শিদাবাদ-নদিয়ার প্রচুর ভাল গায়ক আছেন, তাঁদের হয়তো পৌষমেলা যাওয়া হয়ে ওঠেনি কোনওদিন। এখানে একটা কথা বলে রাখা উচিত, এত যে বীরভূমের বাউলের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি, তাদের মধ্যে বড় মাপের বাউলতাত্ত্বিক কই? গত দুই দশকে অন্তত আমি তেমন কাউকে দেখিনি— আগে নিতাই খ্যাপা ছিলেন। এখন এই মুহূর্তে আমার দেখা যেসব উচ্চমার্গের বাউল তাত্ত্বিকের কথা মনে পড়ছে, তাদের মধ্যে সনাতনদাসের আদিবাস্তু খুলনা জেলায়, বলহরি দাসের জন্ম কর্ম উত্তরবঙ্গের পাবনায়, আজহার খাঁ ফকিরের বাড়ি নদিয়া জেলার গোরভাঙায়, আর নবাসনের হরিপদ গোঁসাই আদতে বরিশালের মানুষ। তা হলে বীরভূম নিয়ে এত হইচই কেন? তার কারণ মিডিয়ার প্রচার, কেঁদুলির জনসমাবেশের অতিরেক, শান্তিনিকেতনের পূত স্পর্শ। এদেশে একবার কোনও কিছু রটে গেলে তা হয়ে ওঠে চিরস্থায়ী। আমার বিচারে মুর্শিদাবাদ জেলা বাউল ফকিরদের বৈচিত্র্যে, গুরুত্বে এবং চলমানতায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যাকে বলে 'living tradition' তার সবচেয়ে উজ্জ্বলন্ত নমুনা, কিন্তু তবু তার খ্যাতি নেই লোকসমাজে বা মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানসে। কারণ জেলাটি কলকাতা থেকে অনেক দূরে, ইসলামি ঐতিহ্যের কারণে হিন্দু এলিটিস্টদের পক্ষে খুব রোচক নয় এবং সেখানকার গায়করা পূর্ণদাসের মতো বিদেশ দাপিয়ে আন্তর্জাতিক জয়জয়কার লাভ করেননি।

গত বেশ কয়েক বছর ধরে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের বাউল ফকিরদের বর্তমান অবস্থা এবং সামগ্রিক অবস্থানের সঠিক খোঁজখবর করতে গিয়ে ঘুরেছি নানা জেলার বহু রকমের জনপদ— শহর ও গ্রাম, নগরতলি। আলাদা করে একাধিকবার প্রবীণ সাধকদের সঙ্গে কথা বলেছি, প্রথমত তাঁদের ডেরায় পরে মেলা মচ্ছবে, তারও পরে শিষ্যের বাড়ি। অভিজ্ঞতায় দেখেছি, অনুসন্ধানী গবেষকদেরও এসব সাধুগুরু নানাভাবে পরীক্ষা করে নিয়ে তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেতরের কথা বলেন, সেই বিচারে আমাকেও যেন অর্জন করতে হয়েছে শিষ্যের মতো গুরু-নির্ভরতা ও প্রশ্নহীন আনুগত্য।

তবে এটা ঠিক যে, তিন চার দশকে সবকিছু খুব পালটে গেছে। সত্তরের দশকে যখন কিছু না জেনে, স্রেফ ব্যক্তিগত কৌতূহলে, উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতাম গ্রামে গ্রামান্তে, তখন খুঁজে পেয়েছি যে পরিমাণ দরদি গায়ক ও আমগ্ন সাধক তা ক্রমশ কমে এসেছে। গ্রামের একেবারে ভেতরে কোনও গুরুপাটে গুরুপূর্ণিমা বা বৈশাখী পূর্ণিমা বা কোনও দিবসী উপলক্ষে আন্তরিক ভক্তসমাবেশ, শান্ত শুদ্ধ গানের আসর যতটা সহজে ও অন্তর্লগ্ন হয়ে উপভোগ করেছি, এখন সেখানে এসে গেছে জনতা ও কোলাহল। এসে গেছে অদীক্ষিত হঠকারী শ্রোতা আর শব্দদূষণের নিনাদ। আর-একটা উৎপাত হয়েছে গ্রামীণ মেলায় শহুরে মানুষের গাদাগাদি ভিড়। তিন দশকের মধ্যে চোখের সামনে বদলে গেল অগ্রদ্বীপ কিংবা ঘোষপাড়ার সুন্দর সুবিন্যস্ত মেলা। সারাদিন ধরে টু-হুইলার, টেম্পো, ট্রাক, ভ্যান, ম্যাটাডোর আর মোটর চেপে এসে পড়ছে অজস্র বিচিত্র রুচির মানুষ— নারীপুরুষ, এমনকী অর্ধশিক্ষিত গ্রামিক সমাজের লুম্পেনরাও। গানের আসরে বা আখড়ায় চলছে জেনারেটরের কর্ণভেদী আওয়াজ এবং তাকে ছাপিয়ে দুনে চৌদুনে তীব্র তালে সাউন্ড সিসটেমের পারদ উপরে তুলে বাউলের গান চলছে মাইকে। সে গানে কোনও নিবেদন নেই, ভক্তিনম্র চিত্তের প্রশান্তি নেই। আছে একজন গায়কের সঙ্গে আরেকজনের পাল্লাদারি, তবে তা গানের তত্ত্ব নিয়ে নয়, গানের পরিবেশনগত চমৎকৃতি ও লম্ফঝম্ফে।

গান পরিবেশনের এই সর্বাধুনিক জাঁকজমক শ্রোতাদের চাহিদাতেই ঘটেছে। ভাল গায়কও এখন অসহায়। শ্রোতারা গানের ফরমাশ করছে, মঞ্চে উঠে গিয়ে বাউলের জামায় এঁটে দিচ্ছে দশ, পঞ্চাশ এমনকী একশো টাকার নোট। সঙ্গে সঙ্গে আসরের উদ্যোক্তারা কর্ডলেস মাইকে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করছেন এই মহান সমঝদারি ও দানের গৌরব বার্তা। যেসব বাউল তত সুকণ্ঠ নন, অথচ ভাবগ্রাহী, গানের তত্ত্বের টানে ভেতর থেকে তুলে আনতে পারেন গহন গভীর অঞ্জলি, তাঁরা এসব উচ্চকিত আসরে কেমন যেন হতভম্ব মূক হয়ে পড়েন। আমার মতো বাউল আসরের বহুদর্শী শ্রোতার মন তখন আকুল হয়ে স্মৃতি হাঁটকায়। মনে পড়ে যায়, হয়তো শেওড়াতলায় অম্বুবাচীর মেলায় উপর্ঝরণ বৃষ্টির মধ্যে সারারাত শুনছি সামিয়েল আর জহরালির পাল্লাদারি গান, তত্ত্বের পর তত্ত্ব আসছে, শ্রোতারা উদ্দীপ্ত, খাড়া হয়ে বসছেন। কিংবা নসরৎপুরে চাঁদনি রাতে জাত-বৈষ্ণবের ভিটেয় সারারাত শুনছি সাধন বাউল আর ইয়ুসুফ ফকিরের গান। নিরাভরণ আসর, আকাশের চাঁদোয়া টাঙানো, খেজুরপাতার ঢালাও তালাই পেতে সমুৎসুক বিশ-পঁচিশজন শ্রোতা। কোনও উচ্চ মঞ্চ নেই, শ্রোতা আর গায়ক একই সমতলে। গানের ভাব শুধু উচ্চ থেকে উচ্চস্তরে উঠে যাচ্ছে। ঊর্ধ্বায়িত হচ্ছে শ্রোতাদের চেতনালোক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবনীদাস বাউল

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

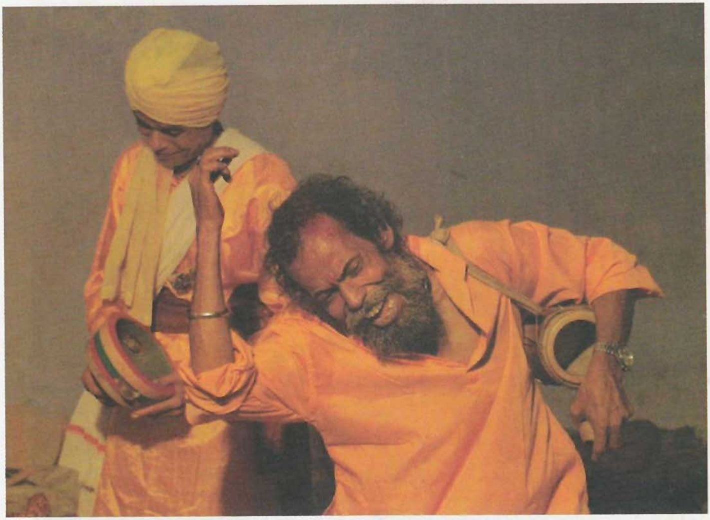

ভাবের গভীরে

দরবেশি পোশাক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এনায়েতুল্লা বিশ্বাস

সোমেন বিশ্বাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মঞ্চে সাজা বাউল

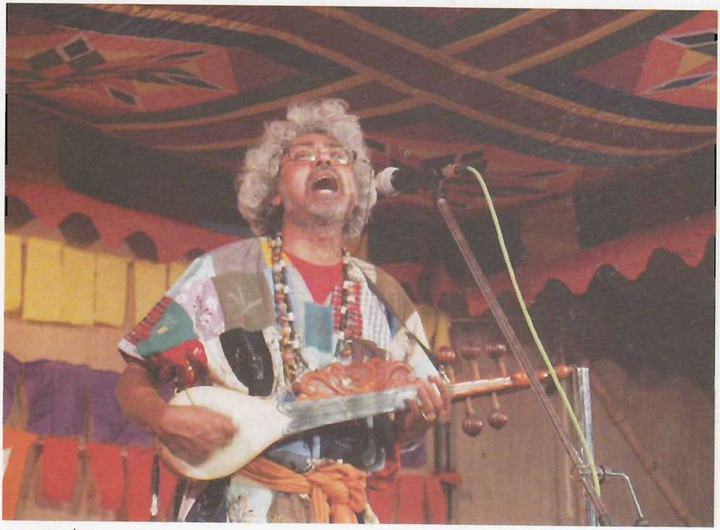

পবনদাস বাউল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফকিরানির ভাবজগৎ

ফকিরানির অন্তর মহল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাউল বাউলানী

দরবেশি পোশাকে গায়িকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

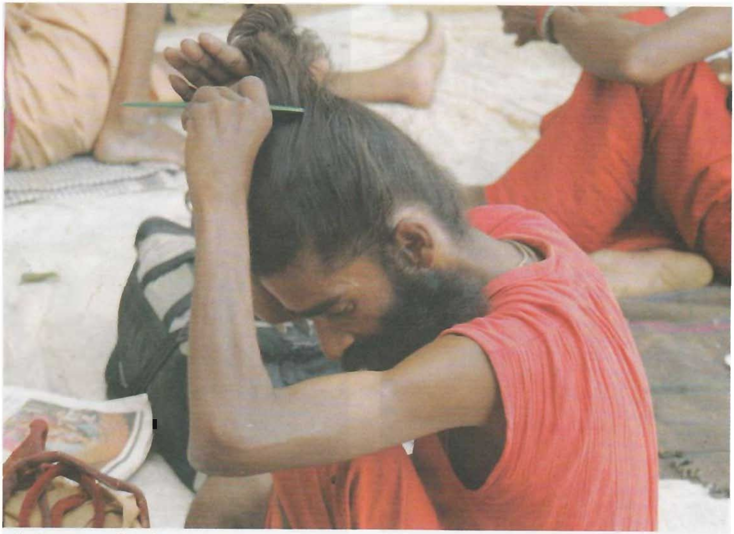

বাউলের চুলের ধম্মিল্ল বাঁধা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একতারা ও ডুবকি

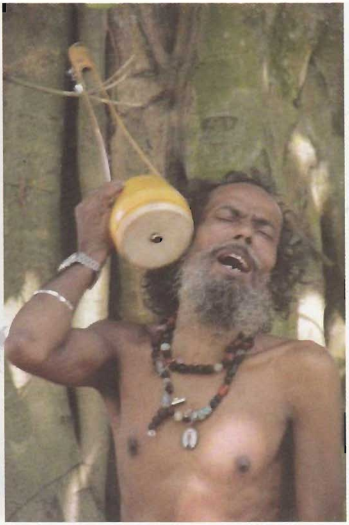

সুরে সুরে সুর মেলাতে

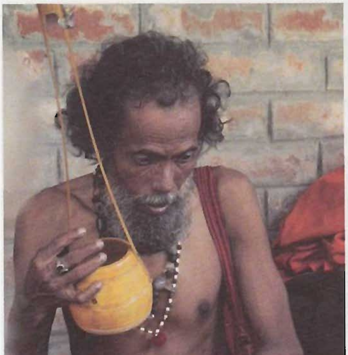

গৌর খ্যাপা

বেলাহার সুরে ফকিরের গান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফকিরি গানের আসর

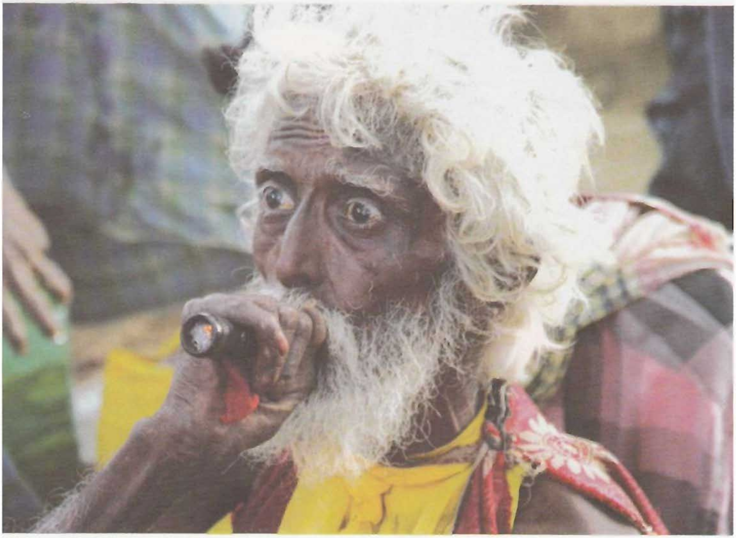

'গাঁজা তোর পাতায় পাতায় রস'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেহালা বাদনরত ফকিরের গান

সুবলদাস বাউল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জয়দেব কবিরাজ

নরেন্দ্রনাথ দেবনাথ

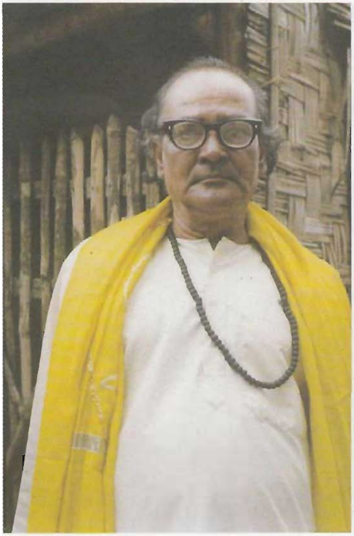

আমিরচাঁদ ফকির

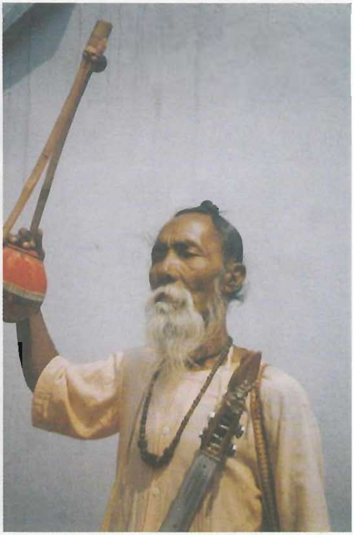

সনাতন দাস বাউল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালাচাঁদ দরবেশ

জালাল শা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরণীসেন মহান্ত

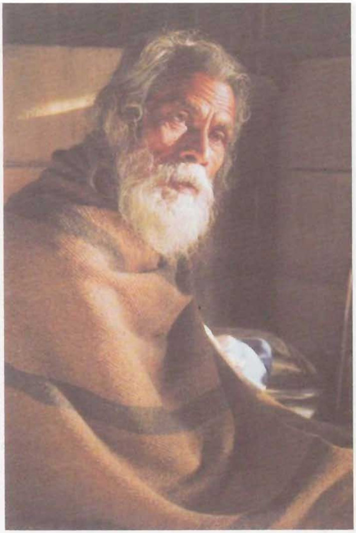

বাংলাদেশের ফকির দৌলত শাহ

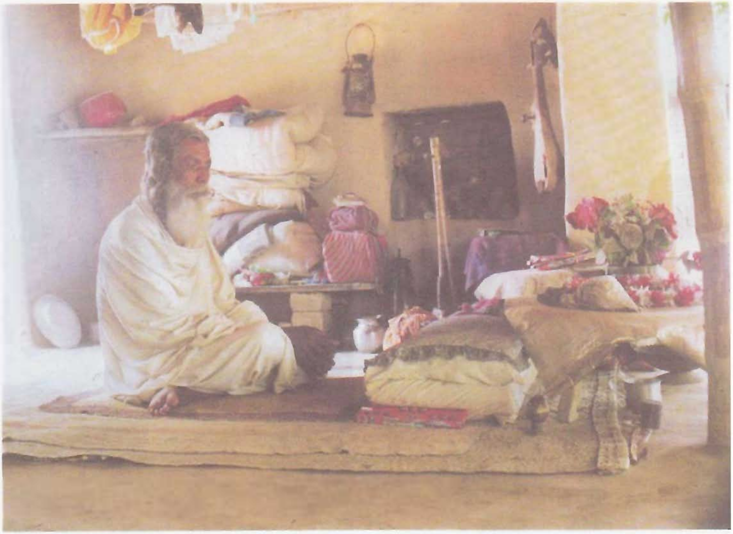

ফকিরের গেরস্থালি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাজ্জা ফকির

সাধন দাস ও মাকি কাজুমি

লক্ষ্মীকান্ত চট্টরাজ ও বনশ্রী চট্টরাজ

বলহরি দাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরস্বতী মহন্ত

প্রফুল্ল হালদার

সাদা পোশাকে বাংলাদেশি বাউল

লিয়াকত আলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

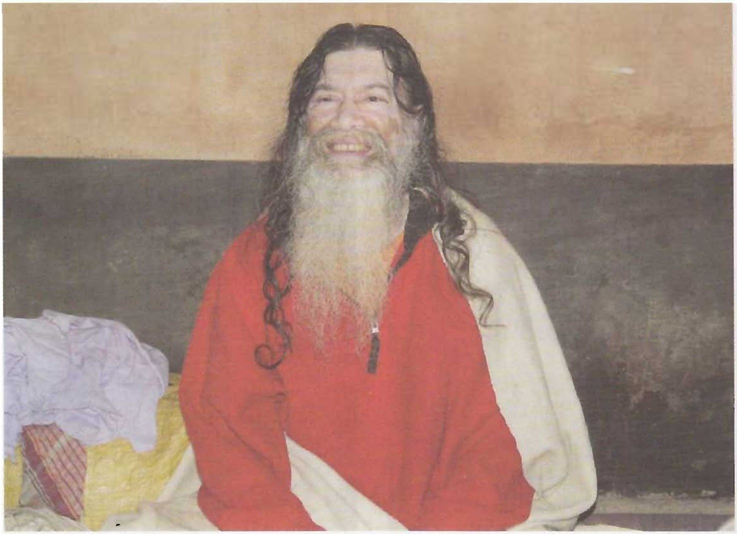

সাধনদাস বৈরাগ্য

যুগল সংগীত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আয়নামহলের কথা

মাঝে মাঝেই নিমন্ত্রণ আসে বাউল সম্মেলন বা বাউলদের নিয়ে সেমিনারে যোগ দেবার জন্য। হয় কিছু বলতে হবে, নয়তো উদ্‌বোধন করতে হবে, না হয় সেমিনারেরই কোনও অংশ বা কর্মসূচি পরিচালনা করতে হবে। আমি, সম্ভব হলে, অন্য কোনও ঝামেলা না থাকলে, এমন আহ্বান এড়াই না। তার দুটো কারণ। এক, একটা না-জানা জনপদ ও অঞ্চল, সেখানকার মানুষ ও নিসর্গকে জানা যায় ঘনিষ্ঠভাবে একদিন-দু'দিনের উষ্ণ সান্নিধ্যে। দুই, বাউলদের কাছাকাছি থেকে তাদের অনেক বেশি সংসর্গে আসা যায়। বিশেষ যাদের হালহদিশ আগে জানতে পারিনি, আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে, তাদের ঠিকানা-বিবরণ আমন্ত্রণ পেয়ে যাই। অবশ্য এ-বর্গের মানুষদের সঙ্গে সবচেয়ে ভাল করে ভাবের লেনদেন ও কথালাপ জমে ওঠে পরে, তাদের আস্তানায় কিংবা আখড়ায়। তবে সেখানে পৌঁছে হুট করে চলে আসার চেষ্টা করে লাভ নেই। থাকতে হবে একদিন দু'দিন। তাদের জীবনযাপন, তাদের সংলাপ, খাদ্য আর স্বভাবের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হবে। তাদের শিষ্য সেবকদের সঙ্গে ভাব করতে হবে। তাদের কাছে শুনতে হবে গুরুর নানা গুণগান, তাঁর মহিমার কত কিছু আখ্যান। গুরু মা-র কাছে বসে তাঁর আঁতের কথা শুনতে হবে। সত্যি মিথ্যে নানা কাহিনি। খুব গম্ভীর হয়ে শুনে যেতে হয়।

আজকাল বাউল গুরুরা নানা পরীক্ষা করেন। যেমন ধরা যাক, বাঁকুড়ার একজন তাত্ত্বিক বাউলের কাছে পৌঁছোলাম, থাকলাম একরাত। তাঁর কাছে পুরনো দেহতত্ত্ব গানের একটা খাতা আছে এ খবর জানতাম। সেটা চাইতে, কপি করে নিতে দেওয়ায় আপত্তি করলেন না, কিন্তু বলে বসলেন, 'খাতাটা তো কাছে নেই। আছে এক শিষ্যের বাড়ি। বড়চাঁদঘর গ্রাম চেনেন? আপনাদের নদে' জেলায়। সেখানে আমার শিষ্য সুবলসখা সরকারের বাড়ি যাব অঘ্রান মাসের সাত তারিখে, মোচ্ছব আছে। সেদিন ব্যস্ত থাকব। আসুন পরের দিন আটই অঘ্রান। নিরিবিলিতে কথা বলা যাবে। গানের খাতাখানও পেয়ে যাবেন। পছন্দমতো গান টুকে নেবেন। তবে সে কাজে দু'দিন থাকতে হবে। অসুবিধে নেই, সুবল বড় গেরস্থ, মস্ত দালানবাড়ি, অঢেল জায়গা। এমনকী আপনাদের সেই স্যানিটারি পাইখানাও আছে, তবে কিনা টিউকল।'

উপায় নেই, শুনে যেতে হবে এহেন গুরুবাক্য। জানতে চাই গানের গুহ্য তত্ত্বকথা, সাধনার কথা, কিন্তু শুনে যেতে হয় অনর্গল— শিষ্যের ধনসম্পদ, প্রভাব প্রতিপত্তি, গুরুভক্তি এমনকী শৌচস্থানের আভিজাত্যের প্রসঙ্গ। তাই সই। এবারে একমাস পরে আটই অঘ্রান ভোরের বাসে চড়ে পৌঁছে যাই পলাশি, সেখান থেকে হাঁটা পথে বড়চাঁদঘর। অবশ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্যান রিকশায় পা ঝুলিয়ে আর ক'জন প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে যাওয়া যেত। কিন্তু আমার পায়দল বেশি পছন্দ। পরিবেশটাকে অনুপুঙ্খ দেখা যায়।

অবশেষে বড়চাঁদঘরে পৌঁছই। সুবলসখার বাড়ি কে না চেনে! বিশেষত গতকাল সেই বাড়ির দীয়তাং ভুজ্যতাং মচ্ছবের খিচুড়ি এখনও সব গ্রামবাসীর পেটে রয়েছে। যাকেই জিজ্ঞেস করি হাঁ হাঁ করে নিশানা দেয়। কেউ কেউ সখেদে আগ বাড়িয়ে বলে, 'দেখুন কপাল, মচ্ছব হয়ে গেল গতকাল, আর আপনি এলেন আজ? কাল এলে দেখতেন এলাহি ব্যাপার। বাউল গান শুনতেন রাতভোর। এখন তারা ঘুমোচ্ছে। এবারে খুব জমেছিল গানের আসর। দশজন গাহক এসেছিল, তার মধ্যে পাঁচজনের একটা দল এসেছিল বাংলাদেশ থেকে। কাল এলেন না?'

আসিনি বলে আমার তেমন খেদ নেই। তারা ভাবল, আমি নিতান্ত বেরসিক। এসব দিবসী মচ্ছবে জাঁকজমক-হইহল্লা খাওয়া-দাওয়াটাই মুখ্য। রাতে গানের আসরটা নৈমিত্তিক, যেমন রাজনৈতিক সভার শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যাই হোক, সুবলসখার বাড়ির সামনে এসে মনে হল গতকাল যেন একটা ঝড় হয়ে গেছে। এখন সব শান্ত, শ্রান্ত ও নিদ্রারত। খোঁজখবর করতে ভিতরবাড়ি থেকে বিব্রত ও বিনীত সুবলসখা এলেন। মাঝবয়সি মানুষ— কোরা ধুতি, খালি গা, খালি পা, গলায় কণ্ঠি। বিব্রত হয়ে বললেন, 'আসুন আসুন, বসুন। কিন্তু বসবেন বা কোথায়। সব ছত্রখান হয়ে আছে। এই একটা চেয়ার দে।'

কাঁঠাল কাঠের চেয়ারে উপবিষ্ট হলে সুবলসখা হাত কচলে বললেন, 'ভেবেছিলাম আপনি বোধহয় একটু বেলার দিকে আসবেন। সারারাত জেগে এখন সবাই ঘুমোচ্ছে। একেবারে আতান্তর অবস্থা। আপনাকে কী করে যে একটু সেবা দেব! ওরে কে আছিস, অন্তত একটু মুড়ি-চা দে। দেখুন দিকি, কাকেই বা বলি, সারাদিন সারারাত ভূতখাটুনি খেটে এখন সব ঘুমিয়ে কাদা। উঠবে সেই বারোটা-একটায়। দেখি, আমিই দেখি, গিন্নিকে ডাকি। বাড়িতে মান্যমান অতিথি বলে কথা...'

আমি তাঁকে নিরস্ত করে বলি, 'ব্যস্ত হবেন না। আমি পলাশি বাসস্টপে নেমে চা খেয়ে নিয়েছি। চা-তেষ্টা নেই, খিদেও পায়নি। আপনার গুরু কোথায়? ঘুমোচ্ছেন? আমার তো বলতে গেলে তাঁর কাছেই আসা।'

'বিলক্ষণ, সে তো জানি', সুবলসখা দাঁত বের করে বললেন, 'নইলে কি এই অধম গরিবের বাড়ি আপনার পায়ের ধুলো পড়ে? গুরু গৌরবেই শিষ্যের মান বাড়ে। কিন্তু উনি তো নেই!'

—অ্যাঁ? সেকী? উনি যে আমাকে আজ আসতে বলেছিলেন।

—হ্যাঁ, বলেছিলেন ঠিকই। এসেওছেন আপনি। গুরুবাক্য লঙ্ঘন হয়নি। কিন্তু উনি এসেছিলেন সাতদিন আগে। ওঁর কাছে ক'জন দীক্ষাশিক্ষা নিল এবার। ক'দিন থেকে তারপরে গতকাল সকালে মচ্ছব শুরু করে দিয়ে তিনি চলে গেলেন সেই দত্তফুলিয়ায়। তবে হ্যাঁ, আপনার কথা বলে গেছেন। খাতির যত্ন করতেও আলাদা করে হুকুম দিয়ে গেছেন। এখন বিশ্রাম নিন। তারপরে দুপুরে মাছভাত খেয়ে, একটু জিরিয়ে...

—কিন্তু আমাকে আসতে বলে চলে গেলেন? আশ্চর্য তো! একাই চলে গেলেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—এটা কী বললেন? তা কি হতে পারে? সুবলসখার মতো শিষ্য তা হতে দিতে পারে? তাঁকে নিতে দত্তফুলিয়ার শিষ্যরা এসেছিল তিনজন। তাঁদের সঙ্গে গেলেন তিনি। বলে গেছেন সেখানে আপনাকে যেতে। সাতদিন থাকবেন সেখানে, মচ্ছব হবে, দীক্ষা হবে। যাবেন তো?

—হুঁ। যেতেই হবে। কালই যাব। ঠিকানা?

—ঠিকানা খুব সোজা। বাসে করে সোজা দত্তফুলিয়া বাজারে নামবেন। তারপরে বলবেন, কাত্তিক মণ্ডলের বাড়ি। বাস যেখানে দাঁড়াবে তার উত্তরদিকে, খুব নিকটে। গাঁয়ের মাথা। সবাই চেনে।

কথা শেষ করে সুবলসখা রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, 'আপনার হয়রানি হল। কিন্তু আসলে গুরু আপনার একটু পরীক্ষে নিলেন। ধৈর্যের পরীক্ষে, আগ্রহের, আন্তরিকতার। বুঝলেন তো?'

বুঝলাম। হালফিলের বাউল-গুরুর নিজের দর বাড়ানোর কেরামতি বুঝলাম আরও পরে, কার্তিক মণ্ডলের বাড়িতে পা রেখে। গুরুঠাকুর দিব্যি বসে আছেন শিষ্যশিষ্যা নিয়ে। পরিতৃপ্ত মুখচ্ছবি। আমাকে দেখে বললেন, 'আসুন আসুন। কালকে খুব হয়রানি হল তো? আজ আসবেন সে.খবর কালরাতে সুবলসখা পাঠিয়েছে। সেইজন্য আজ বেশ ক'জন শিষ্যকে ডেকে পাঠিয়েছি। এসে পড়বে এখুনি সব। আপনাকে দেখতে আসবে।'

—আমাকে দেখতে? কেন?

—আরে, আপনি একজন গবেষক অধ্যাপক। আমাদের নিয়ে কত খোঁজপাতি করছেন। গান জোগাড় করছেন। সেসব ওরা জানবে না?

হঠাৎ কথার মাঝে মুখ ফসকে একজন নির্বোধ শিষ্য বলে বসল, 'তা ছাড়া ধরেন, আমাদের গুরুঠাকুরই কি কম? তাঁর কাছে আপনাদের মতো মানুষ আসছেন। একবার যাচ্ছেন বড়চাঁদঘর, আবার আসছেন এই দত্তফুলিয়ায়। আমাদের গুরু কত বড় ভাবুন তো? সেটা দেখাতেই আজ শিষ্যদের আনা হচ্ছে। এতে তেনার আরও কত শিষ্য হবে, তাই না বলো?'

সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। কার্তিক মণ্ডল বললেন, 'এই কেষ্ট, তুই থামবি? এসব কথা তোকে কে বলতে বলেছে? বুঝিস কিছু?'

গুরুদেব নিমেষে সবাইকে হটিয়ে দিয়ে সাগ্রহে আমাকে ডেকে কাছে বসালেন। তারপর প্রসন্ন মুখে বার করলেন গানের খাতা, তাঁর ঝুলি থেকে। তার মানে, ধৈর্য অধ্যবসায়ের পরীক্ষায় আমি এবারে পাশ করলাম। একথা বোধহয় বলার দরকার নেই যে, খাতাখানা তাঁর কাছে বাঁকুড়াতেই ছিল— তবে আমাকে একটু খেলিয়ে নিলেন।

আগেই বলেছি এসব সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা। আগে এমন দর বাড়ানোও ছিল না, আমার এত ভোগান্তিও হত না। কারণ তখন ব্যাপারটা ছিল সরাসরি। যেমন ধরা যাক, ষাটের শেষে বা সত্তর দশকের গোড়ায় যখন আমি গানের সন্ধানে গ্রামে ঘুরতাম তখন নদিয়ার বৃত্তিহুদায় পেলাম কুবির গোঁসাইয়ের ঢাউস এক গানের খাতা। হাজারের ওপরে গান। গানের যিনি ভাণ্ডারী সেই রামপ্রসাদ ঘোষ সম্পন্ন চাষি গৃহস্থ। খুব আপ্যায়ন করলেন, খাওয়ালেন। এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরনো কাঠের সিন্দুক খুলে লাল শালুতে মোড়া গোঁসাইয়ের গানের খাতা বার করে মাথায় ঠেকিয়ে তারপরে আমাকে দিয়ে বললেন, ‘এই খাতায় কুবির গোঁসাইয়ের গান সবই আছে। আমার পিতা দাসানুদাস ঘোষ, তাঁর পিতা রামলাল ঘোষের হাতের লেখায় এটা মূল খাতার নকল। দেড়শো বছর আগেকার পুঁথি।’

খুব আগ্রহ ভরে হাতে নিয়ে পরম আবেগে তাকিয়ে থাকলাম। একটা ইতিহাস যেন সামনে তার পৃষ্ঠা খুলে দেখাল। কুবিরের লেখা পদ ‘ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন’ দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দিরে বসে গাইতেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। সেই গীতিকারের হাজারো পদ আমার হাতে? আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে বসলাম, ‘এই খাতা আমাকে দেবেন তো?’

—না। খাতা তো দেবই না, এমনকী একটা গানও টুকতে দেব না।

—কেন?

—এহ খাতা দেখতে দিয়েছিলাম চাপড়ার ষষ্ঠী ডাক্তারকে। তিনি কখন আমার অজ্ঞান্তে একখানা গান টুকে নিয়ে আকাশবাণীতে দিয়ে মোটা টাকা পেয়েছিলেন।

—সেকী? কী করে জানলেন? সেটা কোন গান?

—গানটা রেডিয়োতে প্রায় হয়— ‘ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন’, এই দেখুন আমাদের এই খাতায় রয়েছে ৪৩১ নং গান। দেখেছেন?

আমি কিছুতেই রামপ্রসাদকে বোঝাতে পারলাম না যে গানটা ওই খাতা থেকে টুকে ষষ্ঠী ডাক্তার দেননি আকাশবাণীতে— টাকাও পাননি। গানটা আছে ‘শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত’-এ ছাপার অক্ষরে। কিছুতেই বোঝানো গেল না অজ পাড়াগাঁর অশিক্ষিত সেই মোড়লকে। খাতা তিনি দিলেন না। পরে কীভাবে সেই খাতা হস্তগত হল, সব গান পড়লাম, যথেচ্ছ টুকে নিলাম, সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু আপাতত বলতে চাই, আগে ব্যাপারটা ছিল সাদাসাপটা— দেব অথবা দেব না। আর এখন গুরুঠাকুর গোটা কয়েক গান দেবেন বলে আমাকে ঘোরালেন, শিষ্যদের কাছে নিজের গুরুত্ব বাড়িয়ে নিলেন। বাউলদের কাছে কিছু পাওয়া আজকাল বেশ কঠিন হয়ে পড়ছে দিন দিন। তাদের দর এত বেড়ে গেছে।

বাউলদের সেমিনারে গেলে অবশ্য একেবারে উলটো ছবি। সেখানে দলে দলে প্রসাদভিক্ষুর মতো ভিড়। উদ্যোক্তাদের নাকালের একশেষ। সব জায়গায় একই অভিজ্ঞতা। হয়তো কোনও একজন বাউলকে পত্র মারফত নিমন্ত্রণ পাঠানো হল, এসে গেলেন দশজন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন যন্ত্র বাজাবেন, আর বাকি ক'জন এসেছেন সঙ্গ দিতে— আসলে দু'-তিন দিন ধরে থাকা খাওয়া ফ্রি, এদিকে বেড়ানোও হল। কিন্তু উদ্যোক্তাদের নাভিশ্বাস। একজন গায়ক আর পাঁচজন যন্ত্রীকে দিতে হবে অন্তত পঞ্চাশ টাকা করে, সেই সঙ্গে পাথেয় পঞ্চাশ টাকা, সাকুল্যে একশো। বাজেট বেড়ে গেল অনেক। আবার মঞ্চে উঠে আরেক কাণ্ড। নিমন্ত্রিত গায়ক নিজে না-গেয়ে প্রথমে পাঁচজন যন্ত্রীকে দিয়ে একটা করে বাউল গাওয়াবেন। তার মান যাই হোক। তারপরে নিজে গাইবেন। অনুষ্ঠানের ঘোষক পড়ে যান বিপাকে। সময়সীমা রাখাও হয়ে পড়ে কঠিন।

প্রধান উদ্যোক্তা ভদ্রলোক, হাতে ধরা ছোট ব্রিফকেস, ছোটাছুটি করে কূল পাচ্ছেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরবিগলিত ধারায় ঘামতে ঘামতে আমার সামনে এসে, কোঁচার খুঁটে ঘাম মুছে বললেন, 'নামেই বাউল সম্মেলন আর কী যেন বলেন আপনারা? হ্যাঁ সেমিনার... সেমিনার। নিকুচি করেছে কাজের।'

—কেন?

—টাকা দিচ্ছে মানে ম্যানেজ করেছি দু'জায়গা থেকে— পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র আর দিল্লি মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর থেকে। কড়াকান্তি হিসেব রাখতে হচ্ছে, ভাউচারসহ, বুঝলেন?

—অসুবিধে কী?

—আর্টিস্টদের পেমেন্ট করবে EZCC। তার ভাউচারে আর্টিস্টদের সই কিংবা টিপসই লাগবে তো। এখন ধরুন বাউল আর্টিস্ট আসার কথা পঁচিশজন, এসেছে পঁচাত্তরজন। টাকা তো দিয়েছে পঁচিশজনের। বাকি ক'জনের টাকা কোথা থেকে আসবে?

—এত বাউল আছে এ অঞ্চলে?

—না না, সবাই বাউল নাকি? এসে পড়েছে। একসেট গেরুয়া পোশাক আছে, গোটা দশেক গান জানে। ব্যস, তবে আর কী। এখন থাকতে দিতে হবে, গাণ্ডেপিণ্ডে গিলবে পাঁচ-ছ' বেলা, গাঁজা টানবে। যত্ত সব। মশাই, এর নাম লোকসংস্কৃতি? বাউলগানের উন্নয়ন? ধুস। ঘেন্না ধরে গেল। মানবসম্পদের টাকাই তো এখনও আসেনি। বুঝুন ঠেলা।

কিন্তু তবু এমন সম্মেলন আর সেমিনার বেড়েই চলেছে। আসলে একটা নতুন কিছু কর। যে সময়ে যে হুজুগ ওঠে। অথচ বাউল ফকিরদের ব্যাপারটা একেবারেই হুজুগে ছিল না। আমার দ্বিজপদ মাস্টারমশাইয়ের কথা খুব মনে পড়ে। বাউল ফকিরদের গান খুঁজে বেড়াচ্ছি খবর পেয়ে আমার বাড়ি এলেন গ্রাম থেকে সাইকেল ঠেলে। হাতে ধরিয়ে দিলেন একটা তালিকা— তাতে নদিয়া-মুর্শিদাবাদের সাধক-বাউল আর ফকির-মিসকিনদের নাম, অন্তত পনেরোটা। বললেন, 'এঁরা যে যে গাঁয়ে থাকেন তার নাম আর পথনির্দেশ দিয়ে দিয়েছি। খুব কষ্ট হবে কোথাও কোথাও যেতে, অনেক হাঁটতে হবে, তবু যাবেন। এসব সাধক তো নিজেদের ডেরা বা আখড়া থেকে কোথাও যান না— আপনাকেই যেতে হবে। অনেক তত্ত্ব পাবেন, যা দশ বছর পরে বলবার মতো কেউ বেঁচে থাকবে না। তাঁরা হয়তো গায়ক নন, কিন্তু শিষ্য গায়কদের দিয়ে এমন এমন শব্দগান শোনাবেন যা কোনও পুঁথিপুস্তকে নেই, শুধু রয়ে গেছে পরম্পরায়, শ্রুতিতে আর গাহক সমাজে।'

মাস্টারমশাইয়ের কথা আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য। যে-বর্গের সাধক গুরু আর ফকিরদের তখন সঙ্গ করেছি এখন তাঁরা বিরল প্রজাতি, না হয় অদৃশ্য। তবে এ কথাটাও ঠিক যে এমন মগ্ন সাধক তৈরি হয়ে ওঠার মতো আড়াল আজ তো আমরাও রাখিনি কোনও পল্লিতে। গ্রামপতনের ধুন্ধুমার কাণ্ডে সব ফৌৎ। সবই আজ বড় প্রকাশ্য। খয়েরবুনি আশ্রম সনাতনদাসের আখড়ায় যাচ্ছি, হঠাৎ পাশ দিয়ে সাঁ করে চলে গেল একটা টু-হুইলার। চালাচ্ছে জিন্স-পরা নব্যযুবা, ব্যাকসিটে এক বাউল। তার কাঁধে সঙিনের মতো উঁচিয়ে রয়েছে গেরুয়া ঘেরাটোপে একখানা দোতারা। তার মানে সন্ধ্যায় দূরান্তে কোথাও বায়না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে... বাউল ছুটছে খেপমারা শহুরে গান-শিল্পীর মতো। রুজি রোজগার, বাঁচার তাগিদ, জনগণের চাহিদা।

বাউল সম্মেলনে বা সেমিনারে যেসব বাউল যোগ দেয়, তাদের রওনা হতে হয় বেশ সকালে। হেঁটে বাস রাস্তায় আসা, বাসের জন্য প্রতীক্ষা, তারপরে পৌঁছনো জেলা শহরের বাসস্ট্যান্ডে। একটা কোয়ার্টার পাউরুটি, এক প্লেট ঘুগনি আর চা খেয়ে দুপুরের খুন্নিবৃত্তি। এবারে আরেকটা বাস ধরে উদ্দিষ্ট গ্রাম, যেখানে সম্মেলনের মঞ্চ আর বাউলদের থাকার জায়গা। সাধারণত কোনও ইস্কুলবাড়ির শ্রেণিকক্ষ, কিংবা নির্মীয়মাণ কোনও বাড়ির অসমান মেঝে। সেখানেই ঝোলা থেকে কম্বল বার করে ভূমিশয্যা, কিংবা খড়ের ওপর শতরঞ্চি, একটা গেলাস আর করোয়া কিস্তি, একতারা ও ডুবকি, কিংবা আনন্দলহরী। গাঁজার খুচরো সরঞ্জাম। পেটে সর্বগ্রাসী খিদে। তাই প্রথমেই টেবিলের সামনে লাইন দিয়ে সম্মেলনে নিজের নামটি পঞ্জিভুক্ত করে টিফিন আর ভোজের কুপন সংগ্রহ করে দ্রুত খাবার জায়গায় পৌঁছনো এবং অবেলায় খানিকটা ভাত ডাল কুমড়োর ঘ্যাঁট খেয়ে নেওয়া। তারপরে উঃ কী দুর্নিবার ঘুম। পথশ্রম, ক্লান্তি আর উদরপূর্তির নিশ্চিন্ততা। গান বাজনা? সে পরে দেখা যাবে।

আমি খুব মমতা নিয়ে এই ক্ষুৎকাতর মানুষগুলিকে দেখি। আমার দেশের অনেকটাই উপেক্ষিত এক সম্প্রদায়। কুচকুচে কালো গায়ের রং। ঝুঁটি বাঁধা চুল এখন এলিয়ে দিয়ে, হয় নিবিড় নিদ্রাচ্ছন্ন, না হয় ম্লান মুখে বসে বসে বিড়ি টানছে। বাগদি, ডোম, দুলে, কুর্মি, কাহার, নমঃশূদ্র জাতের সব নিম্নবর্গীয় মানুষ। আমাদের এনটারটেনার। সারা বছরে কেমন করে তারা বাঁচে, কোথায় থাকে, কী খায়, কী তাদের সংকট কিছুই জানি না। তথ্য অফিসে ঘুরতে হয় তাদের। বিডিও সাহেবকে তৈলমর্দন করতে হয়। যদি একটা প্রোগ্রাম পাওয়া যায়। বাড়িতে হা-অন্ন পরিবেশ, রুগণ খিন্ন জীবনসঙ্গিনী গেছে মাধুকরী করতে— বাড়িতে কয়েকটা অপোগণ্ড সন্তান।

ভাবতে গেলে কান্না পায়। জমিজিরেত নেই যে ফসল ফলাবে। কেউ কেউ পরের জমিতে মুনিশ খাটে কিংবা গাঁয়ের কারুর মেটে কুঁড়ে ঘর তৈরির সময় জোগাড়ের কাজ করে দু'-দশ টাকা পায়। কেউ ঘরামি, কেউ কীর্তনের পার্টির সঙ্গে খোল বাজায়। তবে ডাক এলে সবচেয়ে আগে বাউল। গোটা কয় পাথুরে মালা আছে সেগুলো গলায় গলিয়ে নেয়, হাতে লোহার বালা, পায়ে টায়ারের চটি। সম্মেলনে যাবার আগের বিকেলে ক্ষৌরি করিয়ে নেয়। গেরুয়া আলখাল্লা আর সস্তার ধুতি লুঙি করে পরা, মাথায় বাবরি কিংবা ঝুঁটি।

সম্মেলনে তাদের নাম পঞ্জিভুক্ত করে এক যুবক। বাঁধানো খাতায় নাম ঠিকানা লেখা হয়। তারপরে বুকে এঁটে দেয় সম্মেলনের ব্যাজ, হাতে দেয় একটা প্লাস্টিকের সস্তা কভার ফাইল। তার মধ্যে একটা ছোট প্যাড, ডট পেন ও ছাপানো কর্মসূচি। ফাইলের গায়ে মুদ্রিত আয়োজক সংস্থার নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং তারিখ। মঞ্চে বসে দেখি দর্শকের আসনে জনপঞ্চাশ বাউল বসে আছেন, তাঁদের চোখে প্রত্যাশা, মনে কৌতূহল। ডেকরেটরের সংকীর্ণ চেয়ারে তাঁদের অস্বস্তি লাগে। এঁরা কেউ চেয়ারে বসার মানুষ তো নন। হাতে ধরা ফাইলটা ভারী বেমানান। নিরক্ষর হয়তো নন কেউ, কিন্তু প্যাড-পেনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পর্ক তৈরি করা খুব কঠিন কাজ তাঁদের পক্ষে। বরং অনেক স্বচ্ছন্দ আনন্দলহরীতে টান মারতে বা দোতারাকে কথা বলাতে। গান গাইতে দিলে তো রক্ষা নেই— গগনবিদারী স্বরে সামনের মাঠ ভরতি হাজার কয় শ্রোতাকে একেবারে ভাসিয়ে দেবেন।

মঞ্চে বসে লোকায়ত জীবন বিষয়ে নির্বোধ ভি. আই. পি-দের ভাষণ শোনা কম শাস্তি নয়। আজকাল আবার নতুন হুজুগ উঠেছে গেরুয়া পোশাক পরে, একতারা দোতারা হাতে নিয়ে, কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে মিছিল করে গ্রাম পরিক্রমা। গ্রামের প্রবেশ মুখে এবং ইতস্তত তোরণ ও পোস্টার। এখানে জাঁক করে বাউলদের সম্মেলন আর সেমিনার হচ্ছে তার জানানদারি। সম্বৎসর যে-মাইকম্যান বড় গাঁয়ের ভিডিও হলের ফিল্ম শো-র ঘোষণা করে ক্যাঁক ক্যাঁক করা কর্কশ আওয়াজে, তারই হাত-মাইকে আজ সম্মেলনের খবর। রাতে হামলে পড়বে পল্লিবাসী তাতে সন্দেহ নেই। গ্রামে প্রত্যক্ষ বিনোদন আর কই? কীর্তন বা কবিগান ক্বচিৎ হয়। যাত্রাপালার দল খুব ভেতরের দিকের গাঁয়ে আসে না। তাই সারাদিন ট্রানজিস্টারে হিন্দি গান বাজে। শহরে সিনেমা দেখে এসে গাঁয়ের দুয়েকটা ছোকরা 'কুচ কুচ হোতা হায়' আওড়াচ্ছে। তার মধ্যে বাউল গান? তার আকর্ষণ সাংঘাতিক।

এখানে একটা সত্যি কথা বলা দরকার। যাঁরা বলেই চলেছেন, গ্রাম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অপ-সংস্কৃতির চাপে তাঁরা ঠিক বলছেন না। সব গ্রামই তো শহর-সংলগ্ন নয় এবং এখনও প্রচুর গ্রামে ইলেকট্রিকের পোস্ট যায়নি। তাই টিভি-র প্রভাব কথাটা অমূলক। কালেভদ্রে পুজোপার্বণে চাঁদা তুলে টিভি এনে ব্যাটারিতে ভিডিয়ো শো হয়। ক'জনই বা দেখে। কাজেই বেশির ভাগ গাঁয়েই এখনও শতকরা নব্বই ভাগ মেয়ে মদ্দ বাউল গানের আসরে আসে। বছরের পর বছর শ্রোতা বেড়েই চলেছে। নদিয়ার আসাননগরের কাছে কদমখালিতে 'লালন মেলা'-য় গত দশ বছরে শ্রোতাদের সংখ্যা এত বেড়েছে যে তিন-তিনটে মঞ্চ করেও সামলানো যাচ্ছে না। তিনরাত গানের বিরাম নেই। লোকায়তের টান হল অমোঘ। যে-কোনও বাউলকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে এখন তাদের কত শ্রোতা। ঠিকই যে মাঝে মাঝে শ্রোতারা অসভ্যতাও করে। তবু উৎসাহ প্রবল।

এখন যেটা মূল সমস্যা সেটা হল আমাদের মতো ভদ্রলোকদের হালচাল এবং বাউল ফকিরদের সম্পর্কে প্রকৃত দৃষ্টিকোণ গড়ে তোলার অভাব। সত্যিই তাদের প্রতি আমাদের মমতা আর সহানুভূতি আছে। আমরা জানতে চাই তাদের জীবনধারা, বুঝতে চাই সমস্যা। হয়তো যেতে পারি না তাদের দরিদ্র যাপনের পল্লিপরিবেশে, কিন্তু তাদের আনতে চাই আমাদের বৃত্তে, শুনতে চাই তাদের সংলাপ। তাদের গান এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসেও সমাদর করে শোনে ছাত্রছাত্রীরা— তার পেছনে কিছু অধ্যাপকের আনুকূল্যও থাকে। সরকারি প্রয়াসে নানা জেলার অজানা কিন্তু প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন বাউল ও ফকিরদের গান ক্যাসেটবদ্ধ করে নিতান্ত স্বল্পমূল্যে বিক্রি হচ্ছে, যার মূল্য লক্ষ্য প্রচার। গান ও গায়কের প্রচার।

এসব তো খুবই ভাল প্রয়াস, কিন্তু আমরাই মাঝে মাঝে বোকামি করে বসি। যেমন বছর কয়েক আগে বাউলদের নিয়ে একটা সেমিনারে যোগ দিতে গিয়েছিলাম বাংলা আকাদেমি চত্বরে। তার বাইরে স্টেজ বেঁধে গান হবে, দুপুরে আকাদেমির ঠান্ডা ঘরে সেমিনার—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার অংশ সেখানেই। সময় বৈশাখ, রুদ্র বৈশাখ। অতবড় রবীন্দ্রসদন চত্বর রোদে পুড়ে যাচ্ছে। দুপুর দুটো থেকে চারটে পর্যন্ত আলোচনা— 'লোকজীবনের সমস্যা: আমাদের কর্তব্য'। এ বিষয়ে বলব আমরা সুধীজন। সাড়ে বারোটা নাগাদ রৌদ্রের ভ্রূকুটি সামলে পৌঁছলাম। কর্তৃপক্ষ দিলেন কোল্ড ড্রিংকস। লোকশিল্পীরা এসে গেছেন। সেদিন রবিবার, তাই আকাদেমির ছুটি। তার বাইরের ছায়াচ্ছন্ন অংশে ডেকরেটরের ব্যবস্থাপনায় বেঞ্চি আর হাইবেঞ্চি পেতে খাওয়ার ব্যবস্থা। টানা বেঞ্চিপাতা। জনা তিরিশ শিল্পীকে খেতে দেওয়া হয়েছে একসঙ্গে। ভাত-ডাল-ভাজা-মাছ-চাটনি। খুব তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছেন তাঁরা। অবশ্য গরমের একটা হলকা রয়েছে কিন্তু তাতে এই গ্রামীণ মানুষদের কী এসে যায়? আমাদেরও খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল। বেলা একটা বাজে, চনমনে খিদে। বলে বসলাম, 'আমরাও তো লাইনে বসে যেতে পারি পরের ব্যাচে।' আমার আগ্রহ ছিল দু'কারণে। এক নম্বর নিশ্চয়ই খিদে, সেটা গৌণ। আসলে ভাবছিলাম এঁদের সবকিছুর ভাগীদার হওয়াই তো উচিত। আলোচনাচক্রের উঁচু মঞ্চে বসে, ব্যবধান টেনে, শুধু বক্তৃতা আর জ্ঞানদান কি শোভন? এঁদের সঙ্গে একসঙ্গে খেলে ওঁরাও তো উৎসাহ পাবেন, ভরসা পাবেন। জীবনের সর্বস্তরেই বিভাজন দেখে ওঁদের নিশ্চয়ই বেশ বিভ্রান্ত লাগে। আমাদের আপ্যায়নেও ফাঁক ধরা পড়ে যায়।

আমার প্রস্তাবে অবশ্য জল ঢেলে দিলেন একজন কর্তাব্যক্তি। হাঁ হাঁ করে উঠে বললেন, 'উঁহু, তা কী করে হবে? আপনারা হলেন স্পিকার। আপনাদের আলাদা ব্যবস্থা। এই এঁদের নিয়ে গিয়ে লাঞ্চ দিয়ে দাও।' অচিরে আমাদের একটা ঘরে এনে চেয়ার টেবিলের সামনে বসিয়ে, ক্যাটারারের লোগোচিহ্নিত সাদা বাক্স করে লাঞ্চ প্যাকেট দেওয়া হল। ক্ষুণ্ণ মনে সেটা উন্মোচন করে পাওয়া গেল একদলা শুকনো ফ্রায়েড রাইস, একটুকরো মুরগির ঝোলবর্জিত নির্মমতা, সকালে-কাটা গাজর-বিট-শসার স্যালাড, প্লাস্টিক মোড়া এক পিস করুণ থ্যাঁতলানো সন্দেশ এবং এসব খাদ্য মুখে তোলার জন্যে এক চিলতে প্লাস্টিক চামচ। কত কষ্টে সেসব গলাধঃকরণ করতে লাগলাম ঘন ঘন জল সংযোগে। সেই মুহূর্তে অন্তত লোকশিল্পীদের খুব ভাগ্যবান মনে হল। ভদ্রলোক ও ইনটেলেকচুয়াল হবার কী বিড়ম্বনা! আলোচনাচক্রে অংশ নেবেন এমন একজন বক্তা আমাকে নিচু স্বরে বললেন, 'মুরগির পিসটা শুধু দন্তস্ফুট করার অযোগ্য নয়, রীতিমতো দুর্বিনীত। ওর বোধহয় আত্মদানে ততটা উৎসাহ ছিল না। বয়সেও আমাদের কিঞ্চিৎ অগ্রজ, কী বলেন?'

আমি মৃদুহেসে সমর্থন করে বললাম, 'আহা, আমরাও তো বাইরের ওই ভোজটা খেতে পারতাম। ইস, ওরা কী ভাগ্যবান, পেটপুরে খেলো।'

বক্তা বললেন, 'উঁহু, ওটা হল লোকখাদ্য। আমাদের কি ওসব খাওয়া শোভা পায়? আমরা হলাম গিয়ে রিসোর্স পার্সন। আমাদের জন্যে তাই স্পেশাল লাঞ্চ প্যাকেট... স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট।'

এর পরের অংশটুকু অবশ্য আরও করুণ। দুটো নয়, আড়াইটে নাগাদ শুরু হল ঠান্ডা ঘরে মহতী আলোচনা চক্র— 'লোকজীবনের সমস্যা: আমাদের কর্তব্য'। ভবিষ্যুক্ত হয়ে আমরা মঞ্চে বসলাম। সঞ্চালক শুরু করলেন তাঁর ভাষণ। সেই বৈশাখের খাঁ খাঁ দুপুরে কোন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলকাতাবাসী আর আসবেন শ্রোতা হয়ে? কাজেই চেয়ার ভরা পঞ্চাশজন লোকশিল্পী, দশজন উদ্যোক্তা, পাঁচজন বেকার আর চারজন বক্তা শুরু করলেন আমাদের কর্তব্য বিষয়ে কূট-কচালি বিচার বিবেচনা। প্রথম বক্তা এতটাই তাত্ত্বিক আর পুথিপড়া পণ্ডিত যে লোকজীবনের সংজ্ঞা নিয়ে বিশদে বোঝাতে লাগলেন। লোকশিল্পীরা তাঁদের কর্তব্য সম্পর্কে একটুও দ্বিধা না রেখে নিপাট নিদ্রাতুর হয়ে পড়লেন। একদিকে লোকখাদ্য আরেকদিকে ঠান্ডা ঘর— এই দ্বান্দ্বিক বিন্যাসে আমার সেটাই সবচেয়ে ছন্দোময় মনে হল।

এবারে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনে হবেই যে, বুদ্ধিজীবী নগরবাসীদের এহেন অবিবেচনার কারণ কী? আমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি বা কাণ্ডজ্ঞানের কোনও গুরুতর অভাব বাস্তবজীবনে খুব একটা দেখাই না, অথচ প্রশ্নটা যখন লোক-লোকায়তের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে তখন কেন আমরা বেহিসেবি কাজ করে বসি? পল্লিজীবনের সঙ্গে আমরা যে নিতান্ত অপরিচিত তাও নয়। এই অবিবেচনার সংকট যে কেবল কলকাতার মতো মেট্রোপলিটন শহরেই দেখা যায় তা নয়। নগরতলিতেও এমন ঘটে, ঘটতে পারে। একটা নমুনা দেব।

সেবার বাঁকুড়া শহরের গায়ে কাঁটজুড়িডাঙায় একটা বাউল মেলা ও আলোচনাচক্র হল দু'দিন ধরে। আমার সেখানে নিমন্ত্রণ ছিল। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা সেখানকার রাঢ় একাডেমি এবং তার প্রধান উদ্যোক্তা অচিন্ত্য জানা উদ্যমী মানুষ। রাঢ় একাডেমির জন্য স্থানীয় ডাক্তার বি. সি. মাজির কাছ থেকে তিনি খানিকটা জমি সংগ্রহ করেছেন। মূল মঞ্চ সেখানেই করা হয়েছে। সুপ্রসারিত মাঠে আরও দুটি মঞ্চ করা হয়েছে বাউল গানের শত শত শ্রোতাদের বিনোদনের জন্য। ১৯৯৫ সালে রেজিস্ট্রিকৃত এই একাডেমি বহু কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা নিয়েছেন। ভেতরে একটু আধটু দলাদলি ছিল এবং আছে— সেটা কোন সংগঠনেই বা নেই? একাডেমি এবারই প্রথম বাউল সম্মেলন করলেন। তাঁদের লিখিত বক্তব্য:

> আগের তুলনায় বাউলের মর্যাদা কিছুটা ভাল। মানুষ এখন বাউলদের অন্য দৃষ্টিতে দেখে। আগে বাউলদের জীবনজীবিকা ছিল ভিক্ষাবৃত্তির উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে সেখান থেকে আর্থসামাজিক ব্যবস্থার ফলে সরে এলেও বাউলদের দৈন্য সমাজের লজ্জা। আগে বেশির ভাগ বাউলদের জীবন কাটত আশ্রমবাসী হিসেবে, এখন অনেকে কেন বেশির ভাগ বাউলই গৃহবাসী। দারিদ্র্য তাদের নিত্যসঙ্গী। খেতে-খামারে কঠোর পরিশ্রম করে বাউল সংগীতকে এঁরা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। মঞ্চে হাজার হাজার মানুষের হৃদয় জয় করে যে পরমপুরুষ সে-ই আবার যখন মাঠে মাটি কাটে তখন কেউ দেখে হয়তো নাক সিঁটকোয়। কাজেই বাউলদের অভাব, অনটন, দারিদ্র্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির সমস্যা খুবই বেদনাদায়ক। এহেন অবস্থায় সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গুরুদায়িত্ব নিতে হবে। বাউলদের সম্মুখে সবচেয়ে বড় বিপদ হল উচ্চ শক্তি পরিচালিত মিডিয়া এবং বাউল সংগীতের উপর শহরের সংগীতের প্রভাব। এক্ষেত্রে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং জনগণকে দায়িত্ব নিতে হবে। সুখের বিষয় সরকার এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ করে চলেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাটজুড়িডাঙায় বাউল সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে চলবেন আশা করা যায় তবে তা যেন বাৎসরিক বাউল গানের আসরে পরিণত না হয়। একথা বলার কারণ হল, এখন পশ্চিমবঙ্গে সব জায়গায় যেসব মেলা হচ্ছে বাউলদের নিয়ে, তার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে বিনোদন।

কিন্তু হচ্ছিল সেমিনারের প্রসঙ্গ। বলা যেতে পারে, শুধু বিনোদন কই? সেমিনার কিংবা নামান্তরে আলোচনাচক্র কি অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে করা হচ্ছে না? হচ্ছে, তবে কীভাবে হচ্ছে তার প্রমাণ ওই সম্মেলনেই বোঝা গেল। সেদিন মেলার উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানের কথা একটু বলা উচিত। উদ্যোক্তাদের ভাষণ, মন্ত্রী মহাশয়ের উৎসাহোদ্দীপক বক্তব্য, বিশিষ্ট অতিথিদের কথার মাঝখানে বলতে বলা হল ডাক্তারবাবুকে, যিনি রাঢ় একাডেমির জমি দান করেছেন। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানালে তিনি বললেন, 'এখানে জমিটা পড়েছিল, এঁরা চাইলেন দিয়ে দিলাম। অন্য কাউকেও দিতে পারতাম। বাউলরা এখানে এসেছেন। এই জায়গাটা কাজে লেগেছে দেখে ভাল লাগছে। বাউল গান শুনতে ভালবাসি— তবে সব বুঝতে পারি না, কঠিন তত্ত্ব কথা। এঁদের জন্যে কিছু করা উচিত ঠিকই, একাডেমি ভাবছেন কী করা যায়। বাউলদের সমস্যার সমাধান করা দরকার। তাঁদের উৎসাহ দেওয়া দরকার। আমি চিকিৎসক, আমি আর কী করতে পারি? আমার চেম্বারে এলে আমি ওঁদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে দিতে পারি। তবে এখানে বলতে আপত্তি নেই যে, এতদিন ডাক্তারি করছি, কিন্তু কোনও বাউল কোনওদিন আমার কাছে চিকিৎসার জন্যে আসেননি। ওঁদের বোধহয় রোগজ্বালা নেই। সাধক তো।'

শ্রোতারা হাততালি দিয়ে উল্লাস জানালেন, বাউলরা হাসলেন অপ্রতিভ হাসি— দেখতে পেলাম মঞ্চ থেকে। ভাবলাম, এ ধরনের অসহায় দরিদ্র মানুষদের নিয়ে এমন কথা কি আমরা বরাবর বলে যাব? বাঁকুড়া শহরের প্রসার প্রতিপত্তি সম্পন্ন ধনী চিকিৎসকের কাছে গ্রামের বাউল কি আসতে সাহস পাবে কোনওদিন? আসার কোনও স্বাভাবিক উপায় আছে কী? এলে কি সে বাউলের পোশাক পরে আসবে? নইলে বোঝা যাবে কী করে যে সে বাউল? ব্যস্ত চিকিৎসকের চেম্বারে প্রথমে নাম লেখাতে হয় এক সহকারীর কাছে। দীনবেশী গ্রাম্য অসুস্থ মানুষরা তাদের কাছে কি কখনও সদয় ব্যবহার পেয়ে থাকে? ডাক্তারবাবুর কাছ পর্যন্ত সে তো পৌঁছতেই পারবে না।

আসলে আমাদের বোঝার জায়গাটা একটু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। বাউল যখন একতারা হাতে শ্রোতাদের বিমুগ্ধ করে গান করে তখন সে একজন অন্য মানুষ— আর যখন সে গ্রামিক সমাজের অন্তর্গত থেকে বাস করে তখন সাধারণ গরিব মানুষ। আধিব্যাধিতে কি তারা আক্রান্ত হয় না? হলে কোথায় যায়? প্রথমে সহ্য করে, তারপরে টোটকা কিছু খায়। না হলে সস্তার হোমিওপ্যাথি। নিতান্ত তাতেও নিরাময় না হলে শহরে গিয়ে ফার্মেসির সেলসম্যানকে বলে আন্দাজি ওষুধ নেওয়া। ডাক্তারের ফি কোথায় পাবে? বাউলরা যে গায়— 'এই মানুষে আছে সেই মানুষ'— একদিক থেকে একেবারে নির্জলা সত্য। ওই সাধারণ গরিব-গুরবো, সুযোগসুবিধাহীন, অসহায় মানুষটার মধ্যে আছে আরেকটা মানুষ, সেই মানুষটা বাউল গায়। যখন গায় তখন অন্য মানুষ। সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়নি, নামযশ নেই,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টাকাপয়সা নেই, কিন্তু মঞ্চে যখন তাকে গান গাইতে ডাকা হয় তখন তার পুনর্জন্ম হয়। সে দেখিয়ে দিতে চায় তার আসল সত্তাকে। সেটা তার অর্জিত। ওই নরম অভিমানের জায়গাটায় ঘা দেওয়া উচিত নয়।

সচরাচর শহরে আর মফস্সলে যেসব ব্যক্তি বা সংস্থা বাউলমেলা, আলোচনাচক্র বা সেমিনার সংগঠন করেন তাঁদের কেবল দরদ আর সহানুভূতি থাকলেই যথেষ্ট নয়। হতে হবে অনেক বাস্তববাদী এবং মানবিকতা সম্পন্ন। বাউল ফকিরদের জীবন ও কর্মশালা সম্পর্কে সরাসরি অভিজ্ঞতা থাকা জরুরি। তা হলেই একমাত্র বোঝা যাবে, কোন পরিবেশ থেকে তারা কোথায় এসেছে, সম্মেলনে কী তাদের প্রত্যাশা ও চাহিদা, কেন তাদের অতৃপ্তি। একটা কথা তো খুব স্পষ্ট। বহুদিনের প্রত্যাশা নিয়ে কাক-ভোরে রওনা হয়ে, সারা দিনের স্বেদ ঝরিয়ে, ক্লান্ত তবু ক্লান্তিহীন যে-গায়ক মানুষটি মঞ্চে উঠেছে তাকে কি একটামাত্র গান গাইতে দেওয়া সংগত? উদ্যোক্তাদের সময় কম, মাত্র তিন-চার ঘণ্টায় কুড়িজনকে গান গাওয়াতে হবে, তার দায় কি ওই গ্রামীণ শিল্পীর নিতে হবে? গানই তো তার জীবন, তার মোক্ষণ, তার প্রতিবাদ। বিদ্যমান সমাজের মধ্যে বাস করে, শত দুঃখ কষ্টেও, তার গান তাকে বাঁচিয়ে রাখে। সন্ধে থেকে বাউল সাজে সেজে তার সে কী অধীর অপেক্ষা! যে মুখচোরা তার আর ডাক পড়ে না মঞ্চে। অবশেষে যখন ডাক পড়ল তখন রাত দশটা। খিদে তেষ্টায় জর্জরিত, ঘর্মাক্ত, সন্ধেবেলা থেকে অপেক্ষাতুর, কেমন গাইবে সে? অথচ এবারে ভাল না-গাইতে পারলে পরের বার উদ্যোক্তারা ডাকবেন না। সেইজন্য এ জাতীয় সম্মেলনে বাউল-ফকিররা যখন গায়, প্রাণপণে গায়, তখন তাদের দিকে আমি তাকাতে পারি না। তার মনের আন্তরিক ইচ্ছা তো আমি জানি— প্রথমে গাইতে চাইবে গুরুবন্দনা, তার পরে মনঃশিক্ষা, তার পরে দৈন্য, সবশেষে কোনও একটি তত্ত্বগান বা মুর্শিদা গান। কিন্তু তার সময় সুযোগ কই? ঘোষক বলে দিয়েছেন, 'এখন গান করবেন সদানন্দ বাউল। তাঁর গান শেষ হলে রসিকদাস বাউল গাইবেন। তাঁকে তৈরি থাকতে বলা হচ্ছে।' সদানন্দ মঞ্চে উঠে প্রথমে দেখে মাঠ ভরতি দর্শক শ্রোতা। করুণভাবে চোখ বোলায় সামনের সারির ভি.আই.পি কিংবা সভাধিপতির দিকে— গবেষক আর অধ্যাপকদের দিকে— সাংবাদিকদের দিকে। ভাবে, কাকে গান শোনাতে এসেছে সে? কোন সেই একখানা আশ্চর্য গান তার পরশমণি, যা সবাইকে স্পর্শ করবে?

কাটজুড়িডাঙার সম্মেলনের লিখিত প্রতিবেদনে যা বলা হচ্ছে তার সঙ্গে আমাদের অন্য সমাবেশের অভিজ্ঞতা একইরকম। বলা হচ্ছে:

> বাউল শিল্পীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় দুটি মঞ্চ করা সত্ত্বেও এক-একজন বাউল শিল্পী একটি বা দুটির বেশি সংগীত পরিবেশন করার সুযোগ পাননি। ফলে তাঁদের একটু ক্ষোভ থেকে যায়। তবে তাঁরা প্রত্যেকেই গান পরিবেশন করে দেখিয়ে দিয়েছেন বাউল গান কাকে বলে।

উদ্যোক্তাদের আত্মতুষ্টি আর শিল্পীদের ক্ষোভ একেবারে সমান্তরাল রেখায় অবস্থিত। কাঠজুড়িডাঙার বাউল মেলাই যে আদর্শ তা বলছি না। তাঁদের উদ্যমকে খাটো করবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনও উদ্দেশ্য নেই আমার। কদমখালির লালনমেলায় একই অবিবেচনা কাজ করছে। সেখানে আবার 'বাংলাদেশ থেকে আগত' বাউলদের খাতির একটু বেশি— টিভি ও অন্য চ্যানেলের আগন্তুক ক্যামেরাম্যান রিপোর্টারদের তৎপরতা চোখে পড়বার মতো। হঠাৎ উড়ে-এসে-জুড়ে-বসা কোনও অধ্যাপক বা মন্ত্রী মহোদয়ের লালনবিষয়ক ভাষণ— যাতে সেই 'ক্লিশে' অর্থাৎ জাতপাতহীন মানবতা, হিন্দু মুসলমান সংহতি আর 'এমন সমাজ কবে সৃজন হবে' বলে দীর্ঘশ্বাস থাকবেই। তার পরে শুরু হবে বাউল গানের ধারাবাহিক, অপরিকল্পিত, অবাধ, অসংগত বিন্যাসে কিম্ভূত এক জগাখিচুড়ি। দেখা যাবে শুদ্ধ গানের পাশে নাবালক রচনা, কখনও হালকা মস্করার গান, কারুর শুধুই লালনসম্বল পরিবেশন, কেউ গেয়ে দিল হাফ-কীর্তন। কে কোন গান গাইবে, গানের পর্যায়ক্রমিক কিছু নিবেদন করা সম্ভব কি না, এসব উদ্যোক্তাদের মধ্যে কে ভাববে? সন্ধ্যার মধ্যে বৃহৎ জনতার হই-চই, ফেরিঅলার চিৎকার, তেলেভাজা ও জিলিপির দোকানে গ্রামীণ ভিড়, মানুষের বাঁধভাঙা ঢল। তারা একটা অনির্দিষ্ট জিনিস শুনতে এসেছে। বাউলের অবয়ব, পোশাক ও গানভঙ্গিকে তারা অন্বেষণ করছে। গানের একটা ধাঁচ তাদের জানা আছে, সেটা চাইছে। শান্তভাবে নিবেদিত আত্মস্থ বাউলের পরিবেশন তাদের ভাল লাগার কথা নয়— তাই যত রাত বাড়ে ততই গায়নের লাগাম খসে পড়ে। মত্ত তাল আর উদ্দাম নাচের ছন্দে গান পরিবেশন করে নবীন বাউলেরা। আসর জমিয়ে দেয়। প্রবীণ, বিবেচক, ভাবুক গায়করা কিছুটা হতভম্ব ও দিশাহারা হয়ে পড়েন। বাউল গান হয়তো তাঁদের বিশ্বাসে বিনোদনের বিষয়ীভূত নয়— তাঁদের গায়নও অনেক অন্তর্মগ্ন, নবীন কণ্ঠের তেজ বা জাদু তাঁদের না-থাকারই কথা। তাঁরা চাইছিলেন গানের মধ্যে দিয়ে কিছু বলতে— কোনও গভীর বাণী। কে শুনবে?

ইদানীং এ-জাতীয় গণমঞ্চে বা লোকমঞ্চে আরেক উৎপাত শুরু হয়েছে। সাধারণভাবে প্রধান গায়কের সঙ্গে তিন-চারজন সংগতীয়া ওঠে। মঞ্চে, দাঁড়িয়ে বা বসে সংগত করেন। কোনও কোনও দলে দেখা যায় এক বালক বা নবীনকিশোর সঙ্গে এসে মঞ্চে বসে। বাউল পিতা বা গুরু স্নেহবশে তাকে কাছে এনে সস্নেহে বলেন, 'এই ছোট্ট ছেলেটা এইটুকু বয়সেই চমৎকার বাউল গাইছে— আপনারা শুনুন। দেখুন কণ্ঠে কী ভাব! এখনও হয়তো তত্ত্ব বোঝে না কিন্তু ভাল গায়। আপনারা শ্রোতারা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে ওঁর গান শুনুন, উৎসাহ দিন।'

তার মানে এক প্রস্ফুটমান পেশাদার শিল্পীর জন্ম হচ্ছে আমাদের সামনে। দেখতে হবে পনেরো মিনিট ধরে বাউলের ক্যারিকেচার। আট-দশ বছরের মানবক, ছোট মাপের আলখাল্লা ও পাগড়ি, কোমরে বেল্ট বাঁধা গেরুয়াবাস, গলায় কাচের মালা, রঙিন কোমরবন্ধ, কপালে আর নাকে স্পষ্ট রসকলি— যেন বাউলের শিশু সংস্করণ। চিকন কণ্ঠে গাবগুবি বাজিয়ে সেও গেয়ে ওঠে অচিন পাখির খাঁচার রহস্য গান। যাকে বলে ছোট মুখে বড় কথা। গণতোষণে কোনও বাধা পড়ে না। একটা গান শেষ হলে জনগণেরা হাততালি দেন বিপুল আবেগে। কোনও অত্যুৎসাহী শ্রোতা মঞ্চে উঠে তার বুকে সেফটি পিন দিয়ে এঁটে দেন তরতাজা দশ টাকার নোট, নিজের কৃতিত্বে নিজেই হাসেন দন্ত বিকশিত করে। নবীনকিশোর দ্বিগুণ উৎসাহে এবারে দ্বিতীয় গানের সঙ্গে তোলপাড় নাচ শুরু করে।

এ ধরনের বাউলবিলাসে সবসময়ে উদ্যোক্তাদের হাতে রাশ থাকে তা নয়। গানের পর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গান হতে হতে আসরের মাঝে একফাঁকে চকিতে ঘটে যায় এমনতর শিশু সংস্করণের বাউল-উজ্জীবন-প্রকল্প। অবিবেচনার এও এক রকমফের। আরেক সম্মেলনে দেখেছিলাম বাউলদের বিপন্নতার অন্যতর দৃশ্য। দুপুর-বিকেল ধরে হল সম্মেলনের উদ্‌বোধন আর ভারী মানুষদের ভাষণ। সন্ধে থেকে হবে বাউল গান। মাঝখানে দু'ঘণ্টার অবকাশে কী করা যায়? উদ্যোক্তারা আয়োজন করে দিলেন আলোচনাচক্র বা গ্রুপ ডিসকাশন। তার আলোচ্য বিষয়গুলি হল:

১. ভোগবাদ ব্যতিরেকে বাউল হল অধ্যাত্মবাদের অগ্রদূত।
২. সম্প্রীতি রক্ষায় ও গণশিক্ষা প্রসারে বাউল সংগীত।
৩. অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এবং সুস্থ সংস্কৃতি রক্ষায় বাউল সংগীত।
৪. বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় বাউল সংগীত বা বাউল শিল্পীদের অবস্থান।
৫. বাউল সংগীত ও বাউল শিল্পীদের মর্যাদায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা।

হঠাৎ এমন সুচিন্তিত তালিকা দেখলে মনে হবে ব্যাপারখানা কি? এ আলোচনা কাদের জন্য? কারাই বা এর অংশগ্রহণকারী? শ্রোতাই বা কে?

না, এ-কোনও চটজলদি এলোমেলো বিষয়-পরিকল্পনা নয়। অনুষ্ঠান সূচিতে আগে থেকে মুদ্রিত ছিল এই আলোচনাচক্র ও তার আলোচ্যচক্রের নাম। কৌতূহল ছিল। দেখতে পেলাম মঞ্চে পাতা হল একটি করে টেবিল, আর তাকে ঘিরে আট-দশটি ফোল্ডিং চেয়ার। মঞ্চ ভরে উঠল পাঁচটি টেবিল আর গোটা পঞ্চাশেক চেয়ারে। এবারে এক-এক চেয়ারে বসলেন এক-একজন বুদ্ধিজীবী আর তাঁকে মাঝখানে রেখে আটজন করে বাউল। একেক ভদ্রলোক একখানা ফাইল খুলে তাঁর সামনের বৃত্তাকারে বসা বাউলদের নিয়ে শুরু করলেন গ্রুপ ডিসকাশন। জনা বিশেক শ্রোতা বা দর্শক নীচে চেয়ারে বসে দৃশ্যটি দেখছেন কিন্তু কিছু শুনতে পাচ্ছেন না। যেন থিয়েটারের মঞ্চে জোনাল অ্যাকটিং, শোনা যাচ্ছে অস্পষ্ট গুজগুজ গুঞ্জন। খানিকক্ষণ দেখেশুনে শ্রোতারা কেটে পড়লেন। আমার কোথাও যাবার ছিল না তাই গুটি গুটি হাজির হলাম মঞ্চে। সে যে কী অবর্ণনীয় বেদনাময় দৃশ্য।

বুদ্ধিজীবী যুবাটি মহা উৎসাহে বাউলদের নানা কূটকচালি প্রশ্ন করছেন আর বাউলরা এ ওর দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত মুখে আঁকছে হতাশার মুদ্রা। গানে যারা মুখর, প্রশ্নোত্তরে তারা একেবারে মূক। আমি একজন বুদ্ধিজীবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছেন?'

—তিনি গভীর খেদে বললেন, 'না। এঁরা তো একটা কথাও বলছেন না।'

—তা হলে উপায়?

—একটা কিছু তো করতেই হবে, দেখি। যাঁরা স্পনসরার তাঁরা গ্রুপ ডিসকাশনের জন্য টাকা ইয়ার মার্ক করে দিয়েছেন যে। রিপোর্ট একটা দিতেই হবে।

বুদ্ধিজীবীদের প্রণীত সেই কপোলকল্পিত রিপোর্ট লিখিত আকারে জমাও পড়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু তাতে ওই বাউলদের কী লাভ হয়েছে? এ সব সম্মেলনকে কে বা কারা প্রকৃত দিশা দেবে?

আগে একেবারে একা একা কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরতাম। খুঁজতে খুঁজতে সন্ধান মিলত একটা কি দুটো গ্রাম্য বাউল বা ফকিরের। গাঁয়ের একটেরে তারা পড়ে থাকত। আশপাশের গাঁ-গঞ্জে মাধুকরী করে, সঙ্গিনীসহ গান গেয়ে সামান্য কিছু পয়সা, চাল ডাল তরকারি পেত। ডেরা বা আখড়ায় এসে তাই ফুটিয়ে দুটো গ্রাসাচ্ছাদন চলত আর ছিল নিভৃত সাধনভজন। উঠোনে থাকত দুয়েকটা শ্বেতটগর বা সন্ধ্যামণি ফুলের গাছ, জুঁই বা মাধবীলতার ঝাড়। হয়তো একটা বেল গাছ বা নারকোল গাছ। চালাঘরের মেটে দেয়ালে মেলা থেকে কেনা শ্রীগৌরাঙ্গের ছবি, আপন গুরুর পায়ের ছাপ আর নানা জায়গা থেকে আনা এটা ওটা ছবি। ভেতরের ঘরের হুকে টাঙানো একতারা, গুপিযন্ত্র— বড়জোর একটা শ্রীখোল। মচ্ছবের দিনে খোলটা লাগে। রোজকার গান ওই একতারা-গুপিযন্ত্রেই হয়ে যায়। ভাত খাওয়ার জন্য আছে দু'খানা অ্যালুমিনিয়ামের থালা, দুটো গ্লাস, করোয়া-কিস্তি। মাঠে-ঘাটে স্নান-শৌচ। পরনে নিতান্ত সস্তা সাদা ধুতি লুঙ্গি করে পরা আর মার্কিন কাপড়ের ফতুয়া, সঙ্গিনীর সাদা জামা ও থান শাড়ি। সঙ্গিনীর গলায় কণ্ঠি, হাত রিক্ত— ব্যস, একেবারে নিরাভরণ। বাউলের কণ্ঠে গুনগুন গান, উর্ধ্বমুখী চোখ, সদাপ্রসন্ন আনন, বিনীত বচন নম্রস্বরে। আমি কখনও উদ্ধত স্বভাবের লোকায়ত সাধক দেখিনি। তাদের কাছে গেলে প্রথমে চা-মুড়ি সেবার কথা বলবেই, পরে দুপুরে দুটি অন্নসেবার কথাও বলবে। কুণ্ঠা জানাবে তার দীন আয়োজনের জন্য। বলবে, বাবু আমরা গরিব বাউল। একেবারে ফকির। সংসারের ফিকির জানিনে। তবু আপনি কষ্ট করে এসেছেন এই আমার সৌভাগ্য— গুরু কৃপা। আমি অধম, অজ্ঞান— কী বা পাবেন?

এই যে আচরিত বিনয়বচন এ তাঁদের সাধনার অঙ্গ— গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-গুরুভাই বা অতিথি তাদের বহুমান্য। শিষ্য তাদের সন্তানতুল্য। নিজের কথা উজিয়ে বলা পাপ, গুরুর নিষেধ। তারা উলটে বলে, আপনারা জ্ঞানীগুণী মান্যজন, আমাদের তো জ্ঞানের পথ নয়— আমরা ভাবের রসিক। যা দুয়েকটা কথা জানি বা বলতে পারি সেও মহাজনদের পদ বা মহতের বাণী, গুরুর শেখানো।

কিন্তু গুরু যেটা শেখাননি সেটাও এদের স্ব-অধিকার। ব্যাপারটা হল ঘরে হা-অন্ন কিন্তু তা বাইরে জানান না-দেওয়া। এসে যাবে কিছু, দিয়ে যাবে কেউ, এমন বিশ্বাস নিয়ে যাকে বলে আকাশবৃত্তি। উপস্থিত অতিথিকে দেওয়া যাক একটু আখের গুড়ের পানা— গরমে হেঁটে এসেছেন এতটা পথ, শরীরটা ঠান্ডা হোক। সঙ্গিনীকে নির্দেশ, 'অতিথি দেবতা— ওঁকে একটু বাতাস করো, তারপর দ্যাখো ঘরের কোণে হাঁড়ি পাতিলে দু'মুঠো চাল ঠিকই আছে, একটু ডাল। ফুটিয়ে দাও দুটি। আর ওই তো দেখছি পেঁপে গাছে পুরুষ্টু দুটো পেঁপে। পেড়ে নিয়ে তরকারি করো।'

এমন সহজ সমাধান, এত সরল জীবনদর্শন, আমি কোথায় পাব? শহুরে মানুষ, কেতাকানুনে দুরস্ত। অতিথি আপ্যায়নে নিজের দৈন্য ঢেকে রাখি। বাউলের সঙ্গিনী তার সঙ্গীকে বলে, 'চালেডালে ঘেঁটে খাওয়াব কী পেঁপের তরকারি রাঁধব সে তো আমার ব্যাপার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন, ঘরে কি কাঁঠালবিচি নেই? কুমড়ো বড়ি? ওই তো পুকুর ঘাটে যজ্ঞিডুমুরের গাছ দেখতে পাচ্ছ— পেড়ে আনব'খুনি কটা।'

মনে ভাবি, কত আর নিজেকে ঢাকবে মা জননী? বৈরাগিনীর ছদ্মবেশে এতো ঘোর সংসারিণী! অথচ আশ্চর্য বই কী যে এদের সংসার ধর্ম সে-অর্থে নেই, সন্তানও নেই। আজ এখানে কাল ওখানে। বিয়েই হয়নি। কাঁঠালবিচি আর বড়িসঞ্চয়ী এমন যে-গিন্নি সে কিন্তু যে-কোনও দিন ছেড়ে যেতে পারে বাউলকে। মাঠে ঘাটে ঘোরাফেরার ফাঁকে যে-নারী লক্ষ রাখে সিমের ঝোপ বা বেওয়ারিশ যজ্ঞিডুমুরের গাছের ফলন্ত রূপের দিকে সে-ই হঠাৎ উধাও হয়ে যেতে পারে মেলাখেলা থেকে নতুন বাউলনাগরকে নিয়ে। এ যে ভাবের পথ।

তবে উপস্থিত সেই নারী আমার মতো অতিথিকে নিয়ে বেশ মশগুল। কিন্তু কখনও শুনিনি এরা আমাকে আমার জীবন নিয়ে প্রশ্ন করেছে। নিজেদের বর্তমানকে নিয়েই এরা বর্তিয়ে আছে। দারিদ্র্য আর অভাবও এদের বাস্তব। তাই আমার সংগ্রহে এমন একটা গানও আছে যে,

আমার এই পেটের চিন্তে
এমন আর চিন্তে কিছু নাই—
চাউল ফুরাল ডাইল ফুরাল
সদাই গিন্নি বলে তাই।
যখন আমি নামাজ পড়ি
তখন চিন্তা ওঠে ভারী
কীসে চলবে দিনগুজারি
সেজদা দিয়ে ভাবি তাই—

AMARBOI.COM

এখানে 'সেজদা' শব্দটার মানে প্রণাম। আরবি শব্দ। নামাজের সময়ে মাটিতে কপাল ঠুকে প্রণাম। ধর্মপ্রাণ 'মুসল্লি' যাদের বলে তারা সেজদা ঠুকে ঠুকে কপালে কালো দাগ করে ফেলে। এই গানে সেজদা দেবার সেই মগ্ন আত্মহারা ভাবটা যেন নেই। উপাস্যকে সেজদা দিতে গিয়ে এমন আশ্চর্য গানের গীতিকারের মনের চিন্তা: কীসে চলবে তার দিনগুজরান? এরপরে গানের শেষের কথাগুলো আরও সাংঘাতিক। সাধনভজনের উপাদান-উপকরণ নিয়ে সে ঠাট্টা করে বলে।

ও সদা পেটের জ্বালা জপমালা
আমি তসবি মালায় জপি তাই।

এ একেবারে বুভুক্ষু মানুষের লেখা নাঙ্গা গান— এর আর রাখঢাক নেই। পেটের জ্বালা-ই যে-জীবনে হয়ে ওঠে জপমালা সেই জীবনকে আমরা আর কতটুকু জানি?

এদিকে যজ্ঞিডুমুরের সন্ধানী নারী আঁকশি হাতে রওনা হতে গিয়ে ফিরে আসে একমুখ হেসে। বলে, ওই দ্যাখো মাঠপাড়ে আসছে তোমার গুরুভাই শুকচাঁদ।

সবই গুরুর কৃপা— বলে বাউল হাসে— জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িতে অতিথি আর দরজায় শুকচাঁদ, মানে সুখের চাঁদ উঠল আজ, তাও দিনদুপুরে। যাকে বলে দিনদুপুরে চাঁদের উদয়।

জীবন-আস্বাদের এও একটা ধরন। সবকিছুকে শব্দের লজ্জে সুন্দর করে নেওয়া। তাতেই শুকচাঁদ হয়ে উঠল সুখচাঁদ, সেই চাঁদের উদয় কিনা দিনদুপুরে। আসলে 'দিনদুপুরে চাঁদের উদয়', 'দিনদুপুরে জোয়ার আসা' এসব বয়ানের গোপন দেহতত্ত্বের অন্তর্ভাষ্য আছে, যা সাধকরাই বোঝে, ঠারেঠোরে বোঝায় চাষি শিষ্যদের। বুঝিয়ে বলেই সাবধান করে:

আরে ঐ না নদীর মাসে মাসে
দিনদুপুরে জোয়ার আসে
ড্যাঙ্গাডহর যায় রে ভেসে
বিদ্ঘুটে বন্যে এসে।

এবারে সে নিজেই নিচুগলায় মুনিশদের বলবে, 'কিছু বুঝলে? এ কোন্ নদী, কীসের বন্যে?'

প্রশ্ন শুনে মুনিশ বাগালদের কেউ কেউ ভ্যাবলা মেরে থাকে, কেউ বলে, এসব নিগূঢ় ব্যাপার। কেউ বলে, এসব গোপ্ত কথা জানতে গেলে গুরু ধরতে হয়। একজন খ্যা খ্যা করে হেসে বলে উঠল, 'ধুর, নিগূঢ়টিগূঢ় কিছু নেই, স্ত্রীলোকের মাসিকের কথা বলা হচ্ছে।'

এবারে হাতে ধানের গুছি রইল পড়ে, শুরু হল পাল্লাদাড়ি। 'বল্ দিকিনি বাঁশি বলে কাকে?' 'ও খুব সোজা— বাঁশি মানে গাঁজার কলকে'। 'বল্ দিকিনি বাবার পুকুর কাকে বলে?' 'ওটা অশৈল কথা'। এবারে একজন রসিক চাষা বলে, 'বেশ, একটা ভাল ধাঁধা শোন দিকি— ব্যাঙাচি খায় দুই পুকুরের জল— এবারে বল্। ওসব গোপ্তটোপ্ত কিছু নয়, সোজাসাপটা ব্যাপার। কী? পারলিনে তো কেউ? তবে শোন্, ব্যাঙাচি মানে বাচ্চা শিশু, তো সে খাচ্ছে মায়ের দুধ— দুই পুকুর কিনা দুটো স্তন।' চলল এবারে গ্রাম্য ধাঁধা আর প্রবাদ প্রবচনের চর্চা— ধানরোয়া রইল পড়ে। সে হবে'খন রয়ে সয়ে। উপস্থিত পাওয়া গেছে একটা রসের বিষয়। তো এইরকম সব মাঠফসলের আসরে আমার কতদিন কেটে গেছে। মিলেছি ওদের সঙ্গে। গুরু কিংবা মুর্শেদের বাড়িতে আলাপ হয়েছে হয়তো— বলেছে, যাবেন আমাদের গাঁয়ে, জমিতে কাজ করতে করতে কত গান হবে, টুকে নেবেন ইচ্ছেমতো। বাবু, আমরা কি গোষ্ঠগোপাল না পূর্ণদাস যে আপনি বললেন আর আমি গেয়ে দিলাম। ওঁদের এলেম কত, আমরা সব বেএলেম, নাকি বলো গো তোমরা। আমাদের সব কথার পিঠে কথা, গানের জবাবে গান।

একেই আমরা সাহেবি ভাষায় বলি ওর‍্যাল ট্রাডিশন। সাতের দশকে দুশ্যান জাভাতিয়েল খোদ ময়মনসিংহে গিয়ে মাঠচাষিদের কাছে সেইসব ব্যালাড শুনেছিলেন যা নাকি পঁচাত্তর বছর আগে গিয়ে আঁকাড়া সংগ্রহ করেছিলেন চন্দ্রকুমার দে। এতগুলো বছর গানের শব্দ কিছুটা পালটে গিয়েছিল অবশ্য। তবু শ্রুতি ও স্মৃতির পরম্পরা বাঁচিয়ে রাখে গানের ধারা, লোক ঐতিহ্য।

সেটারই বড় আকাল ইদানীং, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে। আজকাল বাউল গায়ক বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুয়েকজন মানুষ সব আসরে মিলবে, যারা বাউল সাধনার কিছুই জানে না। গলা আছে, গান গায়। নামযশের কে না কাঙাল! গুসকরার বাউল উৎসবে একজন যুবা আমার পাশের চেয়ারে বসে কেবলই উদ্যোক্তাদের তেল দিচ্ছিল, আমার গানটা একটু আগে দিন, তাড়াতাড়ি ফিরব বাড়ি, কাল অফিস।

অফিস? শুনে এবারে অবাক চোখে তাকাই। বছর তিরিশের বেঁটেখাটো মানুষ, পরেছে এক লম্বা ঝুলের ঝিনচাক রঙিন পাঞ্জাবি, ওই একই রঙের চেপা পাজামা। নিজেই পরিচয় দিল সে ব্রাহ্মণ সন্তান, কাজ করে বি. ডি. ও অফিসে। একজন জানালে, শনি রবিবারে তার বাড়িতে বসে গানের স্কুল। নিজে শেখায় নজরুলগীতি। একসেট গেরুয়া রঙের টেরিকটনের বাউলবেশ আছে। বাউলের আসর হচ্ছে শুনলেই হাজির হয়। পটিয়ে পাটিয়ে মঞ্চে ওঠে— তারপরে তারস্বরে চেঁচিয়ে গায়:

আমি আউলও নই বাউলও নই
আমি মানুষের গান গেয়ে যাই।

ছেলেছোকরা শ্রোতারা হাততালি দেয়। সবাই তার নাম দিয়েছে 'সুপার সেভেন'। এমন নাম কেন জিগ্যেস করলে তারা বললে, মোট চারখানা বাউল গান ও জানে তাই সুপার সেভেন। হেসে ভাবি, তাই তো। সুপার সেভেন ডিস্কে তো চারখানা গানই থাকে।

এদের যেমন লোক-ঐতিহ্য নেই, তেমনই কণ্ঠে নেই লাগসই গানের পরম্পরাগত স্মৃতি। তিরিশ বছর আগেও এমনটা দেখিনি। ওই যে বলছিলাম বাউল পরিবারটির কথা। বাউলানী যাচ্ছিল যজ্ঞডুমুর পাড়তে, এমন সময় গুরুভাই শুকচাঁদকে আসতে দেখে ঘরে ফিরে এল হাসিমুখে। কারণ কী? সেটা বোঝা গেল শুকচাঁদের কাঁধের বস্তা দেখে। একগ্লাস জল চেয়ে নিয়ে, খেয়ে, দুটো বাতাসা চিবিয়ে, প্রথমে পা ধুলো শুকচাঁদ। তাকে ততক্ষণে পাখার বাতাস করতে লেগেছে আখড়ার একমাত্র নারী। সেটা কেড়ে নিয়ে শুকচাঁদ বলে, 'ঠাকরুন পাখাটা আমাকে দাও— এত সুখ কি বাউলের জীবনে সহ্য হয়? পথবোরেগী মানুষ আমরা। আসছি দু'ক্রোশ পথ হেঁটে। কাঁধে বস্তা, তাতে চাল ডাল আনাজপাতি। পথই বা কই? টাঁড় জমির ফাটল দিয়ে হলকা বেরোচ্ছে— উঁচুনিচু ঢিপি। এবারে ঠাকরুন বস্তা খোলো, আজাড় কর মালপত্তর। গুরুভাইকে দেখাও। জয় গুরু।'

গুরুভাই হৃষ্টচিত্তে দেখলে চাল ডাল ছাড়াও এক পাত্র ঘি, একছড়া চাঁপা কলা, থোড়, কাঁচকলা, এঁচোড় আর পটল। ক'টা কচি আম, শসা। কচুপাতায় করে অনেকটা কুচোচিংড়ি ও পুঁটি মাছ। দেখে সোচ্ছ্বাসে বললে, 'কী ভাই পুরো বাগানটাই সাফ করে আনলে?'

শুকচাঁদ বললে, 'সবই গুরুর কৃপা। গতকাল গিয়েছিলাম গুরুপাটে, হঠাৎ এমনই মন টানল, তাই। গিয়ে দেখি এক নতুন শিষ্য দিবসী করছে, তারই বিরাট মচ্ছব। আজ ভোরে উঠতে মা-গোঁসাই এইসব বস্তায় পুরে দিয়ে বললেন, যাও তোমার সেই আমডাঙার গুরুভাইকে দিয়ে এসো। মচ্ছবের থেকে বাঁচিয়ে রেখেছি এসব।'

—কুচো চিংড়ি আর পুঁটি? এসব টাটকা মাছও কি মচ্ছবের বাসি মাল নাকি?

—আরে না না। পথে আসতে একটা সোঁতার ধারে ক'জন মালো মাছ ধরছিল। তাদের

ক'টা গান শোনালাম। খুশি হয়ে বলল, 'যাচ্ছ কোথায়?' বললাম, 'গুরুভাইয়ের আখড়ায়।' তাই শুনে কচুপাতায় করে মাছ দিয়ে বলল, 'ভাল গান শোনালে, ক'টা মাছ নিয়ে যাও। ওখানে রেঁধে খেয়ো।'

—জয় গুরু। সবই কপাল— এই হল আকাশবৃত্তি— না চাইতেই জল। নইলে দ্যাখো ভাই কী আতান্তরে পড়েছিলেম। বাড়িতে ভদ্রলোক মান্যমান অতিথি। যজ্ঞিডুমুর, বড়ি, কাঁঠালবিচি আর পেঁপে দিয়ে কোনওরকমে সেবা দেবার কথা হচ্ছিল, আর এখন?

—যজ্ঞিডুমুরের বদলে আস্ত যজ্ঞি, কি বলো? একটা গান মনে পড়ল গো— শোনো— এ হল ফুলবাসউদ্দিনের লেখা পদ—

দেখে তোমার কাজগুলা যায় না দয়াল বলা।
সাঁই দয়াল নামের এমনি গুণ
পান্তা ভাতে মেলে না নুন—
কেউ খায় ঘি মাখন কারো কাঁধে দাও ঝোলা
কেউ সুখ-সাগরে ডুব দিয়া রয়
কারো কেঁদে কেঁদে জনম যায়।

একেই বলে ভাবের পরম্পরায় গানের উঠে আসা। সেটা এখনকার বাউল সমাবেশে তেমন আর হবার জো নেই। এমন লাগসই গান সময় বুঝে ঠোক করে ক'জন আর গাইতে পারে? ক'জনের মুরোদ আছে? বেশির ভাগ সুপার সেভেন না হলেও বড়জোর একটা লং প্লেইং রেকর্ড।

বাউলদের জীবনধারাও তো আগের চেয়ে অনেকটা পালটে গেছে। আজকাল কোনও কোনও আখড়ার দাওয়ায় দেখেছি মোপেড গাড়ি। কারুর কারুর হাতে ঘড়ি, গায়ে বিদেশি জাম্পার। ঠিকানা চাইলে এগিয়ে দেবে একটা ঝকঝকে কার্ড। তার ওপরদিকে একটা একতারা-আঁকা লোগো। নীচে ইংরিজি হরফে লেখা। অমুকদাস বাউল। সেন্টার ফর যোগ অ্যান্ড মেডিটেশন। ভিলেজ...। ডিস্ট্রিক্ট...। পিন নং...। ফোন...

একেবারে অবিশ্বাস্য নয়। শহুরে ধাপ্পাবাজি, লোকদেখানি, প্রচার বাসনা এখন প্রবল। আগেকার কত কত বাউল আসর দেখেছি শান্ত গৃহাঙ্গনে। বড়জোর একটা ছাউনি বা চাঁদোয়া টাঙানো, সবাই মাটিতে বসে। গান-শোনা মাদুর বা খেজুর পাতার তালাই পেতে। এখন হয় ডেকরেটর ডেকে নানারঙের বাহারি কাপড়ে মঞ্চ বানানো। শ্রোতারা বসবে চেয়ারে। মঞ্চের বা ব্যাকগ্রাউন্ডে থার্মোকল কেটে বাউল উৎসবের জানানদারি ক্যালিগ্রাফিও দেখবার মতো। বাউলের 'ব' হরফের পাশে আকারচিহ্নের বদলে বেঁকানো একতারা। এক সম্মেলনে তিনতিনটে মঞ্চ— লোকমঞ্চ গণমঞ্চ মুক্তমঞ্চ। তবু সামাল দেওয়া যায় না, এত গায়ক এত বাউল এবং এত শ্রোতাও। যেন ভোজবাজির মতো রাতারাতি বাউল গানের গায়ক ও শ্রোতাদের বিস্ফোরণ ঘটে গেছে। রায়গঞ্জের কাছে সুভাষগঞ্জের বাউল উৎসব কিংবা নদিয়ার কদমখালির লালনমেলা বা বাঁকুড়ার নবাসনের সমাবেশ— একইরকম বিপুল জনস্রোতের প্রবাহ আর অগণন বাউলের ভিড়। সবাই বাউল, সবাই গেরুয়া, সবাই গায়ক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপারস্যাপার দেখে একজন গান বেঁধেছে:

বাউল গানের হতেছে প্রচার—
কত রামাশ্যামা বাউল সেজে
গান গেয়ে নিচ্ছে বাহার।
দেখি একজনা বাউল
তার কালো কোঁকড়া চুল
তার ভাঙা হাতে বেঁধে ঘড়ি
মারছে কত গুল।
ও সে নকল সুরে গাইছে বাউল
লোকে বলছে চমৎকার।
বাউল বেতারশিল্পী হলে
ও তার লেজটি যায় ফুলে
লঘুগুরু মানে না আর
আপন মর্ম যায় ভুলে—
আবার হোটেলেতে বসতে পেলে
হয়ে যায় সব একাকার।

এই গানের শব্দ-চিত্রে তবু হালফিলের পুরো ছবিটা ফোটেনি। সেই ছবি অনেকটাই পরিহাসময় হাস্যকর। কিছুটা প্রহসনও বটে। একেবারে দরিদ্রতম বাউলের বাড়ি গিয়ে হয়তো বললাম, 'একটা ফোটো নেব আপনার।'

—ফোটো তুলবেন? দাঁড়ান আসছি।

ভাবছিলাম একেবারে গ্রামীণ আবহে গরিব বাউলের ছবি নেব একটা, সেটাই তো প্রকৃত ছবি! কিন্তু দশ মিনিট পরে সামনে এসে যে দাঁড়াল তার পরনে ফিটফাট গেরুয়া পোশাক, ইস্তিরি করা, গলায় দুটো মেডেল। একতারাটা ওপরে তুলে সপ্রতিভ পোজ দিয়ে এমন দাঁড়াল যে আমার মেজাজ গেল খিঁচড়ে।

ছবির সাটার টিপতেই ব্যাকুল প্রশ্ন: 'কুথায় ছাপা হবে গো? আনন্দবাজারে না বর্তমানে?'

একবার একজন বাউল একটা অ্যালবাম খুলে গর্বিত উক্তি করল, 'এই ফোটোক'টা দেখুন গো। দিল্লির প্রগতি ময়দানে তোলা। আমার পাশে ছোনিয়া গান্ধি, চেনা যাচ্ছে?'

অথচ তিরিশ বছর আগেও এমনটা ছিল না। এখন যেমন দেখি সর্বত্র, কিছু একটা উৎসব বা সম্মেলন হলেই তার অনুষ্ঠানসূচিতে থাকবেই থাকবে বাউল সংগীত। যারা গেরুয়া পরে উপস্থিত হবে তাদের শতকরা সত্তর জনের জীবন ও বিশ্বাসে বাউলের বা-ও নেই। কিন্তু ভাবভঙ্গিটা আছে ষোলো আনা। সঙ্গের যন্ত্রানুষঙ্গ খুব চড়া পর্দার। ক্যাসিও, উঁচুভাবে বাঁধা তবলা— একজন দক্ষ হারমোনিয়ামবাদক প্রথমে সুর তুলবে। বাড়বে দুনে চৌদুনে তালের বাহার। জলদ আরও জলদ। এইভাবে দু'-পাঁচ মিনিট বাজনা গানের পরে বাউল গায়ক কর্ডলেসে 'ভোলামন' বলে ফুকরে উঠবে। ব্যস, জমে গেল শ্রোতা ও দর্শকরা। হাতে হাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেজে উঠল তালির ঝড়। পপ, র‍্যাপ কিংবা ব্রেথলেস গানের আসরে এই শ্রোতারাই থাকে। এরাই জীবনমুখী আর ব্র্যান্ড গানকে জাতে তুলেছে। বাউল গানের ক্ষেত্রে এসব শ্রোতার বাড়তি টান গানের বাণীর দুর্বোধ্যতা বা প্রচ্ছন্ন অশালীন ইঙ্গিতের দিকে। কাটজুড়িডাঙার বাউল সম্মেলনের তিনদিনের অনুষ্ঠানের প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন সম্পাদক। তাতে লেখা আছে:

> লোকমঞ্চে শেষের দিকে দু'-চারজন যুবকের অনুরোধে এক শিল্পী অশ্লীল সংগীত পরিবেশন করলে উদ্যোক্তাদের মধ্য থেকে তা থামিয়ে দেওয়া হলে সেই যুবকদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ায় এবং কিছুক্ষণ পরে তা থেমে যায়। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয় আমাদের সুস্থ সংস্কৃতির পরিপন্থী কোন বাউল সংগীত পরিবেশন করা চলবে না।

এই প্রতিবেদনকে ব্যতিক্রম ভাবার কোনও কারণ নেই। সব নয়, কিন্তু কিছু কিছু লোকসংস্কৃতির আসর যে-রুচিহীনতা ও ক্ষণ উত্তেজনার মাদকতায় খেপে উঠেছে তা বুঝতে গেলে আসরের গানের বাণীতে কান পাতাই যথেষ্ট। যেমন ধরা যাক:

মায়ের মধ্যে আমার বাবা গিয়েছে
আমার যেতে ইচ্ছে হয়েছে
আমি যাব কোন্ দ্বার দিয়া?

শুনেই শ্রোতারা হই হই করে উঠবে। যুবক বাউল আর খমকধারী নৃত্য-সঙ্গী ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকবে। বাউলের পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, তার ওপরে নানা ছিট কাপড়ে কোলাজ করা, দর্জি দিয়ে বানানো, চকচকে জ্যাকেট। গাইতে গাইতে নাচের টানে বাউল যখন দর্শকদের দিকে পেছন ফিরবে তখন দেখা যাবে জ্যাকেটের পিঠে হয়তো লেখা: 'জয়গুরু' কিংবা একটা একতারার ছবি। এটা শো-বিজনেসের অঙ্গ। নবাসনের হরিপদ বাউল আমাকে বলেছিলেন:

এটাসিং পেটাসিং ঝুলিটেপা উদাসীন
মাগমরা ধামাপোড়া এই হয় ছয়।

অর্থাৎ এরাই ছয় ক্যাটিগরির ভ্রষ্ট বাউল। এটাসিং মানে যৌনতাসর্বস্ব কামুক, পেটাসিং মানে পেটুক, ঝুলিটেপা হল তারা যারা মাঝে মাঝে ভিক্ষার ঝুলি টিপে পরখ করে কতটা সংগ্রহ হল। উদাসীন মানে আপাত উদাসীনের ভড়ং যাদের। মাগমরা বলতে যারা স্ত্রীবিয়োগের ফলে বাউল সেজেছে নতুন সঙ্গিনীর খোঁজে। ধামাপোড়া মানে যাদের কাজই হল ধামা বোঝাই করা বা কালেকশন।

যে-কোনও বাউল সম্মেলনে গেলে আমার স্বভাব হল উৎসব মঞ্চ বা দর্শক আসনে না থেকে চারদিক ঘোরা এবং ঘুরতে ঘুরতে সেইখানে যাওয়া সেই ঘরে, যেখানে রাখা হয়েছে বাউলদের। সেখানে বসে-থাকা গায়কদের সে সময়ে গেরুয়া পোশাক-আশাক আলখাল্লা বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাগড়ি থাকে না— সাধারণ বেশবাসে সাধারণ চেহারার গ্রামীণ মানুষ তখন তারা। বেশির ভাগই অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত কিন্তু আমাদের মতো শহুরে জিজ্ঞাসুদের দেখলেই সতর্ক সচেতন হয়ে ওঠে। এদের অনেকে ইন্টারভিউ দিয়ে দিয়ে পাকাপোক্ত। খুব জাঁকিয়ে নিজের নাম, গুরুর নাম, গুরুপাটের ঠিকানা, নিজের বাস্তুবাড়ির নিশানা দেয়। আমি অনেক সময় ইচ্ছে করে এদের নির্বোধের মতো প্রশ্ন করি, 'আচ্ছা বাউল মানে কী?'

শুনে খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকবে, তারপরে গাঁজাটানা বিলোলচোখ মেলে উত্তর আসবে: 'ব কথার অর্থ বায়ুআশ্রিত, উ বলতে যথাতথা আর ল মানে লয়। অর্থাৎ যারা বায়ুযোগে সাধনা করে, সর্বত্র যাতায়াত করে এবং লয় পেয়ে যায় সবার মনে। সকলেই যাদের ভালবাসে।' এমন বিচিত্র সংজ্ঞা কে যে তাদের শিখিয়েছে কে জানে। নানা জমায়েতে এ-বাঁধিবোল যে কতবার শুনেছি!

শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায় দেখা যায় অন্য এক দৃশ্য। সেখানে বাউলরা থাকে একটা চালার তলায়, ফকিররা থাকে একটু তফাতে আরেকটা চালায়। চিরকাল হিন্দুমুসলমানের মধ্যেকার বিভেদরেখা মুছে দিতে যে-রবীন্দ্রনাথ সমন্বয়বাণী প্রচার করে গেছেন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাসত্রে বাউল ও ফকিরদের আলাদা আলাদা ক্যাম্প দেখলে দুঃখ হয়। পৌষ মাসের তীব্র শীতে মেলার মাঠের ছুরির মতো উত্তুরে বাতাসে টেম্পোরিরি আস্তানায় চটের আবরণে, খড় ও কম্বলের শয্যায় এসব সাধক ও বাউলদের রাত্রিবাস বিশ্বভারতীর সহৃদয় মানবিকতারই প্রকাশ নিশ্চয়ই। যদিও রয়ে গেছে অনতিদূরে নাট্যঘরের বিরাট প্রকোষ্ঠ, যেখানে হাজারের বেশি বাউল ফকির থাকতে পারে স্বচ্ছন্দে ও উষ্ণতায়। কর্তৃপক্ষের অবশ্য সেই কবোষ্ণ অনুভূতিটুকু নেই লোকায়তদের প্রতি। কলকাতা ও বঙ্গের নানা দিক দেশ থেকে আসা পৌষমেলার ভদ্র ও মার্জিত ভদ্রসমাজ (শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা তাদের বলে 'বোটু', অর্থাৎ বোকা টুরিস্ট) আসরে বসে নিমীলিত নেত্রে বাউল ফকিরের গান শোনেন। কোনও কোনও অত্যুৎসাহী ব্যক্তি ভিডিও তোলেন, দূরদর্শন ও খাসখবরের প্রতিনিধিরা ব্যস্ত হয়ে ঘোরেন। কেউ খোঁজ রাখে না মেলা চত্বরের দক্ষিণে হু হু শীতে সারারাত কেঁপেছে এই গায়কের দল। সকালে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়েছে নাম পঞ্জিভুক্ত করার জন্যে। নইলে খাবার ও জলখাবারের স্লিপ পাবে না, রাহা খরচ ও দক্ষিণা পাবে না। লম্বা লাইনে দাঁড়ানো দীনভিখারি সেই মানুষগুলোকে দেখলে চোখে জল আসবে।

বাউলদের মধ্যে বসে আছেন ছাউনির একটেরে আশি ছুঁই ছুঁই সনাতনদাস বাউল। সরকার তাঁকে বহুমান্য লালন পুরস্কার দিয়েছে, দৃশ্যকলা আকাডেমি দিয়েছে লোকশিল্পীর পুরস্কার। কিন্তু তাতে কী? তিনি তো ভি. আই. পি নন যে রতনকুঠিতে থাকবেন! তাই যেথায় 'থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন সেই তৃণস্তরে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। তিনি অন্যত্র কেনই বা থাকবেন? আউল বাউল সকলের তো একই ব্যবস্থা, একই আহার, একই শৌচস্থান। আমি বললাম, 'আপনি এখানে? দেখে লজ্জা লাগছে।'

মনে পড়ল সনাতনদাস তাঁর খয়েরবুনি গ্রামের আশ্রমে আমাকে কত সমাদর ও আশ্রয় দিয়েছেন। খাইয়েছেন বেলের শরবত, মণ্ডা। সেই মানুষের এই অনাদর? দোষরোপ করে লাভ নেই, এই হল লোকায়তদের প্রতি আমাদের গড় দৃষ্টিভঙ্গি। সনাতনদাস কিন্তু হেসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন, 'আমরা তো মাটিরই মানুষ, গলায় মেঠো সুর। মরলে এই মাটিতেই হবে সমাধি। এখানে সবাই সমান বাবা।'

পরানপুরের এনায়েতউল্লা ফকিরের সঙ্গে দেখা। পরানপুরে তাঁর বড় দোতলা বাড়িতে রাত্রিবাস করেছি। এখানে তাঁর ভূমিশয্যা বরাদ্দ। বললাম, 'এখানে বাউল আর ফকিরদের আলাদা করে রাখা হয়েছে। কেমন লাগছে?'

—বাউল ফকিরের মধ্যেকার ভেদ আমরা চাই ঘোচাতে, এঁরা সেটা বহাল রাখতে চান। জানেন তো আপনি, আমাদের নদে-মুর্শিদাবাদে 'বাউল-ফকির সংঘ' আছে। আমরা একজোট হয়ে মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে লড়ি। অথচ এখানে আলাদা আস্তানা আলাদা আসর।

—বাউলদের তুলনায় ফকিরদের অবস্থা বেশ খারাপ, তাই না?

—হ্যাঁ, ফকিররা তো ফিকিরি জানে না। খুব গরিব। সামাজিক সম্মান নেই। শরিয়ত মানে না বলে মুসলিম সমাজের সঙ্গে ওঠাবসা নেই, উলটে তাদের হাতে মার খেতে হয়। ঘরদোর পুড়িয়ে দেয়, চুল কামিয়ে দেয়, একতারা ভাঙে। তা ছাড়া ধরুন, ভারত বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিদেশে তো ফকির পাঠায় না, পাঠায় বাউল। তারা মোটা টাকা আয় করে ফেরে। তাদের নিয়ে তথ্যচিত্র হয়, শিল্পীরা তাদের ছবি আঁকে। ফকিরদের পোশাকটার জেল্লা নেই, এই দেখুন আমার সাদা তহবন্দ সাদা পিরান। আজকাল কেউ কেউ আসরে তাই কালো জোব্বা পরে। কী করবে?

—এখানে যেসব ফকির দেখছি তাদের মধ্যে সাধক ক'জন, গায়কই বা ক'জন? কে এদের ডেকেছে?

AMARBOI.COM

এনায়েতউল্লা ম্লান হেসে বললেন, 'ফকিরি একটা সাধনপন্থা। শরিয়তির বদলে মারুফতি। আমাদের সাধনায় ধ্যানজপ জিকিরের কাজ বড়, গানের দিকটা তত জোরালো নয়। ওটা বাউলদের বেশি।'

—তা হলে এখানে কারা এসেছে? আপনাদের ছাউনিতে অতজন যে আছে তারা কারা?

—বেশির ভাগই চিমটে-বাজানো ভিখিরি। পথে ঘাটে ট্রেনে এরা ভিক্ষে করে। সত্যি কথা বলতে কি, এরা এখানে এসেছে দু'দিন ধরে দু'বেলা খেতে পাবে পেট ভরে, কিছু টাকাও পাবে সেই আশায়। এরা ফকির নয় সবাই, গরিব।

—তা হলে এখানে যে সব শ্রোতা ফকিরি গান শুনছে তারা কী শুনছে? কোন গান? খাঁটি ফকিরি গান তবে কি নেই?

এবারে এনায়েত আমাকে লজ্জায় ফেলেন। খাঁটি ফকিরি খানদান ওঁদের। ফকিরের বাড়িতে থেকে তাঁদের ঘরানার ফকিরি সাধনা স্বচক্ষে দেখেছি। বীরভূমের ফকিরডাঙায় দায়েম শা'র ফকিরি গান সংগ্রহ করেছি, শুনেছি কবু শা'র গান। সেসব গানের জাতই আলাদা। শান্তিনিকেতনে ফকিরি আসরে যাদের গাইতে দেখেছি তারা দীনভিখারি বেশির ভাগ। তাদের গান এখানে দেখছি প্রধানত লালনের, যিনি আসলে বাউল পরম্পরার মানুষ।

এসব বিবরণ লিখতে লিখতে লিয়াকত আলির একটা আত্মস্মৃতি ('আমার ফকির-সঙ্গ') মনে এল। এখানে বীরভূম জেলার শাসপুর গাঁয়ের দরিদ্রতম ফকিরদের ১৯৯৯ সালের প্রতিবেদন আছে। তাদের গানের আসরের বিবরণ এই রকম:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(লিয়াকত ফকিরদের জিজ্ঞেস করে,) 'কীভাবে আপনারা গাইবেন? বাদ্যযন্ত্র কিছু তো দেখছি না'।
'হ্যাঁ গো হ্যাঁ' বলে সুলতান দিব্যহাসি হাসে।
এদিকে একজন বেশ তরিবত করে গাঁজা দলতে থাকে। ছিলিমে ভরার আগেই ফকির নিয়ে আসেন থালির উপর রাখা চায়ের কাপ। জলভরতি মগটা ছিল পাশেই। চা খেয়ে সকলে হাতে জল নেয়। এরপর চলে ছিলিমে দম।
গাঁজা শেষ হতেই ওদের নিজেদের মধ্যে ঘটে গেল ইশারা বিনিময়। জল ফেলে দিয়ে একজন হাতে তুলে নিল মগ। সুলতান নিল থালি। অন্য একজন পকেট থেকে চিরুনি বের করে কাগজ সেঁটে নিয়ে ধরল মুখে। ফকিরের হাতে উঠে এল চিমটে। অতর্কিতে বেজে উঠল থালা মগ চিরুনিবাঁশি ও চিমটে। এবং সেই সঙ্গে সুলতানের গলা— 'কেউ ফিরে না খালি হাতে খাজা বাবার দরবারে'।

আয়োজনহীন বাদ্যযন্ত্রছুট এই যে গানের বেদনা সেখানে হৃদয়ের আর্তিটাই বড়, বাজনা বাদ্যি পোশাক মাইক ক্যাসিও লাগে না।

লিয়াকত চোখ-কান-খোলা মুক্তমনের আধুনিক যুবা। বাউল ফকিরদের সঙ্গ সে বহুভাবে করেছে বহুদিন। ১৯৯৯ সালের বাউল আর ফকিরদের তফাত সে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় এই বলে:

বাউলরা, যাদের দামী গেরুয়া আলখাল্লার উপর তাপ্পিসৌখীন বাহারে মোড়ক। এরা কারা? ঐতিহ্যের দৃঢ় অবস্থান ছেড়ে তাদের নাচ আজ পণ্যদূষিত, আত্মীকরণহীন ধার করা আমদানীর ভেজালে সাধনাচ্ছিন্ন বাণিজ্যিক মজা ও ফুর্তির উপাদানে পর্যবসিত। হরেক বাদ্যযন্ত্র ছাড়া তারা আর গানের কথা ভাবতে পারে না। স্টেজে আসার আগে সাজগোজ করতে তারা যে সময় নেয় তা তো প্রসাধনবাজির চূড়ান্ত। এদের পেছন পেছন বাউলপ্রেমিক নামে হিন্দু মধ্যবিত্তের এক শহুরে বাউণ্ডুলে অংশ, গবেষক, মেম ও বিদেশে পাচার করার জন্য ফড়ে ঘুরছে। কুঁড়ে ঘর থেকে নিজেকে বিকিয়ে দালানে উঠেছে বাউল। পরনে বিদেশী জিনসের প্যান্ট শার্ট, পাছার নীচে মোটর সাইকেল। খবরের কাগজ, রেডিও, টিভি, সরকারী বেসরকারী অনুষ্ঠান সর্বত্র এদের নিয়ে মাতামাতি।
কিন্তু ফকিরেরা যে তিমিরে সেই তিমিরে। তাদের পেছনে কেউ নেই। পার্থিব, আকাঙ্ক্ষা পূরণের লালসাজনিত বাণিজ্যিক আত্মপ্রতিষ্ঠা থেকে দূরে থাকে বলেই সর্বত্রই তারা অবহেলিত, এমনকি মূল্যায়নহীনও। মুসলিম মধ্যবিত্তের রসিক-সাজা বাউণ্ডুলে বখাটে অংশও এদের পেছনে নেই।
... নাচ ও বাদ্যযন্ত্রহীন গানেও যে আমি এত বেজে উঠতে পারি।— দরকার ছিল জানার, নিজেকে এভাবে খুঁজে পাবার।

লিয়াকতের লেখাটা থেকে একটা কথা স্পষ্ট, যে বাংলার সমাজের ফকিররা যেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপেক্ষিত ও ব্রাত্য, কলমজীবীদের দরদ ও করুণাও তেমনই পায়নি তারা। প্রদর্শনপটু বাউলদের পাশে তাদের অনাড়ম্বর মগ্ন সাধনা গবেষক ও দূরদর্শীদের হয়তো টানে না। তাদের সাধনায় অবশ্য গানের ততটা প্রাধান্যও নেই। তবে লিয়াকতের বর্ণনা থেকে জানা যাচ্ছে ফকিররাও বাউলদের মতো গাঁজা খায়।

গাঁজা কেন জানি না লৌকিক সাধকদের গ্রাস করে রেখেছে বহুদিন। এতে তাদের নাকি সাধনায় তীব্র একাগ্রতা আনে। হতে পারে, তবে বাউলদের ব্যাপক স্বাস্থ্যহানি এবং গানের গলা নষ্ট হতে আমি অনেক দেখেছি। লালনের গানে গাঁজার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আছে। প্রমথ চৌধুরী 'আত্মকথা'-য় তাঁর বাল্যে শোনা একটা নেড়ানেড়ির গান উদ্ধৃত করেছেন। গানটি এইরকম:

যদি গৌর চাস কাঁথা নে ধনী।
সকালবেলায় ভিক্ষায় যাবি
ঘরে এসে তেল মাখাবি
আর পেতে দিবি বিছানাখানি।
আর গাঁজায় কলকের আগুন দিবি
দিনরজনী।

গানের বাণী অনুসরণ করলে বোঝা সহজ যে বাউল বা ভেকধারীদের উনিশ শতকে ভদ্রশ্রেণিরা কী চোখে দেখতেন। বাউলরা হঠাৎ কীভাবে সমাজে জনপ্রিয় হল তার কারণ অনুসন্ধান আজও হয়নি, তবে এখনকার ছন্নমতি শহুরে যুবাদের গাঁজার প্রতি টান সুবিদিত। তাই কেঁদুলি বা নানা মেলায় বাউলদের আসরে ভদ্রলোকদের সন্তানরা ব্যাপক গাঁজা টানে— এমন দৃশ্য দেখতে আমার চোখ খুব অভ্যস্ত। আজকাল ট্রাউজার ও টপ পরা ছাত্রীদেরও দুয়েকজনকে দেখছি গাঁজায় দম দিতে।

মাঝে মাঝে বাউল ফকিরদের নিজস্ব জমায়েতে গাঁজার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও প্রতিবাদ শুনেছি। তাতে খুব ফল হয়েছে বলে দেখিনি। এখনকার যে-কোনও বাউল মেলায় তাদের সব ক'টি ঠেকে ঢুকলেই ভক করে একটা গন্ধ নাকে লাগে— তীব্র গাঁজার গন্ধ। বাউলের ঝুলিতে ছিলিম বা 'বাঁশি' থাকবেই। সেই সঙ্গে গাঁজাপাতা টুকরো করার জন্য ছোট্ট যন্ত্র। আসরে প্রকাশ্যেই গাঁজার সেবা প্রস্তুতি খুব সাধারণ দৃশ্য। তারপরে হাসি হাসি মুখ, নিমীলিত চোখ আর মাঝে মাঝে 'জয় গুরু' বলে বেমক্কা হাঁক। বাউলানীদের অবশ্য গাঁজা খেতে বড় একটা দেখা যায় না, তবে মেলার গানের আসরে একটা দুটো পারভার্ট মহিলা থাকেই। হঠাৎ হয়তো সে নাচতে শুরু করল কিংবা এলিয়ে পড়ল বাউলের অঙ্গে। যুগলের রসের খেলা বলে কথা। সবটাই তো সাত্ত্বিক নয়— অনেকটাই কামের পরিতৃপ্তি।

বাংলায় যত মেলা হয় তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত কেঁদুলির জয়দেব মেলা। পৌষ সংক্রান্তির দিনে অজয়ের তীরে এ মেলা বহুদিনের। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর যৌবনে কাশী থেকে কেঁদুলি এসেছেন। এখন এ-মেলা অনেক পণ্যবাহী ও বাণিজ্যমুখী হয়ে গেছে, সাধক বাউলদের দেখা মেলে কম, তবু নেই নেই করে এখনও নানা বর্গের গৌণ ধর্মের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধকরা এখনও আসেন। এইরকম একজন সাধুর আখড়ায় চলছিল গাঁজার আসর। ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার, সকলে ঊর্ধ্বমুখী শিবনেত্র। তার মধ্যে একজন বুঁদ হয়ে গাঁজা সাজছিল। মানুষটা তখনও গাঁজা সেবন শুরু করেনি, হাবেভাবে বেশ টনকো। তাকে বললাম, 'গাঁজা নিয়ে গান জানেন? কেউ লিখেছেন?'

প্রসন্ন হেসে লোকটি বলল, 'একটা পদ আমরা গাই তবে তার ভণিতা পাইনি তাই ঠিক কোন মহতের রচনা বলতে পারব না। গানটা শুনুন:

গাঁজা তোর পাতায় পাতায় রস—
না খেলে যায় না বোঝা
খেলে অপযশ।
সিদ্ধি খাও বাটি বাটি
গাঁজা খেলে শরীর মাটি
মদ যে আরও মজার নেশা
এক গেলাসেই কত রস।
যত ভাবি না না না না
এ গাঁজা তো আর খাব না
ভুল করে তাই ভোলাবাবার
হয়ে গেলি বশ।
গাঁজা তোর পাতায় পাতায় রস ৷৷'

গানের সুর 'তুমি কাদের কুলের বউ' মার্কা, খেমটা তালে। শুনেই বোঝা গেল এ গান কোনও মহতের রচনা নয় সেকালের খেঁটারের গান।

এই একটা বেশ ভাববার দিক— আমাদের মঞ্চ নাটকে আর চলচ্চিত্রে বাউল চরিত্রের বহুল ব্যবহার। এ সব চরিত্র আমদানির প্রধান কারণ অবশ্য দর্শকদের গান শোনানোর সুযোগ সৃষ্টি করা, অর্থাৎ নিছক বিনোদন। তাতে খানিকটা গানের মুখবদল হয়, লৌকিক গানের প্রয়োগক্ষেত্র পেয়ে যান সংগীত পরিচালক। কে না জানে আমাদের বাবু-সংস্কৃতি তথা ভদ্রলোকদের পাতে বাউল বা ফোক টিম্বারের যে-কোনও গান চাটনির মতো জমে যায়। তবে তফাত আছে, আগেকার দিনে এ ধরনের গান ভাল লাগে বলেই সকলে উপভোগ করত এখন তাতে প্রমোটিংয়ের একটা ধুয়ো জারি হয়েছে। বলা হচ্ছে এ সব গানে আছে নিম্নবর্গের রুদ্ধবাণী, সমন্বয়বাদ ও সুস্থ প্রতিবাদী চেতনা।

পশ্চিমবঙ্গের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব বিষয়ে সেমিনার হয়, আমি নিজেই অনেক জায়গায় ওই বিষয়ে বলেছি। আধুনিক ইতিহাসচর্চার পাঠক্রমে লোকায়তদের গান এখন 'টেক্সট' হিসেবে সমাদৃত, বিশ্লেষণযোগ্য বিষয়— কিন্তু যারা এই জাতীয় গান রচনা করে, যারা গায়, তাদের আর্থসামাজিক অবস্থান ও অবমানিত অস্তিত্ব সম্পর্কে সরেজমিনে ক'জন উৎসাহী? ক'জন তাদের বিপদে আপদে পাশে আছে? নেই যে, অন্তত ফকিরদের পাশে যে তেমন কেউ নেই, সেটা স্পষ্ট। কারণ ফকিরিগানে বাণিজ্য হয় না, তাদের গানে গিমিক নেই,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোশাকের জেল্লা নেই, 'কালচারাল এক্সপোর্ট সারকিটে' চলে না, ফকিররা একদম বলিয়ে কইয়ে নয়, তাদের সঙ্গে মেম সাহেবরা থাকে না, তা হলে?

এইখানে এসে লিয়াকতের অভিজ্ঞতার বয়ান বেশ দিশা দেয় আমাকে। বাউল ফকিরদের নিয়ে শৌখিন মজদুরি করে না লিয়াকত। সত্তরের রাজনীতির কারণে উচ্চশিক্ষার ড্রপ আউট সে বাউল ফকিরদের বন্ধু ও সঙ্গী। তাদের নিয়ে অবিরত লেখে। এমনকী ফকিরডাঙার একজন ফকিরের মেয়েকে বিয়ে করে সে ঘর বেঁধেছে। পদে পদে বউয়ের সঙ্গে তার জীবনদৃষ্টির ফারাক ধরা পড়ে। সেই রকম একটা ঘটনা সে লিখেছে :

> ফকিরডাঙায়, আমি যেখানে আছি, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ধুলো ময়লার মধ্যে খেলে, গড়াগড়ি খায়। একদিন আমি বউকে, যে কিনা ফকিরের মেয়ে, বলি, 'ছেলেমেয়েগুলো দিনরাত নোংরায় পড়ে আছে, মানা করতে পারো না?' বউ বললে, 'তখন থেকে নোংরা নোংরা করছ— নোংরা কোথায়, ও তো ধুলো।' আমি অবাক। ধুলোকে নোংরা বলে চিনে এই সভ্যতার জন্ম, যেখানে আমি শিক্ষিত হয়েছি— সেই আমি অবাক। কে ঠিক? আমি না আমার বউ? আর আমি নিজেকে ঠিক বলে দাবি করতে গেলেও মনে হচ্ছে এর মধ্যে কোথাও ফাঁকি থেকে যাচ্ছে।

সংশয়ী লিয়াকতের মন উথালপাতাল হয়, সে এবারে প্রশ্ন তোলে, সংগত প্রশ্ন,

> এজন্যই কি পণ্ডিতদের টীকাভাষ্য পুস্তককে ফকিররা গুরুত্ব তো দিতে চায়ই না, উলটে বিরোধিতা করে? এমনকী শাস্ত্রকেও তারা গুরুত্ব দিতে নারাজ। কিন্তু এসব কথা ফকিরেরা নিজে লিখলেই তো ত্রুটিমুক্ত হত, ফাঁকি মুক্ত হত। তাও তারা লিখল না কেন?
>
> মনে হয় গুহ্য জিনিসকে অনেকাংশে গোপন রাখতে চেয়েছিলেন তারা। বিকাশশীল মহা অনন্তকে কোন বিবৃতির ছাঁচে প্রকাশ করার চেষ্টা করেননি তারা, তাতে তত্ত্বের অফুরন্ত সৃষ্টিশীলতার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তাই তারা ওপথ মাড়াননি, বলেছেন 'দিল-কেতাব' পড়ার কথা। লিখেছেন গান। এমন আভাসে ইঙ্গিতে লিখেছেন যাতে ব্যক্তর থেকে অব্যক্তই বেশি। এমনকী ব্যক্তও হয়েছে অন্তহীন রহস্য মাখানো।

লিয়াকত ফকিরকন্যা বিবাহ করলেও ফকিরিপন্থায় সামিল হয়নি। সে তাদের মরমি, দরদি, সব অর্থেই সে তাদের আত্মীয় কিন্তু তার নিজের জিজ্ঞাসা মেটেনি। তবু সে খুব গভীর বিশ্লেষণে বুঝেছে :

> অনধিকারী বলে ফকিরেরা তাদের ভিতরের কথা খুলে না বলুক, তাদের সঙ্গ আমার জীবনের বহু ফাঁকি ঘোচাতে সাহায্য করেছে।

লিয়াকত এরপরে চলে গেছে ফকির-পরিমণ্ডলে দৈনন্দিন জীবনের গভীরে। তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপনের উৎসে। তাদের শৈশব গাথায়। লেখে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
AMARBOI.COM

জালাল শা ফকিরকে যত দেখি তত অবাক হই— সম্পত্তি নেই, মাটির ঘর, কারো কাছে হাত পাতেন না। অথচ মানুষের অযাচিত দানেই তার সংসার চলে। আর তাতে ঘুরিয়ে চলে মানুষেরই সেবা। যেখানেই থাকুন তিনি, যেখানেই যান, তার সঙ্গে পাঁচ-দশজন লোক জুটবেই; তিনি যা খান, তারাও তাই খাবে। যদি উপস্থিত সকলকে খাওয়ানোর পয়সা না থাকে, যত খিদে পাক, নিজে একা কিছুতেই খাবেন না। কাউকে খাওয়াতেও বলবেন না। নিজে থেকে যদি কেউ খাওয়ায়, সে কথা ভিন্ন। এরপর আছে দিনরাতের যে-কোনও সময়ে, এমনকী গভীর রাতেও, ভক্তদের নিয়ে বাড়ি ফেরা।...

ছেলেমেয়েদের প্রতি তার প্রাণাধিক ভালবাসা। অথচ ছেলেমেয়েগুলো ডানপিটে, কিছুটা জংলি এবং স্বাধীন। নিজেদের ইচ্ছামতো বেড়ে উঠেছে। এত ছোট বয়স থেকে এত হস্তক্ষেপহীন স্বাধীনতা ভোগ করার সুযোগ আর কোথাও কোনও ছেলেমেয়ে পায় কিনা জানা নেই। নিজেদের মধ্যে হুটোপুটি মারামারিও লেগে আছে।... অথচ প্রতিটি ছেলেমেয়ের ভেতরটা অদ্ভুত নির্মল। মানুষের প্রতি মমত্ববোধ ও ভালবাসায় শিশুরাও যে কতখানি এগিয়ে এদের না দেখলে বোঝা যাবে না। একটু বড়রা দিনরাত মানুষকে জল এনে দিচ্ছে, চা এনে দিচ্ছে, ধুচ্ছে এঁটো কাপ গেলাস থালা— জাত-পাতের প্রশ্ন নেই, চেনা-অচেনার প্রশ্ন নেই, অর্থবান-ভেদাভেদ নেই— সবার, সবারই।... সঞ্চয় নেই— সঞ্চয় না থাকার উদ্বেগও নেই।

লিয়াকত লক্ষ করে আশ্চর্য হচ্ছে, এদের মধ্যে হা-অন্ন ভাবটা একেবারে নেই। নেই লোভলালসা ধান্দাবাজি। দুয়েক বেলা উপোস এদের দমাতে পারে না, কিন্তু অতিথি আপ্যায়নে অত্যন্ত সজাগ। লিয়াকত বোঝে :

> শিষ্টাচার ভালবাসা ও সেবার এমন আচরিত প্রাত্যহিক সজাগ দৃষ্টান্ত জীবনে খুব একটা দেখিনি। মনে প্রাণে আমিও তো এই জীবন চাই। বিত্তের দাসত্বে মানসিকভাবে ডুবে থাকলে ব্যক্তি, সমাজ ও সভ্যতার যে কী হীন আপোষমুখী আত্মকেন্দ্রিক চেহারা হয়— তা চারপাশে প্রত্যহ দেখছি। এই ফকিরের সৎ বেদনাপ্রশ্নের কাছে বিস্মিত ও শ্রদ্ধানত আমার অবস্থান কোথায়? আমার জ্ঞানবুদ্ধিশিক্ষা, হায়, আমারই আকাঙ্ক্ষার সততাকে দমন করার কাজে লিপ্ত থেকে আমাকে বোঝাচ্ছে— যতই কাঙ্ক্ষিত হোক, ওই নিরক্ষর ফকিরের পথে অতটা হেঁটো না, মরে যাবে। না, ফকিরের ফাঁকি-ঘোচানো জীবন দৃষ্টান্তের আহ্বানে এগিয়ে গিয়ে উদ্ধার হবার যে ততখানি সামর্থ্য আমার নেই এই লজ্জায় আমার মাথা নিষ্কৃতিহীন হেঁট হয়ে আছে।

বিবেকী মানুষের অন্তর্বাষ্পবহুল এমনতর প্রতিবেদনে আমাদের মুখোমুখি করে দেয় সামাজিক দ্বন্দ্বের অনপনেয় দ্বিচারী বিন্যাসে। ফকিরিজীবন শৈশব থেকেই মুক্ত ও হস্তক্ষেপহীন, অথচ তারা সেবাধর্মে উৎসুক। তারা সঞ্চয়হীন কিন্তু প্রত্যাশা নেই উন্নত জীবনযাপনের ভোগরাগে। বিত্তের দাসত্ব, পুঁজির বিকাশ, আমাদের আপোষমুখী ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মকেন্দ্রিক করে তুলছে, গড়ে তুলছে শ্রেণিবৈষম্য— কোথাও উৎসর্জন নেই, আত্মদানের দীক্ষা নেই। তা হলে কী করে বুঝব আমরা প্রকৃত ফকিরদের, তাদের জীবনবিশ্বাসের গানকে? সেসব গান শুধু সংগ্রহ ও সংকলন করলেই হবে না, খুঁজতে হবে সেই বনিয়াদ যা ফকিরদের জীবনসত্যে গ্রথিত। তা ততটা সুরময়, চটকদার না হতেই পারে।

লিয়াকতের অভিজ্ঞতা ও ব্যাখ্যান থেকে আরেকটা কথা স্পষ্ট হল যে, মেলামচ্ছবে সচরাচর যেসব ফকির দেখি তারা উদাহরণীয় ফকির নয়। তারা বেশির ভাগ ক্ষুৎকাতর ভিখারি, চিমটে-বাজানো গানঅলা। খাঁটি ফকিররা থাকেন তাদের অন্তর্জীবনের গুপ্ত ছকে। 'সদা থাকো আনন্দে' যেন তাদের আদর্শ। তবে এমন ফকিরি জীবন বিরল হয়ে আসছে। উৎসবমুখী মধ্যবিত্ত সমাজ তাদের আয়োজিত সম্মেলন ও জমায়েতে প্রায়ই ডেকে আনে বাউল ফকিরদের। এই আহ্বান তাদের সার্বিক সমাজস্রোতের অন্তর্গত করার জন্য নয়, নিজেদেরই দরদি প্রতিমা গড়তে। মঞ্চে তাদের লড়িয়ে দিচ্ছেন। লজ্জাহীন স্থূল শ্রোতাদের বিনোদন করতে না পারলে ভবিষ্যৎ নেই জেনে মরিয়া তালবাদ্যে ও বসনবিন্যাসে বাধ্যত সতর্ক যারা, তারাই কি প্রকৃত বাউল ফকির? তথ্যচিত্রে কেন শুধু তাদের অবয়ব ধরে রাখছি আমরা? গত তিন দশক ধরে আমি দেখে যাচ্ছি মূল বাউল ফকির জীবনের অন্তস্তলীয় পচন এবং মেকি প্রদর্শনকামীদের উত্থান। আমরাই তাদের কানে বিকৃতিমন্ত্র দিচ্ছি। ফলে তারা শিখে নিচ্ছে আমাদেরই স্বার্থভাষা ও প্রচারের শস্ত্র।

এর দুটো নমুনা তো চোখের সামনে দেখেছি এবং এখনও দেখছি। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি কলকাতার বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে প্রথম গান গাইতে দেখি নবনীদাস বাউলকে। রোদে-পোড়া তামাটে বিশেষত্বহীন চেহারা। অঙ্গে ময়লা সাদা পোশাক। তার ক'বছর পরে কলকাতার নিজাম প্যালেসে গৌরকান্তি ঝুঁটি-বাঁধা কেশকলাপে সুপুরুষ পূর্ণদাসের গান ও বৃত্তাকার নাচ দেখে মুগ্ধ হই। গেরুয়া আলখাল্লা, গেরুয়া লুঙ্গি, একই রঙের কোমরবন্ধ ও পাগড়ি পরা পূর্ণদাসের যৌবনবিগ্রহ ও তেজি কণ্ঠ যেন অধুনাতন সময়ে একই সঙ্গে বাউল গানের পুনর্জাগরণ ও নবদ্যোতনা আনল। তাঁর কণ্ঠস্বরে, উচ্চারণে ও তারসপ্তকের টানে একটু কোমলতা ও নারীত্বের ভাব ছিল। দেখতে দেখতে সেটার অনুকরণে বাউল গায়করা হয়ে উঠল পূর্ণ-রই প্রোটোটাইপ যেন। এখনও সে ভাবটা পুরোপুরি কাটেনি। বাউলের জীবনে নাচের ছন্দ থাকলেও বাউল গানের পরিবেশনে তত নান্দনিকতা থাকার কথা নয়। নানা রঙের টুকরো কাপড় সেলাই করে জুড়ে আগেকার দরিদ্র বাউল সাধকরা যে লম্বা আলখাল্লা পরত তাকে বলত গুধরি। তারই যে টেলর-মেড নব সংস্করণ এখনকার সাজানো বাউল গায়করা পরিধান করে থাকে তাতে সচেতন চমক আছে, চেষ্টিত বর্ণময়তা আছে, নজরকাড়া শৌখিনতা আছে কিন্তু প্রাণ নেই। অবশ্য এই ধরনের সাজা বাউলের ইতিহাস এদেশে নতুন নয়। লালন ফকিরের আমলে কাঙাল হরিনাথ শখের বাউল গান লিখে ফিকিরচাঁদ ভণিতা দিয়ে দল বেঁধে গান গাইতেন প্রথমে কুষ্টিয়া-কুমারখালিতে, পরে জনাদরের টানে যশোহর, ঢাকা ও কলকাতাতেও। জলধর সেনের বর্ণনায় এদের চেহারা :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখিতেছি একদল ফকির : সকলেরই আলখেল্লা পরা; কাহারও মুখে কৃত্রিম দাড়ী, কাহারও মাথায় কৃত্রিম বাবড়ী চুল, সকলেরই নগ্ন পদ।

প্রাণকৃষ্ণ অধিকারীর বর্ণনায় :

খিলকা, চুল, দাড়ি, টুপী ব্যবহার এবং কাহার কাহার পায়ে নূপুরও থাকিত, বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ডুগী, খমক, খুঞ্জুরি, একতারা প্রভৃতি ফকীরের সাজে তাহারা বাহির হইত।

ফিকিরচাঁদের দলের সাফল্য দেখে ক্রমে ক্রমে গড়ে ওঠে বালকচাঁদ, গরিবচাঁদ, আজবচাঁদ ও রসিকচাঁদের দল। তাদের মধ্যে পাল্লাদারিও হত। কিন্তু তা স্থায়ী হয়নি।

এখানে লক্ষণীয় যে দুটো বর্ণনাতেই কৃত্রিম সাজে সজ্জিত গায়কদের ফকির বলা হয়েছে, বাউল বলা হয়নি। তাদের গেরুয়া অঙ্গবাসের উল্লেখ নেই। মীর মশাররফ হোসেন বর্ণনা করেছেন গানের ভাষায় :

ছেলেবুড়োয় সং সাজিয়ে
রং লাগিয়ে গান ধরেছে—
তারা বানিয়ে জটা লাগিয়ে আঠা
দাড়ি গোঁপে খুব সেজেছে।
আবার খেল্‌কা পরে হল্‌কা ধরে
মাজা নেড়ে খুব নাচিছে—
এ সকল উপরি চটক আল্‌গা ভড়ক
করে বল ফল কী আছে?

AMARBOI.COM

বলা বাহুল্য এমন সাজানো দলের বানানো গানের ঢেউ বেশিদিন চলেনি। সমকালীনরাও এমনকী একে 'সং' বলে চিহ্নিত ও পরিহাস করেছিল। গানের নামে এ যে গিমিক, 'উপরি চটক' ও 'আল্‌গা ভড়ক' (অর্থাৎ ভড়কি) এবং শেষ পর্যন্ত এ প্রচেষ্টা যে নিষ্ফল তা ঘোষণা করতে সেকালের প্রাজ্ঞ বিবেকীদের সংশয় ঘটেনি। তা হলে আজ আমরা কেন এত উদাসীন ও অপারগ?

বাউল গানের নামে গেরুয়ার বিলাসিতা, সাজসজ্জা কেশবিন্যাসের ঘটা অথবা সাঁইবাবার মতো চর্চিত কেশের মাথা ঝাঁকানো কবে শেষ হবে? চোখের সামনে দেখছি, বাউলদের পাশে আসরে পাত্তা পাবার জন্য যুবক বয়সের ফকিরিগানের গায়ক সাদা পোশাক ছেড়ে পরছে কালো রঙের আলখাল্লা, গলায় পরছে নানা বর্ণের পাথরের মালা। চারপাশে জুটে গেছে নানা ধরনের গীতিকার— তারা সাধকও নয়, তাত্ত্বিকও নয়— গানের সরবরাহকারী। সরকারি আমলা, সভাধিপতি, লোকসংস্কৃতিগবেষক, বিধায়ক, বাউল সমাবেশের উদ্যোক্তা এমনকী মন্ত্রীদের কাছে গিয়ে তারা বিনয়বচনে জানায়, সব রকমের বাউলগান তারা লিখেছে, লিখে দিতে পারে। সাক্ষরতা, বয়স্ক শিক্ষা, পণপ্রথা বিরোধী, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও সংহতি, মৌলবাদবিরোধী, চাইকি থ্যালাসেমিয়া ও এড্‌স্ নিয়ে তার লেখা গান আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে সব গান নিয়মিত গেয়েছে, গায়, অমুক বাউল তমুক বাউল। গান চাই গান? কে নেবে গো বাউল গান!

আজ তাই সারা পশ্চিমবাংলার বাউল ও ফকিরদের বৃত্তান্ত লেখার চেষ্টা করতে গিয়ে মনে হচ্ছে, প্রথমে গত শতাব্দীর আগে থেকে এদেশে বাউল ফকিরদের নিয়ে যে সব চিন্তাভাবনা ছাপা বইতে লিখিত আকারে পাওয়া গেছে তার ধারাবিবরণ জানা জরুরি। মনে রাখতে হবে এসব রচনা হয়তো ছিল নিতান্ত ক্যাজুয়াল। তত কিছু গূঢ় গভীর সন্ধান করে সবাই লেখেননি, এসে গেছে লেখার টানে। কেউ কেউ আবার একটু গভীরে যেতে পেরেছেন। কেউ বাউলদের বিরোধী, কেউ দরদি। তবে দৃষ্টিকোণ যাই হোক, প্রান্তীয় বা উদার, ইতিহাসের প্রয়োজনে আমাদের জানতে হবে এই বৃত্তান্ত রচনার আগে কে কেমন ভেবেছেন নিম্নবর্গের এই গৌণধর্মীদের জীবন আর সাধনা নিয়ে। তার জন্য নানা রকম বইপত্র, পুথি, পুস্তিকা, পত্রিকা ও চিঠি থেকে উৎকলন সহযোগে জেনে নিতে হবে এর পরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোপ্য সাধনার ত্রিবেণী

পঞ্চাশ বছর আগে রাঢ় বাংলার রূপকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রসিদ্ধ 'রাইকমল' উপন্যাসের গোড়ায় লিখেছিলেন :

> পশ্চিমে জয়দেব-কেন্দুলি হইতে কাটোয়ার অজয় ও গঙ্গার সঙ্গম-স্থল পর্যন্ত 'কানু বিনে গীত নাই'। অতি প্রাচীন বৈষ্ণবের দেশ।... এ অঞ্চলে সুন্দরীরা নয়ন-ফাঁদে শ্যাম শুকপাখি ধরিয়া হৃদয়পিঞ্জরে প্রেমের শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে তখন হইতে জানিত।
>
> লোকে কপালে তিলক কাটিত, গলায় তুলসীকাঠের মালা ধারণ করিত; আজও সে তিলক-মালা তাহাদের আছে। পুরুষেরা শিখা রাখিত। এখন নানা ধরণের খোঁপা বাঁধার রেওয়াজ হইয়াছে, কিন্তু স্নানের পর এখনও মেয়েরা দিনান্তে একবারও অন্তত চূড়া করিয়া চুল বাঁধে। ...হলুদমণি পাখি— বাংলাদেশের অন্যত্র তাহারা 'গৃহস্থের খোকা হোক' বলিয়া ডাকে, এখানে আসিয়া তাহারা সে ডাক ভুলিয়া যায়— 'কৃষ্ণ কোথা গো' বলিয়া ডাকে।
>
> চাষির গ্রামে সদ্‌গোপেরাই প্রধান, নবশাখার অন্যান্য জাতিও আছে। সকলেই মালা তিলক ধারণ করে, হাতজোড় করিয়া কথা বলে, প্রভু বলিয়া সম্বোধন করে। ভিখারিরা 'রাধে-কৃষ্ণ' বলিয়া দুয়ারে আসিয়া দাঁড়ায়; বৈষ্ণবেরা খোল করতাল লইয়া আসে; বৈষ্ণব বৈষ্ণবীরা একতারা খঞ্জনী লইয়া গান গায়; বাউলেরা একা আসে একতারা বাজাইয়া।

এই বর্ণনার পর উপন্যাস যত এগোয় আমরা তার কাহিনির পথ ধরে চলে আসি এক স্নিগ্ধ বৈষ্ণবীয় আখড়ায়, হরিদাস মহান্তের গড়ে-তোলা কুঞ্জে। সেখানে থাকে দুটি প্রাণী— মা আর মেয়ে, কামিনী ও কমলিনী। কী করে যেন তাদের জীবনে এসে যায় বৃদ্ধ বাউল রসিকদাস। কমলের নাম দেয় সে 'রাইকমল'। শেষদিকে বাউল আর বৈষ্ণবী, দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ী অসমবয়সি তারা, নিজেদের মালাচন্দনে বাঁধে। এইখানে এসে আমরা আখ্যান অংশ ত্যাগ করে স্বচ্ছ চোখে রাঢ়ের বহুদিনের সমাজ-ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাব, এই ভূমিখণ্ডে বৈষ্ণব আর বাউলে খুব আড়াআড়ি নেই, যেন অজয় আর গঙ্গার মিলে যাওয়া। তাই বৈষ্ণব-তীর্থ কেঁদুলিতে বাউলদের সবচেয়ে বড় সমাবেশ। তাতে কোনও বেসুর বাজেনি, কোনওদিন। বাজেনি যে, তার কারণ, এ প্রান্তের বাউল ও বৈষ্ণবদের বেশির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাগই উচ্চবর্গের বা উচ্চবর্ণের নয়। বৈষ্ণব মানেও সর্বদা নৈষ্ঠিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব নন, বরং জাতি-বৈষ্ণব বা সহজিয়া। সকলেই প্রধানত কায়াবাদী। দেহ-বৃন্দাবনেই তাদের আরোপ সাধনা। অনুমানের পথে নয়, তাদের সাধনার নাম 'বর্তমান'। এই দেহভাণ্ডেই তাদের সবকিছু। তাই দেহের কিছুই ঘৃণ্য বা বর্জ্য নয়।

নজর করলে আরেকটা জিনিস দেখা যাবে। বর্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়ায় প্রতি বছর নির্দিষ্ট দিনে যে সব বিখ্যাত বাউল সমাবেশ হয়ে থাকে তার মূলে রয়েছে সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উদ্যম ও উদ্যোগ। কেঁদুলির কথা তো আগেই বলেছি তা ছাড়া বাঁকুড়া সোনামুখির বাউল সমাবেশ (রামনবমী) হয় মনোহর খ্যাপার প্রসিদ্ধিতে। মনোহর ছিলেন সাধু বৈষ্ণব। বর্ধমানের অগ্রদ্বীপে ঘোষঠাকুরের শ্রাদ্ধে কৃষ্ণমূর্তি গোপীনাথ শ্রাদ্ধ করেন কাছা পরে। পুরোপুরি বৈষ্ণবীয় উৎসব, কিন্তু বাউলদের বেশ রমরমা। বীরভূমের কোটাসুরে একশো বছর ধরে ভাদ্র মাসে সাধুসেবা চলছে। এতে প্রধান ভূমিকা বাউলদের। অথচ আশ্রমটি নারায়ণচাঁদ গোঁসাইয়ের সাধনসঙ্গিনী খ্যাপা মা-র নামেই প্রসিদ্ধ। আগে এর তত্ত্বাবধান করতেন মতিদয়াল গোঁসাই, তারপর মনোহরদাস মহান্ত। নামের ধরন দেখেই বোঝা যাচ্ছে এঁদের জাতি-বৈষ্ণবের পরম্পরা, তবে গৃহী নন— আখড়াধারী। এমনই বহু উদাহরণ দেওয়া যায়— যেমন বেনালীপুরের মেলা, রামকেলীর সমাবেশ, দধিয়া বোরেগীতলার মেলা। বীরভূমের বাউলদের নিয়ে অনেকদিন সরেজমিন কাজ করেছেন আদিত্য মুখোপাধ্যায়। তাঁর ধারণা :

> বেশির ভাগ বাউলই নিজেকে বৈষ্ণব বলে পরিচয় দেন এ আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। আসলে 'রূপ'— 'রাগ' হয়ে বাউল পৌঁছায় 'ভাবে'। বাউলের বিভিন্ন শুদ্ধ আচরণগুলিই তাকে ক্রমশ বৈষ্ণব করে তোলে।

বাউলের শুদ্ধ আচরণ? শুনেই মনে পড়ল ১৮৯৬ সালে পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'Hindu Castes and Sects' বইতে মন্তব্য করেছিলেন :

> The Bauls are low class men, and make it a point to appear as dirty as possible... Aristrocratic Brahminism can only punish them by keeping them excluded from the pale of humanity.

কিন্তু এ মন্তব্য তো উনিশ শতকের শেষ দশকের একজন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের। আধুনিক কালের ব্রাহ্মণ যুবা আদিত্য মুখোপাধ্যায় মনে করছেন অন্য কথা। তিনি বলছেন :

> বিষয়টি গুলিয়ে যাবার মতোই। প্রায় প্রত্যেক সাধু-বাউলের কাছে শুনেছি, তাঁরা বৈষ্ণব বাউল। 'বাউল বোষ্টম' কথাটিও এতই প্রচলিত যে এদের ভিন্নত্ব ধরা পড়ে না। আবার বাউলের সাধন সঙ্গিনীকে সব সময়েই 'বোষ্টুমী' বা 'বৈষ্ণবী'-ই বলা হয়।

এ যেমন সত্যি তেমনি এটাও ঘটনা যে 'আউল বাউল' বলে একটা কথা চালু আছে, 'বাউল-ফকির' কথাটাও খুব সচল। লালন কী ছিলেন— বাউল না ফকির?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনিশ শতকে বাউল আর ফকিরদের বহুক্ষেত্রে সমার্থক বলে মনে করেছেন অনেকে, অন্তত সেকালের পণ্ডিত ও গবেষকরা। তাঁরা কেউই অবশ্য এই দীনহীন সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রসন্ন ছিলেন না। তার কারণ তাঁদের উচ্চবর্ণের অহমিকা একদিকে, আরেকদিকে নিম্নবর্গের এই কায়াসাধকদের গোপন ও গুহ্য আচরণবাদ। কেবল বাউল বা ফকিরিতন্ত্র নয়, জাতবৈষ্ণব-কর্তাভজা-সহজিয়া স্রোত, এমন সমস্ত ধারা যা গৌণধর্মীদের আশ্রয় ও আশ্বাস দিয়েছিল তা তাঁদের মনঃপূত হয়নি। সনাতন ভাবনাচিন্তা বা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আচরিত ধর্মের বাইরে যারা যায় তাদের খ্যাতিবিত্ত জোটার তো কথা নয়। তাদের জোটে নিন্দা ও বিদ্রূপ। তারা হয়ে ওঠে উচ্চশ্রেণির পক্ষে সন্দেহজনক আর শত্রুবিশেষ। তাই তাদের দমন-পীড়ন-ধ্বংস সাধন হয়ে ওঠে আশু কর্তব্য। ব্যাপারটি একপক্ষীয়— কারণ শাস্ত্র-মন্দির-মন্ত্র-মসজিদ-পুরোহিত-মোল্লা সেইদিকে। তারা নগরবাসী, ও শিক্ষিত, মসীজীবী লেখকরাও তাদের পক্ষে। পত্রপত্রিকা, ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও মুদ্রণযন্ত্র তাদের সহায়। অন্যপক্ষে গ্রামে-বাস করা বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত বাউল ফকিরদের অস্ত্র বলতে কণ্ঠের গান আর অন্তরের তীব্র বিশ্বাস। সেই জায়গাটায় অবশ্য তাদের খুব জোর। কোনও অনুমানাত্মক কিছুকে তারা মানে না। তাদের মতে শাস্ত্র-পুরাণ-দেবমূর্তি-মন্ত্র-তীর্থ-উপবাস এসব আসলে 'অনুমান'। সত্য হচ্ছে 'বর্তমান', এই নরনারীর দেহ ও দেহধর্ম, এই ইহজগৎ আর কামনাবাসনা, স্বপ্ন ও মুক্তিপিপাসা। এর পরতে পরতে রয়েছে রহস্য ও মরমিয়া বিশ্ব। খোদা বা ঈশ্বর আছেন মানব জীবনের শরিক হয়ে, তাই মানুষ ধরে সাধনা করতে হবে। তাদের গানে বলা হচ্ছে :

মানুষ হয়ে মানুষ জানো
মানুষ হয়ে মানুষ চেনো
মানুষ হয়ে মানুষ মানো
মানুষ রতনধন।
করো সেই মানুষের অন্বেষণ ॥

এই মানুষতত্ত্ব যার সত্য হয়ে যায় মনের মধ্যে, সে কেন অন্য তত্ত্ব মানবে? সে কেন গ্রস্ত হবে সাবেক স্বর্গ-নরক ধারণায়? তাই তার প্রতিপ্রশ্ন :

আল্লার বাড়ি যদি মাটির দুনিয়া হয়
তবে মানুষ মরে কোন্ বেহেস্তে যায়?

বেহেস্ত বা স্বর্গপ্রাপ্তি যদি কাঙ্ক্ষণীয় না হয় তবে এসব লৌকিক সাধকদের একমুখী লক্ষ্য মানুষের মুক্তি। সে মুক্তি মানে মোক্ষপদ প্রাপ্তি নয়— অজ্ঞানতা, কুসংস্কার থেকে মুক্তি। মাটির ঢিপি ও কাঠের মূর্তি পুজো, অপদেবতা বা উপদেবতায় বিশ্বাস, দরগাতলায় হত্যে দেওয়া বা কবচতাবিজ ধারণ সবেরই বিরুদ্ধাচরণ করা এদের ব্রত। বিচারশীল আর তর্কপ্রবণ বাউলফকিররা বহুলাংশেই গুরুবাদী, কারণ গুরুই কায়াসাধনার পথ ও পদ্ধতি বাতলে দেন। কিন্তু এমন যে অত্যাজ্য গুরু, তাঁকেও অভ্রান্ত না ভেবে বলা হয়েছে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাহা দেখিনি নিজ নয়নে
বিশ্বাস করি না গুরুর বচনে।

এত যুক্তিতর্কবিচার সংকুল পন্থা গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষের কাছে সমাদৃত হবার কথা নয়। কিন্তু মনের মানুষের সন্ধানে নিরত এমন গভীর নির্জন পথ নিঃসঙ্গ সাধকের প্রাণের প্রদীপে আলোকিত। সে নির্ভয় ও ধর্মনির্লিপ্ত— স্রোতের বিরুদ্ধে তার অবগাহন। প্রয়োজনে সে প্রতিবাদী, কিন্তু তার আয়ুধ লাঠি নয়, একতারা। তার বিশ্বাস, 'এই মানুষে সেই মানুষ আছে।'

কিন্তু বিশ্বাসের এত বলিষ্ঠ অবিচল পথের পদাতিকদের সংখ্যাবৃদ্ধি তো সনাতনবাদীদের পক্ষে স্বস্তির হতে পারে না। তাই তাঁদের প্রশ্ন :

কী জন্য প্রবীণ মতে বিরত হইয়া।
অভিনব মতে রত কী সুখ দেখিয়া ॥
স্বর্গের সোপান কি এ মতে গাঁথা আছে।
দড়বড়ি চলি যাবে শ্রীহরির কাছে ॥
না জানি কী লাগি সবে ভ্রান্ত হায় মতি।
নবপথে পদার্পণ কেন এ দুর্মতি ॥

দ্বন্দ্ব এটাই অর্থাৎ প্রবীণ মত আর নতুন মত। 'পাষণ্ডীদলন'-এর লেখক রামলাল শর্মা তাঁর নিরীহ পয়ারে যে প্রশ্ন তুলেছেন তা তার একার নয়। অক্ষয়কুমার দত্ত, যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রেয়াজউদ্দিন আহমদ, দাশরথি রায় এমনকী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসেরও এই এক প্রশ্ন। পুরনো পথ ছেড়ে অভিনব এই পথে কেন? কীসের জন্য? এ পথে কি স্বর্গ বা শ্রীহরির পাদপদ্মপ্রাপ্তি দ্রুততর হবে? মুশকিল যে স্বর্গ বা হরি কোনওটাই এদের অন্বিষ্ট নয়। এদের লক্ষ্য মানব, মানবসত্য।

ঈশ্বরলাভ আর স্বর্গপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা গায়ে গায়ে লেগে থাকে। যুক্তিবাদী লালন শাহ মারাত্মক প্রশ্ন তুলেছেন এ প্রসঙ্গে। বলছেন :

মলে ঈশ্বরপ্রাপ্ত হবে কেন বলে?
মলে হয় ঈশ্বরপ্রাপ্ত সাধু অসাধু সকলে
তবে কেন এত জপতপ এত করে জলেস্থলে?

সকলেরই তো লক্ষ্য ঈশ্বরপ্রাপ্তি, সাধু অসাধু সকলেই তো পাবে ঈশ্বর, তা হলে আর কেন এত জপতপ এত কৃচ্ছ্রসাধন? তারপরের জিজ্ঞাসা :

যে পঞ্চে পঞ্চভূত হয়
মলে তা যদি তাতেই মিশায়—
তবে ঈশ্বর-অংশ ঈশ্বরে যায়
স্বর্গ-নরক কার মেলে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একেবারে তাত্ত্বিক প্রতিপ্রশ্ন। পঞ্চভূত থেকে আমাদের সৃষ্টি আবার পঞ্চভূতেই বিলয়, তা হলে কোন সে উদ্বৃত্ত অংশ যা স্বর্গে বা নরকে যাবে? এ জাতীয় তত্ত্ব ও দ্বান্দ্বিকতার বিন্যাস থেকে বোঝা যায় নিম্নবর্গজাত বাউলফকিররা খুব হেলাফেলার, অবজ্ঞার বা ঘৃণার বিষয় নয়, অনুধাবনের বিষয়।

এদেশে বাউল একটি তত্ত্ব হিসাবে গৃহীত হয়েছে, ধর্মহিসাবে নয় । এরা একই সঙ্গে বৈদিক কর্ম কাণ্ড এবং ব্রাহ্মণ্য আচার আচরণের বিরোধী। এদের ভাবনা ধারণা গঠনে বৈষ্ণবীয় রাগানুগা সাধনা ও পরকিয়া মৈথুনকেন্দ্রিক কায়াবাদ আছে। বেশ কিছুটা প্রতিবাদী ইসলামি স্পর্শ এবং অনেকটা সুফিবাদের সংক্রাম আছে। বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও নাথপন্থের কিছু কিছু সংরাগও লক্ষণীয়। এককথায় বাউল ভাবনায় এক উদার ও সমন্বয়বাদী মানবচেতনা কাজ করেছে, যার নেতৃত্বে শাস্ত্র বা মন্ত্র নেই— আছে গান আর গুরুর নির্দেশ। গানগুলি দ্যোতনাময় ও গূঢ়, তাকে ভেদ করতে হয় সাধনায়। এক কথায় বাউলরা হল ভোগমোক্ষবাদী, সমাজচ্যুত কিন্তু সমাজবিচ্ছিন্ন নয়। সামাজিক দায়দায়িত্ব তারা নিতে চায় না কিন্তু সমাজের শোষিত নিম্নবর্গের শ্রমজীবী অংশ থেকে যেহেতু তাদের আবির্ভাব তাই অত্যাজ্যভাবে তাদের গানে রয়ে যায় নানা সামাজিক স্মৃতি ও সংস্কার, রূপক ও প্রতীক। তাদের গানের ভাবে-বর্ণনায়-সুরে মাটির স্পর্শ খুব প্রকট। কেউ কেউ মনে করেন বাউল সাধনায় পর্যুষিত হয়ে আছে বাংলার ধর্ম, বাঙালির ধর্ম ও তার চিরার্জিত মানসজীবন। 'দেশীভাবে ও বিদেশীপ্রভাবে এর উদ্ভব,' এমন কথা বলেছেন কেউ— সেক্ষেত্রে বিদেশি বলতে ইসলাম ও সুফিপ্রভাবের কথাই ব্যঞ্জিত। সমাজের উপরতলার লোকের ধর্ম হলে এই মতবাদ যে কেবল বাঙালির জীবন ও ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করতো তা নয়, দুনিয়ার মানুষের কাছে উদার মানসিকতার জন্য বাঙালিকে শ্রদ্ধেয়ও করে তুলতো'— আহমদ শরীফের মতো প্রাজ্ঞজনের এ হেন মন্তব্যে ভাবাবেগ যতটা স্ববিরোধও ততটা। কায়াবাদী যৌনযৌগিক কোনও গোপ্য সাধনরীতি কি উপরতলার লোকের চর্চার বিষয় হতে পারে? এ কি কোনওভাবে বহুজনের আচরণীয়?

আহমদ শরীফ অবশ্য বাউলতত্ত্ব বিষয়ে এমন মন্তব্য করেছিলেন বহুদিন আগে, ১৯৬৩ সালে। তারপরে মন্তব্যটি হয়তো তিনি পুনর্বিবেচনা করে থাকবেন। তবে অপেক্ষাকৃত পরে, ১৯৮৮ সালে, তিনি 'ফুলবাসউদ্দীন ও নসরুদ্দীনের পদাবলী' সংকলনের মুখবন্ধে যে মতামত দিয়েছেন তা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। বলেছেন,

> 'Materialism spiritualism'-এর দ্বন্দ্বে যখন দুনিয়ার মানুষের মন অস্থির ও অসুস্থ, যখন নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিপর্যস্ত, যখন পৃথিবীর কল্যাণকামী চিত্ত অবক্ষয়ের নিরূপ যন্ত্রণায় কাতর, মানসদ্বন্দ্বে বিক্ষত মানুষ যখন স্বস্তির নিদান লাভের আগ্রহে উন্মুখ ও উৎকণ্ঠ, বিমূঢ় শিল্পীরা ও মনীষীরা যখন দিশাহারা, তখন এই অধ্যাত্মবাদনির্ভর নিশ্চিত মনের অবিচল প্রসন্ন-প্রশান্তি আমাদের ভাবিয়ে তুলবেই। বাউল গান আমাদের ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করিয়ে দেয় জীবনের জড় রয়েছে গভীরে, গতি হচ্ছে অনন্তে আর সম্ভাবনা আছে বিপুল। অবশ্য স্বীকার করতেই হবে এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> মরমীতত্ত্ব ও অধ্যাত্মবাদ আধুনিক যন্ত্র ও প্রযুক্তিনির্ভর ইহজাগতিক সুস্থ ও স্বস্থ জীবনবিরোধী ও উপযোগবিহীন।

এ একেবারে আধুনিক মনের বিশ্লেষণ, তবে নিরপেক্ষভাবে এমন প্রশ্ন কি উঠবে না যে, যা সুস্থ ও স্বস্থ ইহজাগতিক জীবনবিরোধী ও উপযোগবিহীন, তা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন কোথায়? সেই প্রশ্ন, অনিবার্যভাবে, তবু ওঠে। কারণ আমাদের সাম্প্রতিক মধ্যবিত্তমন বাউল গান শ্রবণ ও চর্চায় খুব উৎসাহী। সত্যিকথা বলতে কি এই মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রোতা ও ভোক্তাদের খুশি করবার জন্যই বাউল তার সাজসজ্জাকে জাঁকালো করেছে, গানের পরিবেশনে এনেছে পারফরমারের মঞ্চদাপানো গিমিক ও ভাবভঙ্গি, যন্ত্রানুষঙ্গে ঘটিয়েছে অতিরেক। যে যুবকটি বর্ধমান বা নদিয়ার গ্রামে চাষবাস করে কিংবা ঘরামির বৃত্তিধারী, সে সন্ধ্যাবেলায় বাউলের আসরে যেন বিদূষক— বিনোদন করাই তখন তার ধর্ম। হালফিল বাউলের এই দ্বিচারিতা সমাজের একটা ব্যাধির মতো বেড়ে চলেছে। তাদের অনেকের জীবনে কোনও মগ্নতা বা প্রশান্তি নেই— বিমূঢ়তার আততি তার চোখে মুখে ছাপ ফেলে।

এই আততির কারণ দু'রকম। প্রথমত, বাউল এতদিন অভ্যস্ত ছিল গ্রামীণ জনপদ ও সেই জনমণ্ডলীকে গান শোনাতে, তাতে কোনও বিরোধ ছিল না কারণ সে-গান তো সেই জীবনেরই ফসল। গানের বক্তব্য, প্রতীক, বর্ণনা এমনকী সুরের একঘেয়েমি তাদের মেনে-নেওয়া। এখন নগরায়ণের তুমুল কলরোলের মধ্যে বাউলকে হতে হচ্ছে নাগরিক গায়ক, বুঝতে হচ্ছে নাগরিক মানুষের সদা পরিবর্তনশীল হালকা পলকা রুচিবোধ। এটাই দ্বিতীয় সমস্যা। যেহেতু গ্রামীণ রুচি ও প্রত্যাশার কাঠামো অনেকটা অনড় তাই সেখানে বাউল গায়ক স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল কিন্তু নগরের মঞ্চে সে আড়ষ্ট বেপথু। কী যে সে গাইবে, কতটা রংবাজি তাতে দরকার তার নির্ধারক এক অশিক্ষিত শ্রোতার দল— যারা কোনও গূঢ় গভীর ভাবের গান শুনতে আসেনি, দেখতে এসেছে একটা গানের ধরন, যা গড়নে 'ফোকো-মডার্ন'। তাদের কারুর কারুর আত্মাভিমান এইরকম যে এই গানের সমাদর বা পরিপোষণ মানে একরকম শিকড়ের সন্ধান ও ঐতিহ্যের পরিচর্যা। বাংলাদেশের গবেষক আহমদ মিনহাজ ভেবেছেন, সমকালের রাজনীতির ঘূর্ণি, মূল্যব্যবস্থার ব্যাপক ওঠানামা, আকাশ-সংস্কৃতির প্রসার-প্রতিষ্ঠা, নীতি-আদর্শের ক্রমস্খলন, সাম্যের পতন, ভক্তির প্রাবল্য ও নাস্তিকের ঔদ্ধত্য, তারও চেয়ে ভয়াবহ ব্যাধি, মধ্যবিত্তের অপরচুনিস্ট হওয়ার Self centered হওয়ার অসুস্থ মানসিকতা থেকে একদল বিবেকী ও সংবেদি মানুষ নিক্রান্ত হতে চাইছেন। কোনও বাঁধা ছকে তাঁদের আর আঁটছে না, তাঁরা কিছুটা ভাবুক বা স্বপ্নবাদী হতে চান, ইতিহাসকে দেখতে চান জীবনের দর্পণে। মিনহাজের ভাষায় :

> আমাদের অনুভূতিতে আজ তাই দোলা লেগেছে, ইতিহাস তার পরিচিত ভঙ্গি বদলে নতুন আদলে ধরা দিতে চাচ্ছে; নিছক অধ্যাত্মবাদ, বস্তুবাদ-এর কোনওটিই নয়, দুইয়ের প্রাসঙ্গিক ও যুগোপযোগী মিলনের আকাঙ্ক্ষাই আজ বড়ো হয়ে উঠেছে। বাউল গান শুধু গান নয়, বাউল গানের ইতিহাসের পাতায় মুখর সাধকদের অন্তর্গূঢ়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাণী হিসাবে শুধু নয়, ইতিহাসের নতুন পথনির্দেশনারূপে আমাদের অনেকের চেতনায় প্রতিভাত হচ্ছে। আমরা গ্রহণ করতে চাচ্ছি এর মানবিকতা এর আধ্যাত্মিকতা এবং এর বস্তুবাদিতাও। মানে করলে দাঁড়ায়, আমরা পুনরায় শিকড়াভিমুখী, পুনরায় আশ্রয়প্রত্যাশী; আমাদের অভিগমন ঐ সব লুপ্তপ্রায় চিহ্ন ও অভিজ্ঞতার কাছে, সেখানে আমাদের অনুপ্রেরণা বাউলের গান, আর অবলম্বন লালন, হাসন, শাহনুর, শীতলাং, ভবানন্দ, ভবা পাগল, পাগলা কানাই, রাধারমণ, আরকুম শাহ, দুর্বিন শাহ, মহিন শাহ, শেখ ভানু, আব্দুল করিম, এমনি শত শত নাম, নামহীন জানা-অজানা মানুষের পরিমণ্ডলে চর্চিত জীবনদর্শন, এক ঋদ্ধ ইহ-আধ্যাত্মিকতা।

নব্য বাঙালির এমন শিকড়সন্ধান ও আশ্রয়প্রত্যাশার অধুনাতন প্রয়াস হয়তো সত্য ও আন্তরিক কিন্তু সেই শুশ্রূষা কি শুধু প্রাক্তনদের লেখা গানেই মিটে যাবে? নতুন গীতিকারদের লেখা গান খুঁজব না আমরা? খুঁজে যদি পাই তবে সেই গান কি অনিকেত আমাদের দিশা দেবে? কী করে দেবে— যখন এখনকার বাউল গীতিকাররাও আরেক অর্থে বিভ্রান্ত ও বিব্রত? যখন চটকদারি কথাবার্তা, বানানো প্রহেলিকা তাঁদেরও আচ্ছন্ন করছে— 'সত্য বলো সুপথে চলো' এমন লালনবাণী যখন উপেক্ষিত অবহেলিত, তখন?

আহমদ মিনহাজ অবশ্য বোঝেন অধুনাতনের বাউল-সমস্যা। গত কয়েক দশক এবং বিশেষ করে গত দশ বছর পশ্চিমবঙ্গের বাউল-ফকির অধ্যুষিত গ্রামদেশে ঘুরে আমি যা বুঝেছি, বাংলাদেশে বাস করে মিনহাজ তার থেকে অনুভবের খুব একটা দূরত্বে নেই। তাই তিনি লেখেন :

> এ যুগ বাউল হবার উপযোগী নয়। জীবনধারণের সমস্যা এত কঠিন হয়ে গেছে, বাউলরাই আজকাল বাউল হতে চান না। গ্রামগুলোতে অভাব দিন দিন বাড়ছে, নগুরে বাবুয়ানা ঢুকে পড়ছে, কে আর গভীর মন নিয়ে বাউলের গান শুনবে, বাউলকে গ্রাসাচ্ছাদনের সুরাহাটুকু করে দেবে। এখনো যারা বাউল আছেন তারা আগের মতো গুহ্য শাস্ত্রের চর্চা করেন না, জীবনের রূঢ় বাস্তবকে প্রকাশ করেন গানে; বলেন মানুষের অভাবের কথা, দারিদ্র্যের কথা, লোক সংস্কৃতির সমৃদ্ধ চিহ্নগুলো হারিয়ে যাওয়ার বেদনা প্রকাশ পায় তাদের গানে।

এরকম অনেক গান আমি সংগ্রহ করেছি আবার নানা সংকলনেও বাউলদের লেখা এমন কিছু কিছু গান রয়েছে যাতে ধরা আছে বিগতদিনের জন্য চাপা কান্না— হারিয়ে-যাওয়া সম্মিলিত গ্রামিক যাপনের স্মৃতির জন্য দীর্ঘশ্বাস। এমন গানগুলির মধ্যে সবচেয়ে যেটি মর্মস্পর্শী বলে মনে হয়েছে আমার, এখানে উদ্ধৃত করছি—

আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম
গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু-মুসলমান
মিলিয়া বাউলা গান ঘাঁটু গান গাইতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্ষা যখন হইত গাজীর গান আইত
রঙ্গে ঢঙ্গে গাইত আনন্দ পাইতাম।
বাউলা গান ঘাঁটু গান আনন্দেরই তুফান
গাইয়া সারিগান নাও দৌড়াইতাম—
আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম।
হিন্দু বাড়িনতে যাত্রাগান হইত
নিমন্ত্রণ দিত আমরা যাইতাম।
মনে ভাবনা সেদিন কি পাব না
ছিল বাসনা সুখি হইতাম...

বাংলাদেশের বাউল গীতিকার আবদুল করিম এমন একখানি সমাজসম্পৃক্ত গান লিখলেন কেন? সমাজের পটপরিবর্তন, লোক সংস্কৃতির থাকা-না থাকা, হিন্দু-মুসলমান সাম্য— এসব নিয়ে বাউলের ভাবনা কেন? ভাবনা এইজন্য যে তার নিজের পথ নির্ধারিত ও স্পষ্ট কিন্তু সেই পথের চারপাশের যে-সমাজ, যে-মানব পরিবেশ তা নিয়েও তার ভাবনা— সেখান থেকেই তার উদ্ভব। তার জন্মের তো কোনও অ-লৌকিক উৎস নেই। স্বদেশ আর স্বসমাজের ভাষাই তার ভাষা— সেই ভাষায় লেখা গান তার স্বভাষীরই সমাদরের বিষয়। সমাজ তাকে তেমন মান দেয়নি, তার জীবনযাপনের ক্লিষ্টতায় দরদ দেখায়নি, সমাজের মূলস্রোতে বাউলের স্থান নেই, সে গ্রামের একটেরে পড়ে থাকে, প্রান্তিক বর্গের মানুষ, তবু সেই সমাজই তার শিক্ষক, সমাজই তার উপমা-প্রতীক-রূপক রচনার চাক্ষুষ উৎস। যাদুবিন্দু গোঁসাইয়ের একটা বাউল গানে একজন একক মানুষের দুঃখভারনত জীবনের ছবি আছে—

AMARBOI.COM

যে ভাবেতে রাখেন গোঁসাই
সেইভাবেই থাকি
আমি অধিক আর বলব কি।
কখনও দুগ্ধ ছানা মাখন ক্ষীর নবনী
কখনও জোটে না ফেন আমানি
কখনও আ-লবণে কচুর শাক ভখি—

'Life is either a feast or a fast' দর্শনে বিশ্বাসী এই একক মানুষটি সত্যিই কি একক না সমষ্টির ব্যথাবেদনার শরিক? গীতিকারের কি কোনও অভিযোগ আছে ব্যক্তি বা সমাজের বিরুদ্ধে? 'গোঁসাই' কে? উত্তরের খোঁজে গানের পরবর্তী অংশ পড়তে পারি—

তুমি খাও তুমি খিলাও
তুমি দাও তুমি বিলাও
তৈয়ারি ঘর পেলে তুমি পালাও
তোমার ভাবভঙ্গি বোঝা ঠকঠকি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুরু দুখ দিতেও তুমি সুখ দিতেও তুমি
কুনাম গুনাম সুনাম বদনাম সবই তোমারই
ও কুলআলম্ তোমারই ও কুদরতবিহারী।
তুমি কৃষ্ণ তুমি কালী তুমি দিলবারি ॥
কহিছে বিন্দুযাদু তুমি চোর তুমি সাধু
তুমি এই মুসলমান এই হিঁদু...

সাব্লিমেশনই এ গানের সারকথা। গুরুই সেই পথে তাকে টেনেছে। সে একলা পথিক কিন্তু একক নয়— তার সঙ্গী জ্বলন্ত বিশ্বাস ও স্থির প্রত্যয়। সমাজ থেকে ছিন্ন হয়ে সে সমাজকে দেখায় সমন্বয়ের স্বপ্ন।

অবশ্য এতসব বিচিত্র দৃষ্টিকোণ একদিনে অর্জিত হয়নি। প্রথমদিকে গৌণধর্মীদের আমরা ঘৃণা ও বিরুদ্ধতা ছাড়া কিছুই দিইনি— পরে দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা দ্রব ও অনুকম্পায়ী হয়েছে। পরিবর্তনের কারণ বোঝা কঠিন নয়। সবচেয়ে বড় কারণ এটাই যে, আঠারো ও উনিশ শতাব্দীর টানাপোড়েনের কালে বাঙালি হিন্দুসমাজে ধর্মচিন্তার যে আলোড়ন ঘটেছিল তার অনেকটা নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের সীমায় অবরুদ্ধ ছিল। ঔপনিবেশিক ভাঙা গড়ায় ধনী অভিজাত, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও গৃহস্থ ভদ্রলোক— এই ত্রিস্তর সমাজকাঠামোয় ধর্মধারণা নানা মাত্রা ও রূপ নিয়েছিল। শিক্ষার আলোয় পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞান এদেশের মননে নতুন চেতনার বিকিরণ করে, ফলে ধর্মকে দেখা হতে থাকে নানা চোখে। একদিকে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, কেশবচন্দ্র— অন্যদিকে রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিজয়কৃষ্ণ ধর্মের জ্ঞান কর্ম ও ভক্তিমার্গের বহু দিক উন্মোচন করেন। কারুর শস্ত্র ছিল জ্ঞান ও যুক্তি, কারুর শরণাগতি ও ভাবোদ্বেল প্রশান্তি। এ ছাড়া সাকার-নিরাকারের প্রশ্ন ছিল। ঐতিহ্যবোধ, শাস্ত্রজ্ঞান, গুরুর গুরুত্ব, শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব, একেশ্বরবাদ, আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস ও পরলোকতত্ত্ব— এতসব বিচিত্র ও বিরোধী সংঘাতে সংশয়ে দুলছিল তখনকার নাগরিক মধ্যবিত্ত বাঙালির সমাজকাঠামো। আমাদের পাঠক্রম ও উচ্চতর শিক্ষাপদ্ধতি বাঙালির এই মানস-সংঘর্ষের ইতিহাসকে বড় করে দেখিয়ে আসছে বলে সমাজের অন্য দিকটা অজানা রয়ে গেছে। তাই আমরা জানতে চাইনি মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পরে নবাবি শাসনের ব্যর্থতার দায় কেমন করে বাংলার গ্রামসমাজকে জীর্ণ করেছিল। আর সেই জীর্ণতার ফাঁকে ফোকরে ঢুকে জেঁকে বসেছিল জাতিভেদ, বর্ণদ্বেষ, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও পুরোহিত বা মোল্লাতন্ত্র। ব্রাহ্মণ্য সমাজের একনায়কত্বজাত কঠোর বর্ণব্যবস্থা আর মুসলমান শরিয়তি নীতির কট্টর আচরণ থেকে পিঠ বাঁচাতে গড়ে উঠেছিল নানা ধরনের গৌণধর্ম, যার মূলে ছিল শোষিত হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত চৈতন্য ও সমন্বয়স্বপ্ন।

ইংরেজের বিদ্যালয়ে ইতিহাসের পাঠ নিয়ে আমাদের ইতিহাসবোধ গড়ে উঠেছিল বলে সেকালের বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও ধর্মনেতারা বুঝতে পারেননি বাংলার গৌণধর্মের অন্তর্লীন শক্তি আর মানবমুখিনতাকে। চোখে পড়েনি মধ্যযুগের কবীর-নানক-দাদূ-রজ্জবের সন্ত পরম্পরার ঐহিক বাণীর সঙ্গে বাউলদের চিন্তার সমকত্ব। রবীন্দ্রনাথের অনুভবেই প্রথম ধরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ে গৌণধর্মীদের মহিমা ও সেই একলা-পথ-চলার গরিমা। তিনিই প্রথম বলেন,

> বড়ই দুঃখের বিষয় যে আমরা দেশে থাকিয়াও দেশের বিষয় কিছুই জানি না।... বস্তুত আমাদের এইরূপ অজ্ঞতা স্বদেশের প্রতি আমাদের অনুরাগকে বড়ই সংকীর্ণ করিয়া ফেলে।

বাঙালি ছাত্রছাত্রীদের তিনি চোখ ফেরাতে চেয়েছিলেন, 'দেশের দিকে— চারিদিকে— দেশের মাটির দিকে।' 'সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মমত প্রচলিত, অজ্ঞাতে ও অলক্ষিতে যে সকল শক্তি সমাজের মধ্যে' কাজ করছে তাকে জানতে চেয়েছিলেন। বুঝেছিলেন 'সমাজের একান্ত আত্ম সংকোচনের অচৈতন্যের মধ্যেও... আত্ম প্রসারণের উদ্‌বোধন চেষ্টা' রয়েছে নিম্নবর্গাশ্রিত আমাদের গৌণধর্ম সংগঠনের অভ্যন্তরে। সেটাই তার ভারতীয়ত্বের সবচেয়ে বড় প্রতীক।

এখন ছবিটা অনেকটাই বদলে গেছে। বাউল নয় শুধু, সব রকমের নিম্নবর্গের নবচেতনার কথা এখন শিক্ষিত বাঙালি জানতে উৎসুক। সাব-অলটার্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসতত্ত্বের যে-নবব্যাখ্যান আর বয়ান তৈরি হচ্ছে আজকাল তার রসদ পাওয়া যাচ্ছে গৌণধর্মীদের আচার আচরণে, বিশ্বাসে ও গানে। উচ্চবর্ণের ও বর্গের ধর্মচেতনার প্রতিবাদ ও সহকারিতা, এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের টানাপোড়েন সবচেয়ে স্পষ্টভাবে স্পন্দমান এ রকমের উন-ধর্মবোধে। প্রতিবাদের দিকটি সম্পূর্ণ অবারিত ও গানে গানে অভিব্যক্ত। লালন ও দুদ্দু শাহ-র গান এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে উদাহরণীয়। সহকারিতার দিকটি একটু ধূসর, তাই সহসা চোখে পড়ে না। কিন্তু লক্ষ করলে অনুধাবন করা যায়, সাম্প্রদায়িক মূর্তিকে ভাঙতে গিয়ে তার বদলে তারা গুরুমূর্তিকে প্রতিষ্ঠা করে বসে, শাস্ত্রের অস্বীকৃতি পরিণতি পায় গুরুবচনের অলঙ্ঘনীয়তায়। সবরকম অধীনতার বন্ধনপাশ ছিন্ন করতে চায় যে-লোকধর্ম তা বন্দি হয়ে পড়ে গুহ্য রহস্যময়তায়। বাউলের আসক্তিহীনতা বারবার অপ্রমাণিত হয় তাদের নারীসঙ্গের অতিরেকে। একস্তরের বাউলের উদগ্র যশোপিপাসা আর প্রচারপ্রবণতা ধ্বস্ত করে দেয় তাদের পরম্পরাগত আত্মস্থ ধ্যানতন্ময়তাকে। কেউ কেউ গৃহস্থসুলভ ভোগবাদে স্পৃষ্ট হয়ে পড়ে। অথচ বাউলজীবন আর বাউলগান, নানা বিকৃতিসত্ত্বেও আজ ব্যাপক জনাদরে সচল। আশ্চর্য যে, বাউলের প্রতীক-প্রতিমা একতারা আজ বুদ্ধিজীবীদের গৃহসজ্জার উপাদান!

বাংলাদেশের সদ্যপ্রয়াত মনীষী আহমদ শরীফ দেড়দশক আগে কিছুটা বিস্ময়মুগ্ধ চিত্তে চমকিত হয়ে লিখেছেন :

> ইদানীং বাউল মত ও গান আমাদের চেতনায় গুরুত্ব পাচ্ছে। কেবল তাই নয়, নানা কারণে এসব আমাদের ভাবিয়েও তুলেছে। সম্প্রতি প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টায় বিপুলসংখ্যক গান সংগৃহীত হয়েছে। সাড়ে তিনশ বছর ধরে দেশের জন-সমাজের এক অংশ এমনি নিষ্ঠার সঙ্গে যে জীবন-চর্চার এ বিপুল আয়োজনে এতদূর এগিয়ে গেছে, সে সম্পর্কে আমরা অবহিত ছিলাম না। লোকচক্ষুর অন্তরালে লোকান্তরে প্রসারিত জীবন বোধের পরিচয়বাহী এই কাকলিকুঞ্জে প্রবেশ করে, এই সুর-সমুদ্রে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবগাহন করে বিস্ময় মানি।... বিস্ময়মুগ্ধ চিত্তে ভাবছি,— এ নিয়ে আমরা কি করব।... দেশের প্রাকৃতজন যখন ফলপ্রসূ চাষে নিরত, তখন শিক্ষিতগণ নিষ্ফল উদ্যান রচনায় ব্যস্ত। বাউল মত যদি আদ্যিকালের ইতিকথা হত, তা হলে পরিহার-যোগ্য ঐতিহ্য মনে করতাম। কিন্তু আজকের মানুষের এক অংশের জীবন দর্শনের প্রতি এমনি উদাসীন থাকা দায়িত্ববোধের অভাবই জ্ঞাপন করবে।

না, এমন দায়িত্ব বোধের অভাবের পরিচয় আমরা দিইনি। আমরা গত এক দশকে প্রচুর বাউল ও ফকিরি গান গোলাজাত করেছি। তার বিষয়গত বিন্যাস, শ্রেণিকরণ, তার অন্তঃস্থ ইতিহাসের দ্যোতনা, তার প্রতিবাদ ও সমন্বয় বার্তা আমরা পেয়েছি। তৈরি হয়েছে উপেক্ষিত এই ব্রাত্য সমাজের সঙ্গে আমাদের মধ্যবিত্তীয় সতর্ক সমাজের সংলাপের ক্ষেত্র। আবার অতিকৃতিও চলছে নাকি? ক্ষুধার্ত বাউল গায়কদের নিয়ে বিদেশ-বিপণনের ব্যাবসাও আজ আর প্রচ্ছন্ন নেই।

সমাজবিজ্ঞানী পার্থ চট্টোপাধ্যায় একটু রসান দিয়ে মন্তব্য করেছেন : 'the Baul, of course, having been granted cultural benediction in the twentieth by its elevation to the status of an export item in the Festival of India circuit.'

এই রপ্তানি-যোগ্যতার কারণ বাউলদের বহুবর্ণিল পোশাক, গুপিযন্ত্র, মাথার ধম্মিল্ল ও নাচের চমৎকার ভঙ্গি। একেবারে নিখুঁত শো-পিস। অনুষ্ঠান জমাতে অদ্বিতীয়, গঞ্জিকাপ্রিয় এই খ্যাপা বাউলরা বিদেশের মুক্ত সমাজে ও যৌনস্বাধীন যুবমানসে সাড়া তুলেছে। বাউল গানের তারসপ্তকের স্বর-গ্রাম অনেককে টানে। মুক্ত নির্বাধ জীবনযাপন, নারীসঙ্গিনী গ্রহণ-বর্জনের স্বতশ্চল স্বাধীনতা, ইতিউতি সর্বত্র ঘোরাফেরা, সংস্কারহীন খাদ্যাভ্যাস বাউলদের সর্বজনগ্রহণীয় করে তুলেছে। তবে পট পাল্টাচ্ছে। বাউল বিশেষজ্ঞ অমিত গুপ্ত লক্ষ করেছেন :

> মূলত তত্ত্বভিত্তিক হলেও বাউল গানের... সুর ছন্দ, অর্থ ও ব্যঞ্জনায় শুধু রস বিস্তারই নেই অন্য আবেদনও আছে। বুদ্ধিজীবী এবং শ্রমজীবী সবার কাছেই বাউল গান গ্রহণীয়। বাউল গানের ক্ষেত্র ও পরিসর সমাজের পটভূমিতে তাই এত বিস্তৃত। ভূমিহীন এই সম্প্রদায়ের মূলজীবিকা ছিল মাধুকরী। সারাদিন গ্রামে ঘুরে ঘুরে গান গেয়ে যা উপার্জন করত তা দিয়েই তাদের গ্রাসাচ্ছাদন হত। এদের ঘর বাড়িও ছিলো না। আখড়া বা সাময়িক আস্তানা গড়ে এখানে-ওখানে বসবাস করত। আজকের চিত্রটা ভিন্ন।... জীবিকা হিসাবে বাউল বেছে নিয়েছে গানকে। প্রভাব ফেলেছে রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা। বিদেশের হাতছানিও বাউলকে প্রভাবান্বিত করেছে।... কৃষিজীবীদের পৃষ্ঠপোষকতার স্থান আজ ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে বুদ্ধিজীবীদের হাতে, বাউলদের ক্ষেত্রে। বাউলদের সাধন-জীবনের মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যায়ন হয়েছে বাউল গান ক্ষ্যাপা জীবনের নির্যাস, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিল্প পণ্য-ক্রেতাদের কাছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখনকার বাউল তথা বাউলজীবন বিষয়ে আধুনিক যুবক-যুবতীদের অনেকে বেশ উৎসাহী। বীরভূমের নানা বাউল সমাবেশে, বিশেষত কেঁদুলির মেলায়, নবীন বয়সের ছেলেমেয়েদের ভিড় চোখে পড়ার মতো। তার সবটাই লোকদেখানি বা অগভীর নয়। বাউলগানের ভেতরকার একটা অনতিব্যক্ত উচ্চারণের ধরন এখনকার কবিদের খুব টানে। বাউলদের অবাধ জীবনযাপনের মুক্তছন্দ, তাদের ছকভাঙার দুঃসাহস, সমাজবন্ধনের প্রতিবাদী স্বাধীন ঘোরাফেরা অনেককে আকর্ষণ করেছে। যেমন সাতকেঁদুরির তরুণ কবি লিয়াকত আলি। এক সময় ছিলেন উদ্দাম বিস্ফোরক রাজনীতিক ঢেউয়ের শীর্ষে। জেল থেকে ফিরে সংস্কার-মুক্ত প্রতিবাদী মনটাকে কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শে তেমনভাবে আর রাখতে পারছিলেন না লিয়াকত। সেই সময় বীরভূমের নানা বাউলদের ঠেকে ঘুরে পেয়ে যান চমৎকার এক মানসিক আশ্রয় ও মানবিক আস্থার উৎস। লিয়াকত নিজে বাউল নন, কিন্তু সেই স্রোতোধারার স্বচ্ছ জলে স্নান করে শুদ্ধ। বাউলদের সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণে তাই একটা অন্য বিবেচনা ধরা পড়েছে। লিয়াকত লিখেছেন :

> নারী পুরুষের সম্পর্ক একটাই সেটা যৌনসম্পর্ক। এটাই প্রাকৃতিক সম্পর্ক। যা প্রাকৃতিক তাই ধর্ম, তাই সত্য, এর ভালমন্দ ন্যায় অন্যায় হয় না। মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর নারীপুরুষের সম্পর্ক একরকম। একমাত্র মানুষই নারী ও পুরুষের এক ধর্মীয় ও সামাজিক সম্পর্ক স্বীকার করে নিয়েছে। যেহেতু ধর্মীয় ও সামাজিক সম্পর্ক প্রাকৃতিক নয়— মানুষের বানানো— সেহেতু এর ভুলভ্রান্তি সম্ভব।... বাউলরা এই সত্যটা জানে। আর জানে বলেই তারাই হচ্ছে গুটিকয় সেই মানুষ যারা প্রায় নারী পুরুষের তথাকথিত ধর্মীয় ও সামাজিক সম্পর্ককে অস্বীকার করে বেঁচে আছে। একটা সাধনসঙ্গী নিয়ে কোন বাউল গোটা জীবন কাটায়। আবার অনেকেই দেখা যায় জীবনের বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন সাধনসঙ্গীর সঙ্গে। কখন যে কার সঙ্গে থাকবে কি পুরুষ কি নারী কেউই জানে না। নতুন কাউকে ভাল লাগলে পুরানোকে ছেড়ে যাওয়াই রীতি। কখনও বা নতুনকে ছেড়ে পুরানোর কাছে ফিরে যাওয়া। যে যখন যার সঙ্গে থাকে, সে-ই তার সুখ দুঃখ ও সাধনার সাথী। যখন থাকে না ভুলে যায় পরস্পরের কথা। স্থায়ী ভাবে ঘর সংসার বলে এদের কিছু নেই। আছে মাথা গোঁজার অস্থায়ী আশ্রয়। যৌথভাবে থাকার সময়ও কেউ কারও উপর তেমন নির্ভরশীল হয় না, উভয়েই ভিক্ষা করে, উভয়েই খায়। আর এ ভাবে যতদিন বেঁচে থাকে, আকাঙ্ক্ষিত মানুষের সঙ্গসুখ নিয়ে বাঁচে।

এখানে বলে নেওয়া ভাল যে বাউলের কাছে সঙ্গসুখ কথাটা মূল্যবান। তাদের সম্পর্কে মরমি মানুষদের বাউলরা বলে রসিক সুজন। যদিও বাউলদের একান্ত গুহ্য একটা দেহসাধনার ব্যাপার আছে তবু সেটাকে প্রচ্ছন্ন রেখে তারা সকলের সঙ্গে মিশতে পারে। কেননা ঈশ্বরপ্রেম বা জীবে দয়ার বদলে বাউলের মানুষের সম্পর্কে রুচি বেশি। লিয়াকত আলি ঠিকই লক্ষ করেছেন যে দেহসাধনার ব্যাপারেও—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাউল নিজের অস্তিত্বের প্রকৃতি কি বুঝে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সম্পূর্ণ নিজস্ব ও স্বতন্ত্র এক পথিক। 'অন্যে ভালো কি খারাপ ভাববে এই আশঙ্কাতে আমরা ঠিক যা করতে চাই কখনো করতে প্যারি না। এবং এই না পারতে না পারতে একসময় আমরা নিজে নিজের মতো না হয়ে অন্যের মতো হয়ে যাই। লাজ লজ্জা ভয়ের নিকুচি করে বাউল ছাড়া আর কে অন্যের মতো না হয়ে নিজের মতো হয়, হতে পারে? মানুষের কাছে এর চেয়ে মূল্যবান আর কিছু আছে!' এখানেও বাউল সার্থক। এখানেও তাদের তুলনা নেই।

বাউলদের সম্পর্কে লিয়াকতের যে পক্ষপাত তা নিশ্চয়ই তাঁর একার নয়। আমাদের মধ্যে যারা একটু সমাজছুট, মুক্ত স্বভাবের বা স্বচ্ছ চোখে জীবনকে নীতির উর্ধ্বে দেখতে আগ্রহী, বাউল জীবন তাদের রোচক হতে বাধ্য। শুধু বাউল কেন বাংলা চৈতন্যপরবর্তী অনেকগুলি গৌণ ধর্মে এই জীবনধর্মিতা ও মানবমুখিনতা আছে। কর্তাভজা, সাহেবধনী, বলরামী, লালনশাহী, সহজিয়া বৈষ্ণব— এ সব নানা ধারাপ্রবাহে বয়ে চলেছে মানবচেতনার বেগবান স্রোতস্বিনী। বেগবান কিন্তু বহুক্ষেত্রে অন্তঃশীল, গোপন ও গূঢ়। একদিক থেকে ভাবলে এই সব কায়াবাদীরা আসলে ডি-ক্লাসড, শ্রেণিবির্ণহীন। ইহজীবন ও দেহজীবনের দ্বন্দ্বে-ছন্দে তাদের অনুরাগী দোলাচল। একটা অস্ফুট রহস্যের হাতছানি, অম্বিষ্টের জন্য এক মমতাময় আততি তাদের ছন্নছাড়া মন্ত্রহীন ব্রাত্যজীবনের দিকে অমোঘ টানে টেনেছে। অস্পষ্ট পরলোক নয়— বর্তমান জীবনযাপন, অস্বচ্ছ ঈশ্বর নন— প্রত্যক্ষ নরনারী, পুণ্যব্রত উপবাস তীর্থ মন্দির নয়— দৃঢ় সম্মিলিত সুস্থযৌনতার স্বীকৃতি, তাদের লক্ষ্য।

কিন্তু বাউলদের নিয়ে গত এক শতক বাঙালির ভাবালুতার শেষ নেই। ১৮৯০ সালের লালন শাহ-র প্রয়াণের পর তাঁকে নিয়ে বাউলপক্ষীয় ও বাউলবিরোধী দুটি দলই সক্রিয় হয়ে ওঠে। কলকাতার উচ্চমহলে ও বাংলার শিক্ষিতসমাজে বিশেষত ঠাকুরবাড়ির প্রয়াসে এবং রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত উদ্যমে ছাপার অক্ষরে লালনের গান ও তার মর্মরস প্রচারিত হয়। শুরু হয়ে যায় বাউল গান সংগ্রহ ও সংকলনের নানামুখী উদ্যম। গড়ে ওঠে কয়েকটি শখের বাউলের দল। ক্রমে ক্রমে নানা গৌণধর্ম ও সম্প্রদায় একই সঙ্গে 'বাউল' এই সাধারণ (Generic) ও বিশেষ (Specific) সংজ্ঞায় আবদ্ধ হয়ে যায়। বাউল সুর বলে একটা অলীক অনির্ণীত ধরন বাংলা গানে চেপে বসে। আজ সময় এসেছে তথ্য ও যুক্তি অবলম্বন করে ইতিহাসের পথে বাংলার বাউলদের স্বরূপসন্ধান। সে কাজ বেশ কঠিন।

কঠিন এইজন্য যে, বাউলদের সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল নানা অলীক ধারণা ও অনুমানাত্মক সংজ্ঞার জন্ম দিয়েছে। মধ্যযুগের একটি বাংলা কাব্যে 'বাউল' শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখে অনেক পণ্ডিত অনুমান করে বসেছেন যে বাউল ধর্ম সুপ্রাচীন। কিন্তু বাউল কি কোনও ধর্ম? মূলে সেই কথাটারই এখনও মীমাংসা হয়ে ওঠেনি। বাউল কি একটা মৌলিক শব্দ না নিষ্পন্ন শব্দ? এ প্রশ্ন ওঠে এই কারণে যে অনেকে মনে করেন বাউল কথাটা 'বাতুল' থেকে এসেছে। বাতুল মানে পাগল। অন্য একদল মনে করছেন বাউল এসেছে 'ব্যাকুল' শব্দ থেকে, কেননা বাউলরা আত্মানুসন্ধানে ব্যাকুল। ক্ষিতিমোহন সেনের মতো বাউলবিশেষজ্ঞ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে করছেন : তাঁহারা মুক্ত পুরুষ, তাই সমাজের কোনো বাঁধন মানেন নাই। তবে সমাজ তাঁহাদের ছাড়িবে কেন? তখন তাঁহারা বলিয়াছেন, "আমরা পাগল আমাদের কথা ছাড়িয়া দাও। পাগলের তো কোনো দায়িত্ব নাই।" বাউলের অর্থ বায়ুগ্রস্ত, অর্থাৎ পাগল।'

এই কথাটার ধরতাই মেনে একজন লিখলেন বায়ু + ল = বাউল। আরেকজন বললেন, হিন্দি 'বাউর' বাংলায় হয়েছে বাউল। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে 'ঈশ্বরপ্রেমে মাতাল, বাস্তবজ্ঞান বর্জিত, উদাসীন ভক্ত', এই অর্থে নাকি বাউল শব্দ একাধিক স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে, বলেছেন অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। আরবি-পারশি ভাষায় পণ্ডিত হরেন্দ্রচন্দ্র পাল মনে করছেন 'আউলওয়লী' শব্দ থেকে আউল-বাউল শব্দের জন্ম। গীতিকার দুদ্দু শাহ গানে বলেছেন : 'যে খোঁজে মানুষে খোদা সেই তো বাউল।' একজন বলেছেন আরবিতে 'বা' মানে আত্ম, 'উল' মানে সন্ধানী, অর্থাৎ বাউল মানে আত্মানুসন্ধানী।

এসব আধুনিক কালের পণ্ডিতি কচকচি ছেড়ে উনিশশতকীয় পণ্ডিতদের বইয়ের পাতা ওলটালে দেখা যাবে, তাঁরা বাউল শব্দের উৎপত্তির চেয়ে তাদের আচার-আচরণ সম্পর্কে নানা অদ্ভুত মন্তব্য বা ধারণা রেখে গেছেন। যেমন অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' বইতে বাউলদের সম্পর্কে এতদূর লিখেছেন যে, 'শুনিতে পাই ইহারা নরবধ করে না; মানুষের মৃতদেহ পাইলে ভক্ষণ করিয়া থাকে।' পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন, বাউল— 'a mad man, A class of beggars who pretend to be mad on account of religious fervour, and try to uphold their pretention by their fantastic dress, dirty habits and queer 'philosophy of their songs.' বসিরহাটের কাজি মৌলবী কেরামতউল্লা ও গোলাম কিবরিয়া 'উচিত কথা' বইতে আরেক নতুন তথ্য যোগ করে বলেছেন, বাউলদের মতে "আসল ফকিরি-তত্ত্ব চারটি, যেমন—

আউলে ফকির আল্লাহ্ বাউলে মোহম্মদ
দরবেশ আদম ছফি এই তক হদ।
তিনমত একসাত করিয়া যে আলি
প্রকাশ করিয়া দিল সাঁই মত বলি।

এই পদ্যাংশ থেকে আউল, বাউল, দরবেশ, সাঁই— চারটি ধারার খবর মেলে। যাঁরা এক সময় অখণ্ড বাংলায় বাউল-বিরোধী আন্দোলন করেছিলেন সেই শরিয়তবাদী আলেম মুসলমানরা আউল-বাউল-সাঁই-দরবেশ সকলকেই কচুকাটা করেছেন। কারণ বিশ শতকের সূচনায় উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে বহু লোক এসব মরমি ও কায়াবাদী সাধনার পথে চলে যাচ্ছিলেন। বাধ্য হয়ে রংপুর জেলার বাঙালিপুরের মৌলবী রেয়াজউদ্দিন আহমদ 'বাউল ধ্বংস ফৎওয়া' অর্থাৎ 'বাউল মত ধ্বংস বা রদকারী ফৎওয়া' জারি করে হুঁশিয়ারি দেন :

> বাউল বা ন্যাড়াদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বঙ্গের অধিকাংশ লোকেই অবগত আছেন; তাহাদের দ্বারা মোছলমান সমাজের যে ভীষণ ক্ষতি হইতেছে, তাহা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> কাহারও অবিদিত নাই। দীর্ঘকাল হইতে বাউল ন্যাড়াগণ মোছলমানের চক্ষে ধূলি দিয়া তাহাদের ঘৃণিত আচার ব্যবহার গুপ্তভাবে করিয়া মোছলমান সমাজের মেরুদণ্ডকে ক্ষয় করিয়া আসিতেছে। ইহারা ভিতরে অমোছলমান, বাহিরে মোছলমানী নামে নাম, মোছলমান মহল্যায় বাস, মোছলমান কন্যাগণের সহিত বিবাহসাদী ও মোছলমানের সকল প্রকার সামাজিকতায় ভুক্ত। এই অপরিচিত অপ্রকাশ্যভাবে ইহাদের মোছলমানের সহিত মেলামেশার ফলে দলে দলে অশিক্ষিত মোছলমান ইহাদের ধোকাবাজী বুঝিতে না পারিয়া সনাতন এছলাম ধর্মকে ও পবিত্র কোরাণকে ত্যাগ করতঃ কাফের মোরতেদ হইয়া যাইতেছে।... এখনও কি তুমি বাউল ফকিরদিগকে মোছলমান বলিয়া জানিবে? এই কি তোমার এছলামী ঈমান ও মোছলমানী প্রাণের টান? তোমার বেখবরী ও হেশ্‌কারী হেতু তোমার অধীনস্থ কোন মোছলমান যদ্যপি বাউল মত গ্রহণ করিয়া পবিত্র এছলাম হইতে খারিজ হয় সেজন্য কি তুমি খোদা ও রছুলের নিকট দায়ী নহ?

এখানে বাউলদের গায়ে গায়ে জড়িয়ে আছে 'ফকির' শব্দ। শরিয়ত-সন্দিহান মুসলমানরা যখন মারফতি পথ বেছে নেয় তখন তাদের ফকির বলে। একসময় তাদের বাউলদের সঙ্গে এক উচ্চারণে শনাক্ত করা হয়েছে। খুব একটা বিতর্কের ঝুঁকি না নিয়ে আমরা বরং বলি যে বীরভূমের বাউল বা রাঢ়ের বাউলদের সঙ্গে উত্তর ও মধ্যবঙ্গের ফকিরদের অনেক ফারাক। দুজনের সামাজিক ভূমিকা কি আজ এক রকমের? পায়ে হেঁটে খোলাচোখে দেখেছি রাঢ়খণ্ডে বাউলরা জনজীবনের স্বাভাবিক ও অচ্ছেদ্য অংশ। তারা ভিক্ষা পায়, বৈষ্ণব সমাবেশে সাদর আহ্বান পায়; গান গাইতে প্রতীচ্যে যায়, তাদের প্রভূত মান্যতা। তুলনায় নদিয়া-মুর্শিদাবাদের বাউল ফকিররা অনেক নিম্নবর্গে, সামাজিক হীনতা নিয়ে দারিদ্র্যে দুঃখে বেঁচে আছে। কিন্তু কণ্ঠে তাদের গানের জোয়ার। সিউড়ির কাছে সাম্বৎসরিক পাথরচাপুড়ির মেলায় ফকিরদের মর্মন্তুদ দারিদ্র্য ও গীতিমুখরতা একই সঙ্গে দেখা যায়।

আমি বোঝাতে চাইছি, বাংলার বাউল বলতে কোনও স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট ধারণা করে নেওয়া জটিল কাজ। তাদের স্বরূপ স্বভাব ও ক্রিয়াকরণ যেন নানা কাপড়ের টুকরোয় বানানো দরবেশি পোশাকের মতো বিচিত্র ও বর্ণিল। নানা ধারা মিলে মিশে বাউল ধরন গড়ে উঠেছে। আজ তাকে প্রত্যক্ষ সংজ্ঞার সীমায় বাঁধা ঠিক হবে না। মধ্যপন্থী ও বিবেচক পণ্ডিতরা তাই সিদ্ধান্ত করেছেন যে মধ্যযুগীয় বাংলায় নানা রকম লোকায়ত ও শাস্ত্রবিরোধী ধ্যানধারণা বাউল মতের পরিবর্ধন ও প্রসাধনে সাহায্য করেছে। বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া, নাথপন্থ, তন্ত্র ও সুফিবাদ মিলে মিশে এক অদৃশ্য দ্রবণে জন্মেছে বাউল ফকিরদের রূপময় জগৎ। আত্মার চেয়ে দেহ, জাতিবর্ণ দ্রোহ, মন্দির মসজিদের চেয়ে গুরুর নির্দেশ, শাস্ত্রের চেয়ে আত্ম-অনুজ্ঞা— এই দেশে তো নতুন নয়। হয়তো সেই লোকায়তিক পরম্পরার এক সমৃদ্ধ উদ্ভাস বাংলার বাউল। সাধারণভাবে ক্রিয়াকরণ, গানের অন্তর্জগৎ বা আচরণ থেকে বাউলদের সকলে চিনে নিতে পারেন। কিন্তু তাঁরা আত্মসাবধানী, সন্ধ্যাভাষী, ইঙ্গিতগ্রাহী। আপন মর্মকে তাঁরা ধর্মের ক্রিয়াপরতায় বোঝাতে চান না। তবে তাঁদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বহির্বাস খুব ইঙ্গিতধর্মী ও সুনির্দিষ্ট। কর্তাভজা-সাহেবধনী-বলরামীদের কোনও নির্দিষ্ট পোশাক নেই। বৈষ্ণব সহজিয়ারা সাধারণত সাদা পোশাক পরেন। কিন্তু বাউলদের একটা নির্দিষ্ট বহিরাবয়ব আছে। বেশ কিছুকাল আগেকার একটা বর্ণনা থেকে বাউলদের বিবরণ উদ্ধৃত করছি—

> কেশ বিন্যাস দেখিলেই বিলক্ষণ চিনা যায়। পরিধানে গেরুয়াবসন, হস্তে লৌহবালা, বগলে দীর্ঘ চিমটা, গলে পাথুরিয়া মালা, আর একটা হুঁকাতে লম্বা নল লাগানো, তাহাতে এক কলিকা গাঁজা সাজিয়া, জয় বোবুম বোবুম গুরু সত্য বলিয়া চক্ষু দুইটি মুদ্রিত করিয়া, সেই গাঁজায় দোম দিতে থাকে।

অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' বইতে একশো বছর আগেকার বাউলদের বর্ণনা দিয়ে গেছেন এই রকম—

> এই সম্প্রদায়ীরা তিলক ও মালা ধারণ করে এবং ওই মালার মধ্যে স্ফটীক, প্রবাল, পদ্মবীজ, রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি অন্যান্য ও বিনিবেশিত করিয়া রাখে। ডোর কৌপিন ও বহির্বাস ধারণ করে এবং গায়ে খেলকা পিরাণ অথবা আলখাল্লা দিয়া ঝুলি, লাঠি ও কিস্তি সঙ্গে লইয়া ভিক্ষা করিতে যায়।... ক্ষৌরি হয় না, শ্মশ্রু ও ওষ্ঠলোম প্রভৃতি সমুদয় কেশ রাখিয়া দেয় এবং মস্তকের কেশ উন্নত করিয়া একটি ধম্মিল্ল বাঁধিয়া রাখে।

অক্ষয়কুমারের এই বর্ণনায় একটা বড় ফাঁক থেকে গেছে। বলা হয়নি যে এসবের সঙ্গে থাকে বাউলদের অচ্ছেদ্যসঙ্গী একতারা ও ডুগি, খমক, সারিন্দা বা দোতারা। কেউ কেউ গলায় কণ্ঠি পরেন, কেউ করেন তিলকসেবা। সেই সঙ্গে থাকে নারীসঙ্গী এবং কণ্ঠে ভাবের গান, যার বাণীতে কূট রহস্যের অতল ব্যঞ্জনা। বাংলা গানের সুদীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ধারাবাহিকতায় বাউলরা এক ধরনের গান সংযোজন করে চলেছেন, যা এই সম্প্রদায় লুপ্ত হয়ে গেলেও থেকে যাবে। কিন্তু বাউলদের পরিচয় একটু অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা জরুরি। প্রথমে তাঁদের বহির্বাস প্রসঙ্গে লক্ষ করা যেতে পারে।

বাউল ফকিরদের জীবনের সঙ্গে বহুদিন সংসর্গকারী সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ১৯৮৭ সালে আমাকে এক ব্যক্তিগত চিঠি লেখেন যাতে তাঁর কতকগুলি নিজস্ব পর্যবেক্ষণ এখানে প্রাসঙ্গিক বলে প্রকাশ করছি। সিরাজ লিখেছিলেন : 'যে বাউলমেলায় তেরাত্তির কাটিয়েছিলাম তাদের অনেকের পরনে গায়ে হলদেটে লাল, কারুর বা স্রেফ গৈরিক, কারুর তালিমারা (সংখ্যাও নাকি ওদের রহস্যময় সংখ্যাবাচক), কারুর সাদা এবং কারুর কালো পোশাক ছিল। পূর্ণদাস প্রমুখ শৌখিন শহুরে বাউলের যে পোশাক তা একান্তভাবে সুফি পোশাক, বৈরাগ্যের প্রতীক গৈরিক, এই Cliche-টি নিছক কবিকল্পনা, সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ-সূত্রে এর প্রাদুর্ভাব। হিন্দু সাধুর পরনে সেলাই-করা পোশাকের আগমন এ যুগে বলেই মনে হয়। কারণ হিন্দুশাস্ত্রে সেলাই করা পোশাক নিষিদ্ধ ছিল। লক্ষ করবেন দর্জি শব্দের কোনও বিকল্প শব্দ ভারতীয় প্রাচীন ভাষায় নেই। সীবনকার অর্বাচীন কৃত্রিম শব্দ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাউলদের ব্যাপারে দ্বিতীয় যে-চিন্তাভাবনা বহু মানুষের মনে তাঁদের সম্পর্কে কৌতূহল অথবা ঘৃণা টেনে এনেছে সেটা 'চারিচন্দ্রভেদ' অর্থাৎ মল মূত্র রজ বীর্য পান। বাউল তো শুধু নয়, আমাদের কায়াবাদী সাধকদের অনেকে 'দুইচাঁদ' (মলমূত্র) বা চার চাঁদের চর্চা করেন। এ তো বহু শত বছরের ধারা। এককালে বাউলদের 'মুতখেকো' বলা হয়েছে। তাঁদের এই বিচিত্র সাধনাকে 'কদর্য' 'বীভৎস' 'জঘন্য' এইসব নিন্দাত্মক বিশেষণে ঘৃণা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে শেষ কথা বলা কঠিন। সভ্যরুচি ও উন্নত জীবনবোধ দিয়ে সব কিছুর মীমাংসা করা যায় কি? বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'বাউলদের যৌনজীবন ও জন্মনিয়ন্ত্রণ' বলে একটা রচনা থেকে এখানে উদ্ধার করছি। বলা হচ্ছে :

> একটি সত্য এই যে মানুষের শরীরে দুটি চেতক এন্টিজেন আছে যা শরীরের প্রতিরোধ পদ্ধতির (Immunological System) অন্তর্ভুক্ত নয়। এই দুটি হল চোখের জলের জলীয় পদার্থ বা অশ্রু এবং বীর্য। আমাদের চোখের জলীয় অংশ বা শুক্রের অংশ কোনক্রমে রক্তে মিললে বিশেষ এন্টিবডি উৎপন্ন করতে পারে। সম্ভবত ঐ বীর্যপানরত পুরুষ নিজের বীর্যদ্বারাই শরীরে এন্টিবডি উৎপন্ন করবে এবং তাতে শুক্রাণুর উৎপাদন অবশ্যই অল্প হবে। তাই দেখা যায়, বাউলদের সন্তান সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। তবে স্মরণযোগ্য, নারী কখনও এই বীর্যপান করে না।

বাউল মতের অন্তঃশরীরে যৌন যোগাচারের লক্ষ্য যেমন স্পষ্ট তেমনই শ্বাসের নিয়ন্ত্রণ খুব গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। উভয়ক্ষেত্রেই গুরুর ভূমিকা অত্যন্ত জরুরি। এই দুই দিক বিবেচনা করলে বাউল মতে সহজিয়া বৈষ্ণব ও সুফিতত্ত্বের প্রভাব চোখে না পড়ে পারে না। গুরুর নির্দেশে যোগক্রিয়া ও মৈথুন বাউলবর্গের লোকধর্ম সম্প্রদায়কে বিশিষ্টতা দিয়েছে। এই প্রক্রিয়ার সফল প্রয়োগের ফলে খাঁটি বাউলদের সন্তান জন্মায় না। অনেক বাউলধারা আছে যেখানে গুরুর শিষ্যরাই পরম্পরা বজায় রাখেন। সন্তান-পরম্পরার চেয়ে শিষ্য-পরম্পরা তাই বাউলদের কোনও কোনও স্রোতে প্রাধান্য পায়। বাউলরা বিশ্বাস করেন, দেহভাণ্ডে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপ রয়েছে এবং আত্মা কোনও অলৌকিক বস্তু নয়, তার উপলব্ধি ও উপস্থিতি দেহেই লভ্য। সেইজন্যই বাউলগান প্রধানত দেহতত্ত্বের গান। নিজের দেহকে জানা, তাকে নিয়ন্ত্রণ করা, তার মধ্যে দিয়ে আনন্দস্বরূপের আস্বাদন— এসবই বাউলের লক্ষ্য। তারই নানা ইঙ্গিত ও দ্যোতনা রয়ে গেছে কয়েক শতকের বাংলা গানে। ভাবের দিক থেকে তাই বাউল গান নানা মাত্রায় বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করেছে। লালশশী, লালন, পাঞ্জু শাহ, হাউড়ে গোঁসাই, কুবির, যাদুবিন্দু, জালাল, দীন শরৎ, রশীদ, দুদ্দু, রাধারমণ, ফুলবাসউদ্দিন, দুর্বিন শাহ, পদ্মলোচন, শীতলাং শাহ, হাসন রজা থেকে আজ পর্যন্ত প্রবাহিত বাউলবর্গের গান আমাদের সগর্ব অর্জন। এঁদের সবাই হয়তো পরম অর্থে বাউল নন, কিন্তু বাউলদের কাছে শ্রদ্ধেয় ও গ্রহণীয়। আরেকটা সত্য হল, বাঙালির সামাজিক ইতিহাসে বাউলদের আচরণ ও চারচন্দ্র নিয়ে তর্ক বা মতান্তর থাকলেও বাউল গান নিয়ে কোনও তর্ক ওঠেনি। নিম্নবর্গ থেকে উচ্চবর্গ পর্যন্ত বাউলগানের স্বতঃস্ফূর্ত চলাচল চলছে প্রায় শতবর্ষ ধরে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বাউল গানের ভাবমূল্যে ও ছন্দে আকৃষ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিলেন এবং দেশবাসীকে প্রথম সচেতন করেছিলেন বাউলগানের নিজস্বতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে তিনি যে সব অভিনব স্বদেশি গান লেখেন তার সুরকাঠামোয় বাউল গানের স্পন্দ ও উদ্দীপনা অত্যাশ্চর্য নৈপুণ্যে ব্যবহার করেন। পরে তাঁর গানে বাউল গানের অন্তর্জগতের গভীর বাণী ছাপ ফেলেছে। তাঁর কোনও কোনও রচনাকে তিনি এমনকী 'রবীন্দ্রবাউলের রচনা' বলে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর নাটকে বাউল চরিত্র সর্বদাই একক, তার নারীসঙ্গিনী নেই। অথচ বাউলের সাধনা সর্বদাই যুগলের রসরতি।

এই প্রসঙ্গে একটা বিতর্কযোগ্য প্রসঙ্গ সেরে নেওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের প্রণোদনায় ক্ষিতিমোহন সেন মধ্যযুগের সন্তসাধকদের সাধনার স্বরূপ সন্ধানে ব্যাপৃত হন এবং সেই সূত্রে বাংলা বাউলদের লুপ্তস্রোতের কিছু পরিচয় ব্যক্ত করেন লেখালেখি করে। ১৯৪৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লীলা বক্তৃতায় তিনি বিষয়রূপে বেছে নেন 'বাংলার বাউল'। তাঁর লেখায় পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের বহু অজানা বাউলের খবর মেলে। যেমন কুষ্টিয়ার পাঁচু ফকির, রাজবাড়ির মেছেলচাঁদ, ঢাকা জেলার শাহনাল, ধামরাই টাঙাইলের পাগলচাঁদ। তার মতে : 'বাংলা ভাষার আরম্ভ হইতেই বাউলের পরিচয় মেলে। তবে গুরু পরম্পরা একবার খোঁজ করিয়া (১৮৯৮ সাল) ১২/১৩ পুরুষ পর্যন্ত কোন মতে পাইয়াছিলাম।' ক্ষিতিমোহন জানিয়েছেন তিনি কাশীতে প্রথম বাউল দেখেন নিতাইকে, পরে ঢাকা জেলার রাজবাড়িতে পরিচয় হয় দাশু বাউলের সঙ্গে। দাশুর আখড়ায় পরিচয় ঘটে দুর্লভ ও বল্লভের সঙ্গে 'তাঁহাদের কাছেই আমি বড় বড় দুইটি বাউলধারা ও বহু বাউল গানের সন্ধান পাই।' যাই হোক ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর ভাষণে মদন, ঈশান যুগী, গঙ্গারাম, বিশা ভূঁইমালি, জগাকৈবর্ত প্রমুখের হালহদিশ দেন। তাঁদের গানের নমুনা পেশ করেন। এঁদের বাউল পদাবলি পড়ে রবীন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হয়ে ক্ষিতিমোহনকে বলেন— 'এমন সহজ এমন গভীর, এমন সোজাসুজি সত্য এত অল্পকথায় এমন অপূর্বভাবে প্রকাশ করিবার শক্তি আমাদেরও নাই। আমার তো ইঁহাদের রচনা দেখিয়া রীতিমতো হিংসা হয়।'

রবীন্দ্রনাথের ঈর্ষাযোগ্য এমন বাউলপদ পরে কয়েকটি রবীন্দ্র বক্তৃতায় ও রচনায় উদ্ধৃত হয়েছে। বাকি সংগ্রহ যা ক্ষিতিমোহনের ছিল তা তিনি প্রকাশ করতে চাননি। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গবীণা'-য় ক্ষিতিমোহন সংগৃহীত ন'খানি বাউলগান সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়েছিল। বাংলার বাউলদের সম্পর্কে সবচেয়ে বিস্তারিত ও সুবৃহৎ বইটি যার লেখা সেই উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেছেন যে ক্ষিতিমোহন সংগৃহীত গানগুলি নির্ভরযোগ্য বাউল গান নয়, তাঁর কথিত বাউলদের অস্তিত্ব ও বিবরণ সন্দেহজনক। উপেন্দ্রনাথের প্রশ্ন ও মন্তব্য একটু তুলে দিচ্ছি— 'বাংলার এ কোন্ অবাস্তব বাউলদের কথা তিনি আমাদিগকে শুনাইতেছেন? ইঁহারা কাহারা? কোথায় ইঁহাদের বাড়ি? ইঁহাদের কি কখনও বাংলায় আবির্ভাব ঘটিয়াছিল?'

এমন মারাত্মক প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করে সবশেষে উপেন্দ্রনাথ দুটি সিদ্ধান্তে এসেছেন। প্রথমত, 'ক্ষিতিমোহন বাবুর গান কয়টি সারা বাংলায় প্রাপ্ত বাউল গান হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ের।' দ্বিতীয়ত, 'বাংলার বাউলদের যে সাধন তত্ত্ব ও সাধন পদ্ধতির কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষিতিমোহনবাবু তাঁহার দুইটি প্রবন্ধে বলিয়াছেন, তাহা বাংলায় বর্তমানে যে বাউলদের দেখিতেছি ও যাহাদের গান পাইতেছি, তাহাদের সম্বন্ধে ঠিক খাটে না।... বাংলার বাউলদের সম্বন্ধে এই মতবাদগুলি তিনি কোথায় পাইলেন?' অভিযোগ দুটি গুরুতর। সেই সঙ্গে ক্ষিতিমোহন সংগৃহীত গানগুলির বাণী বিষয়ে উপেন্দ্রনাথের মন্তব্য : 'বাংলা সাহিত্যের সহিত যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা একবার পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন যে এই গানগুলির মধ্যে যথেষ্ট "আধুনিক হস্তক্ষেপ" আছে এবং ইহা পল্লীর অশিক্ষিত বা সাবেকী ধরণের অশিক্ষিত বাউলদের রচনা নয়।' সাধারণ পাঠকদের অবগতির জন্য উপেন্দ্রনাথের সন্দেহসংকুল কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধৃত করছি—

১) 'নিঠুর গরজী, তুই কি মানসমুকুল ভাজবি আগুনে।' (উপেন্দ্রনাথের মতে মানসমুকুল এই সমাসবদ্ধ অলংকার সৃষ্টি আধুনিক রচনারীতি। তেমনই সন্দেহজনক গানের অন্তর্গত 'যুগযুগান্তে' এবং বেদনা না লিখে 'বেদন' শব্দের ব্যবহার)

২) 'হৃদয়কমল চলতেছে ফুটে কত যুগ ধরি/ তাতে তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা উপায় কি করি।'—এ গানের দার্শনিকতার সঙ্গে বাংলার বাউল ধর্মের কোনও যোগ নেই, এ রচনাভঙ্গিও সম্পূর্ণ আধুনিক কালের— অভিযোগ উপেন্দ্রনাথের।

৩) 'তারে অরুণ এসে দিল দোলা রাতের শয়নে'— ('লাইনটি নিতান্ত অতি আধুনিক গন্ধী')

৪) 'আমার ডুবলো নয়ন রসের তিমিরে/ কমল যে তার গুটালো দল আঁধারের তীরে। উপেন্দ্রনাথের মন্তব্য : 'এইরূপ বাক-চাতুর্য ও কল্পনা আধুনিক কালের কবিদের রচনা ছাড়া বর্তমানে বাউলদের গানে মিলে না, তাহা এই পনেরো-ষোল বছর ধরিয়া প্রায় দেড় সহস্র বাউলগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনার অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিতে পারিতেছি।'

এমন স্পর্শকাতর প্রসঙ্গ এবং ভয়ানক অভিযোগ সম্পর্কে আমরা নিজস্ব কোনও মতামত বা নতুন বিতর্ক তুলব না। কেবল 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' তৃতীয় খণ্ডে ব্যক্ত অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য পেশ করব। তিনি বলছেন :

> এই গানগুলির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে ডঃ ভট্টাচার্যের সংশয় নিশ্চয় সুধীজনের চিন্তা উদ্রেক করিবে... অবশ্য অবিশেষজ্ঞ হইয়াও বলিতে বাধা নাই যে, উল্লিখিত চার ও পাঁচ সংখ্যক গান ('আমি মজেছি মনে/ না জানি মন মজল কিসে আনন্দে কি মরণে' এবং 'আমার ডুবলো নয়ন রসের তিমিরে') দুইটির ভাব ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিমা আধুনিকমনা সুশিক্ষিত ব্যক্তির রচনা বলিয়া মনে হইতেছে।

অনির্ণীত এবং অমীমাংসিত এক সমস্যা বাংলার বাউল গানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এর থেকে সন্দেহ না জেগে পারে না যে, বাউল গান বলে বিপুলাকার সংকলনবদ্ধ যে অজস্র গান আমরা হাতে পেয়েছি তার সব প্রামাণিক ও খাঁটি বাউলের রচনা তো? কথাটা ওঠে আরও এজন্য যে, উনিশ শতকে 'সখের বাউল' নামে একাধিক বাউল বা বাউলের দল প্রচুর গান লিখে গেয়ে বেড়াতেন। তার সবচেয়ে সফল নমুনা মেলে কাঙাল হরিনাথ বা ফিকিরচাঁদের গানে। বাউল না হয়েও তিনি উৎকৃষ্ট বাউল গান লিখেছেন। বাংলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাউলগানের ধারা এ সব গানেও সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত বাউল গান— সাধনা-লব্ধ ও পরম্পরাজাত ক্রমশ নকলের ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে।

'বাংলার বাউল' কথা দুটি যতটা উত্তেজক ও আকর্ষণময়, তেমনই অতল আর সমস্যাবহুল। বাউল কে, বাউল কী, বাউল কোথা থেকে, কবে থেকে, এ সব প্রশ্ন যদি বা মেটে তারপরে নতুন প্রশ্নের জট তৈরি হয়। আঠারো উনিশ শতক থেকে দীপ্যমান বাংলার বাউল বিশ শতকের রসিক ও বুদ্ধিজীবীদের আগ্রহ ও গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে। এককালে ভদ্রলোকশ্রেণি তাদের ঘৃণার চোখে দেখেছেন, নৈষ্ঠিক মুসলমানরা ফতোয়া জারি করেছেন ধ্বংসের, তবু তারা নানা লোকায়ত বর্গের ধারার সঙ্গে গা ঢেলে দিয়ে অবিনাশী উদ্ভিদের মতো বেঁচে বর্তে আছে। একেবারে হালফিল, দু'-এক দশক, বাংলার বাউল সারাদেশে ও বিদেশে অভূতপূর্ব মান্যতা পাচ্ছে। এরা যতটা বাউল সাধক তার চেয়ে বড় গায়ক। যেমন পূর্ণদাস, পবনদাস বা আরও অনেকে। ব্যঙ্গ করে এদের বাংলার বা ভারতের সাংস্কৃতিক রপ্তানিযোগ্য বলেছেন কেউ কেউ। সেই অত্যুক্তি না হয় আমরা গায়ে নাই-বা মাখলাম, কিন্তু বাংলার বাউল নিজের মোপেডে ঘুরবেন, সঙ্গে বিদেশিনী, দৃশ্যটি বেশ অভিনব। অভিনব, কেননা আবহমান বাউলের সাধনা তো মগ্নতার, আত্মগোপনের। তাঁরা ভিক্ষাজীবী, আখড়াধারী বা গরিব গৃহী। বাউলরা বরাবর নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে থেকে কায়াসাধনা ও গান গেয়ে এসেছেন। বাসাছাড়া পাখির মতো বন্ধনহীন তাঁদের জীবনে পথ চলাতেই সমধিক আনন্দ। আর ছিল কতই মেলা— কেঁদুলি, রামকেলী, দধিয়া বৈরেগীতলা, পাথরচাপুড়ি, সোনামুখি, কোটাসুর, অগ্রদ্বীপ, ঘোষপাড়া। ওদিকে মানভূমের খাতরা, কুষ্টিয়ার ছেঁউড়ে, রাজশাহীর খেতুরী বা প্রেমতলী। এসব মেলায় সারা দেশের বাউলরা এসে মিলতেন, গান হত সারারাত— তত্ত্বগান, ভাবগান, ফকিরি গান, শব্দগান। আবার মনঃশিক্ষা বা আখেরিচেতনের গান, 'দৈন্যতা'র গান, দেহতত্ত্ব। ছিল কেন, এখনও সবই আছে তবে মর্যাদাবান হয়ে নেই। মেলার আসরে রসিকের চেয়ে দর্শক বেশি, তত্ত্বজ্ঞের চেয়ে গবেষক বেশি, একতারার চেয়ে ক্যামেরা বেশি। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত 'বাংলার বাউল' বইয়ে ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছিলেন :

> এই সব স্থানের খবর পাইয়া বহু 'গবেষণা' করনেওয়ালা ডক্টরেটপ্রার্থী বিদ্বজ্জনের সেখানে ভীষণ সমাগম ঘটে।... কেঁদুলির নিত্যানন্দ দাস তো একদিন আমাকে বলেন বাবা, বৎসরান্তে এখানে আসিতাম। কিন্তু তোমাদের পিস্তলের মতো পেন্সিল ওঁচানো দেখিয়া স্থানটা ছাড়িতে হইল।

এখন দৃশ্যটা আরও ঘোরতর। কেবল পেন্সিল-ওঁচানো গবেষক নয়, নাগরিক ফোটোগ্রাফারের ফ্ল্যাসবাল্বের ঝলক, টেপরেকর্ডারের আমদানি, ভিডিও রেকর্ডিং ও কর্ণভেদী মাইক সবই দেখা যাবে। অমিত গুপ্ত তাঁর 'বাংলার লোকজীবনে বাউল' বইতে হালের রাঢ় খণ্ডের বাউলদের নাম সাকিনের পরিচয় রেখেছেন। তাঁর সংগৃহীত একটা সদ্যকালের গান হল 'কৃষ্ণ নামের মিষ্টি চুরুট/ মুখে রাখো সর্বক্ষণ।' এই একটা গানের বাণী ধরে আমরা হালফিলের বাউল জগতে (বিশেষত রাঢ়ের) ঢুকে পড়তে পারি। আদিত্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখোপাধ্যায় তাঁর 'ধর্ম ও সংস্কৃতির আলোকে বাউল' বইয়ে এমনতর কৃষ্ণনামের মিষ্টি চুরুট খাওয়া বাউলদের বিবরণ দিয়েছেন।

তিনি জানাচ্ছেন গৌরখ্যাপা বিদেশ ঘুরে এসে বাড়ি করেছেন, মোটর সাইকেল চেপে ঘুরছেন। হাতে বিদেশিনীর দেওয়া সোনার হাতঘড়ি। পবনদাসের গানের শুরু ট্রেনের কামরায়, ১৯৮৮ সালে তিনি 'বিদেশিনী মিমলু সেনের সঙ্গে প্যারিসে। সাধক জীবন তাঁর শেষ।' লাভপুরের ধনডাঙার কার্তিক দাস, শৈশবে গ্রাম্য যাত্রাগানে বিখ্যাত ছিলেন। এখন 'ডিস্ক ক্যাসেট বিদেশ সব হয়ে গেছে।' কৃষ্ণবাহাদুর থাপার জন্ম নেপালে, থাকেন পানাগড়ে। ১৯৬০ সালে সেনাবাহিনী থেকে ফিরে স্ত্রী আর পাঁচ বছরের ছেলেকে নিয়ে কেঁদুলি মেলায় আসেন এবং মনোহর খ্যাপার আখড়ায় গান শুনে মজে যান। তারপরেই কণ্ঠে নেন বাউল গান। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, কানাডা, ফ্রান্স ঘোরা বাউল কৃষ্ণবাহাদুর এখন প্রয়াত। 'বিশ্বনাথ বাউলের বড় ছেলে আনন্দও এক বিদেশিনীর (৪৩-এর বেশি বয়সের জার্মান মহিলা কেরিন) প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে পুনরায় ফিরে এসেছে ঘরে।' বাংলার বাউল বলতে কি এঁদের প্রসঙ্গকে গণনায় আনতে হবে?

শেষ পর্যন্ত বাউল কি তবে একটা মনগড়া মিথ? একটা আশ্চর্য জীবনযাপনের ধরন? বিদেশের বিজ্ঞাপনে বলা হচ্ছে বাউল— 'Child of Transcultural Studies'। সে 'Sings and dances mad songs of ecstacy'। ব্যাপারটা প্রকৃতপক্ষে কি তাই? আমাদের অবশ্য ভিন্নতর অভিজ্ঞতা আছে। বলবার কথা সেটাও। রাঢ়ের বাউলদের অর্থ কীর্তি সচ্ছলতার বাইরেও তো একটা বৃহৎ বঙ্গ আছে। বর্ধমানের একটা অংশ, নদিয়া আর মুর্শিদাবাদ জুড়ে সাধক বাউলদের অভাব কই? তাঁরা বিদেশেও যান না, সিন্ধু পারের সুন্দরীরা তাঁদের সাধনভ্রষ্টও করেন না। অখণ্ড নদিয়ার খণ্ডিত অংশ, যা আজ বাংলাদেশ, তা তো বাউল গানের স্বচ্ছ স্রোতোবেগে প্রাণবান। সীমান্ত পেরিয়ে তার কিছু সুবাস আজও পাই। বাউলদের তো কোনও দেশগত বেড়া নেই। তাই এ বাংলার বাউল আসরে ও মেলায়, ও-বাংলার বাউলদের কত গান আমরা শুনি। তবে সে গানের ধরন ধারণ আলাদা। নৃত্যবিরল ভাবময় সেসব বাউল গান একটু অন্য ধাঁচের, হয়তো সুর কাঠামোটাও একটু স্বতন্ত্র।

এইখানে একটু খোলামেলা কথা বলতেই হবে। কলম-ওঁচানো গবেষকবৃন্দ যতই না কেন নিন্দিত হন তবু বাউলদের নিয়ে কাজের কাজ তো তাঁরাই কিছু কিছু করেছেন, করে চলেছেন। এদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা, ধর্মপ্রতিষ্ঠান বা সমাজসেবী সংস্থা বাউলদের জন্য তেমন কিছু করেছেন বলে তো শুনিনি।

এটাও মনে রাখতে হবে, বাউল সুর বলে স্পষ্ট, নির্দিষ্ট কোনও কাঠামো নেই। অঞ্চল ভেদে তা আলাদা। বাউলদের সম্পর্কেও এ কথাটা বলা চলে। অঞ্চল ভেদে তাদের ধরনধারণ জীবন প্রণালী আলাদা। সেইজন্যই রাঢ়ের বাউলদের সঙ্গে কুষ্টিয়ার বাউলদের খুব গভীর মিল খোঁজা নিরর্থক। আবার রাঢ়ের বাউলদের ঘনিষ্ঠ যেমন সহজিয়া বৈষ্ণবরা, নদিয়া মুর্শিদাবাদে তেমনই বাউলদের গায়ে গায়ে রয়েছে ফকিররা। বাউল আসলে তবে কি এক সমাধানহীন দ্বৈত? তার জীবনের কবোষ্ণ তাপ, তার পোশাকের মণ্ডন-ধর্ম, তার গানের উদার মানবিকতা, তার বন্ধনহীন পথচলা— এক অলক্ষ্য অস্তিত্বের মতো। বাংলার বাউল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেন এক মগ্ন স্রোত, তার চোরা টানে প্রতিদিন আমাদের অবশ্যম্ভাবী অবগাহন চলছে।

কিন্তু সেই অবগাহনের মধ্যে রয়ে যাচ্ছে ফাঁক ও ফাঁকি। এটা ততদিন ছিল না যতদিন বাউল ফকিররা তাদের নিজেদের পরিবেষ্টনীর মধ্যে থাকতে পেত, নিজেদের মতো আত্মমগ্ন সাধনার পথে। সত্তর-আশির দশক থেকে হঠাৎ শহরবাসী মধ্যবিত্ত এ-বর্গের গান সম্পর্কে এবং বেশি করে এদের জীবনধারা সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে ওঠে। তার সবটাই হুজুগ বা গিমিক নয়। আসলে নাগরিক জীবন ও তার বিনোদনের উপকরণগুলি কৃত্রিম আর ক্লান্তিকর হয়ে উঠছিল ক্রমশ— বাংলা গানও একটা পুনরাবৃত্তির ছকে ঢুকে পড়েছিল। কাজেই একটা নতুন স্বাদ আর পরিবর্তন সবাই চাইছিলেন। আমাদের সাবেক ইতিহাসতত্ত্বের ধারণা ও ইতিহাস চর্চাও খুঁজছিল এক নতুন পথরেখা— তাই লুপ্ত অথবা ক্ষীণ গৌণধর্মগুলির শিকড়সন্ধানে ব্রতী হতে চাইলেন অনেক ইতিহাসসন্ধানী। জেগে উঠল শত জল ঝরনার ধ্বনি।

সেইসঙ্গে এই সময়খণ্ডে একটা নতুন জিনিস হল— বাউলদের বিদেশে নিয়ে গিয়ে গান শোনাতে আগ্রহী হলেন কেউ কেউ। তাঁরা আমেরিকাবাসী বাঙালি। বলা বাহুল্য তাঁদের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ছিল না সেদেশে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ বা বৈরাগ্যবাণী প্রচার করা। পূর্ণদাস ও অন্যান্য ক'জনের গানে বিদেশে কিন্তু একটা ভুল বার্তা পৌঁছে গেল। শতবর্ষ আগে শিকাগোয় স্বামী বিবেকানন্দ যে-বেশ ধারণ করে তাদের মাতিয়েছিলেন, সেই গেরুয়া আলখাল্লা লুঙ্গি পাগড়ি ও কোমরবন্ধধারী বাংলার বাউল তাদের তারসপ্তকের উচ্চনিনাদে ও বৃত্তাকার নাচে কোনও কোনও বিদেশির মন মজাল। তারা এবার ঘন ঘন দেখতে চাইল বাউলদের— হঠাৎ বাউল-অনুরাগী বিদেশিদের সংখ্যা বেড়ে গেল। সাধন-সর্বস্ব একটি সম্প্রদায়কে হতে হল পারফর্মার।

দেখা যাচ্ছে, বাউলদের জীবনযাপনের ধরন এবং বাউল গান অনেককেই টেনেছে, কিন্তু অন্তরঙ্গতা ও নিবিড় পর্যবেক্ষণ থেকে সাম্প্রতিককালে কিছু কিছু অন্য স্বরও ফুটে উঠেছে। বাউলদের সম্পর্কে এমন কিছু ভাল ও মন্দ মন্তব্য কয়েকজনের রচনা থেকে উদ্ধৃত করব, তার থেকে তাদের হাল চাল কিছু জানা যাবে। প্রথমে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য :

> একসময় বাউলগান সম্পর্কে আমার খুব আগ্রহ জেগেছিল। কোথাও কোনো বাউলের গান শুনলেই টুকে রাখতাম।... বারবার ছুটে গেছি কেঁদুলির মেলায়, শীতের মধ্যে সারা রাত জেগে বসে থেকেছি অজয় নদীর ধারে ছোট ছোট আখড়ায়। খুবই দুঃখের কথা, কয়েক বছরের মধ্যেই আমি বাউল গান সম্পর্কে গোপনে গোপনে হতাশ হয়ে পড়ি।... মন দিয়ে বারবার শুনলে, বাউল গানেও একঘেয়েমি এসে যায়। তিন চার রকমের বেশী সুর বৈচিত্র্য নেই। গানের মাঝে মাঝে 'ও ভোলামন' বলে একটি দমফাটানো তান আসলে শ্রোতাদের চমকে দেবার একটা কায়দা মাত্র। শুধু গান শোনার আনন্দের জন্যই একসঙ্গে তিন চারটের বেশী বাউল গান শোনা যায় না, তখন হাই ওঠে, কিংবা ফ্যাসানের বশবর্তী হয়ে কৃত্রিম বাহবা দিতে হয়। সাহেবরা প্রকাশ্যে গাঁজা খেতে শুরু করার পর এদেশের ভদ্রসমাজের অনেক ছেলেমেয়েদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যেও গাঁজা টানার চলন হয়েছে। সাহেবদের পরবর্তী শিকার ঐ বাউলরা। দলে দলে বাউলদের আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ইংলণ্ড সফর শুরু হয়ে গেল। সাহেবদের দেশ ঘুরে আসার আগে ও পরে একই বাউল গান শুনে দেখেছি, অনেক তফাৎ। তার গায়ে যেন আঠেরো ঘা।

আসলে বাউল গানের কাছে আমাদের খুব বেশী প্রত্যাশা করাটাই ভুল। বাউল গান বাউল গানেরই মতন। আমরা তার থেকে আংশিক আনন্দ পেতে পারি মাত্র। তার বেশী কিছু নয়। সমস্ত পৃথিবীর সভ্যতাই নগরকেন্দ্রিক। আমরা আর ইচ্ছে করলেই গ্রামীণ হয়ে যেতে পারিনা। স্বতঃস্ফূর্ত গানের প্রতি আমাদের অন্তরীণ বাসনা আছে বলেই আমরা বাউল গান বা লোকসঙ্গীতের কাছে গেছি বারবার। কিন্তু মন্দিরের সিঁড়িতে বসা একান্ত বাউলের গান বা ভেসে যাওয়া নৌকোয় মাঝির গান শোনবার সৌভাগ্য আমাদের দু' একবারই হয়। বারবার পেতে গেলে সব কিছুর মধ্যেই একটা সাজানো ব্যাপার এসে পড়ে। মঞ্চে ওঠবার আগে বাউল প্যান্ট শার্ট ছেড়ে পরে নেয় গেরুয়া পোশাক, শ্রোতাদের দাবিতে মজার গান হিসেবে পরিবেশন করে এইরকম গান : 'এঁড়ে গরু বেড়া ভেঙে খেজুর গাছে চড়েছে।'

অতি উৎসাহে বাউল বা লোকসঙ্গীত শিল্পীকে আমরা সরিয়ে আনি তার জীবনচর্যা থেকে। তার ফলে স্বতঃস্ফূর্ততা নষ্ট হয়ে যায়। ক্রমশ সেও আমাদের কৃত্রিমদ্রব্য সরবরাহ করতে থাকে।

AMARBOI.COM

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই বাস্তব বিশ্লেষণের মধ্যে যেমন সমাজ সত্য আছে তেমনই আর্টের সত্য আছে। বাউলকে যদি তার নিজস্ব সাধন ভজনের জগতে না থাকতে দিই, বারেবারে তাদের টেনে আনি আলোকোজ্জ্বল শহুরে মঞ্চে, আমাদের বিনোদনের কারণে, তবে তারা সাজগোজ কৃত্রিম গায়ন আর চটকদার ভাবভঙ্গিতে গ্রস্ত হবে তাতে সন্দেহ কি? বাউলরা তো কোনওদিন আত্মবিজ্ঞাপনে অভ্যস্ত ছিল না— থাকত আপন আপন ভজন কুটিরে, ঘুরত পথে প্রান্তরে, মেলা মচ্ছবের সম্মিলনে। গানকে জানত তত্ত্ব বলে। তার ছিল তিনটে পর্যায়— আত্মতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব আর দেহতত্ত্ব। এ ছাড়া ছিল দৈন্য ও মনঃশিক্ষার গান। কোথায় গেল সেইসব আত্মগুপ্ত ঠাঁইনাড়া স্বভাবের বাউল সাধক? নবনীদাসের কথা মনে পড়ে। জন্মেছিলেন একশো বছরেরও আগে বীরভূম জেলার গুনুর ভুমরি গাঁয়ে। পিতামহ অনন্ত গোঁসাই। পিতা অক্রূর গোঁসাই। সামান্য লেখাপড়া শিখে দশ বছরে মন্ত্র দীক্ষা চাঁদপুরের খেপি মায়ের কাছে। তারপরে বৈরাগ্য দীক্ষা নারায়ণ গোঁসাইয়ের কাছে। এবারে শুরু হল একসঙ্গে সংসার আর গানের জীবন, ভ্রাম্যমাণ সত্তার পরিক্রমণ। স্ত্রী ব্রজবালা আর বোন ফুরুবালা। একে একে সন্তান হল অন্নপূর্ণা-রাধারানী-পূর্ণদাস লক্ষ্মণদাস-চক্রধর।

কিন্তু মানুষটা সংসারী ছিলেন না। গান গেয়ে বেড়াতেন গাঁয়ে গাঁয়ে আর মাঠে মাঠে বাউল তত্ত্ব নিয়ে গানের পাল্লাদারি হত বোন ফুরুবালার সঙ্গে। নবনীদাসের দীক্ষিত শিষ্য ছিল মাত্র দুজন— হরিদাস মহান্ত আর ক্ষুদিরাম দাস। সুদর্শন হরিদাস পরে বিয়ে করেন ফুরুবালাকে, নবনীর সেটা পছন্দ হয়নি। সে যাই হোক, সারাজীবনই নবনী খ্যাপা ঠাঁই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বদলেছেন। বিয়ের আগে ছিলেন জয়পুর গ্রামে, সেখানে থেকে উঠে আসেন বসোয়া-বিষ্ণুপুরে। বেশ কিছুকাল ছিলেন নানুরে। পরে ক্রমান্বয়ে বাস্তু গড়েছেন ও ভেঙেছেন— উবরুন্দি চিংগাঁ, রায়ান-বেলুটি, সিন্দূর, ফতেপুর, কুলেড়া হয়ে পারুলডাঙা, সবশেষে সিউড়ির কেন্দুয়া পল্লিতে এসে দেহ রাখেন। ভবঘুরে স্বভাবের উদাসীন এই সাধকের গান ও জীবনচর্যায় মুগ্ধ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ কিন্তু শান্তিনিকেতনে তাঁকে ধরে রাখতে পারেননি। তাঁর গলায় অসামান্য বাউল গান শহরবাসী কোনওদিন শোনবার সুযোগই হয়তো পেত না; যদি না ঘটনাচক্রে সিউড়ির ডাক্তার কালীগতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হতেন নবনীদাস। গুণগ্রাহী চিকিৎসক কেবল যে তাঁর শরীরের দেখভাল করেছিলেন তাই নয়, তাঁর উদ্যমে নবনী ও পূর্ণ রেডিয়োতে গান করেন, অংশ নেন কলকাতার বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে। বলতে গেলে পঞ্চাশের দশকে সেই প্রথম কলকাতার রসিকদের খাঁটি বাউল গান শোনা। মনে আছে আজও নবনীদাসের সেই মগ্ন গায়ন ও দীন বেশভূষা। তখন গেরুয়ার এত বিলাসিতা আসেনি বাউল সমাজে, ছিল সাদা ধুতির লুঙ্গি আর সাদা মার্কিনের ফতুয়া। এই বর্গের সব সাধক বাউলই এখন দেহ রেখেছেন। তাঁদের নাম ও রূপ অবশ্য অনেকের স্মৃতিতে এখনও ধরা আছে, যেমন ধরা যাক— ত্রিভঙ্গ খ্যাপা, রাধেশ্যাম দাস, চিন্তামণি দাসী, রূপদাসী, হরিদাস গোঁসাই, মনোহর গোঁসাই। গাঁয়ের পর গাঁ পায়ে হেঁটে পার হতেন, কাঁধে কাঁথার ঝোলা নিয়ে। নগ্ন পা, নগ্ন গা। অঙ্গে শুধু ডোর কৌপীন আর তহবন্দ। মাথায় চুড়ো করে বাঁধা চুল, সর্বকেশধারী বৈরাগী। মাধুকরী ছিল একমাত্র ব্রত। প্রসন্ন আনন, শান্ত স্বভাব, স্বল্পভাষী কিন্তু উৎফুল্ল।

পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলা ঘুরে বাউল ফকিরদের হালহকিকত জানতে গিয়ে আমি দু'রকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি। বেশির ভাগ বাউলই অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত, মোটামুটি চলে যায় গান গেয়ে, মাধুকরী করে, অবরে সবরে কারুর কারুর ডাক আসে সরকারপোষিত অনুষ্ঠানে, কিছু অর্থলাভ ঘটে। আর আছে কিছু সুযোগসন্ধানী বাউল, তৎপর ও চৌকস, ভাল গায়, ভাল কথা বলে। আলাপ হলেই একটা নাম ঠিকানা লেখা (অবশ্যই ইংরিজি অক্ষরে) কার্ড ধরিয়ে দেয়, তাতে গেরুয়া রঙের প্রিন্টে একতারা ছাপা আছে লোগো হিসেবে। এই একতারা একটা শো পিস, এর নানা সাইজ। আমি বর্ধমানের তথ্য দপ্তরে এক বাউলের ছবি তুলেছি, যার পরনে র-সিল্কের আলখাল্লা এবং হাতে দশ-বারো ইঞ্চির একটা ঝকঝকে পালিশ করা মিনি একতারা— ওটার কাজ অলংকারের। হয়তো পিন পিন করে একটু বাজে কিন্তু আসরের নানা বাজনার জগঝম্পে সেই ক্ষীণ ধ্বনির কীইবা মূল্য! তবে হ্যাঁ, ভারী দেখনদারি আর বাউলের নানা অঙ্গভঙ্গির সহায়ক যন্ত্র।

প্রশ্ন উঠেছে এখানেই— পরিবর্তমান দেশকালে, প্রতিযোগিতামূলক বাউল গানের বিশ্বে বাউল কি নবনীদাস বা রাধেশ্যামদের মতো সরলসিধে ভাবনিষ্ঠ সাধক থাকবে, না দেখনদারি ঝলমলে পোশাক পরে নেমে পড়বে অন্যকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে? এই তো সেবার কেঁদুলির মেলায় গিজগিজ করা মানুষের ভিড়ে সবাইকে সচকিত করে একটা লাল মোপেডে চড়ে আবির্ভূত হলেন বিশ্বনাথ দাস। ঝাঁকড়া চুল, আজানুলুণ্ঠিত লাল সিল্কের আলখাল্লা, পিঠে বাঁধা বন্দুকের মতো গেরুয়ামোড়া ছুঁচালো একতারা, যেন বাদ্যযন্ত্র নয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শস্ত্র। তার এহেন পোশাক পরিচ্ছদ বা ঔজ্জ্বল্য বিষয়ে প্রশ্ন করতে সে কোনও দ্বিধা না রেখেই বলল, 'চিরকালই কি খালিপায়ে খালিপেটে বাউল কষ্ট করবে? এখন অবস্থা ফিরেছে। গান গেয়ে টাকা আসছে, বিদেশ যাচ্ছি আমরা, মান মর্যাদা পাচ্ছি। এ সব মেলা মচ্ছবে তাই একটু দেখাচ্ছি। এর ফলে অনেক বায়না হবে, অনেক আসরে গান করার ডাক আসবে। রোজগার হবে। তা না করে আখড়ায় ধুনি জ্বেলে বসে, গাঁজায় দম দিয়ে ভোম মেরে বসে থেকে কী লাভ?'

এ একেবারে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি, পাকা প্রফেশনাল। আদিত্য মুখোপাধ্যায় এদের সম্পর্কে হতাশ হয়ে কিছুটা ভগ্নহৃদয়ে লিখেছেন :

> 'বাউল' শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই মনের ক্যানভাসে একটি উদাসী মানুষের ছবি ভেসে ওঠে— গেরুয়া পোষাক, ধম্মিল্ল করে বাঁধা চুল, বগলে গাবগুবি বা আনন্দ-লহরীর চোরা সুর। কিন্তু যতদিন যায়, বাউলের পোষাকও বদল হয়। কেঁদুলীর মেলায় গেলে এ সত্যটি সুন্দর ধরা পড়ে। পবন দাস এখন জিন্‌স্ ব্যবহার করে বেশি, নিতাই দাস প্যান্ট-সার্ট পরে, নক্ষত্র দাস, বিপদতারণ দাস, কার্তিক দাস সবাই সাধারণ মানুষজনের মতোই থাকেন। গৌর আর সে গৌর নেই, বিশ্বনাথ দাস মারুতি কেনার নেশায় মগ্ন, আনন্দ দাস ভারতে গান গাইতে পছন্দ করে না।... আবার একজন বিদেশিনীর সঙ্গ না করলে এই সময়ের বাউলের মনও ভরে না, পকেটও ভরে না, সঠিক অর্থে বাউল জীবন বৃথা হয়ে যায়।

এই পর্যন্ত পড়ে আমাদের দু'-একটি মন্তব্য করতেই হয়। প্রথমত, বীরভূমের বাউলরাই তো একমাত্র বাউল নয়, সারাদেশে নানাভাবে নানা সাধন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে আছে বাউল— তাদের সবাই এমন প্রদর্শনকামী বা লোভাতুর নয়। নদিয়া-মুর্শিদাবাদ-বর্ধমান-মেদিনীপুর বা বাঁকুড়ায় প্রচুর বাউল দেখা যায়, যারা সৎজীবনযাপনে আত্মসুখী, দরিদ্র ও ভক্তপ্রাণ। মোপেড বা মারুতি তো দূরের কথা, তাদের অনেকের একটা সাইকেলও নেই, গান গেয়ে উদয়াস্ত টহলদারি করছে, তবু পেট ভরে কই? সেই কবেকার কুবির গোঁসাই মনের দুঃখে লিখেছিলেন :

> মুষ্টিভিক্ষে করে আমি খেতে পাইনে
> উদর পুরে।
> ঘরে ঘরে ঘুরব কত
> ভূত খাটুনি খাটব কত?

এখনও গড়পড়তা বাউল-ফকিরদের এটাই ভবিতব্য, তবে তারা বেশির ভাগই অভিযোগহীন, স্বভাবে শান্ত। কেমন তাদের আস্তানা? অনুপম দত্ত বর্ণনা দিয়েছেন এইরকম :

> আশ্রমটি অজয় বাঁধের ধার ঘেঁষে ছোট একটি দোচালা ঘর। একফালি বারান্দা। সামনের খানিকটা জায়গা ঘিরে ঢোল কলমীর বেড়া। এখানে তার বৈষ্ণবী গাঁয়ে গাঁয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> মাধুকরী করে বাউলের সংসার চালায়।... বাউলের সংসারে সামান্য সচ্ছলতাটুকু নেই। তার ঘর-জোড়া সস্তা কাঠের তক্তায় ছেঁড়া কাঁথা, তুলো-ফেটে বেরুনো বালিশ। ঘরের কোণে হাঁড়ি কলসীর আবর্জনার ভেতরে মশাদের গুহাবাস, ছারপোকা আর আরশোলার জন্মঘর।

বাউলদের তুলনায় ফকিরদের অবস্থা আরও করুণ, শোচনীয়— অবশ্য খাঁটি ফকিরিয়ানার সেটাই তো শর্ত। বীরভূমের শাসপুরে আমিন শা ফকিরের খোঁজে গিয়েছিল লিয়াকত আলি। ফকির তখনও ফেরেননি। তাই অপেক্ষাতুর লিয়াকত দেখছেন :

> আমিনের বউ মাঝবয়সী, রঙ বেশ ফরসা। তবে পরণের মোটা রঙিন ফুলছাপ সস্তা শাড়িটি খুব ময়লা। উঠোনে, খোলা আকাশের নীচে, রোদ্দুরের মধ্যে, মাটির উনুনে কালো তোবড়ানো হাঁড়িতে ভাত রান্না হচ্ছে। পাতার জ্বালে আগুনের চেয়ে ধোঁয়াই বেশি। উঠোনের ওদিকে মাটির বাড়ি, অবশ্য ওটিকে যদি আদৌ বাড়ি বলা যায়। বাড়িটি জরাজীর্ণ ও বিধ্বস্ত— কোনরকমে খাড়া হয়ে আছে। খড়ের চাল পচে ধ্বসে গেছে। ঠাঁই ঠাঁই খড়ও নেই। উঠোনে ও বাড়ির দাওয়ায় নানান জিনিস বিশৃঙ্খলভাবে পড়ে আছে। বাড়ির মধ্যে মুরগী চরছে, ন্যাংটো শিশু ঘুরছে। আধন্যাংটো একটি বালক কোমরের পেছনে কাস্তে গোঁজা, মাথায় করে একবোঝা ঘাস নিয়ে এসে দাওয়ার ওপর ধপ্ করে ফেলল। উঠোনে এপাশে অন্য কারোর বাড়ির পেছন দিক। তারই ছাচের নীচে ছায়ায় খেজুরপাতার তালাই বিছিয়ে আমাকে বসতে দিয়েছেন বউটি। পরক্ষণেই এনে দিয়েছেন খাবার জল।

এ ধরনের দীনহীন ও শ্রীহীন বসত বাড়ি যে সবার তা নয়। করিমপুরের কাছে গোরভাঙায় আজহার ফকির ছিলেন সম্পন্ন গৃহস্থ। জোতজমি, পাকাবাড়ি, গ্রামজোড়া মান্যতা। ছেলেরাও ফকিরি মতে রয়েছে। ছোট ছেলে মনসুর ফকির এখন গান গেয়ে বেশ নাম করেছে। তবে আজহার ছিলেন তাত্ত্বিক সংসারজীবী ও গীতিকার, মনসুর শুধুই গায়ক। বাড়ির দাওয়ায় বসেছে গানের আসর। আমাদের চোখ চলে গেল গায়কের ঝাঁকড়া চুলের ওপাশে দাওয়ার কোণে— সেখানে রয়েছে একটা তাগড়াই রাজদূত মোটর সাইকেল।

কিংবা ধরা যাক, বর্ধমানের হাট গোবিন্দপুরে সাধন দাসের কুটির। শ্রীময়, শান্ত ও সচ্ছল। দৈন্যের কোনও ছাপ নেই। দিব্যি মোরাম বিছানো রাস্তা, চমৎকার সব খড়ে ছাওয়া ভজনকুটির। বিন্যস্ত গাছগাছালি, ফলফুলের বাগান। একটা নতুন ঘর গাঁথছে সাধনের শিষ্যরা গতরে খেটে। সাধনদাস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাকের সফিস্টিকেটেড মানুষ। জাপানি সাধনসঙ্গিনী মাকি কাজুমি অঙ্গন আলো করে আছে।

এইখানে স্পর্শকাতর বিদেশিনী প্রসঙ্গটি একটু ভেবে দেখা দরকার। সব বাউলরাই যে বিদেশিনী মেমদের নিয়ে আছেন তা নয়। হয়তো সাকুল্যে জন দশ-পনেরো বাউলের কপালে নেকনজর জুটেছে মেমদের তাতেই বদনাম রটেছে সকলের নামে। এখানে একথাটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো বুঝতে হবে এই শ্বেতাঙ্গিনী বিদেশিনীরা কেউই মহীয়সী নারী নয়— কেউই আসেনি ভারত উদ্ধারে। তারা কেউ মার্গারেট নোবল বা মীরা রিশার নয়, তারা পশ্চিমি বণিক সভ্যতায় দিগ্‌ভ্রষ্ট রমণী। অর্ধশিক্ষিত কিংবা নেশাগ্রস্ত, কামুক কিংবা বখে যাওয়া। সামান্য দুয়েকজন জিজ্ঞাসু ও গবেষক। তবে এটা ঠিক যে তাদের কল্যাণেই বাউলদের বিদেশি সংযোগ ও ডলার রোজগার এ প্রসঙ্গে আমি একবার লিখেছিলাম :

> একদল গায়ক-বাউলের দেশেবিদেশে সাম্প্রতিক বিপুল জনপ্রিয়তার প্রসঙ্গও উল্লেখ করা উচিত। এঁরা অনেকেই জীবনাচরণে ও সাধনায় বাউল নন, কিন্তু বাউল গানকে পণ্য করে, বাউলের পোষাক পরে, বিদেশী মঞ্চ দাপিয়ে বিপুল ডলার রোজগার করছেন।... গত দু'দশক ধরে সাজানো বাউলরা বিদেশী শ্রোতাদের জনপ্রিয়তা লাভের আশায় দেশজ গানকে ভাবে ও সুরে যতটা চটকদার বিনোদনধর্মী করে তুলেছেন, তার তরঙ্গ আমাদের পল্লী প্রান্তের গায়ককেও দিনে দিনে আকৃষ্ট করছে ও বিভ্রান্ত করছে।

এ-বক্তব্যের বিপরীতে বাউলরসিক অরুণ নাগ একটি নিবন্ধে মন্তব্য করেছেন :

> সত্যি কথা বলতে কি বিদেশীদের মনোরঞ্জনের ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি। বিদেশীদের কতজন চটুল গান উপভোগ করার মতো বাংলা বোঝে? সুর বা লয় ইমপ্রোভাইজেশনের ক্ষমতাই বা গড়পড়তা কজন বাউলের থাকে? 'গুরু কি মাছ ধরেছ বঁড়শি দিয়া' বা 'ও জামাই দরজা খোলো'— জাতীয় গান দেশী শহর-গ্রাম নির্বিশেষে এক ধরনের নিম্নরুচির শ্রোতার মনোরঞ্জন করে এবং যথেষ্ট জনপ্রিয়। ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের দিক্‌পালেরা বাউলদের থেকে অনেক বেশী বিদেশ যান, ডলার রোজগার করেনও অনেক বেশী, তাঁদের বেলায় কিন্তু বিদেশ-ডলার নালিশ শোনা যায় না। তাঁরা বিদেশে আলাপ অংশ সংক্ষিপ্ত করে, তবলার সঙ্গে সওয়াল-জবাব বাড়িয়ে পরিবেশনকে আকর্ষণীয় করেন। অথচ কেউ বলেন না রবিশঙ্কর, আলি আকবর, বিলায়েতের পাল্লায় পড়ে ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত গোল্লায় যাচ্ছে, তরুণ শিল্পী প্রভাবিত হচ্ছে পরম্পরার পথ ছাড়তে।... অনিকেত বৈরাগী ধূলিধূসরিত পায়ে একতারা বাজিয়ে গান গেয়ে হেঁটে যাচ্ছে গ্রামের পথে, এমন একটি ধারণা, ভাবমূর্তি মনে প্রোথিত থাকলে তার সঙ্গে সত্যিই মেলানো শক্ত জেট-মার্গী, ডলারপ্রেমী আধুনিক বাউলকে, যিনি নাইকি পায়ে, মারুতি চড়ে, গান গাইতে আসেন। রবিশঙ্করদের এমন ইমেজ কোনোকালে ছিল না বলেই কোনো আপত্তিও ওঠে না। গণ্ডগোল এখানেই।

প্রতিযুক্তি খাড়া করতে গিয়ে অরুণ নাগ নিজেও খানিকটা বিপাকে পড়েছেন। তাঁর বিবেচনায় আসা উচিত ছিল যে, (১) মার্গ সংগীত ও বাউল গান এক পঙ্‌ক্তিতে উদাহরণযোগ্য নয়, (২) রবিশঙ্করবর্গীয় উচ্চাঙ্গ শিল্পী ও গ্রামের অশিক্ষিত বাউল গায়ক শ্রেণিগতভাবেও একেবারে আলাদা, (৩) বাউল এক ধরনের জীবনাচরণ ও লৌকিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধনামার্গ, তাকে শহুরে মঞ্চে তোলার কথা নয়, (৪) বাউল গান ও মার্গসংগীতের দেশি শ্রোতারা একেবারে ভিন্ন বর্গের। সবচেয়ে বড় কথা, বাউল গানে পরিবেশনগত বিকৃতি এলে আমাদের লোকসমাজে তার প্রভাব অনিবার্য এবং সেটা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। রবিশঙ্কর আলি আকবর বিলায়েতরা বিদেশে পরিবেশনে যে চটক দেখান (সওয়াল-জবাব) এদেশে তো তা দেখান না, কাজেই তরুণ শিল্পীর পরম্পরাভ্রষ্ট হবার কথা আসছে কোথা থেকে? অরুণ নাগ আর একটা ব্যাপার গুলিয়ে ফেলেছেন। কণ্ঠসংগীত শিল্পী বাউলের সঙ্গে যন্ত্রসংগীত শিল্পীদের তুলনা এনে ফেলেছেন। জেট-মার্গী ডলার প্রেমী আধুনিক বাউল গায়ক নাইকি জুতো পরছেন, মারুতি চড়ছেন, এ-ইমেজ কোনওদিন ছিল না যেমন, আজও নেই। তাই যে দু'-একজন প্রদর্শনকামী ভ্রষ্ট বাউল বিদেশে বাহ্‌বা পেয়ে এদেশের মঞ্চেও সেই কৌশলে গান প্রদর্শন করেন, প্রকৃত বাউল গানের রসিকরা তাদের এড়িয়ে চলেন কিন্তু তাতে ধ্বংস বা বিকৃতি ঠেকানো যায় না। কারণ তরুণ গায়ক সম্প্রদায় সত্যিই তাতে প্রভাবিত হন এবং তাদের যন্ত্র-গানের দাপট, লম্বা ঝুলের বিচিত্রিত পাঞ্জাবি, চাপা প্যান্ট এবং কর্ডলেস মাইক নিয়ে চিল চিৎকার এখন বাউল গান বলে চালানো হচ্ছে। ক্রমশ তাদের আসব পানের অতিরেক ও নারী আসঙ্গ যুবসমাজে ছড়িয়ে পড়ছে। অথচ এদের দেখলে বাউল সমাজের প্রকৃত চিত্রটি বোঝা যাবে না। তারা চিরদরিদ্র ও উপেক্ষিত। আমাদের দেশের গড়পড়তা বাউলদের সম্পর্কে শিক্ষিত নগরবাসীদের ধারণা খুবই ধোঁয়াটে বা প্রান্তীয়। বিশেষত তাদের যাপনরীতি ও জীবন সংগ্রাম সম্পর্কে আমরা মূলত অজ্ঞ ও নির্লিপ্ত। তাদের সামাজিক অবস্থানগত বিপন্নতা, দৈনন্দিন অপমান ও সংকটের খবর শহুরে বাঙালির ভাবনা-বলয়ের মধ্যে নেই। তারা আমাদের বিনোদন মঞ্চের উপকরণ কিন্তু তাদের দারিদ্র্য ও ক্লেশ নিয়ে আমরা উদাসীন। তাই মুর্শিদাবাদের গ্রামে গ্রামে বছরের পর বছর ধরে নিরন্তর বাউল ফকির নিগ্রহ আমাদের দূরদর্শনের খাসখবরেও আসে না।

এদেশে বসে অবশ্য আমরা জানতে পারি না বিদেশে ঠিক কোন পর্যায়ের বাউলরা যান এবং মঞ্চে কী গান করেন। খোঁজ করলে দেখা যাবে পূর্ণদাস, প্রহ্লাদদাস বা পবনদাসরা যেমন ঘন ঘন যান, ততটা হয়তো লক্ষ্মণদাস বা সমীর রায়রা যান না— সবই আসলে যোগাযোগ বা স্পনসরের ব্যাপার, যার কপালে যেমন জোটে। ঘটনাচক্রে সনাতনদাসের মতো গুণী বাউলেরও ডাক আসে। যেমন একবার এসেছিল ফ্রান্স থেকে। সনাতনদাসের খয়েরবুনি গাঁয়ের আশ্রম থেকে ফরাসি ভাষায় লেখা ফ্রান্সের একটা অনুষ্ঠানপত্রী সংগ্রহ করেছিলাম। সেটার অংশ বিশেষ অনুবাদ করলে আমরা যে-সংবাদ পাই তা অনুধাবনযোগ্য। সনাতনদাস সম্পর্কে সে দেশের পক্ষে পরিচিতি হল :

> Sanatan Das Baul, born in 1923, not attracted by the commercial circuit, has preserved an authenticity linked with his rural mood of life. Coming from Bangladesh, he lives in the village of Khayerbuni (district Bankura). He interpretes Bhatiali, (song of the rivers) by playing on the *ektara* (stringed lute) on the *dotara* (lute with 4 strings). He is accompanied by his two sons

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Viswanath and Basudev, who also play on the gubgubi. He celebrates the awakening of the soul.

বাংলার প্রখ্যাত বাউল ফ্রান্সে গিয়ে একতারা বা দোতারা বাজিয়ে ভাটিয়ালি গাইছেন, এমত সংবাদ কৌতুককর না প্রহসনাত্মক? তাঁর গানের বিষয় 'Cruel Ganga' এবং পুরো গানটি অনুষ্ঠানপত্রীতে ছাপা রয়েছে এবং তার 'text'-এ কুত্রাপি বাউলতত্ত্ব নেই। সেটি এক নিছক ভাটিয়ালি। কৌতুকের এখানেই শেষ নয়, সনাতনের সহশিল্পী কার্তিকদাস বাউলের পরিচিতিও চমৎকার। বলা হয়েছে :

> Kartikdas Baul belongs to the 'topsil' caste, linked with agriculture. An old member of 'jatra'. a popular musical theatre of Bengal, seduced by the ways of the Baul at the age of 15, he became a disciple of Sanatandas Baul. Today at the age of 35, he lives with his family in the village of Dhandanga (Birbhum district). He specially invokes the Ganga and its cruelty, to the accompaniment of his gub-gubi.

অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে বাংলার বাউল গাবগুবি বাজিয়ে বিদেশে গেয়েছেন ভাটিয়ালি।

সে যাই হোক, বিদেশে বাউল গান কথাটা শুনলেই উর্ধ্ববাহু হয়ে ভাবমগ্ন হবার কিছু নেই— অনুপুঙ্খে অনেক বিচিত্র বার্তা উঠতে পারে। তার আর এক রকমফের এবারে পরিবেশন করা যেতে পারে।

রান্ডি নিকলসন নামের এক বিদেশিনীর হঠাৎ ভাল লেগে যায় সমীর রায় নামের গায়ক যুবাকে। কেঁদুলির মেলায় সে আতিপাঁতি করে খুঁজতে থাকে সমীরকে। লিয়াকত তাকে যোগাযোগ করে দেয় সমীরের সঙ্গে। সমীর প্রসঙ্গে লিয়াকতের মুদ্রিত মন্তব্য :

> সমীর ব্যক্তিগতভাবে আমার খুব পরিচিত। গানবাজনার জগতে বেশীদিন আসেনি। গানটা গায় মোটামুটি ভাল। কিন্তু নাচটা ওর একেবারে বাউল নাচ নয়।... পরের বছরই সমীর বিদেশ চলে গেল। অভাবিত এই ঘটনা ওর জীবনে দারুণ প্রভাব ফেলে। প্রচণ্ড শ্রমে আগের থেকে গলাটিকে তো ভাল করেই, নাচটিকেও মোটামুটি ঠিক করে নেয়। ওকে পছন্দের কারণ হিসাবে রাণ্ডি নিকলসন যা বলে তা আরো অদ্ভুত। ছেলেমেয়ে বাবা ভাই কেউ বাউল নয়, পরিবারটাও সাবেকি মধ্যবিত্ত, আর পাঁচটা পরিবারের মতো। শুধু সমীর বাউল। বাউল পরিবারের ট্রাডিশনাল বাউলের চেয়ে নাকি এ রকম বাউলই তার কাছে কৌতূহলজনক। তাই সমীরকে তার পছন্দ।

রান্ডির পছন্দসই সমীর তো বিদেশ পৌঁছল এবং আসরে আসরে পরিবেশন করল বাংলার নিজস্ব লোকায়ত বাউল গান। এবারে শোনা যাক তার কনফেশন :

> অনেকে বিদ্রূপ করে আমাকে বলে, আমি বাউলের ছেলে নই, উটকো এসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুটেছি।... কথাটা ঠিকই। কখনো বলি না আমি বাউল। কিন্তু যারা বাউল তাদের মধ্যে এমনও আছে, তারা কি তুচ্ছ ও উদ্ভট জীব স্বপ্নেও তা ভাবতে পারবেন না। ইউরোপে গেছি, আছি এক জায়গায়, আমাদের দেশের একটা কালচারকে তুলে ধরছি। ভাবতে পারেন এমনই বাউল আমরা, একজনের গান চলাকালীন আমরা তার অন্য সহযোগীরা বাজনা গোলমাল করে দিচ্ছি।... আমি এতে ভীষণ হতাশ হয়ে যাই এবং এত মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করি যে ফ্রান্সে কোপেনহেগেনে নির্ধারিত প্রোগ্রাম বাতিল করে দেশে ফিরে চলে আসি। তাহলে বুঝুন, এরাই বাউল।

সমীরের আত্মবিবৃতিতে অনেক ভাঁজ আছে, যার দ্যোতনা বহুমাত্রিক। যেমন তাঁর একটা বৈদেশিক অভিজ্ঞতা এইরকম :

একবার গান করছি। প্রোগ্রাম শেষ। হঠাৎ দেখি সঙ্গীরা কেউ নেই। আমি একা পাশেই লেক। ওদের খুঁজতে সেদিকে গিয়ে দেখি, গুচ্ছের মেয়ে, সব টিনএজার। ওদের দেখতে পেয়ে আমার সঙ্গী একজন বলল, 'ওরে সমীর আয় আয়, শালা দেশে আর ফিরে যাব না।' ওরা এমন হতেই পারে, ওদের ওটাই জীবন, কিন্তু আমরা বাউলরা, আমরা আমাদের মতো কই? একী হলাম, একী তুলে ধরছি— এখন বল, ইউরোপ ভাসবে না আমরাই ভেসে যাব?

সমীরের কনফেশনে এক ধরনের মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ কাজ করছে। এখনকার সুযোগসন্ধানী অশিক্ষিত যৌনকাতর বাউলযুবাদের সঙ্গে বিদেশে সে নিজেকে, নিজের বিবেক ও কাণ্ডজ্ঞানকে মেলাতে পারেনি তার কারণ তার একটা সংস্কৃতিগত বোধ আছে, খানিকটা শিক্ষা আছে। এইখানটায় একটা বড় তফাত গড়ে উঠেছে। গানের কণ্ঠটি ভাল, পরিবেশনভঙ্গি সপ্রতিভ এবং বোলচাল কায়দা কানুনে অভ্যস্ত হতে পারলে এখন খুব সহজে একজন বিশ-পঁচিশ বছরের নিম্নবর্গসম্ভূত যুবক বাউল গানের মঞ্চে উঠে পড়ছে। ধীরে ধীরে পরিচিতি ঘটছে আসরে আসরে, ডাক আসছে এখানে ওখানে। মন্দমতি কম বয়সি হুল্লোরবাজ শ্রোতারা তাকে হুকুম করছে যৌনইঙ্গিতপূর্ণ হালকা গান গাইতে। শিক্ষা নেই, বোধ নেই, রুচি নেই, পরম্পরা নেই— লক্ষ্য কেবল অন্যকে দাবিয়ে এগিয়ে যাওয়া, গানের আসরে আগে-ওঠার তদ্বির। এদের চাপে আর দাপটে সব আসরে দেখেছি কুঁকড়ে থাকে একদল নিরীহ গায়ক, বসে থাকে একটেরে। যখন গাইবার ডাক আসে তখন কেমন যেন ঘাবড়ে যায়। দীক্ষিত বাউল তো হঠাৎ মঞ্চে উঠে জনমনোরঞ্জনী গান গাইতে পারে না, তার একটা শিক্ষাক্রম আছে, গুরুর বাচনিক নির্দেশিকা। তাই গুরুবন্দনা দিয়ে তার গান সূচনার রীতি মানতে হয়, পরে একটা তত্ত্বের পথে এগোতে হয়। বেশির ভাগ গানের মঞ্চ তো আসলে বিনোদনমূলক ও তাৎক্ষণিক উত্তেজনার আকর, তাই আসর মাত করে কণ্ঠকেরামতি ও বাজনাসর্বস্ব গায়কের দল। তারাই জনপ্রিয়।

তাদের বেশ কিছু টেকনিক বা কায়দাকৌশল আছে। প্রচুর গাঁজা টানে আর শিবনেত্র হয়ে কথা বলে। প্রচারের দিকটা সবচেয়ে খেয়াল রাখে। এমন কেন করে? বুঝতে অসুবিধে নেই

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে এটা তাদের জীবন নয়, জীবিকা— এবং জীবিকার কঠিন পথে হাঁটতে হলে, টিকতে হলে, নিজেকে আলাদাভাবে তুলে ধরতে হবেই। হতে হবে বিশিষ্ট— তার গানের ও গায়নের মান যেমনই হোক, কালক্রমে সে হয়ে উঠতে চায় পরীক্ষিৎ বালা, সনজিৎ মণ্ডলের মতো সফল ক্যাসেটশিল্পী। তাদের মডেল পূর্ণদাস বা গোষ্ঠগোপাল। মেলা মহোৎসবে যখন সে যায় তখন টাকা দিয়ে ভাড়া করে একজন দক্ষ ক্যাসিওবাদককে ও তালবাদ্যকারীকে। প্রথমে তারা দশ মিনিট ধরে বাজনা-গানের উত্তেজনাকর পরিবেশ তৈরি করে, তারপরে অবতীর্ণ হয় নবীন গায়ক। এসব দেখেশুনে রাধাময় দাস একটা গান বেঁধেছেন, সেটা এইরকম :

দেশ ভরেছে বাবু বাউলে
তারা জামা জোড়া পরছে এখন
ডোর কৌপীন খুলে ফেলে—
দ্যাখো বাবু বাউলে।
কোথায় গেল সে আংরাখা
কোথায় গেল মালা
কোথায় গেল পায়ের নূপুর
কোথায় গেল ঝোলা।
তারা ঘুরছে এখন পার্কে লেকে
রেডিও নিয়ে বগলে।
বটের বাউল কোথায় পাব
বট ভেঙেছে ঝড়ে
সাধনা নাই শখে সবাই
বেতারে গান করে।
রাধাময় কয় যা আছে তা
ক্যামনে রাখি আগুলে।

AMARBOI.COM

শেষ পঙ্‌ক্তির আর্তিটুকু সত্য ও মর্মন্তুদ— যা আছে, এখনও যা আছে, তা কেমন করে আগলে রাখা যাবে?

আসলে তো জীবনচর্যাটাই বদলে গেছে— চলে গেছে ধ্যান ও অন্তর্বীক্ষণের গভীর নির্জন প্রহর। রাধাময় দাসদের মতো বিচিত্র সাধকদের সন্ধান কে আর দেবে? তাই তাঁর কথা একটু বলি।

বর্ধমানের অন্তর্গত খাসপুরে রশীদ ডাক্তারের যে পুত্রসন্তান জন্মায় ১৯৩০ সালে তার নাম রাখা হয় কাজী নুরুল ইসলাম। বীরভূমের খুজুটিপাড়ায় কাটে নুরুলের ছাত্রজীবন। পরে কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের সান্নিধ্যে জেগে ওঠে সৃজন প্রতিভা— নিজের লেখক নাম নেন কুমুদকিঙ্কর। তারপরে বর্ধমান শহরে সংক্ষিপ্ত বসবাসকালে তিনি জড়িয়ে পড়েন সুভাষপন্থী রাজনীতিতে— পরে তাতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে চলে আসেন সেই পুরনো খুজুটিপাড়ায়। সেখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলাপ ও ভাবসম্পর্ক গড়ে ওঠে সেখানকার সরকারি হাসপাতালের নার্স আশালতার সঙ্গে। এই আশালতা একজন ব্রাহ্মণকন্যা। বীরভূমের কুশুলা গ্রামের তারকনাথ মুখোপাধ্যায় তার পিতা। বিয়ে হয় সিউড়ির ধ্বজাধারী চট্টরাজের সঙ্গে। আঠারো বছর বয়সেই ঘটে আশালতার বৈধব্য এবং সেইসঙ্গে পিতৃবিয়োগ। এরপরে সেবিকাবৃত্তি ও খুজুটিপাড়ায় নুরুলের সঙ্গে প্রণয়। ইত্যবসরে নুরুল ইসলাম পেয়ে গেছেন ভাব-জগতের দিশা। তাই সংসার, সমাজ ও ধর্মের বন্ধন কাটিয়ে মুর্শিদাবাদের রাধার ঘাটে নিতাই খ্যাপার কাছে তাঁর আশ্রমে নেন মন্ত্রদীক্ষা ও সন্ন্যাস। নুরুল ইসলামের নতুন নাম হয় রাধাময় গোস্বামী। আশালতাকে ধর্ম ও সাধনসঙ্গিনী করে কেন্দুলিতে আশ্রম গড়েন রাধাময়। ১৯৮৯ সালে সেখানেই তার প্রয়াণ ঘটেছে। এমন বিচিত্র জীবনকাহিনি কত যে আমার সংগ্রহে আছে!

যেমন ধরা যাক, মাস কয়েক আগে হঠাৎ লোকমুখে খবর পেলাম বলহরি দাস দেহ রেখেছেন। এতবড় এই দেশে এটা কী আর এমন খবর? কিন্তু আমার কাছে অনেকটাই। বছর তিনেক আগে উত্তরবঙ্গের রায়গঞ্জের অন্তর্গত সুভাষগঞ্জে তরণীসেন মহান্ত-র আস্তানায় বলহরিকে প্রথম দেখি। তখনই বেশ বৃদ্ধ।

বলহরিকে যখন দেখি তখন তিনি আশি ছুঁই ছুঁই বয়সের। ধবধবে ফরসা পাঞ্জাবি ও ধুতি-লুঙ্গি পরনে। গলায় একগাদা মালা— স্ফটিক-প্রবাল-পদ্মবীজ ও রুদ্রাক্ষের। সুদর্শন, চমৎকার নম্র কণ্ঠস্বর। মানুষটি রসিক। বললেন, 'কারুর নাম বলহরি শুনেছেন? আসলে বাবা-মা জন্মকালেই আমার স্বরূপ তত্ত্ব বুঝে খরচের খাতায় নাম তুলে দিয়েছিলেন। নইলে শ্মশানযাত্রায় যে বুককাঁপানো হুংকার তোলে মানুষ সেই বলহরি নাম দেবেন কেন? তা আমিও হয়ে গেলাম জ্যান্তে-মরা অর্থাৎ বাউল। কিন্তু সে তো অনেক পরে, যৌবন পেরিয়ে... তার আগে খুব মজার লাইফ আমার।'

বলহরি দাসের 'লাইফ' জানার আগে এটা কবুল করা দরকার যে, বীরভূম-বাঁকুড়া-মুর্শিদাবাদ-বর্ধমানে যেসব গেরুয়াধারী বাউল দেখি বলহরি সে-গোত্রের নন। তাঁর বহির্বাস শ্বেতশুভ্র, কারণ তিনি উত্তরবঙ্গের বাউল। উত্তরবঙ্গের বাউল কথাটা স্ববিরোধী কারণ ওই অঞ্চলে স্বাধীনতার আগে এবং বেশ কিছুকাল পরেও কোনও বাউল-ট্রাডিশন ছিল না। জলপাইগুড়ি, রায়গঞ্জ, কোচবিহার, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং এসব জায়গায় বাউল আখড়া, বাউল গান, বাউল সাধনা খুঁজে পাওয়া কঠিন। অঞ্চলের জনবিন্যাসে মিশ্র সংস্কৃতির ভূমিপুত্রদের সঙ্গে মিশে আছে ওপার বাংলার উদ্বাস্তুরা— তাদের জীবনে বাউল সংস্কৃতি তেমন ছিল না, যদিও লালন সমকালে অর্থাৎ দুশো বছর বা তার আগে কুষ্টিয়া-পাবনা-রাজশাহী-রংপুর ধরে বাউলদের একটা ধারা ছিল। কিন্তু মৌলবাদী আলেম মুসলমানরা এ অঞ্চলে বাউলখেদা আন্দোলনে দুর্বার ছিল। হয়তো সেই কারণে আত্মগোপনকারী বাউলরা ছড়িয়ে গেছে নানাদিকে।

দেশত্যাগী যেসব বাউল এখন উত্তরবঙ্গে বা বিশেষ করে পশ্চিম দিনাজপুরে বেশ নাম করা তাঁদের কয়েকজনের নাম ও জন্মস্থানের পরিচয় দিলে বোঝা যাবে ওই অঞ্চলের বাউলদের পরিচয়। বলহরি দাসের জন্ম রাজশাহীর নওগাঁ মহকুমার মান্দা থানার ঘাটকৈর গ্রামে। নৃপেন্দ্রনাথ বা খেজু ঘোষ জন্মেছেন নওগাঁ মহকুমার বদলগাছি থানার রথপাড়া গ্রামে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরণীসেন মহান্ত-র জন্ম পাবনা জেলার অষ্ট মুনিষাগ্রামে, গোবিন্দদাসের জন্ম বগুড়া জেলায় গোবিন্দপুর গ্রামে, বিনয় মহন্ত জন্মেছেন উত্তর করিঞ্জির মাকৈল গ্রামে, ধীরেন মোহন্ত জন্মেছেন রংপুর জেলার বদরগঞ্জে। এঁরা এবং এঁদের মতোই বেশ কিছু উদ্বাস্তু মানুষ গত এক দুই দশকে গড়ে তুলেছেন উত্তরবঙ্গের বাউলসমাজ। এঁদের একটা বড় বাৎসরিক সমাবেশ (সূচনা ১৯৮৯) হয় রায়গঞ্জের সুভাষগঞ্জে ১লা বৈশাখ তারিখে প্রধানত তরণীসেন মহান্তর উদ্যোগে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেখানে একটা স্থায়ীমঞ্চ গড়ে দিয়েছেন। বলহরি সেই মঞ্চের ভেতরদিকে একটা প্রকোষ্ঠে বসে কথা বলছিলেন। তাঁর কথা বলবার আগে জানা দরকার যে উত্তরবঙ্গের বাউলরা সংযত স্বভাবের ভক্তপ্রাণ ব্যক্তি। কেউই গেরুয়া পরেন না, সকলেই শুভ্রতার অনুরাগী। মাথায় চূড়া করে ধম্মিল্ল বাঁধেন না, নৃত্যের পরম্পরা নেই বলা যায়। এঁরা প্রধানত সংসারী ও শান্ত। গানের চটকের চেয়ে গানের তত্ত্ব বিষয়ে বেশি আগ্রহী, তাই আসরে প্রশ্নোত্তরমূলক (যেমন 'গুরু-শিষ্য,' 'শরিয়ত-মারফত', 'ভক্ত-ভগবান') গানের পাল্লাদারি খুব জনপ্রিয়। এঁরা কেউ বিদেশ যাননি বা সাহেব মেমদের পাল্লায় পড়েননি। বাড়ি গাড়ির বা প্যান্ট শার্টের দেখনদারি নেই। হাতে বড়জোর একটা হাতঘড়ি। এবারে শোনা যাক বলহরি-বৃত্তান্ত।

১৩২০ বাংলা সনের ১৩ই পৌষ জন্মেছিলেন বলহরি ঘাটকৈর গ্রামে। বাবা শ্রীকান্ত দাস, মা শরৎসুন্দরী। ছোটবেলা থেকে গানপাগল আর মিষ্টিগলা। তবে শৈশবেই পিতৃহারা, তাই মাতৃস্নেহে পালিত। মায়ের সঙ্গে সর্বদা মেয়ে সেজে থাকতেন এবং তার ফলে স্বভাবে আচরণে মেয়েলিপনা এসে যায়। নারীসাজ তাঁর এত স্বাভাবিক ও নিখুঁত ছিল যে একবার জমিদার নরেন্দ্রনাথ সাহাচৌধুরীর সঙ্গে কলকাতা ভ্রমণে এলে পুরুষরা ট্রামে তাঁকে লেডিজ সিট ছেড়ে দেন।

বলহরি বললেন, 'মেয়ে সেজে থাকতাম, গান গাইতাম, তাই যাত্রাদলে ডাক এল— একচেটিয়া ফিমেল পার্ট— খুব লোকপ্রিয় ছিলাম। দেশভাগের বছরে পাবনা জেলার সুজানগর থানার শ্যামগঞ্জের হাটে আমাকে নিয়ে তো রায়ট বাধার জোগাড়। হাটে বছিরুদ্দিন মিঞা নামে এক ধনী মুসলিম আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে বলল, "হিন্দুরা সব চলে যাচ্ছে, আমি এ মেয়েডারে ছাড়ুম না।" যাকে বলে "বলপূর্বক নারীহরণ" বুঝলেন? তারপরে চারদিকে রটে গেল, সাগরকান্দী থানায় খবর গেল হাট থেকে হিন্দুরমণী নিয়ে যাচ্ছে বছির মিঞা। পুলিশ এসে বন্দুকে ফাঁকা আওয়াজ তুলে লোকজন সরিয়ে ঘিরে ধরে। ব্যাপার দেখে সাগরকান্দীর ননী পোদ্দার হেসে বলে, "আরে বছির তুই কাকে নিয়েছিস? এ তো আমাদের বলহরি— ঐ যে গান গায়।" আমি কিন্তু রা কাড়িনি বুঝলেন, ভাবছিলাম দেখা যাক রগড় কদ্দুর গড়ায়।' বলহরি একটু থেমে রসান দিয়ে বললেন, 'এ ঘটনার আগে আমি আরেকবার অপহৃত হই। সেবার সরাসরি যাত্রার আসর থেকে আয়ুব খানের খানসেনা আমাকে সখীর সাজপরা অবস্থায় ধরে তাদের ব্যারাকে নিয়ে গিয়ে তোলে। তারপরে বুঝতেই পারছেন, ব্যাটাদের সেকি আফশোস।'

এমন আদ্যন্ত রসিক মানুষটি কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ে গেলেন বৈরাগ্যপন্থী। ঘর সংসার করেননি। লালন শাহর প্রশিষ্য মহম্মদ কুতুব আলির কাছে বলহরি নেন তত্ত্ব জ্ঞানের দীক্ষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষা। তবে কায়াসাধন করেননি। গানে গানে মাতিয়ে দিয়ে গেছেন দুই বাংলা অর্থাৎ সীমান্তের এপার আর ওপারের উত্তরবঙ্গ। না, ফরাক্কার এপারে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় সমভূমি তাঁর বিচরণস্থল ছিল না। পশ্চিম ও পূর্ব দিনাজপুরে ছিল এবং এখনও আছে অনেক শিষ্য, প্রধানত গানের। সীমান্তে তাঁর ছাড়পত্র লাগত না। গানের সুরের আসন পেতেছিলেন ভক্তদের প্রাণে। এ অঞ্চলের সকল গায়ক তাঁকে 'বাউল সম্রাট' শিরোপা দিয়েছিল। ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানী ও রসিক। আশি ছুঁই ছুঁই বয়সে, আমার অনুরোধে, বলহরি একহাতে একতারা নিয়ে কোমরে আরেক হাত রেখে যে-আশ্চর্য নাচ নেচেছিলেন লালনের গানের সঙ্গে, তাতে একটা অন্য নাচের ঘরানার ছাপ ছিল। তাঁর মৃত্যুতে নিঃসন্দেহে উত্তরবাংলার বাউল গানের পরিমণ্ডল বিষণ্ণ ও কিছুটা রিক্ত হয়ে গেছে।

বলহরি ছিলেন জন্মসূত্রে নিম্নবর্গের নমঃশূদ্র। একথা ভাবতে গিয়ে মনে পড়ল যে এখনকার পশ্চিমবঙ্গের যত গায়ক বা গায়িকা বাউল গান গেয়ে বেঁচে আছেন ও সংসার চালাচ্ছেন তাঁদের একটা বড় অংশ নিম্নবর্গ থেকে আসা। ভদ্ররকম জীবিকা জোটেনি তাঁদের— কায়িক শ্রমে আছে কুণ্ঠা বা আলস্য। অগত্যা বাউলের আসর তাঁদের দিশা দিয়েছে। বেশি গান হয়তো সঞ্চয়ে নেই, নেই তেমন গানের শিক্ষা, কিন্তু আছে উদ্যম ও মরিয়া লড়াই।

অন্য সব পথ বা জীবিকা ছেড়ে কেন যে এরা বাউলের মার্গে আসে তার কারণ এক একজনের কাছে এক এক রকম, তবে অনেকে আসে গানের নেশায়। যেমন ধরা যাক কার্তিকের কথা। মাঠে চাষ-করা, মাছ-ধরা, মুনিষ-খাটা এক শ্রমজীবী ঘরের ছেলে সে, হঠাৎ কীভাবে খমক, খঞ্জনি, একতারা, ডুবকি আর দোতারার সুর তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছিল কে জানে। তার আড়ষ্ট হাতের খমক বাজনা আর অপটু গলার গান শুনে তবু তাকে ভরসা দিয়েছিল বন্ধুরা, বাড়ির লোকজন— ভাইবোন, বাবা-মা। শেষমেশ বাগদি ঘরের কার্তিক হয়ে গেছে বাউল। মাধবদাস বাউলের কাছে দীক্ষা— বাউল পথের আর বাউল গানের। কিন্তু গুরুর সঙ্গে আড়াআড়ি ঘটে গেল। কারণ গুরুর আশ্রমে আশ্রিত একটি মেয়ের সঙ্গে তার প্রণয়। দুজনে একসঙ্গে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল গুরুর কাছে। গুরু তাকে তাড়িয়ে দিলেন। আশ্রমচ্যুত, নিরাশ্রয়, অন্ন নেই— সে এক কঠিন সময় গেছে কার্তিকের। এদিকে দুর্জয় মনের টান দুজনের— আসঙ্গ পিপাসা। অদম্য সেই টানে আবার যোগাযোগ, আবার পলায়ন। এবার দুজনকে আশ্রয় দিলেন জীবন গোঁসাই। তাঁর কাছে হল বাউল মতে কায়া সাধনার শিক্ষা। মেয়েটি হল সাধনসঙ্গিনী।

কাহিনিটি যত সরলরৈখিক, জীবন তত বক্র।'কাজেই কার্তিকের কঠিন আত্মসংকটের দিনগুলো পেরোনোর কথা এ-আখ্যানে উহ্য থাকল। দুজনের দুখের কুটির, দিন গুজরান, মাধুকরী, গান গেয়ে গেয়ে গলা চিরে যাওয়া, সাধনসঙ্গিনীর ভিক্ষাবৃত্তি, আবার সন্তান পালন ও ক্ষুন্নিবৃত্তি— এমনতর দিনযাপন গড়পড়তা বাংলার বাউলের জীবনে নির্মম সত্য। এর কোথাও বিদেশভ্রমণ, ডলার উপার্জন, লালসা কিংবা ভোগবাদের স্পর্শমাত্র নেই। অথচ এরাই এখনকার বাউলের গরিষ্ঠ অংশ। মেলা মচ্ছবে এরাই সকল অতিথিকে সেবা দেয়, শুশ্রূষা দেয়, ভালবাসে। জন্ম এদের প্রধানত হীন বা অচ্ছুৎ বংশে— হাড়ি, ডোম, বাগদি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুলে বা রাজবংশী এরা, অনেকে 'অর্জল' পর্যায়ের মুসলমান অর্থাৎ নিকিরি বা জোলা বা নলুয়া— শরিয়তি খানদানে তারা অস্পৃশ্য— বেশরিফ।

এমনই একজন অন্তেবাসী বাউল আমাকে সমাদর করে চিঠি লিখে নেমন্তন্ন করেছিল জয়দেব কেঁদুলির মেলায়। পরে সেই বেণীমাধব দাস আর তার 'ফকির বাউল আখড়া'য় আমি অনেক ভদ্রসন্তানকে নিঃসংকোচে নিয়ে গেছি। আখড়ার মধ্যমণি হয়ে একটা বড় কাঠের ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছে বেণীমাধব। প্রসন্ন চোখমুখ, সেবাপরায়ণ মন, কৃষ্ণকান্ত দেহ। আখড়ায় যে আসছে, একটানা গান শুনছে, ঘড়ি ঘড়ি হাতে এসে যাচ্ছে ধূমায়িত চা। পরে সকলেই পাবে অন্নসেবা— অবশ্য মাটিতে বসে, সকলে সবজাতিবর্ণ মিলে সেই সেবা— অজস্র স্বেচ্ছাব্রতী কর্মী নিরলস খেটে যাচ্ছে পরিবেশন ও রান্নার কাজে। অথচ বেণীমাধব তো কোনও সম্ভ্রান্ত মহান্ত নয়— চেয়েচিন্তে ধারকর্জ করে সে চাল ডাল গুড় সবজি এনেছে। আখড়ার মধ্যে ছোট ছোট খুপরি করে আয়োজন করেছে অতিথিদের বিশ্রামের, মেয়েদের আব্রুর। তার ছেলেবেলার স্মৃতি বলতে গ্রাম-নদী-দারিদ্র্য। ছাড়াছাড়াভাবে লেখাপড়া শিখে তৃতীয় শ্রেণিতে উঠে ইস্তফা, তার মধ্যেই আটবার স্কুল বদল— এ-আত্মীয় ও-আত্মীয় বাড়ির কৃপায় যেটুকু যেমন আশ্রয় জুটেছিল। তারপরে দরিদ্র সংসারে অবশ্যম্ভাবী শিশুশ্রমিকের হরেক বৃত্তি নেওয়া— চায়ের দোকানে বয়, সবজি বিক্রি, সাইকেল সারাই, হকারি। মাঝে মাঝে বাবার সঙ্গে পায়ে হেঁটে আশপাশের গ্রামে ভিক্ষাবৃত্তি। পরে একা একা, খঞ্জনি বাজিয়ে।

এবারে বেণীমাধব হিসেব করে দেখল গাঁয়ে গাঁয়ে পায়ে হেঁটে 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' নামগান শোনালে গেরস্থরা তেমন একটা উপুড়হস্ত করে না, তাই অন্য গান চাই, অন্তত রোজগার বাড়াতে গেলে। গান তো অনেকই জানা ছিল তার কিন্তু যন্ত্র? যন্ত্র কেনার পয়সা কই? থাকার মধ্যে ওই সেই সাবেক খঞ্জনি জোড়া। হঠাৎ একজন একটা গুপিযন্ত্র হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল বাজাতে। মজার কথা হল যে দিল যন্ত্রটা সে নিজে সেটা বাজাতে জানত না। বেণীমাধব কিন্তু স্বল্পায়াসেই বাজাতে পারল। আর তাকে দেখে কে?

এভাবেই বেণীমাধব হয়ে গেল বাউল গানের গায়ক। তার বংশে প্রথম একজন গানের এই নতুন জীবিকাধারী হয়ে উঠল। তারপরে একদিন একজন প্রবীণ বাউল বেণীকে নিয়ে গেল 'নিরাময়' নামের যক্ষ্মা হাসপাতালে। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে রুগি আর নার্সদের গান শোনানো, সে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। অনেক পয়সা হত কিন্তু ভাগের সময় দেখা যেত কম। কী ব্যাপার? সেই বুড়ো বাউল থলির মুখটা নিচু করে পয়সা নিয়ে নিত অদ্ভুত কায়দায়। সন্দেহ হত কিন্তু বেণী ভয়ে কিছু বলতে পারত না, যদি সে তাকে সব জায়গায় না নিয়ে যায়। বেণীকে কে আর চেনে? কেই বা গাইতে দেবে? একদিন রাগে দুঃখে শূন্য থলেতে হাত পুরে বেণী টের পায় থলের মধ্যে আটটা খোপ, তার চারটেয় এমন কৌশল যে উপুড় করলেও পয়সা পড়বে না। প্রবঞ্চিত বেণী খেপে উঠে চেঁচায়, লোকটা ধরা পড়ে রেগে যায়। তাকে মারে লাথি চড় ঘুসি। জীবনে বলতে গেলে এই প্রথম বাইরের লোকের হাতে মার খাওয়া। খুব কান্না কাঁদল বেণীমাধব। অভিজ্ঞতা এমন করেই তাকে বড় করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুলল দিনে দিনে। কিন্তু যাবে কোথায় সে? একা একা তো সর্বত্র গান করার সুযোগ ঘটে না, দলে থাকতে হবে। কোনও একটা বাউলের দলে।

কিন্তু সে সময়ে অর্থাৎ বেণীমাধবের কৈশোরে এত তো বাউলের দল ছিল না, ছিল না তার এখনকার মতো জনাদর। বীরভূমে তার চেনা পরিধির মধ্যে ছিল মাত্র দুটো দল। একটা নবনীদাসের আরেকটা স্থানীয় পঞ্চরত্নের দল। তাতে সদস্য ছিল গঙ্গাধর দাস, নারায়ণ দাস এরা। গানটা বেণী ভালই গাইত। গঙ্গাধরের মনে ধরে গেল, তাকে নিয়ে নিল দলে। পারিশ্রমিক একরাতে দু' টাকা। অনেকে গান শুনে ব্যক্তি-শিল্পীকে আলাদা পয়সা দিত, দলের নিয়ম ছিল সে পয়সা যার যার তার তার। কিন্তু বেণীকে তা দেওয়া হত না— অন্যেরা নিয়ে নিত। বঞ্চনা ও অত্যাচারের এতেই শেষ নয়। স্রেফ দলে টিকে থাকার জন্যে বড়দের তোয়াজ করা, ফাইফরমাশ খাটা বা গা-হাত-পা টিপে দেওয়া। তার অন্যথা হলেই মার। কেঁদে লাভ নেই, ক্ষোভ চেপে রাখতেই হবে। কারণ দলে তো কেউ তাকে ধরে রাখেনি। অথচ দলে তাকে থাকতেই হবে, নইলে তার নাম-যশ ছড়াবে কী করে? খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভের দুর্দম খিদে তখন বেণীমাধবের। নিজের একটা আলাদা পরিচিতি চাই-ই চাই, অতএব চোখ বুজে শাসন শোষণ মেনে নিয়ে কেটে গেছে তার কৈশোর কাল।

তারপরে যৌবন সূচনাতেই তার সুনাম ছড়িয়ে গেছে, পঞ্চরত্ন দল ছেড়ে সে গড়ে তুলেছে বেণীমাধবের দল। স্বাধীন আর স্বয়ম্বশ। আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। এখন সে কেঁদুলি মেলার আখড়াধারী। অতিথি, দুঃস্থ, ক্ষুধার্ত ব্যক্তি এবং মান্যমানদেরও সে এখন সেবা দিতে পারে।

বাউলদের নিয়ে বা তাদের তত্ত্ব ও জীবনদর্শন নিয়ে যারা ইতিহাস ধরে জানতে চায় তাদের চোখে না পড়ে পারে না যে প্রথমদিকে বাউল ও ফকির এই দুই সাধনপন্থা বা আচার আচরণ ক্রিয়াকরণ বিষয়ে কোনও স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ ছিল না। ১৮৪৬ সালে ইন্ডোলজি চর্চাকারী এইচ. এইচ. উইলসন সাহেব গৌণধর্মী সাধকদের বিবরণে বাউলদের কথা এনেছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত ১৮৭০ ও ১৮৮৩ সালে লেখা তাঁর দুটি বইতে প্রায় উইলসনের ধারণার প্রতিধ্বনি করে গেছেন। বাউলদের ধর্মাচরণ ও জীবনযাপন সম্পর্কে এঁদের ধারণা ছিল কিছুটা ভ্রান্ত, অস্পষ্ট অথচ বিরুদ্ধ। ১৮৯৬ সালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ তো বাউলদের সম্পর্কে যথেচ্ছ কটূক্তি করেছেন। ১৮৯৮ সালে মৌলবি আবদুল ওয়ালি তাঁর একটি দীর্ঘ নিবন্ধে মুসলমান ফকির ও হিন্দু বৈরাগী বলে বিভাজন করেছেন— লালনকে (মৃত্যু ১৮৯০) তিনি ফকিরদের দলভুক্ত করেছেন। এঁদের লেখালেখির সমসময়ে নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'বিশ্বকোষ'-এ 'বাতুল' থেকে 'বাউল' এমন মত প্রতিষ্ঠা করে মন্তব্য করেছেন।

> বাতুলের ন্যায় এই সম্প্রদায়ের মানুষ লোকেরা ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড সংযোজিত করিয়া পরিধান করিয়া থাকে। ভজনগীত কালে নৃত্য ও বেশভূষা নিরীক্ষণ করিলে ইহাদিগকে বাতুল বলিয়াই অনুমিত হয়। বাতুল হইতে ইহাদের বাউল নাম হইয়াছে।

এর মধ্যে মধ্যে লালন শাহ ফকিরের তিরোধান ঘটেছে এবং সারা মধ্যবঙ্গ জুড়ে তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপক অনুসারীদের খবর মিলছে হাজারে হাজারে। ১৮৯০ সালে তাঁর প্রয়াণ সংবাদসহ ৩১ অক্টোবর 'হিতকরী' পত্রিকা কুষ্টিয়া থেকে যে প্রতিবেদন-প্রবন্ধ প্রকাশ করে, তাতে লেখা হয়েছে:

> তিনি ধর্ম্মজীবনে বিলক্ষণ উন্নত ছিলেন... নিজে লেখাপড়া জানিতেন না; কিন্তু তাঁহার রচিত অসংখ্য গান শুনিলে তাঁহাকে পরম পণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়।... সকল ধর্ম্মের লোকই তাঁহাকে আপন বলিয়া জানিত।

এই প্রথম একজন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্রলোক লালনের জীবনপ্রণালী ও গান সম্পর্কে শিষ্ট এমনকী প্রশংসাযুক্ত উক্তি করলেন। দেখা যাচ্ছে ১৮৯০ সাল নাগাদ বাউল-ফকিররা ততটা অপাঙ্‌ক্তেয় নেই বা নিন্দাযোগ্য হয়নি। লালনের সমসময় এবং তিরোধানের পর মধ্যশিক্ষিত গ্রামবাসীশ্রেণি শখের বাউলের দল গড়ে এক ধরনের ভাবমূলক এবং নির্বেদচিন্তার গান গাইতে শুরু করেছিলেন। প্রধানত কাঙাল হরিনাথের রচিত ও অন্যান্যদের সেই গান কলকাতা ও ঢাকাতেও জনপ্রিয় হয়েছে। সেইসব ভাববহুল গানের ধাঁচে আকৃষ্ট হয়ে অনেক নগরবাসী ভদ্রলোক বাউল গান লিখতে থাকেন, যার সেরা নমুনা মেলে কবি বিহারীলালের 'বাউল বিংশতি'-তে।

কিন্তু বাউলদের গান রচনা তাঁদের জীবনের একটা প্রকাশপিপাসু বাসনার সৃজন হলেও আসল সাধনা তাঁদের দেহতত্ত্বগত করণকৌশল, যা গোপ্য ও গুরুকেন্দ্রিক। সমাজের ধর্মধারণা ও আচরণের সাত্ত্বিক মূল স্রোতের প্রতিবাদী বা বিরুদ্ধবাদী এই সাধকরা এমন সব বিশ্বাসের কথা বলতে থাকলেন যা উচ্চবর্ণের সমাজ ও ধর্মবোধকে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করতে লাগল। শ্রীরামকৃষ্ণ এই সাধনাকে স্পষ্ট ভাষায় নিন্দা করলেন। ব্রহ্মবাদী সম্প্রদায়ের ভাল লাগেনি এমন ইহকেন্দ্রিক দেহসর্বস্ব সাধনাকে। বিশেষত বাউল ফকিররা অনুমানবাদে মোটেই বিশ্বাসী ছিল না, পূর্ব ও পরজন্মে ছিল সন্দিহান, মন্দির মসজিদের ছিল বিরোধী।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, বাউল ফকিরদের মতো অন্যান্য গৌণধর্মীদের, বৃহত্তর হিন্দুসমাজ উনিশ শতকে বেশ তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও নিন্দা করেই ক্ষান্ত হয়েছে— প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামেনি। এই প্রতিবাদ প্রতিরোধ ও বাউল উৎসাদনে নেমেছিল মুসলমান সমাজের কট্টর অংশ। শরিয়তি অনুশাসন থেকে বেরিয়ে এসে দলে দলে বহু সাধারণ অশিক্ষিত মুসলিম বাউল ফকির হতে থাকে। ওহাবী, ফরায়জি ও আহলে হাদিস আন্দোলন এবং সংরক্ষণশীল মুসলিম মানসের বিরুদ্ধাচরণে বাউলরা বিপন্ন হয়। তাদের ওপর দৈহিক অত্যাচার ও সামাজিক বয়কট চলতে থাকে। এ সবের বিশদ নমুনা পাওয়া যায় ১৯২৫ সালে প্রকাশিত 'বাউল ধ্বংস ফৎওয়া' বইতে। এই পক্ষের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল ইসলাম ত্যাগীদের দুরাচার— এবং অজ্ঞ গ্রামবাসী মুসলমান শ্রেণির মধ্যে তাদের দুর্বার অনুপ্রবেশের আশঙ্কা। ফৎওয়ায় বলা হয়েছিল:

> মোছলমানের মধ্য হইতে একদল লোক বাহির হইয়াছে, যাহারা 'বাতেনী দোরবেশ ফকীর' বলিয়া দাবী করে। উহাদের প্রকাশ্য নাম 'বাউল' বা 'ন্যাড়ার ফকীর'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লক্ষণীয় যে ধর্মত্যাগীদের একই সঙ্গে বাউল ও ফকির বলা হয়েছে। পরবর্তীকালেও নানা রচনায় দেখা গেছে বাউল আর ফকিরদের সমার্থক বলে মনে করা হয়েছে। বাউলবিরোধী আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য লালন শাহ্ ফকির ও তাঁর অনুসারী লালনপন্থীরা। ধর্মপ্রাণ শরিয়তনিষ্ঠ মুসলিম মানসে বাউলদের সম্পর্কে ঘৃণা ও বিদ্বেষ উৎপাদনের জন্য ফৎওয়ায় নানা অলীক অভিযোগ পেশ করা হয়েছিল। যেমন:

> তাহারা মোছলমানের দোরবেশ, আলি, শাহ্, ফকিরের পরিচয়ে মোছলমান সমাজে মিলিয়া মিশিয়া, তাহাদের কন্যা ও ভগ্নিকে বিবাহ্ করতঃ গুপ্ত শত্রুভাবে পর্দ্দায় থাকিয়া নানারূপে ছলে, বলে ও কৌশলপূর্ব্বক পবিত্র কোরআন ও এছলামকে ধ্বংস করার মানসে, বিষম ধোকার জাল ফেলিয়া, মোছলমান সমাজকে জর্জ্জরিত ও মূর্খ মোছলমানকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিতেছে। আবার হিন্দুজাতির বৈরাগী সাজিয়া, কামাখ্যা, নবদ্বীপ, কাশী, বৃন্দাবন, কান্তজ্বী প্রভৃতি হিন্দু তীর্থস্থানে তীর্থ ও দেবদেবীর পূজা করিয়াও থাকে।

এ-বিবরণ পড়লে বোঝা যায়, অভিযোগ মূলত ভেকধারীদের সম্পর্কে। একদিকে তারা দরবেশ-অলি-ফকির সেজে মুসলমান সমাজে ধ্বংসের বীজ পুঁতছে, আরেকদিকে হিন্দু বৈরাগী সেজে তীর্থ ও ভজনপূজন করছে। তার মানে এরা ঠিক ধর্মাচারী নয়— ভণ্ড, মেকি ও প্রতারক। কিন্তু অভিযোগ কেবল এইটুকু বা এত সামান্য নয়। বলা হয়েছে:

> তাহারা হায়াজ নেফাজের রক্ত, বীর্য্য, মল, মূত্র, গর্ভপাত শিশুর মাংস, গাঁজা, ভাঙ্গ, মদ ইত্যাদি নাপাক জিনিস ভক্ষণে রিপুদমন করে। স্ত্রী যোনি ও অগ্নিকে ছেজদা করে। দলে দলে স্ত্রীপুরুষ একত্রে উলঙ্গ হইয়া নাচিয়া গাহিয়া কাম-রিপু দমন হইয়াছে কিনা তাহার পরীক্ষা এবং তাহাতে যে বীর্য্যপাত হয়, তাহা ময়দার সহিত মিশাইয়া রুটি প্রস্তুত করতঃ 'প্রেমভাজা' নামক উপাদেয় (?) মারফতী খানা খায়। তাহারা পরস্পর পরস্পরের স্ত্রীকে ব্যবহার করিয়া হিংসা রিপু দমন করে ও স্ত্রী-পুরুষ মিলিত হইয়া খমক, খঞ্জরী, জুড়ি বাজাইয়া দেহ-তত্ত্ব ফকীরি গান করতঃ ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়।

এতসব অভিযোগমালা পেশ করে এদের ধ্বংসের ফৎওয়া জারি করে কট্টরপন্থীরা বসে থাকেনি নিশ্চয়ই। বস্তুত ব্যাপকভাবে বাউলখ্যাদা আন্দোলন, শারীরিক নির্যাতন, গান-বাজনার প্রত্যক্ষ বিরোধিতা চলেছে এবং তার ফলে একদল বাউল ফকির নিবৃত্ত হয়েছে, একদল পালিয়েছে, আরেকদল আত্মগোপন করে ছড়িয়ে পড়েছে নানা গ্রামে। কিন্তু ইতিমধ্যে দেশের হাওয়া বদলেছে। প্রধানত কলকাতার ঠাকুর পরিবার তাঁদের শিলাইদহ-কুষ্টিয়া ও পাবনা-সাজাদপুরে জমিদার পরিচালনা সূত্রে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন ওই অঞ্চলের বাউলদের। তাদের ধর্মকর্ম বা আচরণবাদ নয়, ঠাকুররা আকৃষ্ট হন তাদের গানের ভাবে ও সুরে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাউলদের সম্পর্কে অনুকম্পায়ী ও গুণগ্রাহী। লালন ও গগন হরকরার গানে তাঁরা বিমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাগিনেয়ী সরলা দেবীও সংগ্রহ করেছিলেন অন্য অনেক বর্গের লোকায়ত গান। তাঁদের উদ্যমে তৈরি হতে থাকল বাউল গানের স্বরলিপি, তার লক্ষ্য নিশ্চয়ই প্রচার। 'বীণাবাদিনী' পত্রিকায় ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী লালনগীতির স্বরলিপি প্রকাশ করলেন। রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী' পত্রিকায় ছাপলেন মোট কুড়িটি লালনগীতি, কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়া আখড়া থেকে এনে, ১৩২২ সালের আশ্বিন থেকে মাঘ সংখ্যায়, চার কিস্তিতে। তার আগেই ১৩১৪ সালে 'প্রবাসী'-তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসে লালনের একটি ('খাঁচার ভিতর অচিন পাখি') গান উদ্ধৃত হয়েছে, 'জীবনস্মৃতি'-তে (১৩১৯) উল্লিখিত হয়েছে বাউল গানের মাহাত্ম্য ও অসামান্যতা।

একথা আজ সবাই মানেন যে, সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালন শাহ-র দেখা সাক্ষাৎ হয়নি, কিন্তু লালন শিষ্যদের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হত, বাউলপন্থা নিয়ে তাঁর কৌতূহল ছিল, বাউল গানের সুর কাঠামো তাঁর সাংগীতিক মানসে স্থায়ী ছাপ রেখেছিল। ১৯২২ সালে শ্রীনিকেতনের কালীমোহন ঘোষকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন,

> তুমি তো দেখেছ শিলাইদহতে লালন শাহ ফকিরের শিষ্যগণের সহিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার কিরূপ আলাপ জমত। তারা গরীব। পোষাক-পরিচ্ছদ নাই। দেখলে বোঝবার জো নাই তারা কত মহৎ। কিন্তু কত গভীর বিষয় কত সহজভাবে তারা বলতে পারত।

একেই বলে দৃষ্টিভঙ্গির তফাত। উইলসন, অক্ষয়কুমার, যোগেন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ, নগেন্দ্রনাথ ও 'বাউল ধ্বংস ফৎওয়া'র সংকলক রেয়াজউদ্দিন আহমদের বিরূপ ও বিদ্বিষ্ট মনোভাবের তুলনায় রবীন্দ্রনাথ কত মরমি ও অনুভূতিপ্রবণ। দরিদ্র বাউলদের মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন মহত্ত্ব ও গভীরতা। লালনের গানের অনুলিপি সংগ্রহ করে এনে যত্ন করে পড়েছিলেন, সেই খাতা এখনও শান্তিনিকেতনে রক্ষিত আছে।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ১৯২৫ সালে কলকাতার ভারতীয় দর্শন মহাসভায় রবীন্দ্রনাথ যে লিখিত ভাষণ পাঠ করেন তাতে বাউল দর্শনের এক ভাববাদী ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়। তাঁর অনুভবে মনে হয়েছিল গ্রাম বাংলার নিরক্ষর গীতিকারের লেখা বাউল গানের তত্ত্ব আর প্রাচীন বৈদিক ঋষির রচনায় এক চমৎকার ভাবসাযুজ্য আছে আনন্দময়তায়। বাউলের রচনা আর শেলির কবিতায় তিনি পেয়েছিলেন একই সংরাগ যেন। পরে, রবীন্দ্রনাথের গানের সংগঠনে বাউল সুরকাঠামোর এমনকী কয়েকটি ক্ষেত্রে বাউল গানের ভাবাত্মক প্রকাশভঙ্গির নিজস্ব ভাষা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। সন্দেহ নেই, বাংলার বাউলকে তিনি জাতে তুলেছেন এবং হয়তো খানিকটা আদর্শায়িত করে।

দেখতে দেখতে এমন দাঁড়াল যেন বাউল ও লালন সমার্থক। ব্যাপারটা চমৎকার বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন রমাকান্ত চক্রবর্তী। তাঁর মতে,

> একথা জোর দিয়েই বলা যায় যে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির এবং বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের অন্বেষণ এবং সুদৃঢ় পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে, মধ্যবঙ্গীয় বুদ্ধিজীবীদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচার সত্ত্বেও, হিন্দু-পুনরুত্থানবাদের ধ্যানে তারকাচক্ষু বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকেরা লালনকে দেখতেই পেতেন না। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে উৎসারিত জোরাল প্রচার বাউল গানকে এবং লালনকে অমরত্ব দান করল।

শুধু লালন নয়, রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করতেন গগনের গান, সাধক গোঁসাইগোপালকে এবং তাঁর কথাবার্তা হত সর্বক্ষেপী বোষ্টমির সঙ্গে। এ সবই শিলাইদহ-কুষ্টিয়া পরিমণ্ডলের ব্যাপার। পরে ক্ষিতিমোহন সেনের প্ররোচনায় অন্য ধরনের কিছু বাউল গানের আস্বাদ পান এবং তা নিজের লেখায় নানাভাবে উদ্ধৃত করেন। হাসন রজার গানও তাঁর প্রিয় ছিল। বাংলার বাউল ও বাউল গান বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি মন্তব্য বা ভাষ্য আমরা লক্ষ করতে পারি, তার থেকে বোঝা যাবে কেন তাঁর বাউল গানের প্রতি পক্ষপাত জন্মেছিল। পর্যায়ক্রমে তিনি লিখেছেন:

১. আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিলন ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে বাউলের সুর ও বাণী কোন এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।

২. 'অন্তরতর যদয়মাত্মা' উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন 'মনের মানুষ' বলে শুনলুম, আমার মনে বড়ো বিস্ময় লেগেছিল। এর অনেককাল পরে ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের অমূল্য সঞ্চয়ের থেকে এমন বাউলের গান শুনেছি, ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না— তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব তেমনি কাব্য রচনা, তেমনি ভক্তির রস মিশেছে। লোকসাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করি না।

দুটি মন্তব্যেই বাউলের গানের ভাব-ভাষা-সুর ও সারল্যের মধ্যে গভীরতার কথা আছে, বাউলের জীবনাচরণ বা প্রতিবাদী চেতনার কথা নেই। উপনিষদীয় ভাবনার সঙ্গে তিনি 'মনের মানুষ' তত্ত্বের সমীকরণ করতে চেয়েছেন, যদিও 'মনের মানুষ' আসলে এক কায়াসাধনের কনসেপ্ট— তা কি তিনি জানতেন না? ক্ষিতিমোহনের সংগৃহীত গানে ভাষার সরলতা ও ভাবের গভীরতা না হয় বোঝা গেল কিন্তু তার 'সুরের দরদ' তিনি কীভাবে অনুসন্ধান করলেন? ওই গানের গায়নপদ্ধতি ও সুরকাঠামো কি ক্ষিতিবাবুর আয়ত্ত ছিল? তিনি কি বাউল গান গাইতেন? এমন খবর অন্তত আমাদের জানা নেই।

বাংলার বাউল গান বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উচ্ছ্বাস ও আসক্তির কারণ অনুসন্ধানে রবীন্দ্রনাথের আরও দুটি মন্তব্য আমরা পরীক্ষা করতে পারি। তাতে দেখা যাবে এ-জাতীয় গানের অন্যতর সমাজ-তাৎপর্য তাঁর চোখে পড়েছে অথচ বুঝেছেন তার একঘেয়েমিও। যেমন:

৩. আমাদের দেশে যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত বলেন তাঁরা প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অন্য দেশের ঐতিহাসিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থূলে তাঁদের শিক্ষা। কিন্তু, আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্যন্ত, প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেছে। বাউল-সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের এই সাধনা দেখি— এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই; একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনে সভাসমিতির প্রতিষ্ঠা হয়নি; এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরান পুরাণে ঝগড়া বাধেনি।

৪. অধিকাংশ আধুনিক বাউল গানের অমূল্যতা চলে গেছে, তা চলতি হাটের সস্তাদামের জিনিস হয়ে পথে পথে বিকোচ্ছে। তা অনেক স্থলে বাঁধি বোলের পুনরাবৃত্তি এবং হাস্যকর উপমা তুলনার দ্বারা আকীর্ণ— তার অনেকগুলোই মৃত্যুভয়ের শাসনে মানুষকে বৈরাগীদলে টানবার প্রচারকগিরি।— এর উপায় নেই, খাঁটি জিনিসের পরিমাণ বেশি হওয়া অসম্ভব।... এইজন্যে সাধারণত যে-সব বাউলের গান যেখানে-সেখানে পাওয়া যায়, কী সাধনার কী সাহিত্যের দিক থেকে তার দাম বেশী নয়।

মন্তব্যগুলি নেওয়া হয়েছে ১৯২৭ সালে 'হারামণি'-র রবীন্দ্রলিখিত ভূমিকা থেকে। এসব মন্তব্যে তাঁর বাউলগান সম্পর্কে প্রত্যাশা, প্রাপ্তি, উচ্ছ্বাস ও হতাশা সবই আছে। কিন্তু যেটা বিশেষ লক্ষণীয় তা হল, রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষ দুটি দশকে বাউল গান সম্পর্কে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন। লালনের কুড়িটি গান তিনি ১৯১৫ সালে 'প্রবাসী'-তে মুদ্রণ করলেন অথচ পরে আর একটাও লালনগীতির প্রকাশে উদ্যম নিলেন না। তথ্যত দেখা যাচ্ছে, তাঁর কাছে লালনের গানের অন্তত তিনটি খাতা ছিল এবং তা যে তিনি সযত্নে পড়েছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে তাঁর স্বহস্তে লেখা পাঠশুদ্ধিতে। রমাকান্ত চক্রবর্তী সংগত প্রশ্ন তুলেছেন:

> লালন-গীতাবলি রবীন্দ্রনাথ কেন প্রকাশ করলেন না? তার কারণ কি এই যে, লালনের গানের প্রযৌক্তিক শব্দের অর্থ জেনে তিনি আর তা ছাপাবার জন্য চেষ্টা করেননি? তার কারণ কি এই যে, কিছু কিছু উন্নত 'ভাব'-এর অন্তরালে বাউলদের বিচিত্র যৌন-জীবন তাঁর অজ্ঞাত ছিল না? তার কারণ কি এই যে, যে-'চারিচন্দ্রভেদ' বাউল সাধনার ভিত্তিস্বরূপ, তার বিবরণও তাঁর অজ্ঞাত ছিল না?

অবশ্য রমাকান্ত চক্রবর্তী প্রশ্ন তুলে ক্ষান্ত হননি, সিদ্ধান্তেও এসেছেন। তাঁর মনে হয়েছে,

> একথা বলাই সঙ্গত যে, সমাজের ও ধর্মের যে অসামান্য গুরুত্ব উনিশ শতকের শেষের দিকে দেশাভিমানী বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবিগণ অনুভব করেছেন, সেই অনুভবই দেশাভিমানী রবীন্দ্রনাথের বাউল-প্রেমে সর্বদা অভিব্যক্ত হয়েছিল। দেশী-সংস্কৃতির এই বিশেষ উপাদানকে রবীন্দ্রনাথ অবহেলা করতেন না।

এবারে একটু অন্যদিকে তাকানো যাক। ১৮৯০ সালে লালন শাহ প্রয়াত হন। তাঁর সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শিলাইদহের বোটে প্রবৃদ্ধ লালনকে বসিয়ে পোর্ট্রেট এঁকেছিলেন। শোনা যায় সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী শুনেছিলেন লালনের কণ্ঠে গান। রবীন্দ্রনাথ এঁদের সূত্রেই লালন ও তাঁর গান প্রসঙ্গ শুনেছিলেন। ১৮৯০ সালের পর তিনি লালনশিষ্যদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাদের কাছে লালনের গানের নমুনা শোনেন এমন অনুমান অসংগত নয়। লালনের শিষ্যরা জমিদার রবীন্দ্রনাথের ওপর ভরসা রাখতেন, যার প্রমাণ রয়েছে লালনের শিষ্য মনিরুদ্দিন শাহ ফকিরের লেখা একটি আবেদনপত্রে। 'মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদার মহাশয় সমীপেষু' বলে সম্বোধন করে আবেদন করা হয়েছে তাদের গুরুর ছেঁউড়িয়া আশ্রমের ভগ্নদশা থেকে উদ্ধার করে তাকে পাকা ইমারতে পরিণত করবার। এসবই রবীন্দ্রনাথের বাউলপ্রেমের স্পষ্ট প্রমাণ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিশ শতকের প্রথম দশকের পরে তিনি বাউল সম্পর্কে বেশ ভাবাত্মক মনোভঙ্গিতে গ্রস্ত হয়ে পড়েছেন, এর মূলে হয়তো ক্ষিতিমোহন সেনের সঙ্গ-সান্নিধ্য কিছুটা দায়ী। ক্ষিতিমোহন ১৯০৮ সালে শান্তিনিকেতনে যোগ দেন এবং রবীন্দ্র-সঙ্গে ছিলেন ১৯৪১ সাল পর্যন্ত একটানা। তিনি রবীন্দ্রনাথকে বাউল পরম্পরা বিষয়ে বহু তথ্য ও তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ করেন এবং গুরুদেবকে দেন বেশ ক'টি সংগৃহীত গান। সেই গানগুলি স্পষ্টতই লালনঘরানা বা কায়াবাদী বাউল পরম্পরার গান থেকে একেবারে আলাদা, কিছুটা সফিস্টিকেটেডও বটে। এই নতুন গানের ভাবে রসে রবীন্দ্রনাথ মজে যান। ক্ষিতিমোহন মধ্যযুগের সন্তসাধকদের সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং 'বাংলার বাউল' নামে ১৯৪৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ভাষণ দেন, পরে সেটি বই হয়ে বেরোয়। এ-বই থেকে আমরা পাই তাঁর এমত ভাষ্য যে,

> গ্রন্থাশয়ী পণ্ডিতের দল ঠিক বাউলিয়া ভাব ও মর্ম ধরিতেও পারেন নাই এবং পরিচয়ও দিতে পারেন নাই। যাঁহারা নির্গ্রন্থ তাঁহাদের পরিচয় গ্রন্থে কেমন করিয়া মিলিবে?

তিনি অবশ্য বাউল সাধনা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে গেছেন এই বলে যে,

> ইহাদের দেহ-সাধনায় চারিচন্দ্রের ভেদ অতি গোপনীয় ব্যাপার এবং তাহা অতি বীভৎস। ...চারিচন্দ্রের ভেদ হইল তন্ত্র ও যোগশাস্ত্রের দাসত্ব। তাহাতে অনুরাগ পথের কি আছে?

এইখানে আমরা একটা স্ববিরোধ না দেখে পারি না। বাউলদের দেহ সাধনা তাঁর মতে বীভৎস অথচ তাদের গান অত্যন্ত ভাবগভীর ও অন্তরস্পন্দী কি করে হতে পারে?

সম্প্রতি প্রণতি মুখোপাধ্যায় একটি জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন ক্ষিতিমোহন প্রসঙ্গে। তাতে মন্তব্য করেছেন: 'ক্ষিতিমোহন তন্ত্র ও যোগশাস্ত্র মতে যে বাউলরা কায়াসাধন করেন তাঁদের চেয়ে উচ্চতর ভাবের বাউল সাধকদেরই পরিচয় তাঁর গ্রন্থে দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথও তাঁদেরই কথা বিশ্বজন সভায় জানিয়েছিলেন তাঁর অক্সফোর্ডের বক্তৃতায়।'

অক্সফোর্ডে রবীন্দ্রনাথ যে-হিবার্ট লেকচার দেন তাতে প্রধানত উদ্ধৃতি দেন ক্ষিতিমোহন প্রদত্ত বাউল গানের। সেইসব গানে কায়াবাদীদের চেয়ে উচ্চতর ভাবের বাউল সাধকদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা প্রণতি মুখোপাধ্যায় তুলেছেন, কিন্তু তাঁরা কারা? আমাদের চেনা বঙ্গদেশে কি তাঁরা কোনওদিন ছিলেন বা গান লিখেছিলেন? তাঁরা কোথায় চলে গেছেন? মহম্মদ মনসুরউদ্দিন, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য বহুতর বাউলগান সংগ্রাহকদের চোখে সেসব গান ধরা পড়ল না কেন? কেন ক্ষিতিমোহন সংগৃহীত গানে আধুনিক হস্তাবলেপের আশঙ্কার প্রশ্ন উঠল? প্রণতি নিজেই জানিয়েছেন ক্ষিতিমোহন সম্পর্কে:

> তাঁর দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায় আর তিনি নিজে বাউলবাণী বার করেননি, যদিও তা সাজিয়ে লিখে রেখেছিলেন। প্রায় চল্লিশ বছর অর্থাৎ বলা চলে ১৯০৯-১৯১০ সাল থেকে এগুলি নিজের কাছেই রেখে নিজেই আলোচনা করেছেন, যার জন্য তাঁর এই সংগ্রহ। বন্ধুবান্ধবদেরও দেখিয়েছেন, এর থেকেই রবীন্দ্রনাথ ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে কখনো দিয়েছেন। মনে প্রশ্ন জাগে, এই সাজিয়ে রাখা বাউল গান সংগ্রহের পাণ্ডুলিপি কোথায় গেল?

'কোথায় গেল' এ-প্রশ্ন বেশি করে ওঠে এইজন্য যে, ১৯০৮ সালে শান্তিনিকেতনে তিনি স্থায়ীভাবে এসে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত আমৃত্যু আশ্রমিক আবহেই ছিলেন— বড়জোর 'গুরুপল্লী'র বাসা ছেড়ে নিজের বানানো বাড়িতে উঠে গেছেন। সদাসঙ্গিনী পত্নী কিরণবালা, পুত্র কঙ্কর সেন, কন্যা অমিতা— ক্ষিতিমোহনের তিন উত্তরাধিকারীর কাছে প্রণতি এই পাণ্ডুলিপির হদিশ পাননি।

কিন্তু ক্ষিতিমোহনের সাক্ষ্যে দেখা যাচ্ছে, তাঁর সংগৃহীত বাউলগান থেকে ১৫টি গান তিনি চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়েছিলেন ছাপতে এবং সেগুলি বেরোয় 'বঙ্গবীণা' বইতে। রবীন্দ্রনাথ এই পনেরোটি গান থেকেই প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সন্দেহ হয়, তাঁর জীবনের একটি পর্বে, অন্তত বাউল-ভাবনার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিবাবুর দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তিনিই কি রবীন্দ্রনাথকে কায়াবাদী চারচন্দ্র সাধনকারী বাউলদের বিষয়ে অবহিত করে তাঁর উৎসাহ নিবৃত্ত করেন? দেখা যাচ্ছে 'বাউল-পরিচয়' প্রবন্ধে ক্ষিতিমোহন লিখেছেন:

> সহজভাবে বাউল সম্বন্ধীয় যে-কয়খানা পুঁথি পাওয়া যায়, তাহাতে সাচ্চা বাউল-ভাবের পরিচয় মেলে না। আসল বাউল তো পুঁথির ধারই ধারে না। যাঁহারা আধা বৈষ্ণব আধা বাউল, কি আধা তান্ত্রিক আধা বাউল, তাঁহারাই নিজেদের পরিচয় খানিকটা বৈষ্ণব ও তান্ত্রিকভাবে Compromise-এর মত, দিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু যথার্থ সে নির্ভীক শক্তি বা রচনার গভীরতা গ্রন্থী বাউলদের নাই। সহজ নামে তাঁহারা যে সস্তা ইন্দ্রিয়-উপভোগের পন্থা খুলিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকপক্ষে কোনো সাধনার ভিত্তি হইতে পারে না। চর্যাচর্যবিনিশ্চয় প্রভৃতি গ্রন্থও তান্ত্রিক ভাবের গ্রন্থী বাউলের শ্রেণীর সঞ্চয়।

এই মন্তব্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ও দ্যোতনাবহুল এবং সেইসঙ্গে ব্রাহ্ম ক্ষিতিমোহন সেনের সহজিয়া সাধনা তথা বাউলধারা সম্পর্কিত ধারণার স্পষ্ট প্রতিবেদন।

মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করলে ক্ষিতিমোহনের মনের যে-রূপ ফুটে ওঠে তাতে বোঝা যায় চর্যাগীতি থেকে উৎসারিত বাংলা গীতি পদাবলির ধারাকে তিনি শনাক্ত করতে চান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তন্ত্রসম্পৃক্ত কায়াবাদী বলে। সহজিয়া পদকে ও পন্থাকে তিনি সরাসরি অভিযোগ করেছেন ইন্দ্রিয়-উপভোগের নামান্তর বলে। তবে তিনি যথার্থভাবে বলেছেন যে সাধারণভাবে বাংলার বাউল গানে 'আধা বাউল আধা বৈষ্ণব' বা 'আধা তান্ত্রিক আধা বাউল' পন্থার সমন্বয় ঘটেছে। একথা বলে তিনি বাউল গানের মূল স্রোত থেকে তাঁর সংগৃহীত পনেরোটি পদের স্বাতন্ত্র্য ও কৌলীন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। অর্থাৎ সেসব পদে উচ্চভাব ও গভীরতা আছে, কায়াবাদী সাধনার সঙ্গে ওই পদকারদের সম্পৃক্তি নেই, সহজধারার ইন্দ্রিয়-উপভোগের সরণি থেকে এ গান স্বতন্ত্র পথযাত্রী। এমন ধারণা ও মন্তব্য করার পেছনে ক্ষিতিমোহনের উদ্দেশ্য যাই থাক, একথা স্পষ্ট যে শান্তিনিকেতনে বসবাসকালে সহজিয়া তথা 'আধা বৈষ্ণব আধা বাউল' ধারার গান ও গায়কদের তিনি ভাল করে জেনেছিলেন। প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের বই থেকে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। ১৯১২ সালে—

> পৌষ সংক্রান্তির দিনে কেন্দুলির জয়দেবের মেলায় গিয়ে ভরা-মনে ফিরলেন, বাউল ও বাউল গানের প্রবল আকর্ষণে এমন কতবারই গেছেন। নিতান্ত অল্প বয়সেই তিনি এ মেলায় আসতেন নিতাই বাউলের সঙ্গে, তখন শান্তিনিকেতনের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই ছিল না। এখানে এসেও প্রথম প্রথম কাউকে না জানিয়ে একা চলে যেতেন। তারপর জানাজানি হল, বন্ধু-সহকর্মীরা সঙ্গী হতে লাগলেন। তাঁর ভয় ছিল পাছে কেউ বাউলদের প্রশ্ন করে বিরক্ত করেন।

এখন সমস্যা হয়েছে আমাদের মতো জিজ্ঞাসু ও তথ্য অনুসন্ধানীদের, যারা ক্ষিতিমোহন বা উপেন্দ্রনাথের অনেক পরে সরেজমিন কাজে নেমেছি। একটা কথা স্পষ্ট যে, ক্ষিতিমোহন বহুদিন ধরে এবং বহু জায়গায় ঘুরে মরমি ভাবসাধকদের সঙ্গ করেছেন, তাঁর শাস্ত্রজ্ঞানও ব্যাপক ও গভীর। তুলনায় উপেন্দ্রনাথ অনেক পরে ব্রতী হয়েছেন তাঁর সন্ধান ও সংগ্রহ কাজে, তাঁর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রও অনেক সীমায়িত। তবে উপেন্দ্রনাথ বেশ জোরালোভাবে আমাদের কায়াবাদী বাউল সাধকদের হয়ে সওয়াল করেছেন— ধরতে চেয়েছেন তাদের গোপন ও গুহ্য সাধনার ধারা তথা দর্শনকে। বাউলদের চারচন্দ্রভেদ বা মলমূত্ররজবীর্যপান তাঁর ততটা গর্হিত বা ঘৃণার্হ বলে মনে হয়নি— ক্ষিতিমোহন সে বিষয়ে একেবারে বিপরীতমুখী। কাজেই ক্ষিতিমোহনকে উদ্ভাবন করতে হয়েছে এক নতুন লব্জ— কায়াবাদীদের বিপরীতে তিনি প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন উচ্চতর ভাবের বাউল সাধকদের। কিন্তু খুব সংগত যুক্তিতে ও স্থানিক কারণে তিনি তাঁদের খুঁজে পাননি রাঢ়বঙ্গে বা কেঁদুলির মেলায়। লালনশাহী পন্থা সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ থাকার কথা নয়, যিনি স্বচ্ছ ভাষায় লিখেছিলেন 'ধরো রে অধরচাঁদে অধরে অধর দিয়ে।' কাজেই অবিভক্ত বাংলায় ঠাকুর পরিবারের জমিদারিভুক্ত কুষ্টিয়া পরিমণ্ডলে তিনি যাননি, উৎসাহ পাননি লালনবাণী প্রচারে। অথচ এখন নানা ঘটনাচক্রে লালন শাহের গান ও তত্ত্ব দুই বাংলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য হয়ে উঠেছে। লালনবাণী এখন বুদ্ধিজীবীদের দিশা দিচ্ছে এবং লালনগীতির সুরকাঠামো নিয়ে কৌতূহল বেড়েই চলেছে। তথ্য থেকে জানা যায়, ১৮৯০ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত একশো বছরে লালন সম্বন্ধে বই লিখেছেন ৪৪ জন, প্রবন্ধ লিখেছেন ১৫০ জন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এহেন লালনের গান রবীন্দ্রনাথের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল উনিশ শতকের শেষ দশকে। সে গানের ভাবরস ও সুরমাধুর্য তাঁকে টেনেও ছিল, অথচ পরে সেই লালন সম্পর্কে আর যেন তেমন উচ্ছ্বাস ছিল না। যেটুকু ভাবোচ্ছ্বাস তিনি প্রকাশ করেছেন তা লালনের দেহ খাঁচার অচিন পাখির রহস্য নিয়ে। 'মাঝে মাঝে বদ্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন পাখী বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়; মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায় কিন্তু পারে না'— তাঁর উপভোগ ছিল লালনের এই অসামান্য অনুভবের জন্য ও প্রকাশভঙ্গির কারণে। বাউল গানের 'mystic transcendentalism' তাঁর পক্ষে রোচক লেগেছিল, কিন্তু বাউলদের প্রতিবাদী মনন, আত্মবেদন ও নির্যাতিত অবস্থান বিষয়ে তিনি কলম ধরেননি। পরিণত বয়সে ১৯০৬ সালে 'পত্রপুট' কাব্যের ১৫ সংখ্যক কবিতায় তিনি লিখেছিলেন:.

কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে
একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মানদীর ধারে,
যে নদীর নেই কোনো দ্বিধা
পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙে ফেলতে।
দেখেছি একতারা-হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার
গভীর নির্জন পথে।

যৌবনে পদ্মাতীরে দেখা একক বাউলের এই নিঃসঙ্গ সন্ধান নির্জন পথে, তাঁর পক্ষে একটি ভাবময় চিত্রকল্প হয়ে উঠেছে। বাউলকে তিনি একলা সাধকরূপে দেখতে চান— 'মনের মানুষ'-ও তাঁর বিবেচনায় এক অন্তরগ্রাহ্য তত্ত্ব। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বাউল সাধনা যুগলের সাধনা এবং দেহতত্ত্বের জটিল পথক্রমায় তার চলাচল। মনের মানুষ তাদের বিশ্বাসে কোনও ভাব বা অনুভব নয়, তা নিতান্ত এক বস্তু, যা উপলব্ধি করতে হয় নরনারীর দেহসংগমে এবং গুরুনির্দেশিত করণকৌশলে।

'ওদের সাধক' উচ্চারণে কবি যাঁদের কথা বলেছেন তাঁদের পরিচিতি দিতে গিয়ে তাঁর বাচন:

ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত।
দেবালয়ের মন্দিরদ্বারে
পূজা-ব্যবসায়ী ওদের ঠেকিয়ে রাখে।

বাউলদের হয়তো অন্ত্যজবর্গে শ্রেণিভুক্ত করা যেতেও পারে, অন্তত গভীরার্থে, ওরা মন্ত্রহীন কেননা মন্ত্রে ওদের বিশ্বাস নেই— প্রশ্নটি তাই কিন্তু অধিকারঘটিত নয়। দেবালয়, দেবতা, বিগ্রহ পূজা বা পুরোহিত কিছুই ওদের কাম্য নয় তাই পূজা ব্যবসায়ীদের দ্বারা নিরুদ্ধ হবার প্রশ্ন ওঠে কি? এর পরের রবীন্দ্রবাণী আরও ভ্রমাত্মক। বলেছেন:

ওরা দেবতাকে খুঁজে বেড়ায় তাঁর আপন স্থানে।

অথচ শুধু বাউল কেন কোনও লোকায়ত সাধকই দেবতাকে খোঁজে না, খোঁজে মানুষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেহের দেহলী

ইহসাধক ও দেহবাদী বাউলদের প্রথম থেকে এই যে চিহ্নিত করা হল মিস্টিক ও একক অনুসন্ধানীরূপে, তার ঘোর আজও কাটল না। তার প্রমাণ পাচ্ছি ফ্রান্স থেকে প্রকাশিত বাউল-পরিচিতিতে, যা অতি সাম্প্রতিক এবং বিশ্বসকাশে বাংলা সংস্কৃতির পরিচায়ক বলেই চিন্তার বিষয়। বলা হচ্ছে ফোল্ডারে:

Across all ideas of ethnicity or caste, the Bauls of Bengal move from village to village (Madhukari). Whether they live in small communities or are engaged in a profession, the Bauls are always in search of the Supreme Being who resides in the temple of the body. Prossessed by 'winds of the mind', translation of the Sanskrit 'Vakula' or Baul, they utilise music and dance as props of the divine madness. The artistic act, more than a simple imaged ritual is actually the accomplishment of that meeting with the Supreme Being.

বিদেশে বাউল সম্পর্কে এই হল আমাদের প্রচারের নমুনা। এমন সব প্রচার পুস্তিকার রচয়িতাদের কে বলে দেবে যে, এখনকার বাউলদের বাস্তব এমন নয়। এ ধরনের বস্তাপচা কথা বলার দিন এবারে শেষ হওয়া দরকার। বাংলার বাউল মানে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাজীবী, মাধুকরীব্রতধারী, কে বলেছে? কে বলেছে নাচ আর গানে তারা দক্ষ? কে বলেছে তারা দিব্যোন্মাদ ব্যাকুল? বাউলদের একটি ক্ষুদ্র অংশ হয়তো ভিক্ষাজীবী, তেমনই খুব কম বাউলই গান গায় বা নাচে। বেশির ভাগই আচরণবাদী, প্রচ্ছন্ন ও সংগুপ্ত। এমনভাবে সাধারণ জীবনস্রোতে তারা মিশে থাকে যে হঠাৎ শনাক্ত করাও কঠিন। তারা বেশির ভাগই শ্রমজীবী ও মাটিঘেঁষা জীবনের লড়াইয়ে সামিল। অনেকে আবার বিপন্ন, মৌলবাদীদের অত্যাচারে। একজন বা দু'জন গায়ক-বাউল বীরভূম বা বাঁকুড়া থেকে মাঝে মাঝে যেতে পারেন প্রতীচীর মঞ্চে, গাইতে পারেন নেচে ঘুরে ঘুরে, কিন্তু তিনি কোনওভাবে কি বাংলার বাউলের প্রকৃত প্রতিনিধি হতে পারেন?

এ প্রশ্ন যে আমাদের মনে ওঠে না তার কারণ কিছু কৌশলী মানুষ বা চতুর স্পনসর আজকাল দেশে ও বিদেশে খুব দক্ষতার সঙ্গে বাউলদের ব্যবহার করছে নিজেদের অর্থ উপার্জনের জন্য। বাউলদের অনেকে নিজের অজান্তে এদের দ্বারা প্রতারিত হচ্ছেন। তাঁদের প্রতি গুরুর নির্দেশ ভুলে, স্বাভাবিক মূল্যবোধ জলাঞ্জলি দিয়ে, প্রযোজকের রুচি ও ব্যাবসাবুদ্ধি অনুসারে নিজেকে সং সাজাচ্ছেন প্রতিনিয়ত, আত্মপীড়ন করছেন যথেচ্ছ। আড়ম্বরপূর্ণ ভোগের জীবন এবং সব রকমের কৃত্রিমতার আড়ালে আত্মসংযত থাকার কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাউলের, কিন্তু প্রচার তাঁদের বিপথগামী করে প্রতিনিয়ত। এখন নানা নাগরিক অনুষ্ঠানে বা পুজো প্যান্ডেলে, গুরু বা ছোটখাটো অবতারকল্পের বাৎসরিক পালনে, বক্তৃতা, প্রতিযোগিতা, অষ্টম প্রহর তারকব্রহ্মনামের সঙ্গে অনুষ্ঠান সূচিতে লেখা থাকে 'রাতে বাউলগান'। সন্ধ্যার মুখে এসে পড়েন খ্যাপা নামধারীরা এবং বিপুল জন সমাবেশে তারস্বরে চেঁচাতে থাকেন, গানের নামে। তাঁদের আশু লক্ষ্য অর্থোপার্জন, উদ্যোক্তাদের লক্ষ্য অনুষ্ঠানের সাম্বৎসরিক জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। এঁরা প্রকৃত বাউল নয়— বাউলের অনুকল্প।

এমনতর ক্ষেত্রে কথা উঠেছে বাউলের মূল্যবোধ নিয়ে। নবনীদাস বা নিতাই খ্যাপা, রাধেশ্যাম বা ত্রিভঙ্গ দাসকে কি এভাবে ব্যবহার করা যেত? যেত না, কারণ তাঁদের বাউল সাধনার ভিত ছিল অনেক সুদৃঢ়, বোধ ছিল পরিপক্ক, নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখাই ছিল লক্ষ্য। আজ পটভূমি পালটে গেছে, আর্থ-সামাজিক পরিবেশ হয়ে গেছে অন্যতর, অস্তিত্বের সংকট হয়ে উঠেছে তীব্র। এ প্রসঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক বিকাশ চক্রবর্তী মনে করিয়ে দিয়েছেন একটি নিবন্ধে যে,

১. বিদ্যমান সমাজের রীতিনীতি মূল্যবোধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়া সত্ত্বেও বাউলরা একান্তভাবেই সামাজিক মানুষ, কারণ সপ্তদশ শতাব্দীর সামাজিক প্রতিবেশই বাউল মতবাদের জন্ম ও ক্রমবিকাশকে সাহায্য করেছে এবং তারই ভিত্তিতে নিজস্ব বিকল্প মূল্যবোধ তারা গড়ে তুলেছে। তাই অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো বাউল জীবন ও তার মূল্যবোধ মিথষ্ক্রিয়ার বন্ধনে আবদ্ধ।

২. একটা বিষয় খুব স্পষ্ট যে বাউল সাধনা কোন ক্ষণিকের সাধনা নয় বরং এক সামগ্রিক জীবনচর্যা, যার শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই।

৩. প্রত্যেক সমাজ ব্যবস্থাই যে সম্পর্ককে সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে বিচার করে এবং বিধিনিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখে, তা হলো নারী-পুরুষের সম্পর্ক, কারণ এই সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে সম্পত্তির সংরক্ষণ ও উত্তরাধিকার ব্যবস্থা। বলা বাহুল্য, অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রের মতো নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও বাউলরা সমাজ-অনুগামী নয়। খুব সহজেই তাই এদের বিরুদ্ধে বহুগামিতা ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ ওঠে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে তত্ত্বগতভাবে বাউল সাধনা যৌন স্বেচ্ছাচারকে আদৌ সমর্থন করে না। এই যুগল সাধনার প্রকৃতি-নির্বাচন-গ্রহণ-পরিত্যাগ গুরুর আদেশ ও অনুমতি সাপেক্ষ।

বিকাশ চক্রবর্তীর তিনটি বক্তব্যই গুরুত্বপূর্ণ ও অনুধাবনযোগ্য এইজন্য যে তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক। বহু বছর ধরে বহু গুরুপাট ও আখড়ায় তাঁর যাতায়াত আছে এবং মেলা মহোৎসবে অগণ্য মানুষের অংশগ্রহণের আতিত ও আনন্দ তিনি জানেন। বাউল সাধক ও তার সাধনসঙ্গিনী, তাদের গুরু ও তাঁর নির্দেশিকা বিকাশ চক্রবর্তীর প্রত্যক্ষভাবে জানা। বাউল আচরণ-বিধি ও বিধান তিনি সরেজমিন দেখে তাঁর সিদ্ধান্ত করেছেন। সেই জন্যেই তিনি বাউলদের যৌন-যোগাচারকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেন না— বাউল জীবনের স্বেচ্ছা সাধনার ভিত্তিমূলে কঠোর সংযম ও শৃঙ্খলার কথা তাঁর অভিজ্ঞতায় থাকে। উপরন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজতত্ত্ব তাঁর চর্চার বিষয় বলে এমন সিদ্ধান্তে আসতে পারেন যে,

> যে-স্বয়ংশাসিত ও কৃষিজীবী সমাজে বাউল মতবাদের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, আধুনিকীকরণের প্রভাবে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে সেই সমাজের। সমকালীন সমাজের দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে বাউলরা চলে গিয়েছিলেন মূল স্রোতের বাইরে। সমাজপতিদের ভ্রূকুটি ও প্রতিরোধ সত্ত্বেও তাঁরা বজায় রাখতে পেরেছিলেন তাঁদের স্বতন্ত্র জীবনধারা, কারণ তৎকালীন সমাজের গড়নই তা সম্ভব করেছিল। আধুনিকীকরণ সঞ্জাত নগরায়ণ প্রক্রিয়া ও গণমাধ্যম দুর্বার গতিতে প্রবেশ করেছে দেশের প্রত্যন্ত প্রদেশে এবং এই অপ্রতিহত আগ্রাসনের কবল থেকে বিশেষ কোন অঞ্চল বা সম্প্রদায়ের মানুষের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রচেষ্টা নিতান্তই অসম্ভব। সামাজিক রূপান্তরের এই আঘাতে বাউলরাও বিপর্যস্ত। অস্তিত্বরক্ষার প্রয়োজনে পরিবর্তিত হচ্ছে তাদের জীবনবোধ, জীবনধারণের উপায়, এক কথায় সমগ্র জীবনচর্চা।

কথাগুলি বিবেচনাযোগ্য ও যুক্তিপূর্ণ। একসময়ে সমাজস্রোতের বিরুদ্ধতা করেও বাউলরা নিজেদের অস্তিত্ব আর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পেরেছিল সেই বিশিষ্ট সমাজ কাঠামোর জন্যই। আজ সেই সমাজ কাঠামো নিজেই বিধ্বস্ত তাই তার ঔদার্যের অভাবে বাউলরা অনিকেত। মূল সমাজ চরিত্র আজ পরিবর্তনের ঝড়ে দিশাহীন, তাই বাউলরা তাদের non-conformist ভূমিকা থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়ে পেশা ধান্দা ও চাতুর্য এমনকী বৈদ্যুতিন যন্ত্রব্যবহারের কৃৎকৌশলে ক্রিয়াপর। একতারা আর এখন তাদের প্রতীক নয়, সহযোগী যন্ত্রও নয়— শো-পিস।

সহজধারার বাউল গায়ক আর তার মরমি শ্রোতাদের মধ্যে এখন রয়েছে বিভ্রম ও চমকের পরদা। চমকপ্রদ হওয়া এবং পেশাদারিত্ব অর্জন এখন বাউলের আচরিত কৃত্য। শ্রোতাদের মন এখন গভীরতা বা রহস্য অতলতার প্রত্যাশীও নয়। তারা তত্ত্ব চায় না, চায় তীব্র ঝোঁক আর দ্রুতচালের হালকা গায়নরীতি। রবীন্দ্রনাথ, ক্ষিতিমোহন, উপেন্দ্রনাথ, মনসুরউদ্দিন— কেউই বাউল গানের এত অবনমন দেখে যাননি। দেখে যাননি বাউল জীবন চর্যার অধঃপতন। হালফিল চারদিকে একটা নৈরাশ্যের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। কয়েকটি সংলাপ এখানে উদ্ধৃত হচ্ছে প্রসঙ্গত।

মহিলা বাউল গায়িকা ননীবালাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ‘বাউল মেলা মহোৎসবে যান? ননীবালার জবাব, ‘আগে যেতাম। এখন আর যাই না। গানের পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে।’

কেঁদুলির মেলায় আদিত্য মুখোপাধ্যায় কয়েকজন সাধক বাউলের কাছে খাঁটি বাউলদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল। তার উত্তর পাওয়া গেছে নানারকম। যেমন—

> ‘বাউল কুথাগো ইখানে? ইখন তো ড্রেসের চমক আর খমকের কেরামতি’—
> বলেছেন প্রবীণ রামেশ্বর দাস বাউল।
> মনোহর দাসের উক্তি: ‘বাউল সুরের সেদিনই মৃত্যু হয়েছে, যেদিন বাউল একতারা ছেড়েছে।’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গায়ক পূর্ণদাসের গানের বিষয়ে জনৈক বাউলের টিপ্পনী : 'পুন্ন আর বাউল কি গাইছে গো, বাউল গাইত নবনী দাস, পুন্নর বাবা।'
স্বয়ং পূর্ণদাসের স্বীকারোক্তি : 'বিদেশীরা স্বীকৃতি দেবার আগে এবং সেখানে ব্যাপক প্রচার ও বিপুল সমাদরের পূর্বে আমাদের দেশে বাউল-সংস্কৃতি নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামাননি।'

এবারে উঠবে এক গুরুতর প্রশ্ন— নবনীদাস বা তাঁর পুত্র 'বাউল সম্রাট' পূর্ণদাসকে কি আদপে বাউল বলা যাবে?

হঠাৎ কি এমনতর প্রশ্ন উঠল বলে মনে হচ্ছে? আসলে এটা একটা জারিত জিজ্ঞাসা, যা বহুদিন ধরে বহুবর্গের বাউলদের সঙ্গে মেলামেশা করতে করতে আমার মনের কোণে জেগেছে কিন্তু সমাধান করতে পারিনি। সমাধান করলাম বহুদিন পরে, মাত্র বছর কয়েক আগে। ঘটনাটা এইরকম।

সে সময় সিউড়ি শহরকে কেন্দ্র করে ঘুরছিলাম আশপাশের কয়েকজন বাউলদের সন্ধানে। জানা গেল সিউড়ির উপকণ্ঠে কেন্দুয়া পল্লিতে থাকেন সপরিবারে লক্ষ্মণদাস বাউল। লক্ষ্মণদাস, নামী মানুষ, কারণ নানা জায়গায় তাঁর গানের ডাক আসে, সরকারি অনুষ্ঠানেও, তার একটা কারণ তাঁর ঘরানা খুব অভিজাত। লক্ষ্মণদাস নবনীদাসের পুত্র, পূর্ণদাসের ভাই। বিদেশে গেছেন বেশ ক'বার, বিদেশিনী সংসর্গ করেছেন ব্যাপক— গায়ক-বাউলরা অনেকে তাঁর সৌভাগ্যে ঈর্ষাকাতর— কথাবার্তায় লক্ষ করেছি। তো এক গ্রীষ্মের বিকেলবিকেল গেলাম লক্ষ্মণদাসের বাড়ি— কেন্দুয়া পল্লিতে। বাড়তি একটা টান ছিল। শুনেছিলাম, জীবনের একেবারে শেষদিকে অসুস্থ ও বৃদ্ধ নবনীদাস বাউল আশ্রয় নিয়েছিলেন লক্ষ্মণদাসের ওই বাড়িতে— ওখানেই দেহ রাখেন। বাড়ির পাশে আছে তাঁর সমাধি।

AMARBOI.COM

লক্ষ্মণদাসের পল্লিকে একটা মোটামুটি বাউল পাড়া বলা চলে। নানা বয়সের বাউল ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছোটখাটো তাদের কুটির। সকলেরই কেশ চূড়া করে বাঁধা, পরনে গেরুয়া অঙ্গবাস, গলায় নানারকম পাথুরে মালা। বেশ চমৎকার পরিবেশটি। আমার মনে পড়ল নদিয়া জেলার পরানপুরে এনায়েতউল্লা ফকিরের বাড়ির কথা। সেখানে অবশ্য গিয়েছিলাম এক যুবকের মোটর সাইকেলের পেছনে বসে। যুবকটি নানা কথা বলতে বলতে গাড়ি চালাচ্ছিল। বোঝাচ্ছিল দেশ কালের পরিস্থিতি, তার গ্রামের হালচাল। হঠাৎ একজন সাইকেল আরোহী ব্যক্তির আমরা মুখোমুখি। সে জিজ্ঞেস করল ভারিক্কি চালে, 'আসছ কোথা থেকে? যাবে কোথায়?'

যুবকটি মোটর সাইকেল থামিয়ে বিনয় বচনে বলল, 'ভাল আছেন কাকা? আসছি এখন নাজিরপুর থেকে, এঁকে পরান ফকিরের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

'বেশ বেশ' বলে লোকটি চলে যেতেই ছোকরা বলল, 'যাকে দেখলেন স্যার, ও হল এ দিগরের সবচেয়ে বড় ডাকাত। কী দিনকাল এসেছে ভাবুন।'

—কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—ডাকাতের সঙ্গেও হেসে কথা বলতে হয়। কাকা বলেও ডাকতে হয়। খুব ঘেন্না ধরে যায় নিজের ওপর।

বাউল ফকিরের খোঁজে এসে ডাকাত দর্শন? পরে জেনেছি, বাউল ফকিরদের মধ্যে কেউ কেউ পূর্ব আশ্রমে ডাকাত ছিল। পরে অনুতপ্ত হয়ে সব ছেড়ে ছুড়ে ভক্ত বনে গেছে। সে কি পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে ভোল পালটে একেবারে দেশান্তরী হওয়া? তা জানি না। তবে গতবছর মুর্শিদাবাদে এক ফকিরি গানের আসরে একজন দশাসই চেহারার গায়কের গান শুনছিলাম। বিশাল লম্বা চওড়া চেহারা, শক্ত গড়ন। কালো রঙের এক ঢাউস আলখাল্লা পরে ভাবাবিষ্ট হয়ে গান গাইছিল একতারা নিয়ে। যে বাড়িতে আসর বসেছে সেই গৃহস্বামী আমাকে কানে কানে বলেছিলেন— 'কার রক্তে যে কে জন্মায়। এই যে গান করছে ইসমৎ ফকির, এর বাপ ছিল দুর্ধর্ষ ডাকাত— অন্তত পঞ্চাশ জনকে মেরেছে। এ ছোঁড়া কিন্তু ছোট থেকেই অন্যরকম— ঠান্ডা ভক্তিমান স্বভাবের। গান গাইতে গাইতে কাঁদে। বাড়ি ঘরদোর বউ ছেলে ছেড়ে ফকিরি নিয়েছে।'

এনায়েতউল্লা ফকিরের বাড়িতে একদিন একরাত বাস করে আমার চোখকান অনেকটা খুলে গিয়েছিল। বাউল ফকিরদের সম্বন্ধে হালকা ভাবাবেগ আর অকারণ মুগ্ধতা রয়েছে যাঁদের, তাঁদের উচিত এক আধরাত তাদের আস্তানায় কাটানো। এই যেমন এনায়েত ফকিরের ঘরে দেখছিলাম, চার-পাঁচটা ছোকরা নিমীলিত চোখে সশ্রদ্ধভাবে এনায়েতের সব কথা গিলছে। এরা হবু ফকির। খুব শিগগির ফকিরি পন্থা নেবে। কেন এই ধরনের কুড়ি থেকে পঁচিশ বছরের যুবকেরা ফকিরি পন্থায় আসছে— আজও আসছে— জানবার ইচ্ছে জাগল।

এনায়েতউল্লা আমাকে সম্পূর্ণ অবাক করে দিয়ে বললেন, 'এরা আসে জন্মনিয়ন্ত্রণ শিখতে।' আমার বাকস্ফূর্তি হচ্ছে না দেখে বোঝালেন, 'মুসলমানদের ঘরে ঘরে, বিশেষত অশিক্ষিত গ্রাম সমাজে সন্তান সংখ্যা বেশি। তার ফলে চরম দারিদ্র্য আর অস্বাস্থ্য। এই যারা ফকিরি পথে আসতে চাইছে, এরা বিবাহিত, দু'-একটা সন্তানও হয়েছে। আর চায় না, তাই এ পথে আসছে। আমার কাছে দমের কাজ শিখতে পারলে সন্তান হবে না, এটা জানে। তাই পড়ে আছে।'

লক্ষ্মণদাসের বাড়িতে এসে এনায়েত ফকিরের কথা মনে পড়ল দুটো কারণে। প্রথমত, বাড়ির আশেপাশে যেমন বাউলদের দেখছি নানা বয়সের, তেমনি এনায়েতের বাড়ির ইতিউতি দেখেছিলাম ফকিরদের। ফকির পাড়া যেন। দ্বিতীয়ত, ফকিরের বাড়ির সামনে দেখেছিলাম একসার ইসলামি শৈলীর সমাধি, ছোট ছোট। এনায়েতের বাবা পাঁচুরুল্লা বিশ্বাসের কবর— আরও অনেকের। তার মানে মারফতি ফকির বলে গ্রামের ইসলামি কবরখানায় এঁদের স্থান হয়নি বা প্রতিবাদী চেতনা থেকে এঁরা নিজেরাই নিজের ভিটের আওতায় সমাধি দিয়েছে পূর্বজদের।

কেন্দুয়াতেও তাই। লক্ষ্মণদাসের বাড়ির পাশে বাউলদের সমাধিক্ষেত্র। সেখানে চিরনিদ্রাবৃত নবনীদাস বাউল। ভাবতেই বিহ্বল হয়ে পড়লাম। মানুষটার শেষ বয়সের চেহারা আমি দেখেছিলাম বহু পুণ্যফলে— সেকথা মনে পড়ল। ১৯৫৬ সালে কলকাতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে গান গাইছিলেন নবনীদাস। দীনভিখারির বেশে কিন্তু উদ্দীপ্ত কণ্ঠে। পূর্ণদাসকেও ওই বছরে দেখি তবে নিজাম প্যালেসে। অসামান্য রূপ, অপূর্ব চোখ, কপালে রসকলি, পরনে গেরুয়া। ঘুরে ঘুরে বৃত্তাকার নাচের সঙ্গে সেই চমৎকার যৌবনভরা কণ্ঠে গান আর তান। বীরভূমের গ্রামে গ্রামে মাধুকরী থেকে অবতীর্ণ হয়েছিলেন পূর্ণ একেবারে কলকাতার আলোকোজ্জ্বল আসরে— আগ্রহী মিডিয়ায়। নবনীদাস ফিরে গিয়েছিলেন স্বস্থানে— পূর্ণদাসকে আর ফিরতে হয়নি। ভাগ্য তাঁকে খ্যাতি বিত্ত প্রাসাদ দিয়েছে— তাঁর কণ্ঠের অক্ষম অনুকারক এখনও সারা বাংলায় ছড়ানো। তিনি এখন সংগত কারণেই 'বাউল সম্রাট'। একজন লিখিত প্রশ্ন তুলেছেন : 'সম্রাট শব্দটা তো সামন্ততান্ত্রিক। বাউলের নামের আগে এই শব্দটা বসে কি করে? অন্যরা এই উপাধি তাকে দিতে পারে। তারা অজ্ঞ। কিন্তু তিনি প্রতিবাদ করেছেন বলেও আমাদের জানা নেই!' পূর্ণদাসের একটি ভিজিটিং কার্ডে লেখা আছে : Baul Samrat, Baul Kirtan Ratnakar, Baul Sagar (Benaras), Baul Mani of International fame, Lok Ragasree (Allahabad) মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

পূর্ণদাস আর লক্ষ্মণদাস সহোদর ভাই কিন্তু চেহারায় একেবারে মিল নেই, স্বাস্থ্যও আলাদা রকমের। গানের গলা আর জীবনযাপনও বেশ অন্যরকম বোঝা যায়। বিদেশিনীকে বাহুলগ্ন করে বেসামাল লক্ষ্মণদাসের গল্প অনেকে করে থাকেন। যাই হোক সেদিন কেন্দুয়ায় শেষ বিকালে লক্ষ্মণদাসকে পাওয়া গিয়েছিল আত্মস্থ অবস্থায়। নিতান্ত ভদ্র ও বিনয়ী মানুষ। তবে চেহারায় এক ধরনের ম্লানতা আর ক্লান্তির ছাপ। এ জাতীয় নানাদেশ ঘোরা পোড়খাওয়া প্রফেশনাল বাউলের সঙ্গে গভীর আলোচনা চলে না। এদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা আর কীইবা থাকতে পারে? সাধনভজনের জীবন তো নয়। পূর্ণ বা লক্ষ্মণ নিজেরাই কবুল করেন : 'আমার বাবার মধ্যে যেটা ছিল সেটা আমরা পাই নাই। তিনি ছিলেন বড় সাধক, ভাবুক মানুষ।'

AMARBOI.COM

সেটা জানেন বলে লক্ষ্মণদাসের মধ্যে চালাকি কম। ধীরে সুস্থে কথা চলছিল— নির্দিষ্ট কোনও লাইন ধরে বা তত্ত্বকথা নিয়ে নয়। গানের কথা, নবনীদাসের কথা... এখনকার বাউলদের পেশাদারি মনোভাবের কথা। আস্তে আস্তে কথা ঝিমিয়ে পড়ছিল। চা-বিস্কুট দিলেন ওঁর স্ত্রী, সাধারণ গ্রাম্য নারী। সন্তানরাও কাছাকাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবারে সন্ধ্যা নেমে এল। বাড়ির অন্দর থেকে বেজে উঠল সাঁঝবেলার শাঁখ। একটু চমকে গেলাম। বাউলের বাড়িতে শাঁখ? শঙ্খ ঘণ্টা প্রদীপ আরতি দেবারাধনা কখনও দেখিনি বাউলের বাড়ি। তাঁদের বিশ্বাসে ও আচরণে তো ওই বস্তুগুলি নেই। তবে?

লক্ষ্মণদাস কিছুটা কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বিনয় করে বললেন, 'আপনারা বসুন— আমি একটু ভেতরে যাব, আধঘণ্টার মতো। সায়ংসন্ধ্যায় আমাদের ক্রিয়াকরণ থাকে তো।'

—আমরাও যেতে পারি তো?

—বিলক্ষণ। ভেতরে আসুন। ক্রিয়াকরণ দেখবেন?

সত্যি সত্যি কৌতূহল ছিল— বাউলের সান্ধ্য ক্রিয়াকরণ দেখার এমন সুযোগ হঠাৎ জুটে গেল। গেলাম বাউলের পিছু পিছু। ভেতরের ঘরের মধ্যে একটা উঁচু বেদিতে রাধাকৃষ্ণ মূর্তি। আমাকে সম্পূর্ণ বিস্মিত করে গমগম করে বেজে উঠল শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর এবং এমনকী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন বাজাতে লাগল শ্রীখোল। ধূপ ধুনো জ্বলছে। একেবারে সাত্ত্বিক পরিবেশ। বাড়ির স্ত্রী-পুরুষ সকলেই কৃতাঞ্জলি করে আছেন। হরিধ্বনি হরিকীর্তনে সকলে সমস্বর। এ তো একেবারে বহুবার দেখা বৈষ্ণবীয় সন্ধ্যারতি। নবনীদাসের বংশ তবে কি বাউল নয়? জাতিবৈষ্ণব?

আরতির আসরে আমার মন চলে গেল কাটোয়া-পাটুলি-অগ্রদ্বীপ-দাঁইহাট-মাটিয়ারি আরও কত গ্রামে বৈষ্ণবদের, সহজিয়া আর জাতবৈষ্ণবদের আচার আচরণের স্মৃতির সরণি বেয়ে। মনে পড়ে গেল ক্ষিতিমোহন সেনের মন্তব্য কেঁদুলির মেলা সম্পর্কে ... বাউল সম্পর্কে— 'আধা বৈষ্ণব আধা বাউল'। এঁরা কি তাই? এবারে বিদ্যুচ্চমকের মতো মনে পড়ে গেল শান্তিদেব ঘোষের একটি গভীর মন্তব্য। বহুদিন ধরে বহুজনকেই জিজ্ঞেস করেছি, রবীন্দ্রনাথ কেন বাউলদের সম্পর্কে উৎসাহ হারিয়েছিলেন? কেন তিনি কখনও যাননি বোলপুরের অত কাছে জয়দেব-কেঁদুলিতে? বীরভূমের বিখ্যাত বাউলদের সম্পর্কে কেন এক পঙ্‌ক্তিও ব্যয় করেননি? কারুর কাছে সদুত্তর পাইনি। শুধু শান্তিদেব ঘোষ বলেছিলেন, 'বাউল গান বাউল নাচ সবই খুব ভালোবাসতেন গুরুদেব। কিন্তু বীরভূমের বাউল সম্পর্কে ওঁর উৎসাহ ছিল না কেন জানেন? ওরা বাউল নয় ঠিক, বরং সহজিয়া বৈষ্ণব। বাড়িতে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ আছে। গুরুদেব বিগ্রহপুজোর বিরোধী ছিলেন। তাই যাননি।'

আরতির শেষে বাইরের বারান্দায় আবার এসে বসলাম সকলে। বিজলিবাতি জ্বলে উঠল। কিন্তু ততক্ষণে আমার মনের সুর কেটে গেছে। লক্ষ্মণদাসের পক্ষে সেটা বোঝা কঠিন। তিনি সহাস্যে বললেন, 'দেখলেন তো আমাদের সন্ধ্যারতি, কেমন লাগল? আর কিছু জিজ্ঞাসা আছে আপনার?'

বললাম, 'ভালই তো। না, আর কিছু জানবার নেই বিশেষ। কেবল একটাই প্রশ্ন আছে, আপনাদের গোত্র কী?'

—আমরা অচ্যুতানন্দ গোত্রের।

আমার প্রশ্ন শেষ, উত্তরও একেবারে যথাযথ, মানে যেমন ভেবেছিলাম। অচ্যুতানন্দ গোত্রই তো ভেবেছিলাম। বাংলার সব সহজিয়া আর জাতিবৈষ্ণবের একই গোত্র— অচ্যুতানন্দ। কিন্তু বাউলের তো কোনও জাত নেই, গোত্র নেই, তবে এরা কী? বাউল না বৈষ্ণব? নাকি আধা বাউল আধা বৈষ্ণব? এর উত্তর প্রকৃতপক্ষে পাওয়া খুব সহজ নয়। তবে বাউল আর বৈষ্ণব সম্ভবত দুটি আলাদা পথ। যেমন লিখেছেন দুদ্দু শাহ:

বাউল বৈষ্ণব ধর্ম এক নহে তো ভাই
বাউল ধর্মের সাথে বৈষ্ণবের যোগ নাই।
বিশেষ সম্প্রদায় বৈষ্ণব
পঞ্চতত্ত্বে করে জপতপ
তুলসী মালা অনুষ্ঠান সদাই।
বাউল মানুষ ভজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেখানে নিত্য বিরাজে
বস্তুর অমৃতে মজে
নারী সঙ্গী তাই।

লালন-শিষ্য দুদ্দু শাহ-র text অতীব প্রাঞ্জল ও নির্দেশক। বাউলদের সঙ্গে বৈষ্ণবদের কোনও সম্পর্ক নেই এই বিশ্বাস খাঁটি বাউলদের— কেননা তারা নারীপুরুষে যুগল দেহসাধনা করে গুরু বা মুর্শিদের দেখানো পদ্ধতিতে। তাদের লক্ষ্য বীর্যের স্থায়িত্ব সাধন এবং উর্ধ্বরেতা হয়ে কাম থেকে প্রেমে উত্তরণের আনন্দে আবিষ্ট থাকা। মানবদেহের অন্তর্গত বীর্য ও রজ নিয়ে তাদের সাধনা, সেটা কোনও অলীক অনুমানের নয়, দেবদেবতানির্ভর নয়, নরনারীর বাস্তব শরীরনির্ভর— তাই তাদের এক অর্থে বলা যায় বস্তুবাদী ('বস্তু' মানে পিতৃবস্তু ও মাতৃবস্তু) এবং মানববাদী। তাই 'সবার উপরে মানুষ সত্য'। তারা এতদূর বলে,

যে বস্তু জীবনে কারণ
তাই বাউল করে সাধন।

অর্থাৎ তাদের সাধনা রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ পূজা নয়, নিজের শরীরের অন্তঃস্থিত পদার্থকে সংরক্ষণ। সেই বিশ্বাস এত প্রবল যে গয়া কাশী বৃন্দাবন নবদ্বীপ সবই তাদের কাছে অসার। তারা মনে করে :

জীবনই তীর্থ ধর্ম পথ
এই কথা বাউলের মত।

তীর্থ বলতে বাউলরা কোনও স্থানবিশেষকে বোঝে না। এই শরীরেই আছে মক্কা মদিনা, এখানেই মথুরা বৃন্দাবন— তবে আর কেন তীর্থে যাওয়া? স্পষ্ট করে বরং এইরকম ভাবা সহজ যে,

শুক্র ধাতু ভবেৎ পিতা
রজ ধাতু ভবেৎ মাতা
শূন্য ধাতু ভবেৎ প্রাণঃ

তার মানে রজবীর্যে গঠিত মানবদেহ, অনুমানের বিষয় নয়— একেবারে বাস্তব। আর প্রাণ? প্রাণ আসে শূন্য থেকে। তা হলে এই মানুষেই আছে সেই মানুষ— পিতার মধ্যেই পুত্র। বাউলতত্ত্বের এটাই মূল বিশ্বাস। সেইজন্যেই পিতৃবস্তু বা বীর্যকে অযথা ক্ষয় করা উচিত নয়— তাকে সংরক্ষণ করে অটল করতে হবে। সেই অটলই হল অধরমানুষ বা আলেক সাঁই। তার আরেক নাম 'মনের মানুষ'। বাউল আর্তি করে বলছে: 'আমি কোথায় পাবো তারে?' তারে অর্থাৎ মনের মানুষ যে, তাকে। সে তো একমাত্র নরনারীর দেহযোগে পাওয়া যায়— সঠিক সাধনপথে, সেই পথ দেখিয়ে দেন গুরু বা মুর্শিদ। সে কারণেই নিতে হবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দীক্ষা, তারপরে শিক্ষা। যে শিক্ষায় কামকে এড়িয়ে নয়, পেরিয়ে, পেতে হবে প্রেমানন্দ। 'কামে থেকে হও নিষ্কামী' তাদের প্রতি নির্দেশ। অপক্ক দেহকে কর পক্ক। তার জন্যেই ভজন সাধন। সে সাধন মানে মন্ত্র জপ ধ্যান নয়। শরীরী সাধন। তারা প্রশ্ন তুলেছে—

ব্রজে ভজিল গোপী সাক্ষাৎ ভজনে
আমরা কেন ভজি অনুমানে?
অনুমানে করে ভজন যত সব অজ্ঞানে।

অতএব অনুমানের ভ্রান্ত পথ নয়, ধরো বর্তমানের দিশা। সেই দিশা পেলে বোঝা যাবে কোনও পুরাণপ্রসিদ্ধ দেবতা উপাস্য নয়, তবে তার স্বরূপ কি?

আমি নই অযোধ্যারই রাম
নই বৃন্দাবনের শ্যাম
সহজ থেকে বলছে ডেকে
সহজ আমার নাম।

বাউল মত হচ্ছে সহজকে অর্জন করবার কঠিন পথ। সেখানে বৈষ্ণবদের মতো তুলসী মালা, মালসাভোগের অনুষ্ঠান, তুলসী পাতা, গঙ্গাজল, পঞ্চতত্ত্ব— কিছুই লাগে না। শুধু লাগে সিদ্ধ দেহ ও মুক্ত মন। উপবাস, মন্ত্রজপ বা দেবতার বিগ্রহ লাগে না। শুদ্ধ প্রেমকে পেতে গেলে কামনাকে অঙ্গীকার করতে হয়। লালন যেমন বলেন,

শুদ্ধ প্রেম সাধলে যদি কাম-রতিকে রাখলে কোথা?
আগে উদয় কামের রতি
রস-আগমন তারি সাথী
সেই রসে হয়ে স্থিতি
খেলছে মানুষ দেখগে তোরা।

দেহকে নিয়ে দেহোত্তীর্ণ হওয়া, যাকে কেউ কেউ বলে 'জ্যান্তে মরা', বাউলের পরম অন্বিষ্ট।

তাই বলে এমন ভাবাও ঠিক নয় যে বাউল আর বৈষ্ণবে মুখ দেখাদেখি নেই বা সর্বদা লেগে আছে বিবাদ বিসংবাদ। আসলে লোকধর্মের মধ্যে সবসময়ে চলে পারস্পরিক দেওয়া নেওয়া— সমালোচনা আবার স্বীকরণ। একটু আগে যে 'বাউল আর বৈষ্ণব এক নহে তো ভাই' পদটি আমরা দেখলাম সেখানে বৈষ্ণব বলতে নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবদের বোঝানো হয়েছে। সেই নৈষ্ঠিক ধর্ম ভেঙে আরও কত রকম লৌকিক বৈষ্ণবমত গড়ে উঠেছে তার হিসেব রাখা কি সহজ? তবে লোকায়ত বৈষ্ণবদের প্রধান দুই ধারা— সহজিয়া বৈষ্ণব আর জাত-বৈষ্ণব। এর বাইরে আছে রাধাশ্যামী, রূপকবিরাজী, চরণদাসী, হরিবোলা, গুরুদাসী, খণ্ডিত বৈষ্ণব, করণ বৈষ্ণব, বৈষ্ণব তপস্বী, কিশোরীভজনী, টহলিয়া বা নমো বৈষ্ণব ও চামার বৈষ্ণব। এরা সব গৌণ ধর্মী এবং নিম্নবর্গের মানুষ নিয়ে সংগঠিত। বাইরে থেকে তফাত বোঝার উপায় নেই— কেবল ক্রিয়াকরণে পৃথক এরা। বাউল দুদ্দু শাহ-র ধারণা—

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নদের গোরা চৈতন্য যারে কয়
সে শাক্ত ভারতীর কাছে শক্তি মন্ত্র লয়।

এ হল একটা লোকায়ত বিশ্বাস যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাক্ত কেশবভারতীর কাছে কিছুটা শক্তি সাধনায় দিশা নিয়েছিলেন। তার মানে মূল বৈষ্ণব ধর্ম অবিমিশ্র নয়, তাতে অন্য ভাবনা ও ক্রিয়াকরণের মিশেল ঘটেছে। পদে এবারে বলা হয়েছে :

পরে গিয়ে রামানন্দের কাছে
বাউল ধর্মের নিশানা খোঁজে—
তবে তো মানুষ ভজে
পরমতত্ত্ব পায়।

কেশবভারতীর কাছে শাক্ত দীক্ষাতেই শেষ নয়, মহাপ্রভু তারপর রায় রামানন্দের কাছে নিলেন বাউল মতের খোঁজ এবং সেই সুবাদে পেলেন মানুষভজনের নতুন পথ— যা হল পরমতত্ত্ব অর্থাৎ নরনারীর যুগল-ভজন। মহাপ্রভুর আগে চণ্ডীদাস (তিনিও নাকি বাউল) বলেছিলেন 'সবার উপরে মানুষ সত্য'। সেই ইঙ্গিত দিয়ে দুদ্দু শাহ এবারে বলছেন:

বাউল এক চণ্ডীদাসে
মানুষের কথা প্রকাশে
সেই তত্ত্ব অবশেষে বৈষ্ণবেরা নেয়।

তার মানে বৈষ্ণব ধর্মের অনেক আগে ছিল বাউলতত্ত্ব, সেই চণ্ডীদাসের পদে। সেই আদিবাউল চণ্ডীদাস যে মানুষতত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন সেই তত্ত্ব শেষ পর্যন্ত নেয় একদল বৈষ্ণব। আর যেসব বৈষ্ণব নেয়নি সেই মানুষতত্ত্ব, তারা হল মর্কট বৈরাগী।

মর্কট বৈরাগী যারা
এক অক্ষরও পায় না তারা
গীতা ভাগবত শাস্ত্র পড়া পণ্ডিত সবায়।

এই মর্কট বৈরাগীরা মানুষতত্ত্ব তথা বাউলতত্ত্ব না নিয়ে গীতা ভাগবত আর শাস্ত্র পড়া নীরস পণ্ডিত বনে গেছে। আর একদল আচরণবাদী বৈষ্ণব, তারা কেমন?

তিলক মালা কৌপীন আঁটার দল
জানে শুধু মালসাভোগের ছল
দিনরাত কিছু না বুঝে
মালা জপে যায়।

বৈষ্ণবদের সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিকোণ অর্জন করতে গেলে আমাদের একটু ইতিহাস ঘাঁটতে হবে। বেশির ভাগ লোকের ধারণা, শ্রীচৈতন্যদেব গৌড়বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম প্রতিষ্ঠা ও প্রচার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেন। কথাটা অর্ধসত্য, কারণ নবদ্বীপ তথা গৌড়বঙ্গে তিনি তো বৈষ্ণব আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারেননি, চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন নীলাচলে। নবদ্বীপে মাত্র তেরো মাস মতো সময় তিনি আন্দোলন সংগঠন করেছিলেন, তারপরই সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করেন। শিষ্য পরিকরগণ তখনও দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা অর্জন করেননি। অদ্বৈতাচার্য বৃদ্ধ বলে নেতৃত্ব দেবার পক্ষে অযোগ্য ছিলেন। তাঁর শিষ্য ঈশান আর দুই শিষ্য কৃষ্ণদাস ও শ্যামাদাস, অদ্বৈত-র পত্নী সীতাদেবী আর তাঁর সন্তান অচ্যুতানন্দ বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করতে লাগলেন নিজের মতো করে। কোনও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বা নির্দেশ ছিল না। এই সময় থেকেই বাংলার বৈষ্ণবধর্মে নানা খণ্ডিত মত ও উপদলের সৃষ্টি হতে থাকে প্রধানত আচরণবিধির পার্থক্য থেকে। নানা জায়গায় বৈষ্ণবকেন্দ্র গড়ে উঠল। তার একটা শান্তিপুরে, একটা বাঘনাপাড়ায়, একটা খড়দহে, একটা নবদ্বীপে। এঁদের কেউ ব্রাহ্মণ্যবিরোধী, কেউ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আপোষকামী, কেউ শূদ্রদের বৈষ্ণবভুক্তির ব্যাপারে তৎপর। এঁদের এক একটা আলাদা তত্ত্ব ও বিশ্বাস ছিল। কেউ সরাসরি চৈতন্যপূজক, কেউ গৌরনাগরবাদের প্রচারক, কেউ গদাইগৌরাঙ্গ তত্ত্বে বিশ্বাসী, কেউ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার উপাসক, কেউ রসরাজ সম্প্রদায় বলে নিজেদের পরিচয় দিত। অত অনুপুঙ্খে আমাদের যাবার দরকার নেই। আমরা কেবল বাউল উৎসে বা বিবর্তনে বৈষ্ণবদের সংযোগ খোঁজার চেষ্টা করব।

স্পষ্টত বৈষ্ণবদের নানা দল উপদল থাকলেও নিত্যানন্দ আর তাঁর পুত্র বীরভদ্র প্রধানত কাজ করেছিলেন অন্ত্যজ ও ব্রাত্যদের বৈষ্ণব সমাজে অন্তর্ভুক্ত করতে। তাঁদের ডাকে ব্যাপক সাড়া পড়েছিল। গৌড়বঙ্গে যে বিপুল পরিমাণ আত্মগোপনকারী নিম্নবর্গের বৌদ্ধ ছিল, যাদের বলা হত নেড়ানেড়ি, তাঁদের নিত্যানন্দ বা মতান্তরে বীরভদ্র ধর্মান্তরিত করেন। বৈষ্ণব মতে দীক্ষা নেবার সময় তাঁরা কেশমুণ্ডন করেছিলেন বলে তাঁদের নেড়ানেড়ি বলত সবাই। কথাটা পরে হীনার্থবাচক হয়ে পড়ে এবং নেড়ানেড়িদের বৈষ্ণবরা ততটা সম্মান করেনি বলে তাদের অনেকে বাউল পথে চলে যায়, অনেকে হয় ফকির। এই ফকিরদের 'নাড়ার ফকির' বলা হত বলে অনেকে বিশ্বাস করেন।

এদিকে চৈতন্যদেবের বাংলা ত্যাগের পর এবং পরে তাঁর অপ্রকটকালে বৃন্দাবনে গড়ে উঠছিল একটি বৈষ্ণবকেন্দ্র— তার সংগঠনে ছিলেন ছ'জন নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব, তাঁদের বলা হয় ষড়গোস্বামী। এঁদের নাম রূপ ও সনাতন, তাদের ভাইপো জীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট ও রঘুনাথ দাস। এঁদের মধ্যে রঘুনাথ দাস বাদে বাকি পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও সংস্কৃত পণ্ডিত এবং পাঁচজনেই মূলে দক্ষিণ ভারতীয়। পাঁচজনের মধ্যে রূপ ও সনাতন ছিলেন গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের মন্ত্রী— উচ্চবর্গের আমলা। এঁরা দুজন এবং ভাইপো জীব গোস্বামী গৌড় থেকে বৃন্দাবন চলে গিয়ে কোনওদিন আর ফেরেননি। গোপাল ও রঘুনাথ ভট্ট কোনওদিন গৌড়বঙ্গের মুখই দেখেননি। অথচ চৈতন্য-তিরোধানের পর এঁদের ওপর বৃন্দাবনকেন্দ্রিক বৈষ্ণব আন্দোলনের নেতৃত্ব এসে পড়ে। বাংলার জনমানস ও সংস্কৃতির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হল বৃন্দাবনী তথা উচ্চ ব্রাহ্মণ্য ভাবাদর্শ। গোপাল ভট্ট ব্রাহ্মণ্য ভাবাদর্শে লিখলেন বৈষ্ণবদের আচরণীয় স্মৃতিশাস্ত্র— যার নাম 'হরিভক্তিবিলাস'।

বৃন্দাবনের বৈষ্ণবীয় অনুশাসন গৌড় বাংলার মূল বৈষ্ণব আদর্শের মুখকে একেবারে অন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিকে ঘুরিয়ে দিল। আচণ্ডালকে উদার ধর্মপরিবেশে ও মানবস্বীকৃতিতে আহ্বান করতে চেয়েছিলেন চৈতন্যদেব, ভাঙতে চেয়েছিলেন শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য, করেছিলেন জাতিবর্ণ নির্বিশেষে পতিতদের উদ্ধার। 'হরিভক্তিবিলাস' সেই বৈষ্ণবীয়তাকে করে দিল শুদ্ধতাবাদী, ব্রাহ্মণ্যমুখী ও বর্ণাশ্রমী। তাঁদের নির্দেশ ছিল : ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব সবাইকে দীক্ষা দেবে, অব্রাহ্মণের থাকবে না দীক্ষাদানের অধিকার। অনুলোম প্রথা চলবে অর্থাৎ সামাজিক স্থিতাবস্থা— যে যেখানে ছিল সে সেখানেই থাকবে।

অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-শ্রীবাস-গদাধর জাতীয় প্রত্যক্ষ চৈতন্য সঙ্গকারীরা কেউই বৃন্দাবনের সঙ্গে সংস্রব রাখতেন না। কিন্তু তাঁদের পরের প্রজন্মের অনেকে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের কাছে নীতি-নির্দেশ নিতে থাকলেন এবং বৃন্দাবন হয়ে উঠল প্রধান বৈষ্ণবীয় কেন্দ্র। বৃন্দাবনে যেতেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন— নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবাদেবী, শ্রীনিবাস আচার্য, শ্যামানন্দ, নরোত্তম দত্ত, উদ্ধারণ দত্ত, রামচন্দ্র, গৌরীদাস পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস, গোবিন্দদাস কবিরাজ, রামচন্দ্র কবিরাজ। তবু এটা বুঝতে খুব অসুবিধে নেই যে, কেন্দ্রীয় নির্দেশ সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে না। সপ্তদশ শতকে বাংলার বৈষ্ণবরা নানাভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। সেই ভাগ হবার কারণ দুটি। এক, উপাসনা এখানে কেউ করতেন সখাভাবে, কেউ দাস্যভাবে, কেউ রাধাভাবে— 'হরিভক্তিবিলাস' নির্দেশ দিল একমাত্র সখীর সখী মঞ্জরিভাবে উপাসনার— সেটি সকলের মনঃপূত হয়নি। দুই, যে-কোনও জাতিবর্ণের বৈষ্ণব ছিলেন দীক্ষাদানের অধিকারী, সে অধিকার খর্ব হল— তাও মনঃপূত হবার কথা নয়। এইখানে অর্থনৈতিক প্রশ্ন ছিল— যার সঙ্গে জড়িত গুরুবাদ। কথাটি বুঝিয়ে বলেছেন, 'জাতবৈষ্ণব কথা' বইয়ে অজিত দাস, এইভাবে :

অর্থনৈতিক কারণে দল-উপদল তৈরির প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল বিশেষভাবে। বৈষ্ণব-আন্দোলন হোম-যজ্ঞ-পুজো-পুরোহিত প্রথা বাতিল করেছিল। কিন্তু তার স্থলে প্রবর্তিত হল গুরুবাদ। গুরু ছাড়া দীক্ষা নেই, মুক্তি নেই। ঘরে বসে হাতে তালি দিয়ে নামগান করলেই মুক্তি মিলবে না আর। পথপ্রদর্শক গুরু চাই। গুরু ঈশ্বরতুল্য। পুরোহিতের দক্ষিণা দেওয়ার মতো গুরুকে প্রণামী দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। নইলে গুরুই বা জীবনধারণ করবেন কীভাবে? শিষ্যের বাড়িতে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের অনুষ্ঠানের সময় গুরুবরণ গুরুপ্রণামী বাঁধা। শিষ্যের সামর্থ্যানুযায়ী গুরুপ্রণামী। সেটা পাঁচ সিকা থেকে একটি জমিদারি অবধি হতে পারে প্রাপ্তি।

তাহলে যিনি যত শিষ্য করতে পারবেন, তাঁর তত আর্থিক নিশ্চয়তা বাড়বে, সাংসারিক দুর্ভাবনা কমবে। প্রধান গুরুর অধীনে সহকারী গুরুর হিসাবে কাজ করলে মূল গুরুকে প্রণামীর সিংহভাগ দিতে হয়। স্বাধীন স্বতন্ত্রভাবে গুরুগিরি করতে পারলে আর কাউকে ভাগ দিতে হয় না। তাই দল ভেঙে উপদল। এক থেকে বহু।

বোঝা গেল গুরুবাদ ও অর্থনীতি বৈষ্ণবদের বিভাজনে একটা বড় সূত্র তবে নিশ্চয়ই প্রধান নয়। অবশ্য সপ্তদশ শতকে নানা মতে বিভক্ত, নানা গৌণ সম্প্রদায়ী আচরণে বিশ্বাসী বহুতর বৈষ্ণব রাজশাহীর খেতুরিতে সমবেত হয়ে যে-মহোৎসব করে সেখানে ব্রাহ্মণেতরদের দ্বারা দীক্ষাদানের তথা গুরুগিরির প্রশ্ন ওঠে এবং খানিকটা মীমাংসাও হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরে কেউ কেউ স্বাধীনভাবে সম্প্রদায় ও তার আচরণবিধি গড়ে তোলে। সে সময়ে বৃহৎ ছিল গৌড়বঙ্গ, সারাদেশে ভৌগোলিক যোগাযোগ ছিল দুর্বল। আখড়াধারী বাবাজি সম্প্রদায় আর গৃহী বৈষ্ণবদের মধ্যে ধর্মাচারের নানা ধরন গড়ে উঠতে থাকল। কত যে উপসম্প্রদায় (নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবদের ভাষায় 'অপসম্প্রদায়', 'পাষণ্ড') ও সহজিয়া স্রোত বইতে লাগল সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের নানা সময়ে তার হদিশ এখন পাওয়া কঠিন। দক্ষিণী ব্রাহ্মণ তোতারাম ছিলেন বিষ্ণু উপাসক, অষ্টাদশ শতকে থাকতেন নবদ্বীপে। বৈষ্ণবদের শাখাপ্রশাখার শ্রীবৃদ্ধি দেখে ব্যথিত হয়ে তোতারাম বলেছিলেন :

আউল বাউল কর্তাভজা নেড়া দরবেশ সাঁই।
সহজিয়া সখীভাবুকী স্মার্ত জাত গোঁসাই ॥
অতিবড়ী চূড়াধারী গৌরাঙ্গনাগরী।
তোতা কহে এই তেরোর সঙ্গ না করি ॥

তেরোটি গৌণসম্প্রদায়ের মধ্যে আউল-বাউল-দরবেশ-সাঁই এমন কায়াবাদী সাধনার পাশে সহজিয়া আর জাত-বৈষ্ণবদের (যা বৈষ্ণবতার উপজাত) প্রতি অনাস্থা লক্ষণীয়। পরে এই সব উপসম্প্রদায় ক্রমে সংখ্যায় ও আচরণবাদের বৈচিত্র্যে বেড়ে গেছে। নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবদের ধিক্কার তাদের প্রতিহত করতে পারেনি। তোতারাম আবারও খেদোক্তি করেছেন:

পূর্বকালে তেরো ছিল অপসম্প্রদায়।
তিন তেরো বাড়ল এবে ধর্ম রাখা দায় ॥

তিন তেরো উনচল্লিশটি অপসম্প্রদায়ের চাপে মূল গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাখা বিপন্ন হয়েছিল এতে সন্দেহ নেই। 'বৈষ্ণব ব্রতদিন নির্ণয়' বইতে আরও অনেক গৌণধর্মীদের তালিকা আছে।

আমরা সেই বিস্তারে না গিয়েও মূল সত্যে পৌঁছতে পারি। সেটা এই যে, ব্রাহ্মণ্যলক্ষ্য মৌল বৈষ্ণবদের ধিক্কার ও সক্রিয় বাধা সত্ত্বেও বাংলার সমাজবিন্যাসে গৌণধর্মবিশ্বাসের ও করণকারণের রবরবা দেখা দিল। গুরু-শিষ্য, পির-মুর্শিদ, বাবাজি, আখড়াধারী, গৃহী— নানাস্তরে নানাভাবে চুইয়ে পড়তে লাগল চৈতন্যের সাম্যমন্ত্র। সমান্তরাল কাঠামোয় গড়ে উঠল গুরুবাদ ও ধনসম্পদ। সেই শক্তি থেকে স্বতন্ত্র শাস্ত্র, বিশ্বাস ও মন্ত্রতন্ত্র গড়ে উঠল। জেগে উঠল গান— দেহতত্ত্বের ও মনঃশিক্ষার, গুরুবন্দনা ও দৈন্যবোধের। পতিতা, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তাদের আশ্রয় জুটে গেল আখড়ায়— তাঁরা মান পেলেন। কায়াসাধনের সূত্রে বিকৃতি ও যৌন-স্বাধীনতার পথও কিছুটা অবারিত হল।

এইখানে একটা ভুল ধারণার অবসান ঘটানো দরকার। জাত-বৈষ্ণব বা সহজিয়া বৈষ্ণবদের সকলেই যে নিম্নবর্ণজাত বা অন্ত্যজ তা নয়। হয়তো তারা একটা গরিষ্ঠ অংশ কিন্তু ব্রাহ্মণ কায়স্থ নবশাখ বেনে আর মাহিষ্য সম্প্রদায় এদের মধ্যে অনেক ছিল। সহজিয়াদের ছিল নানা ধরনের সাধন-পদ্ধতি (কাটোয়া-স্রোত, পাটুলি-স্রোত, রূপ কবিরাজী ইত্যাদি) ও গুহ্যাচার— কেউ কেউ দুইচাঁদ বা চারচাঁদের করণ করতেন। তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের সঙ্গে বাউলদের কিছু কিছু ব্যাপারে মিল ছিল। জাত-বৈষ্ণবদের একটা অংশ ছিল ভক্তিমান গৃহস্থ আরেক অংশ আখড়াকেন্দ্রিক বাবাজি-সেবাদাসী সম্প্রদায়।

অজিত দাস তাঁর বইতে জাতবৈষ্ণব সমাজের সংখ্যাবৃদ্ধির ব্যাপকতার একটি হিসাব দিয়েছেন। ১৮৭৯ সালে অর্থাৎ উনবিংশ শতকের শেষের দিকে জাত-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সদস্য মেদিনীপুরে ছিল ৯৬,১৭৪ জন, বর্ধমানে ২৬,০০০ এবং হুগলিতে ১২,১০৭ জন। ১৮৮১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট বলছে, সারা বাংলায় জাত-বৈষ্ণব ছিল, ৫,৬৮,০৫২। এই সংখ্যা নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবদের পক্ষে চিন্তা ও উদ্বেগজনক। তাঁদের গোঁড়া দৃষ্টিভঙ্গিতে জাত-বৈষ্ণবরা ধিকৃত হলেন। বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন, জাত-বৈষ্ণবরা সমাজবহির্ভূত। নৈষ্ঠিকরা মনে করতেন ১) ওরা ব্রাহ্মণদের কাছে অস্পৃশ্য। ২) ব্রাহ্মণ্যবাদ নির্দেশিত আচার মানে না। ৩) বিয়ে হয় মালাচন্দনে। ৪) বিবাহের অনুষ্ঠান এত সরল যে বৈধ মনে হয় না। ৫) ওদের মধ্যে বিবাহ ছাড়া সঙ্গম স্বাভাবিক ও বৈধ। ৬) ফলত ওরা জারজ এবং ৭) পরিণামে জাতবৈষ্ণবরা এক ভিক্ষুক সম্প্রদায়। সমাজে অধঃপতিত ও নিন্দাযোগ্য।

রমাকান্ত চক্রবর্তী তাঁর বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন গোঁড়া দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই শুধু নৈষ্ঠিকরা জাত-বৈষ্ণবদের বিরোধিতা করেননি। তাঁর মতে,

> গোঁড়ামির কারণেই জাত বৈষ্ণবদের ওপর খাপ্পা হয়নি ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব সমাজ। নিজেদের গোঁড়ামির জন্য তাঁরা সকলকে শিষ্য করতে না পারায় আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলেন। জনসংখ্যা বাড়ছিল শহরে এবং সাধারণ ব্যবসায়ী আর সাধারণ মানুষের হাতে পয়সা আসছে, তাদের শিষ্য করতে না পারায় গুরু প্রণামীর আয় হচ্ছে না। সেটা বাবাজীরা পেয়ে যাচ্ছে। তাই উচ্চবর্ণের গুরুরা তাঁদের ধনী শিষ্যদের বাবাজীদের হাত থেকে রক্ষা করতে অপপ্রচার করতে বাধ্য হতেন যে বাবাজী আর নিম্নবর্ণের বৈষ্ণবরা অস্পৃশ্য।

সেই কুৎসা ও অনুশাসনে যখন কাজ হল না, তখন বিধান জারি করলেন,

> ব্রাহ্মণগুরু দিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে দীক্ষা নিতে হবে। অথবা উচ্চবর্ণের (অব্রাহ্মণ) ভেকধারী গৌড়ীয় বৈষ্ণব দিয়ে দীক্ষা নিতে হবে। অথবা উচ্চবর্ণের গৌড়ীয় বৈষ্ণব গৃহীগুরু হলেও হবে। জাতবৈষ্ণবরা নিম্নবর্ণ বা অস্পৃশ্য সমাজ থেকে আগত। ওরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব নয়।

জাত-বৈষ্ণব গুরু আর সহজিয়া স্রোতের গুরুরা এ নির্দেশ মানবেন কেন? কাজেই অচিরে বাংলাব্যাপী গ্রাম্য জনসমাজ দলে দলে দীক্ষিত হতে থাকল গৌণধর্মে। তার মধ্যে একটা হল বাউলপন্থা, যাদের মধ্যে সহজ বৈষ্ণবপন্থা অলক্ষ নয়।

একটা চালু কথা গৌণ সম্প্রদায়ীদের সঙ্গে মিশলে জানা যায়, সেটা হল, এ-জাতীয় গুহ্য সাধনার চারটি স্তর : প্রবর্ত-সাধক-সিদ্ধ-সিদ্ধের সিদ্ধ। শিষ্য যখন গুরুর কাছে লোকায়ত সাধনার মানসে দীক্ষা নিতে আসে তখন বেশ কিছুকাল, ধরা যাক বছর খানিক, গুরু তাকে বলেন আখড়ায় আসাযাওয়া করতে, বাহ্য ক্রিয়াকরণের ব্যাপার-স্যাপার দেখতে, অন্যান্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুরুভাইদের বাড়ি যেতে এবং সম্প্রদায়ের মেলা মহোৎসব, গুরুর জন্মদিন বা দিবসী উৎসবে যোগ দিতে। এ প্রসঙ্গে শিষ্যর নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও আগ্রহ গুরু লক্ষ করেন। শিষ্যর স্বভাবনম্রতা, সেবাপরায়ণতা বা অনুরাগ নানা ঘটনায় প্রমাণিত হলে গুরু পরিতুষ্ট হন এবং তখন তিনি শিষ্যকে মন্ত্রদীক্ষা দেন আনুষ্ঠানিকভাবে। সেই সঙ্গে একটি নির্দেশ থাকে, এ-সাধনায় লজ্জা ঘৃণা ভয় তিনটিই ত্যাগ করতে হবে। কথাটার তাৎপর্য অনেকটাই গভীর, অর্থাৎ এতদিনকার যাপিত জীবন ও সমাজবোধের বিপরীত মার্গে এবার যেতে হবে শিষ্যকে। তার জন্য মানস-প্রস্তুতি চাই। বিদ্যমান সমাজের মূল্যবোধ থেকে বাউল জীবনের মূল্যবোধ, আচরণ, খাদ্যাভ্যাস ও সমাজ হবে স্বভাবত স্বতন্ত্র। তার ভবিষ্যৎ জীবন যতটা নিন্দিত হবে ততটা নন্দিত হবে না। সে হয়তো নিঃসঙ্গ হবে না কিন্তু তার এক বিচিত্র সমাজের অভিজ্ঞতা হবে, যে-সমাজ সংগুপ্ত ও আবদ্ধ, গুরুকেন্দ্রিক এবং অন্তর্মুখী।

প্রবর্ত অবস্থাতেই অনেকের সাধনজীবন কেটে যায়, তার বেশি এগোতে পারে না। এই অগ্রগতি আড়াআড়ি নয়, খাড়াখাড়ি অর্থাৎ উর্ধ্বগ। মনকে অচঞ্চল, সংহত ও উর্ধ্বগামী করতে পারে যদি শিষ্য, তখন গুরু তাকে উপযুক্ত মনে করলে সাধনপথে শিক্ষা দেন। মন্ত্রদীক্ষার পরে হয় রূপের দীক্ষা, যাতে সাধিকা দরকার। কারণ বাউল সাধনা দেহনির্ভর, কাম থেকে প্রেমে উত্তরণের লক্ষ্যভেদী, শ্বাসনিয়ন্ত্রণের যৌন-যৌগিক ক্রিয়ার সফলতার উপর বিন্যস্ত। দেহসাধনা ও শ্বাসনিয়ন্ত্রণের দ্বারা সাধকের অপক্ব দেহ পক্বতা পায়। এর জন্য পদে পদে লাগে গুরুনির্দেশ, তাঁর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি এবং অভিভাবকত্ব। সাধক সাধারণত তার সাধনসঙ্গিনীর সঙ্গে দেহচর্য্যা করে। কখনও কখনও গুরুই বেছে দেন শিষ্যের সঙ্গিনী। এ-সাধনা ধৈর্য ও সংযমসাপেক্ষ। অনেকে পারে না, তাদের ঘটে 'যোনিতে পতন'। কিন্তু যারা পারে তাদের আনুষ্ঠানিক দীক্ষা দেন গুরু এবং বলে দেন :

AMARBOI.COM

আপন সাধন কথা না কহিও যথাতথা
আপনার আপনিরে তুমি হইও সাবধান।

একেই বাউলরা বলেন 'আপ্ত সাবধান'— নিজের বাকসংযম। অথচ লোকমধ্যে লোকাচারের নির্দেশ থাকে অর্থাৎ সাধারণ মেলামেশায়, সামাজিক ওঠাবসায়, বাউল থাকে প্রচ্ছন্ন হয়ে কিন্তু ওপর ওপর সকলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। বিনয় বচনে ও সদাচারে তার জুড়ি মেলে না। গুরুকে ও গুরুপত্নীকে সে পিতৃমাতৃজ্ঞানে মান্য করে। গুরুভাইদের আপন বলে মানে। গুরুর ভুক্ত অন্ন শ্রদ্ধাসহকারে খায়। নিজের জীবনকে সে সমর্পণ করে গুরুর পাদপদ্মে। তার হয় নবজীবন। পূর্বাশ্রমের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না আর। নামটাও যায় পালটে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও সম্পদ বলে তার কিছু থাকে না। ভিক্ষাবৃত্তি করে, ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে, কৌপীন সম্বল জীবন এবারে অনিকেত হয়ে যায়। গুরুর দেওয়া ইষ্ট মন্ত্র হয় তার অবলম্বন।

এত সব তত্ত্বকথা না আউড়ে একটি বাউল দীক্ষার প্রতিবেদন পেশ করা অনেক বাস্তবসম্মত হবে। এ প্রতিবেদন পাওয়া গেছে সমাজ-নৃতত্ত্ববিদ মানস রায়ের লেখা 'The Bauls of Birbhum' (১৯৯৪) বই থেকে। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত কালপর্বে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে লেখক ঘুরে বেড়িয়েছেন বীরভূমের নানা গ্রামে এবং সন্ধান করেছেন বাউলদের। এঁর বই থেকে পাওয়া প্রত্যক্ষ বিবরণ (দেবীদাস বাউলকথিত) এখানে তুলে ধরছি বাংলা অনুবাদে।

> দেবীদাস বাউল পূর্বাশ্রমে ছিলেন ব্রাহ্মণ সন্তান। বীরভূম জেলার অন্তর্গত সাঁইথিয়ায় থাকতেন তিনি পিতামাতার সঙ্গে। তাঁর পিতামহ ছিলেন বৃত্তিতে পুরোহিত— পিতা ছিলেন জ্যোতিষী ও হোমিওপ্যাথ। আট ভাইবোনের মধ্যে দেবীদাস সর্বকনিষ্ঠ। দিদিদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে, বড়দি মারা গেছেন। চার দাদার মধ্যে একজন সাঁইথিয়ায় স্কুলশিক্ষক, মেজদা রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে আর সেজদা রাজ্য পুলিশে কাজ করেন। কনিষ্ঠ দেবীকুমার চট্টোপাধ্যায় (এখন দেবীদাস বাউল) কাজ করতেন এক কারখানায়। ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে তিনি ছাঁটাই হন। অন্য কাজ চেষ্টা করেও জোটেনি— এসে যায় গভীর হতাশা। তবে তিনি গান গাইতে ও বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারতেন ভাল। বাউলদের গান আর জীবনযাপনের বৈচিত্র্য তাকে টানত। তাই বাউলদের সঙ্গে বিভিন্ন মেলা আর আশ্রমে আখড়ায় ঘুরতে ভাল লাগত। এইভাবে তার দেখা হল রামানন্দ গোঁসাইয়ের সঙ্গে, তাঁর দাসকলগ্রামের আশ্রমে। তাঁর কাছে মন্ত্রদীক্ষা নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন দেবীকুমার, তক্ষুনি ইচ্ছাপূরণ হল না। রামানন্দের আশ্রমে অন্যান্য বাউলদের সঙ্গে মাসখানেক থেকে গেলেন। তারপরে গুরু তাঁকে দীক্ষা দিলেন— মন্ত্রদীক্ষা।

এবারে মন্ত্রদীক্ষার অনুষ্ঠান কেমন হল তা শোনা যাক শিষ্যের জবানিতে :

> মন্ত্রদীক্ষা অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ গুরু রামানন্দ গোঁসাই আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিলেন। অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য তাঁর মন্ত্রশিষ্যদের ও গুরুভাইদের এক তালিকা করেছিলেন। আমাকেও পূর্বাহ্নে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন অনুষ্ঠানের উপকরণ জোগাড় করে রাখতে। সেগুলি হল : চিঁড়া, গুড়, দুধ, দই, ঘি, ছানা, লুচি, মিষ্টি, পাঁচরকম ফল (লালরং বাদে), পাঁচরকম ফুল (লালরং বাদে), তুলসীপাতা, একটি গামছা, একঘড়া গঙ্গাজল ও সাতখানি মেটে মালসা।
>
> তিনদিনেই আমি এসব জোগাড় করে ফেললাম। তারপরে দীক্ষার দিন ভোরে স্নান করে আমি সাদা নতুন কাপড় পরলাম। যে ঘরে দীক্ষানুষ্ঠান হবে তার মেঝে নিকিয়ে নিলাম গোবর দিয়ে। এসব কাজ দীক্ষার্থীরই করার কথা। মূল অনুষ্ঠানে যে মচ্ছবভোগ বিতরণ হবে তার প্রস্তুতিতে অবশ্য আখড়ার কেউ কেউ সাহায্য করলেন আমাকে। আমি মালসাভোগ বানালাম চিঁড়ে, গুড়, দুধ, দই আর ঘি দিয়ে। তা রাখা হল পাঁচটা মাটির পাত্রে মানে মালসায়, সোজা সরলরেখায়। এগুলি উৎসর্গ করা হল গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর ও শ্রীবাস এই পাঁচ মহাপ্রভুর নামে। পবিত্র তুলসীপাতা, সুগন্ধি, পবিত্র গঙ্গাজল, পাঁচরকম ফুল আর ফল রাখা হল সাজিয়ে। ঐ ঘরে কেউই ঢুকতে পারবেন না। কিন্তু বাইরের দাওয়ায় নিমন্ত্রিতরা অনুষ্ঠান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কীর্তন গাইতে লাগলেন। অনুষ্ঠানের সূচনায় গুরুদেব সাতটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> মালসায় একটা করে তুলসী পাতা দিয়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলেন তাতে, তারপর আমার মাথায় আর নিজের মাথায়। তারপরে তুলসী পাতায় চন্দন নিয়ে লাগিয়ে দিলেন আমার মাথায় কপালে, কণ্ঠে, বুকে, উদরে। এবারে প্রথমে গুরুদেব তাঁর নিজের গুরুর উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে স্মরণ করলেন পাঁচ মহাপ্রভুকে আলাদা আলাদা করে, স্বতন্ত্র মন্ত্র উচ্চারণে। তারপরে তিনি মালসাভোগ নিবেদন করলেন প্রথমে আত্মগুরু এবং পরে পঞ্চ প্রভুকে। অবশেষে তিনি আমাকে বীজমন্ত্র দিলেন এবং নামকরণ করলেন 'দেবীদাস'। অনুষ্ঠান শেষ হল আমন্ত্রিত ব্যক্তি ও আশ্রমিকদের মহাপ্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে। এবারে মচ্ছব শুরু হয়ে গেল।

এই অনুষ্ঠানের পর থেকে দেবীকুমার চট্টোপাধ্যায় হয়ে গেলেন দেবীদাস বাউল। গুরুর সম্প্রদায়, পরিবার ও গোত্রের অন্তর্গত হয়ে গেলেন তিনি। তাঁর হল 'মধ্বাচার্য' সম্প্রদায়, 'নিত্যানন্দ' পরিবার ও 'অচ্যুতানন্দ' গোত্র।

আমাদের মনে এবারে খটকা লাগে এই ভেবে যে, দেবীদাস বাউল হলেন না জাত-বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত হলেন? বাউলদের তো গোত্র পরিবার বা সম্প্রদায়গত পরিচয় থাকে না। তারা মুক্ত ও অনিকেত। কোনও গোষ্ঠী বা সমাজভুক্ত নয় তারা। কিন্তু দেবীদাস তো বাঁধা পড়লেন এক সম্প্রদায়ী বন্ধনে। তা ছাড়া তুলসীপাতা, গঙ্গাজল, গোময় ও পঞ্চপ্রভুর অর্চনা— এসব বাউল সাধনায় কেন? তার অর্থ, দেবীদাস বাউলপন্থার মানুষ নন, যেমন নন লক্ষ্মণদাস বা পূর্ণদাস বা নবনীদাস। তাঁরা বাউলগান করেন কিন্তু তাঁদের আচরণ ও গোত্র হল জাত-বৈষ্ণবদের। এবার সাহস করে বলে ফেলা যাক, বীরভূমের বেশির ভাগ বাউল আসলে অচ্যুতানন্দ গোত্রের জাত-বৈষ্ণব। ক্ষিতিমোহন কি এঁদের মতো ব্যক্তিদের দেখে 'আধা বৈষ্ণব আধা বাউল' কথাটি প্রয়োগ করেছিলেন?

কিন্তু দেবীদাসের বৃত্তান্ত এখনও শেষ হয়নি। মন্ত্রদীক্ষার পর তাঁর লাভ করার কথা 'শিক্ষাদীক্ষা'। তার জন্য গুরুর নির্দেশে বেশ কিছু ক্রিয়াকর্তব্য পালন করতে হয়। দেবীদাস বলছেন:

> আমি গুরুর নির্দেশিকা অন্তরের সঙ্গে পালন করতে লাগলাম। যেমন, আশ্রম পরিষ্কার করা, গুরু-গুরুমা ও আশ্রমবাসীদের জন্য ভিক্ষা করা, গুরু আর গুরুমার পরিধেয় বস্ত্র এবং ব্যবহৃত বাসনকোসন পরিষ্কার করা। এর বাইরে আমি প্রতি বৃহস্পতিবার গুরু ও গুরুমাকে পূজার্চনা করতাম। এছাড়া প্রতিদিন সায়ংসন্ধ্যায় গুরুদেবের সামনে বসে শুনতাম তাঁর বাণী, তাঁর বলা দর্শন আর বাউলতত্ত্ব, বাউলের করণকারণ— যা থেকে হওয়া যায় একজন আদর্শ বাউল। শিখতাম বাউলের দেহতত্ত্ব সাধনার প্রসঙ্গ, গুহ্য ও গোপ্য নানা কথা। ঘুরতাম আশ্রম থেকে আশ্রমে, মেলা থেকে মেলায়— যেখানে দেখা মিলত কত রকম বাউল সাধকের। শুনতাম তাঁদের বাণী ও অভিজ্ঞতার কথা। প্রতিদিন অভ্যাস করতাম গুরুদেবের কাছে শেখা প্রাণায়াম। এভাবেই কেটে গেল একটি মাস। এবারে আমার অপেক্ষা শুরু হল শিক্ষাদীক্ষা লাভের জন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানস রায় লিখেছেন, মন্ত্রদীক্ষার একমাস পরেই গুরু রামানন্দ দেবীদাসকে দেন শিক্ষা। এ-পর্যায়ে লাগে নারীসঙ্গী, তাই গুরু তাঁর মেয়ে ললিতাকে বেছে নিলেন দেবীদাসের সাধনসঙ্গিনী হবার জন্য। শিক্ষাদীক্ষার আচার-অনুষ্ঠান প্রায় মন্ত্রদীক্ষার মতোই— প্রভুদের মালসাভোগ নিবেদনের পর দেবীদাস ও ললিতা পরস্পর তুলসীমালা বিনিময় করে আনুষ্ঠানিকভাবে হলেন পতি-পত্নী। এ অনুষ্ঠানের নাম 'কণ্ঠিবদল'। দেবীদাসের কণ্ঠিবদল অনুষ্ঠান হল গুরু রামানন্দের উপস্থিতিতে এবং পাঁচজন বিশিষ্ট সাধকের সান্নিধ্যে। শিক্ষাদীক্ষা অনুষ্ঠানের তিনদিন পরে দেবীদাস আর ললিতাকে ডাকা হল গুরুর কাছে হাতে কলমে যৌন-যৌগিক গুহ্য সাধনা শেখবার জন্য। গুরু তাঁর নিজের সাধনসঙ্গিনীর সহায়তায় নবদম্পতিকে শিখিয়ে দিলেন যৌন সংযমের করণকৌশল, দমের কাজ আর দেহসংযমের কঠিন পথ পরিক্রমার রহস্য।

গুরুর নির্দেশিত পথে কঠিন সাধনায় শিষ্য অর্জন করে 'সাধক' স্তর। কিন্তু তার জন্য তাকে পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হতে হয়। একজন গুরু যত বেশি সাধক তৈরি করতে পারেন তত তাঁর মান্যতা বাড়ে। রামানন্দ গোঁসাই বলেছেন :

> শিষ্য যখন সাধক-স্তরে পৌঁছতে চায় তখন তাকে কঠিন পরীক্ষা দিতে হয় নিজের যোগ্যতা প্রমাণের জন্য। গুরু ও সাধকের সামনে শিষ্যকে প্রমাণ দিতে হয় তার দেহগত সংযম ও আত্মশক্তির। শিষ্যর যেদিন পরীক্ষা হয় সেদিন গুরু ডেকে আনেন তাঁর গুরুভাইদের এবং আঞ্চলিক কয়েকজন বিখ্যাত সাধক ও তাঁদের সাধনসঙ্গিনীদের— এ যেন 'প্র্যাকটিক্যাল' পরীক্ষা নিতে আসা 'এক্সপার্ট'-দের মতো। গুরুর ঠিক করা দিনক্ষণ অনুযায়ী পরীক্ষা শুরু হয়।
>
> প্রথমে গুরুর আদেশে শিষ্য আর তার সাধনসঙ্গিনী রাত্রিবেলা ঢোকে এক বদ্ধ ঘরে। সাধক ও সাধনসঙ্গিনীরা ঘরের বাইরে বারান্দায় বসে একটানা ভক্তি সংগীত ও কীর্তন গেয়ে চলেন যতক্ষণ চলে সাধনা। আকাশে তারার চলন দেখে তাঁরা সময় নির্ণয় করেন। এইভাবে যখন আঠারো দণ্ড নিশা কেটে যায় (তার মানে ৭ ঘণ্টা ১২ মিনিট) তখন একজন অভিজ্ঞা বর্ষিয়সী সাধনসঙ্গিনী ঘরে প্রবেশ করেন এবং শিষ্যের সাধনসঙ্গিনীর যোনি পরীক্ষা করেন। পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হলে তিনি ঘোষণা করেন যে শিষ্যের বীর্যচিহ্ন নেই স্ত্রীঅঙ্গে, অর্থাৎ এই দীর্ঘ সংগমে শিষ্য উর্ধ্বরেতা অবস্থায় থাকতে পেরেছে। তাকে এবারে সাধক শিরোপা দেওয়া যেতে পারে।

এমন পদ্ধতিতে সাধক পদমর্যাদা লাভ সহজ নয় তা বলা বাহুল্য। উদাহরণত দেখা যাচ্ছে দাসকলগ্রামের এই রামানন্দ গোঁসাইয়ের মোট শিষ্য সংখ্যা পনেরোজন— তার মধ্যে মাত্র একজন শিষ্য, চিন্ময় দাস, এই সুদুর্লভ সাধকের সম্মান লাভ করেছেন। উল্লেখ্য যে, গ্রামদেশে সকলেই সাধক হবার বাসনার গুরুর কাছে আসে না। মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে শিষ্য হওয়াই তাদের প্রাথমিক ও একমাত্র লক্ষ্য। যেমন দেখা যাচ্ছে, মানস রায়ের সমীক্ষা অনুযায়ী ময়ূরেশ্বরের রাধাশ্যাম দাস, গড়গড়িয়ার বাসুদেব দাস, মল্লারপুরের শান্তিরাম দাস ও বল্লভপুরের বাঁকাশ্যাম দাস দীক্ষা নিতে এসেছিলেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশ্রয় পেতে। এদের মধ্যে মল্লারপুরের শান্তিরাম দাস পূর্বাশ্রমে ছিল একজন আসামি। ১৯৭৮ সালে ডাকাতির অপরাধে তার জেল হয়। সেখান থেকে জামিন পেয়ে বাউল মতে দীক্ষা নেয় সামাজিক নিরাপত্তার আশায়। মানস রায় তাঁর সরেজমিন অনুসন্ধানে অন্যতর তথ্যও পেয়েছেন। লক্ষ করা গেছে এ পথে অনেকে আসে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার লোভে, টাকাপয়সার জন্য নয়। অনেকে বিত্তশালী। যেমন কালনার কৃষ্ণদাস বা বাউতিজোরের দীনবন্ধু দাস— এদের প্রচুর জমিজমা আছে, তবু দীক্ষা নিয়েছেন কারণ গান বাজনা ভালবাসেন, ইচ্ছা ওই ব্যাপারে কিছু নামযশ হোক। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণসন্তান থেকে শুরু করে কায়স্থ, সদগোপ বা গন্ধবণিকের মতো মধ্যবর্ণের মানুষ এবং অস্পৃশ্য জাতের বাগদি, হাড়ি, মুচি ও ডোমেদের ঘরের ছেলে দীক্ষিত হচ্ছে বাউলমতে।

কিন্তু কারণ দেখে সংশয় জাগে রামানন্দের দ্বারা দীক্ষিত শিষ্যরা কি বাউল পন্থার না বৈষ্ণব পন্থার লোকায়তিক পর্যায়ের সদস্য? নাকি এরা এক বিমিশ্র পদ্ধতির উপজাত? কেননা পরবর্তী তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে দেবীদাস বাউল চারচন্দ্রের সাধনা শিখছেন ও অভ্যাস করছেন তাঁর গুরুর নির্দেশে। তাতেই অবশ্য প্রমাণ হয় না যে দেবীদাস 'বাউল' পর্যায়ের লোক, যেহেতু সহজিয়া বৈষ্ণবরাও অনেকে চারচন্দ্র সাধনা করে থাকে। আসল কথা হল, বঙ্গ সংস্কৃতির একটা সাধারণ স্বরূপ দেখা যায় মিশ্রণধর্মিতা— বহুরকম মত ও পথের। লোকায়ত গৌণধর্মে এমনতর বিমিশ্রণ অনেক বেশি— সদা সর্বদা সেখানে চলেছে গ্রহণবর্জন। ব্যাপারটা আরেকটু তলিয়ে বোঝবার জন্য এবার আমরা আর এক রকম বৈষ্ণবীয় দীক্ষার বিবরণ উপস্থাপন করব। অনুপম দত্তর রচনা, আখ্যানধর্মী, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে অনুপম আমাকে জানিয়েছেন একটি চিঠিতে যে, এ-বিবরণ তাঁর আত্মজৈবনিক। অনুপম দত্ত প্রবীণ ব্যক্তি, থাকেন বীরভূমের দুবরাজপুরে। ১৪ জুন ২০০০ দিনাঙ্কের চিঠিতে আমাকে তিনি লিখেছেন :

> বৈষ্ণবীয় দীক্ষার যে বিবরণ সম্পর্কে আপনি শুধিয়েছেন তা ব্যক্তিগত জীবন ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। বলতে গেলে, একটা প্রচণ্ড সময়ে আমাকে বৈষ্ণব ধর্মের কাছেই যেতে হয়েছিল। তারপরে আরো কোথাও। তথাকথিত সমাজ ধর্ম আমার পায়ের তলার মাটি কেড়ে নিতে চেয়েছিল। সেই সময় আমার গুরুদেব— সিউড়ির কাছে 'ঝোরা মাঠ' আশ্রমে, বর্তমানে বাতাসে মিশে যাওয়া গুরুদেব নিরঞ্জন গোঁসাই আমাকে দীক্ষা দিয়েছিলেন আর আমাদের মালাচন্দন ঘটিয়ে ছিলেন। তিনি আমার বর্তমান সহচরী।... তো বৈষ্ণব ধর্ম নিয়ে পায়ের তলার মাটি খুঁজব কিন্তু গুরু হবার নামে বৈষ্ণব এলেন। তাঁরা বিধানক্রমে মাথান্যাড়া, কৌপিন খোঁচা, ঝুলি কাঁধে নগর ভিক্ষা এবং এর জন্য সময় লাগবে বৎসর খানেক তবে আমার বিচার হবে দীক্ষা যোগ্যতার। হয়তো জানতে পেরেছিলেন গুরুদেব। তিনি কিভাবে যে টেনে নিলেন তাঁর আশ্রমে। বললেন, 'বাবা নিয়ম, হ্যাঁ, নিয়ম ঠিক আছে। তবে হয়, করলেই হয়। আসিস তোরা অমুখ তারিখে। হয়ে যাবে।' তাঁর আশ্রম, উঠান ভরে ভক্ত বৈষ্ণবদের সমাধি, আর তাঁর ঘরে... পড়েছেন তো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুপমের লেখা আখ্যানের মধ্যে থেকে এখানে শুধু দীক্ষা গ্রহণের অনুষ্ঠানটুকু আমরা ছেঁকে নেব। স্থান বীরভূমের এক গ্রামের বৈষ্ণবীয় আখড়া। গুরু রাধাকান্ত গোঁসাই, দীক্ষার্থী শিষ্যের নাম পরেশ, তার সঙ্গিনীর নাম অনুরাধা।

গুরুর নির্দেশে পরেশ একটা ফর্দ লিখল অনুষ্ঠানের উপকরণ নিয়ে। প্রথমেই লেখা হল সিদ্ধি দশ গ্রাম, গাঁজা একভরি। তারপরে আট রকমের ফুল আর ফল। দুশো গ্রাম ধূপধুনো, দু'প্যাকেট ধূপকাঠি। এক টাকার আসলি চন্দনগুঁড়ো ও একটি রক্তচন্দনের বাঁট, একশিশি গঙ্গাজল, একশিশি অগুরু, একশিশি মধু, এক টাকার কর্পূর, দেড়শো গ্রাম খাঁটি গব্য ঘৃত, তুলসী কাঠের মালা দু'গাছা। একজোড়া কোরা ধুতি। একটা উত্তরীয়। ল্যাঙট একজোড়া। পাঁচ হাত বহরের গামছা একজোড়া। একটি লালপাড় সাদা শাড়ি আর একটি জাম রঙের রেশমি শাড়ি, যার পাড় আর আঁচলায় সোনালি নকশা। তার সঙ্গে মানানো ব্লাউজ, সায়া ও অন্তর্বাস। দশকর্মা আর কাপড়ের দোকান থেকে এসব সংগৃহীত হল।

এ ছাড়া কেনা হল বাজার থেকে তরিতরকারি। একজন ভক্ত টাকা বার করে বললেন, 'এই হরেন, ছুটে যা তো মাছ নিয়ে আয় দু'কেজি।' কথায় বলে বৈরাগী হতে গেলে মাছ লাগে। একটা মহোৎসবের আয়োজনে বেরিয়ে পড়েছে আশ্রমের অনেকদিন অব্যবহারে থাকা হাতা হাঁড়ি গামলা কড়াই। কাজের শব্দে আর ব্যস্ততায় আশ্রমের এলাকা সজীব হয়ে উঠেছে।

পাঠক, অনুপম দত্ত-র বর্ণনার অনুপুঙ্খ আর মানসী রায়ের প্রতিবেদনে ফারাকটা ধরতে পারছেন নিশ্চয়। এবারে দীক্ষা পর্বের বৃত্তান্ত :

> একটা কম্বলের আসনে পরেশ বসে রয়েছে অন্য এক বেশে। গায়ে জড়ানো রয়েছে হালকা সাদা সুতির চাদর। কোরা ধুতিটির তলায় যে ল্যাঙট সেটা বেঁধে দিতে সাহায্য করেছে গোঁসাইজি।
>
> ঘরটি, যদিও দিনের বেলাতেও আবছা আলো স্পষ্টই চোখে পড়ে দেয়ালের একদিক ঘেঁষে সিমেন্ট বাঁধানো বড় বেদী। তার উপর ফ্রেমে বাঁধানো নানা দেবদেবীর স্বর্গীয় মূর্তি। উপরের দেয়ালে পুরনো একটা ছবি— নীল মেঘের ভিতরে নৃত্যপর শ্রীগৌরাঙ্গদেব। অন্য দেয়ালগুলোতে যেখানে সেখানে লালকালির বড় বড় হরফে 'হরে কৃষ্ণ' মন্ত্র লেখা। একগুচ্ছ ধূপকাঠির পুড়তে থাকা গন্ধ আর ধোঁয়ারেখা। প্রাচীন পিলসুজের উপর ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলতে থাকা শিখা স্থির।
>
> শিশি থেকে জল নিয়ে পরেশের মাথায় ও দরজার বাইরে বসে থাকা একজন দর্শকের উপর ছুঁড়ে দিলেন রাধাকান্ত গোঁসাই।... উৎসুক মানুষেরা বিড়ি টানছে, গাঁজার কল্কেতে দম দিচ্ছে। সামনের রাখা পুজোর টুকিটাকি জিনিসের মধ্যে থেকে একটি ছোট কাঁচি তুলে নিলেন গোঁসাইজি। বললেন, 'শাস্ত্র মতে মস্তক মুণ্ডন। কই দেখি মাথাটা একটু ঝুকিয়ে আনো তো।' তার ব্রহ্মতালুর উপরের একগাছা চুল কেটে সেটাতে রাখলেন ডানপাশের বেদীর নিচে। বললেন, 'বাবা, তোমার টিকির চুল কেটে এখানে রাখলাম। এটি আমার গুরু গোঁসাইয়ের সমাধি। তিনি এর ভিতরে শুয়ে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছেন। তোমার মন তোমার চেতনা এখানে বাঁধা থাকল। শাস্ত্রবিধি মতে এটাই তোমার মস্তক মুণ্ডন হল বাবা। এরপর কর্ণছেদন।'

তামার কোষায় ভিজছে একটি খেজুর পাতা। তিনি সেটি তুলে, আসনে বসে থেকেই পরেশের ঘাড় টেনে মাথা কাত করে প্রথমে ডান কানের লতিতে পরে বাঁ কানের সেই জায়গায় পাতার ছুঁচলো শক্ত আগাটা সামান্য জোরে ফুটিয়ে তুলে নিলেন।

'বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের জন্য তোমার দেহগত সংস্কার হল বাবা। এবার'—

রাধাকান্ত গোঁসাই বাটা চন্দনের সাথে খানিকটা গঙ্গামাটি মিশিয়ে অতি যত্নে পরেশের কপালে, নাকে, কানের লতিতে, দুই বাহুর উপর, বুকে এঁকে দিলেন তিলকচিহ্ন। পুজোর সামগ্রীর পাত্র থেকে তুলে নিলেন দু'গাছি তুলসী কাঠের মালা। পরেশের গলায় পরিয়ে দুই প্রান্তের খোলা সুতোয় গিঁট বেঁধে দিলেন।

'এখন গুরুর কাছে বৈষ্ণব-মন্ত্র নেবার যোগ্য তুমি হলে বাবা। এখন থেকে তোমার নাম হল পরেশদাস বৈষ্ণব। আর সাধনপথে যখন যাবে তখন তোমার নামটি পরমানন্দ দাস বৈষ্ণব। এবার তুমি আমাকে ষাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর।'

'কল্যাণ হোক কল্যাণ হোক' শিষ্যের দু'হাত ধরে তুলে তাকে বুকে জড়ালেন। চুমু খেলেন কপালে। তারপর তাকে ছেড়ে দু'হাতের বিচিত্র সব মুদ্রা অনেকক্ষণ পরেশের সামনে করার শেষে বললেন, 'এ হল ব্রহ্মচর্য মুদ্রা বাবা পরমানন্দ।'

...'তুই পরমানন্দ, কাল রাত থেকে এখন পর্যন্ত অনেক পল অনুপল ব্রহ্মচর্য পালন করে ব্রহ্মচারী হলি।... এখন তোকে মন্ত্র দেব। আসনে বোস।' সামনা সামনি বসে পরেশের মাথাটি নিজের খোলা বুকে লাগিয়ে তার ডান কানে খুব ফিসফিসিয়ে কৃষ্ণ নামের একটা উচ্চারণ করলেন। মুখ সরিয়ে বললেন, 'এ মন্ত্র তোর একার। খুব গোপনের। সব সময় একে জপ করবি। একে বলে বীজমন্ত্র।'

তারপর তিনি পরেশের দুই গালে দাড়ি ঘষে আবার সেই মন্ত্রটি একই গোপনতায় উচ্চারণ করে তার কানের লতিতে ভাঙা দাঁতের দুই মাড়ির চাপ দিয়ে কামড়ালেন, 'মনে রাখিস। কখনও ভুলিস না।' এবারে পরম স্নেহে পরম প্রেমে পরেশের দুই গালে দুটি নিবিড় চুমু খেলেন। পরেশ গড়িয়ে পড়ল গুরুর চরণে কাঁচা মাটির মূর্তির মত, অথবা নতুন প্রবাহের কোনো স্রোতের মত।

অনুপম দত্তর অনুভূতিময় বর্ণনে ও জাদুভাষায় যেন প্রত্যক্ষ শরীরী হয়ে উঠেছে সমগ্র পরিবেশ ও ব্যক্তি। বৈষ্ণবীয় দীক্ষাগ্রহণের এমন বিস্তারিত বিবরণ বড় একটা পাওয়া যায় না পুথিপত্রে। এ বর্ণনার অভিনবত্ব ও গভীর আবেদন মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে এই কারণে যে, লেখক আখ্যানের কাঠামোয় ভরে দিয়েছেন নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও সংবেদন। স্বাভাবিক মধ্যবিত্ত শিক্ষিত একজন জীবিকাধারী মানুষ যখন বৈষ্ণবীয় স্রোতোধারায় নিজেকে স্বেচ্ছায় মিলিয়ে দিয়েছেন তখন তাঁর রূপান্তরিত নবজন্ম বিস্ময়কর নয় কি? এক বিশ্বাস থেকে আরেক বিশ্বাসে, এক ধরনের যাপন থেকে সম্পূর্ণ অন্য এক যাপনের মধ্যে তিনি যাচ্ছেন। কিন্তু অনুষ্ঠান এখনও শেষ হয়নি। রোমাঞ্চিত বিহ্বল হতচকিত মৃণ্মূর্তির মতো অবলুণ্ঠিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিষ্যকে এবারে গুরু রাধাকান্ত গোঁসাই তুলে ধরে তার হাতে দিলেন বৈষ্ণবের ভিক্ষার ঝুলি। বললেন,

'এতে আছে দুটি পথের কড়ি।' তিনি বের করলেন, 'আর এই দেখ,' কড়ি রেখে উদ্দিষ্টটি বের করে তুলে ধরে বললেন, 'চিরঞ্জীবী শিয়াল শিঙ্গি।' তিনি ওটিকে ধূপশিখার কাছে আনলেন তারপর সিঁদুর চন্দন মাখিয়ে বললেন, 'বাবা, এটি জ্যান্ত। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা এর ধূপসেবা চন্দনসেবা চাই। তাহলে এর থেকে উঠবে মৃগনাভির গন্ধ।' রেখে দিলেন ঝুলিতে, 'আর এখানে আছে দেবী কামিখ্যের রজঃসিক্ত বস্ত্র। বাবা, তোমার এ জীবনে আজ থেকে এগুলিই হল শেষ সম্বল। নাও, ঝুলি ধর। নগর ভিক্ষায় যাও।'
সে জানে না কোন্ নগর? কতদূর তার পথ?
'যাও পরমানন্দ' গোঁসাইজি বললেন, 'প্রথম ভিক্ষা রাধারানির কাছ থেকে আনবে।'

দীক্ষা ঘরে ফিরে পরেশ দেখল তার আসনের পাশে আরেকটি কম্বলের আসন।
গুরু বললেন, 'এস বাবা, নগর ভিক্ষা হল?'
'গুরুদেব, আমি শুধু অনুরাধার কাছে ভিক্ষা চেয়েছি।'
'নারীই নগর বাবা! নগরের সব ঐশ্বর্য ধনে যে ধনী। তুমি নারীর কাছে ভিক্ষা চেয়েছ। মাতৃজাতির কাছে ভিক্ষা চেয়েছ। এতে বাবা, নারীকে মাতৃজ্ঞানে সাধনার কাজটি তুমি করলে। এবার ভিক্ষের ধন আমার হাতে দিয়ে বস তোমার আসনে।'

AMARBOI.COM

এই বিবরণের মধ্যে ভাষাবিন্যাস ও সংলাপের আন্তরিকতা লক্ষণীয়, সেই সঙ্গে বৈষ্ণবীয় মাধুকরীর বৃত্তান্ত খুব মধুর। বৈষ্ণব সাধনায় এই মাধুর্যরসই প্রধান। ভিক্ষাগ্রহণ ব্যাপারটিও প্রতীকী ব্যঞ্জনায় চমকপ্রদ। নারী সম্পর্কে দৃষ্টিকোণ অতীব গভীরতাস্পর্শী। বোঝা যায় লোকায়ত জীবনের মরমি রহস্যময়তা ও বাচনসৌন্দর্য। ওদিকে কিন্তু অনুষ্ঠান এগোচ্ছে। এরপরে রাঙা চেলি পরিয়ে অনুরাধাকে আনা হবে। পরেশ ও অনুরাধা পাশাপাশি দুই আসনে। সামনে গুরু রাধাকান্ত। তাঁর কণ্ঠে সংস্কৃত মন্ত্র, নারীরা বাজাচ্ছেন শঙ্খ, সঙ্গে হুলুধ্বনি। গুরু বললেন,

'এই ঘরে বেদীটি, আমার গুরু ভগবান মনোমোহন দাস বৈষ্ণবের সমাধি। আর যত ঠাকুর দেবতার ছবি, তাঁদের পাশে যাঁরা মানুষ ছিলেন, ঠাকুর হয়েছেন তাদের সকলের সামনে আমি শ্রীরাধাকান্ত গোস্বামী, বনমালীপুরের আশ্রমের সেবাইত তোমাদের একটি নর আর নারীর প্রেম মিলনের জন্যে মালা-চন্দনের অনুষ্ঠান করছি। সবাই একবার গৌর গৌর বলুন, বাবারা।'
'আজ আমি প্রজাপতি ঋষির নামে তোমাদের দুজনের মালাচন্দন করে দিচ্ছি। সাক্ষ্য রইলেন ছত্রিশকোটি দেবতা, জলস্থল আকাশ বাতাস আর আসরের মানুষেরা।'

এখানে যেটা বিস্ময়কর তা হল সামঞ্জস্যবোধ। বৈষ্ণব বিবাহ অনুষ্ঠানে সংস্কৃত মন্ত্র,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রজাপতি ঋষির প্রসঙ্গ আর ছত্রিশকোটি দেবতাকে স্মরণ একরকম উদার সমন্বয়বাদের বোধ জাগিয়ে তুলছে না কি?

বাটির থেকে বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে চন্দন তুলে তিনি অনুরাধার কপালে টিপ পরালেন, 'এখন রাধারানির কপালে আমি চন্দনের টিপ দিলাম। সে হল আমার বৈষ্ণবী। আমার সেবাদাসী।' একটু থেমে তিনি অনুরাধাকে বললেন, 'কই, হ্যাঁ বল।'... 'তুমি কি জানো না রাধারানি, শিষ্য যা কিছু পাবে তার সমস্তই গুরুর প্রসাদী। গুরু আগে ভোগ করবেন। তা দেখে শিষ্য মস্ত হয়ে থাকবে। তারপর প্রসাদ পাবে। কি, বৈষ্ণবী হয়ে এসব কথা জানো তো?'

অনুরাধা চুপ করে থাকল।

'না জানলে, বাবা পরমানন্দ তুমিও জেনে নাও গুরু হচ্ছেন ব্রহ্মা। গুরু কৃষ্ণ। তাই প্রথমে এই বৈষ্ণবীটি হবেন কৃষ্ণসঙ্গিনী।... এবার তুমি মেয়ে, বল।'
অনুরাধা রহস্য হাসি মুখে ফুটিয়ে বলল, 'আমি আপনার বৈষ্ণবী হলাম গুরুদেব।'

গুরুপ্রসাদী কথাটার নানা কদর্থ আমরা আগে শুনেছি বা বইয়ে পড়েছি। কিন্তু বনমালীপুরের এই মালাচন্দনের অনুষ্ঠান রীতিমতো সুন্দর ও মহিমময়— নিগূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ। এবারে বিবাহ কৃত্যের শেষপর্বের শুরু।

রাধাকান্ত গোঁসাই ডান হাতের তর্জনীর আগাটি ছুঁইয়ে অনুরাধার কপাল থেকে ভিজে চন্দন নিয়ে পরেশের কপালে টিপ এঁকে দিতে দিতে বললেন, 'রাধারানির কপাল থেকে নিয়ে তোমার কপালে দিলাম বাবা পরমানন্দ। এখন থেকে ও বৈষ্ণবী তোমার হল।' দু'ছড়া আকন্দ মালা দু'জনের গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, 'উঠে দাঁড়াও। নিজের নিজের মালা বদল কর।'

AMARBOI.COM

এরপরে সমবেত নারীকুলের শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনি, পাঠক, এসব কল্পনা করতে পারবেন। গুরুর সক্রিয় ব্যবস্থাপনায় চাদরের আবরণের আড়ালে হল যুগলের শুভদৃষ্টি। গুরুদেব ঘোষণা করলেন,

'এবার রাধাকৃষ্ণের মিলনলীলা।' পরেশকে একটু ঠেলে সরিয়ে যেটা কিনা অনুষ্ঠানগত একটা কৃত্যমাত্র এমন ভঙ্গিতে তিনি অনুরাধার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে দুহাতে জাপটে ধরে বুকে টানলেন। গভীর আলিঙ্গনে অনুরাধার মুখের উপর নামালেন চুল-দাড়ির অতি প্রবীণ বয়স্ক মুখখানি। দাঁতশূন্য দুই মাড়ির ঠোঁট নামালেন অনুরাধার দুই ঠোঁটের নিচে চিবুকে। একটা শান্ত দীর্ঘ চুম্বনের পর অনুরাধাকে ছেড়ে দিলেন গুরুগোঁসাই।
নিজের আসনে সরে এসে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'এই আসরে উপস্থিত মানুষ-রতনদের সামনে তোমরা দুজনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে পরস্পরের মুখচুম্বন কর।' তিনি হেসে তাকালেন পরেশের দিকে, 'বাবা পরমানন্দ, এ বৈষ্ণবী তোমার। এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার নারীরত্ন। মনে রেখো, গুরুপ্রসাদে একে তুমি পেয়েছ। আমার এই রাধারানি আজ থেকে তোমার সাধনসঙ্গিনী হল বাবা। সে তোমার সাধনপথের গুরু। তাকে সেইভাবে দেখবে। সেইভাবে ভালবাসবে। তখন বুঝবে বাবা, সর্বজীবে প্রেম কী করে হয়, কাকে বলে।'

তারপরে গুরুর আদেশে পরেশ আর অনুরাধা একটি যেন মিথুনমূর্তি। সকলের উঁকিঝুঁকির মধ্যে পরেশ অনুরাধাকে গভীর চুম্বন করল। কিন্তু গুরুগোঁসাই জানেন সময় পরিমাণ। তাঁর ছোট ছোট হাততালির শব্দে তিনি ওদের মগ্নতা ভেঙে দিলেন। ওরা বিচ্ছিন্ন হল।

মানস রায় বর্ণিত দেবীদাসের বাউলদীক্ষার চেয়ে অনুপমের বর্ণনায় বৈষ্ণবীয় সহজিয়া মতের দীক্ষা অনেক প্রাঞ্জল ও স্পষ্টরেখ। গুরু-শিষ্যের ভূমিকা, গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সাধনসঙ্গিনীর সম্পর্ক— এ সবই কৌতূহলোদ্দীপক আর মরমি বিন্যাসে গাঁথা। দুটি বর্ণনা থেকে এমনও মনে হতে পারে বুঝিবা দুই সম্প্রদায়ে কৃত্যগত বেশকিছু মিলও আছে। তবে একটা বিষয় পরিষ্কার যে দেবীদাসের দীক্ষা পুরোপুরি বাউল-ঘরানার নয়। কেন নয়, সেকথা স্পষ্ট করতে এবারে কার্তিকদাস বাউল-কথিত বিবরণ উপস্থিত করব। বীরভূমের এক গ্রামের কার্তিকদাস আর লতা দুজন দুজনকে ভালবেসেছিল। নানা বাধা বিপত্তি পেরিয়ে তারা আশ্রয় পেল জীবন গোঁসাইয়ের কাছে। এবারে কার্তিকের জবানিতে—

তিনি আমাদের দুজনকে আশ্রয় দিলেন। আমি তাঁর কাছে শিক্ষা পেয়েছি। লতা হয়েছিল আমার সাধনসঙ্গিনী।
সে শিক্ষার কথা কি বলব, প্রথমে ক'দিন আমাদের ব্রহ্মচর্য পালন। এমনকি দেখাসাক্ষাৎ বারণ দুজনের। আমি থাকি আশ্রমের একদিকের ঘরে আর লতা থাকে ভেতরে আরো ক'জন বৈষ্ণবীর সাথে। এ বড় কঠিন সাধনা... একে বলে পেয়ে-হারানো। কাছে আছে কিন্তু দেখা হবার নয়। বিন্দুধারণ শিক্ষা বাউল-সাধনার মূল শিক্ষা।
আমি বাউল ঘরে জন্মি নাই তাই বাউল বংশের আসল ভাবটি, রূপটি আমার পাওয়া হয় নাই। যাকে বলে সহজ পাওয়া, বংশধারায় পাওয়া। বাউলের ছেলে কি রকম বাউল হয় আমি তো তা জানি না। পূর্ণদাসের কথা ভাবো, তার বাবা নবনীদাস কত বড় বাউল। তাই সাধক বাউলের যদি ছেলে না হবে তবে দেশে আসল বাউল জন্মাবে কি করে?

কার্তিক দাস একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন। বিন্দুধারণ আর উর্ধ্বরেতা হয়ে, বাউল সাধনা যদি জন্মনিরোধ করে অটল মানুষকে শুধু চায়, তবে খাঁটি বাউল জন্মাবে কী করে? দীন হীন ভজনসাধনবিমুক্ত সাধারণ ব্যক্তি যখন বাউল হয় তখন তো তার উচ্চ পরম্পরা, তার ভাব ও রূপ থাকতে পারে না। সাধক বাউলের সন্তান সাধনজীবনে কিংবা গানের জীবনে অনেকটাই এগিয়ে থাকে স্বভাবজ কারণে। কার্তিকদাসের সে-পরম্পরা ছিল না, তার ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রমজীবী জীবনের অভিজ্ঞতা। বাউল জীবন তার কাছে অপূর্বকল্পিত, একেবারে তরতাজা এক অন্য জগৎ। তার বাচনে—

> ব্রহ্মচর্য সময়ে আমাকে তিনটি রস পান করতে হয়েছিল। প্রথমটি হচ্ছে প্রস্রাব। যতবার সেটি ত্যাগ করেছি ততবার পরপর তিনদিন সেটিকে আবার নিজের ভেতরে ফিরিয়ে নিয়েছি। যতবার প্রস্রাব করেছি ততবার একটা নারকেল মালুইয়ের পাত্রে ধরে সেটা খেয়েছি। সকালের বিষ্ঠার প্রথম অংশ খানিকটা তুলে যেতে হবে। বাকিটা থেকে খানিকটা তুলে নিয়ে দু'হাতের তালুতে সেটাকে ফেঁটে যেতে হবে। ফাঁটতে ফাঁটতে এক সময় সে-জিনিস মাখনের মত তেলতেলে হয়ে যাবে। তখন আর কোনো বদ্‌গন্ধ থাকবে না। এরপর সেটা মুখে বুকে পেটে ভাল করে মালিশ করে ভোর বেলাকার রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আধঘণ্টা পর ভাল করে স্নান করে ধুয়ে ফেলতে হবে। ওই জঙ্গলের ধারে, বালির খালে অনেকটা জল। আমি লাগাতার একমাস গুরুবাক্য পালন করে সেই জলে নেমে স্নান করেছি। সে খালও আর নাই। জলও নাই।
>
> স্নানের পর দমের কাজ। এটাই আসল। এই দমের কাজই দেবে বিদ্যা-বুদ্ধি-বল। দমের কাজ হল গিয়ে শ্বাসের কাজ।... ভিতরকে দিতে হবে বাতাস। রেচক কুম্ভক করে সেই বাতাস বুকে ধরা আর ছাড়া হল দমের কাজ।

কার্তিকের আত্মবিবৃতি থেকে বোঝা সহজ যে, বাউলসাধনার সূচনাপর্বই বেশ কঠিন। বৈষ্ণবদের দীক্ষাপূর্ব স্তর অনেকটা ভাবময়, যা দেখা গেছে দেবীদাস আর পরেশের অভিজ্ঞতার বয়ান থেকে। বাউল সাধনা প্রথম থেকে লজ্জা-ঘৃণা-ভয়কে অতিক্রম করিয়ে নেয়। ব্যাপারটি ক্রমশ হৃদয়ঙ্গম হয় কার্তিকের পরবর্তী অভিজ্ঞতার বিচিত্র বিবৃতি থেকে—

> তো এই দমের কাজের মধ্যে আমাকে এক মহারস আস্বাদন করতে হয়েছিল। সে এক সেঁকো বিষ। কুমারীর প্রথম রজ-রস... গুরু কোথা থেকে জোগাড় করে আমাকে দিয়ে বললেন, 'খা বেটা।'... হাঁ করে মুখে ঢেলে দিলাম। খাওয়া হল। কোনো স্বাদ নাই, বিস্বাদও নাই। তারপর একসময় ঘুম এলো।... ঘুম নয় যেন যমে ধরল আমাকে। দিনরাত ঘুমে ঢলে আছি আর মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখতে পাচ্ছি একটি অষ্টদল পদ্ম যার মৃণাল চলে গেছে আমার জন্ম ঘরে সেখানে আমি একটি বিন্দু। আমাকে ঘিরে রক্তের ফুল থরে থরে সাজানো।
>
> অদীক্ষিত একজন পল্লিবাসী অর্ধশিক্ষিত সাধকের পক্ষে এমনতর ভাবনিবিড় অবলোকন একটু অস্বাভাবিক না লেগে পারে না— অন্তত আমাদের স্বাভাবিক যুক্তিবোধে। তবে গুহ্য চেতনার জগৎ আর যাপন তো আমাদের অভিজ্ঞতায় নেই, তাই তর্ক তোলা সাজে না। অতঃপর—
>
> গুরু একদিন সকালেবেলায় বলে দিলেন, আজ তোর বিন্দু-ধারণ শিক্ষা হবে। সন্ধ্যের পর চলে যাবি অজয়ের বালির চরে। যেদিকে খুশি হাঁটতে থাকবি। একসময় নিশানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাবি। তখন সেই লক্ষ্য রেখে চলবি। যা এখন ঘরে বসে ধ্যানে থাক।

বৈপরীত্যটুকু বেশ চোখে পড়ে— এর আগে আমরা দুটি দীক্ষা উৎসবের বিবৃতি দেখেছি। তাতে নানা উপকরণ, পূজা, মন্ত্র, গুরুগিরি, গুরুপ্রণামী, মহাজনদের ছবি, ভোজন, কীর্তন, ফুল ফল সুগন্ধি কতকিছুর সমারোহ। নববস্ত্র, নগরভিক্ষা, কণ্ঠিবদল, চন্দনলেপন— আয়োজন ও সমারোহের যেন শেষ নেই। সে তুলনায় কার্তিকদাস আর তার বাউল গুরু জীবন গোঁসাই একেবারে অনাড়ম্বর ও অন্তর্মুখী। সরাসরি কায়াসাধনার কঠিন পন্থায় শিষ্যকে বৃত করতে গুরু তৎপর। বাউল সাধনা সব রকম কৃত্রিম ভজনপূজনকে এড়াতে চায়, দেবদেবীবিগ্রহকে অস্বীকার করে এবং সাধককে ঠেলে দেয় সাধনার গভীরে নির্জন পথে অনিকেত করে। কার্তিকের অভিজ্ঞতা শোনা যাক। গুরুর নির্দেশে সন্ধ্যার পর অজয়ের বালি চড়ায় নিঃসঙ্গ পরিক্রমায় তার কানে এল যেন দোতারার ঝংকার। সেই সুরের নিশানা ধরে এগোতে এগোতে অসাড় চৈতন্যে হঠাৎ একসময়ে আবিষ্কার করল গুরুকে। আর—

তাঁর কাছে লতা বসে। গুরু বললেন, 'বোস'।
সে গুরুর কাছে বসতে গেল। তিনি বাধা দিয়ে বললেন, 'আমার কাছে না, তোর সাধন-সঙ্গিনীর কাছে গিয়ে বোস।'
'এবারে মন পেতে শোন্, যে-কর্মে লিপ্ত হতে যাচ্ছিস্ তার পরিণাম ভয়ঙ্কর। তবু সাধক সেই ভয়ঙ্কর থেকেই পরমানন্দ প্রেম সংগ্রহ করে। মালকোঠায় ধন আগলে রাখে। আর এভাবেই রমণীর মন রক্ষা করে। বিন্দুধারণই সেই প্রেমসাধনা। আজ তা দুজনকে শেখাব।... নারী হচ্ছে আনন্দ সহচরী। সে এক মহামায়া। তিনিই সৃষ্টি ও স্থিতির জননী। আবার লয় বিলয়ের মহাশক্তিরূপিনী। সেই নারীর সঙ্গে লীলা সহজ কথা নয় বাবা। না বুঝে তার সঙ্গ করলে সমূলে নাশ হয়ে যাবি। তাই সাবধানে, ধীরে ধীরে, সুস্থিরে। যখনই বুঝবি উত্তেজনা তোকে গ্রাস করছে। কুম্ভক করবি। দম ধরে পিতৃধন রক্ষা করবি।'

এরপরে একটা দেহতত্ত্বের গান দোতারা বাজিয়ে শোনালেন গুরু জীবন গোঁসাই। গানটা কতবার শুনেছে সে কিন্তু অন্তর্গত তত্ত্বকথা বোঝেনি। গুরু গান শেষে বোঝাতে লাগলেন,

'বোঝ্, ভালো করে বোঝ্, গানে রয়েছে গভীর জলে অষ্টদল পদ্মের কথা। সেই পদ্মের আটটি পাঁপড়ি প্রথমে জিভ দিয়ে অনুভব করবি। বুঝবি, সেই পদ্মের মৃণাল পেরিয়ে ফুল ঘিরে ফল জমাট বাঁধে। সেখানেই মানুষ বিরাজ করে। নারীসঙ্গ কালে এই ধ্যানটি সবসময় মাথার ভিতর ঢুকিয়ে রাখবি।'

কার্তিক দাস এই বলে শেষ করে তার বিবৃতি যে,

গুরু কৃপায় আমরা সেই বালিচরের উপর খুলে ফেললাম আমাদের গায়ের যত পোষাকের ছাল। লতা, যার সঙ্গে আমার দেহ সম্পর্ক আগে হয়েছে, এ যেন সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> নয়। সে এক মোহ, প্রেম। আমি তার চুল, কপাল, ঠোঁট... তার মনোহর শরীরের সব জায়গা চুমাতে ভরিয়ে চললাম। তারপর গুরুনির্দেশিত প্রক্রিয়ায় আরম্ভ হল আমাদের কাজ। আমরা দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। সেই যেমন গানে আছে— 'দেখে এলাম মর্ত্যে/ একটি গর্তে/ দুই সাপের জড়াজড়ি' সেই রকম। সে জিনিস বোঝানো যাবে না। করে দেখতে হবে। জীবনে তাকে পেতে হবে। সে জিনিসকে অনুভব করতে হবে। ভাবের জগতে বুঝতে হবে। ধ্যানে থাকতে হবে...

বাউল দীক্ষা ও গুরু নির্দেশিত কায়াবাদী সাধনার প্রত্যক্ষ জবানি এতক্ষণে আমাদের কাছে স্পষ্ট ও সত্য হয়ে উঠেছে। যদিও এর অনুভববেদ্য অংশটুকু, যা প্রধান অংশ, তা উপলব্ধি করা অসম্ভব। তবে এটা বোঝা যায় যে, প্রকৃত বাউল সাধনায় সফলতা আনতে হলে, কায় সংযম পেতে হলে, গুরু নির্দেশের সঙ্গে চারচন্দ্র সাধনও জরুরি। এ-পন্থা ইহবাদী ও বস্তুময়— লোভ, মোহ ও প্রলোভনে পদে পদে স্খলনের আশংকা। একা সাধক বাউল নয়, তার সাধনসঙ্গিনীর নিষ্কাম সহযোগিতা অনেক বেশি আবশ্যিক।

কিন্তু প্রসঙ্গত এমন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, জীবন গোঁসাই যেমন পদ্ধতিতে কার্তিকদাস আর লতাকে ব্রহ্মচর্য থেকে দেহসংগম পর্যন্ত নিয়ে গেছেন সেটাই কি সব বাউল আখড়ায় গুরুরা অনুসরণ করেন? নাকি এটি নিতান্ত জীবন গোঁসাইয়ের আচরিত একক পদ্ধতি, যা সুনিশ্চিতভাবে তিনি অর্জন করেছেন তাঁর নিজস্ব গুরুর ঘরানা থেকে?

এ ধরনের পর্যালোচনা আর সরেজমিন সমীক্ষা থেকে বিচিত্র সব তথ্য উঠে আসে। প্রথমত, মনে হয়, অঞ্চলভেদে ও সম্প্রদায়ভেদে দীক্ষা ও শিক্ষার নিয়ম কানুন আলাদা। দ্বিতীয়ত, একেক গুরুর একেক মত। কেউ মনে করেন দীক্ষার আগে একমাস পর্যবেক্ষণ ও গুরুগৃহে থাকা আবশ্যিক, কেউ মনে করেন অবস্থা অনুযায়ী সেটা কম সময়েই হতে পারে। যেমন জীবন গোঁসাই তো তিনদিনের ব্রহ্মচর্যের পরই কার্তিককে দীক্ষা শিক্ষা দিয়ে দিয়েছেন। তার কারণ তাদের দেহগত অভিজ্ঞতা আগে হয়ে গিয়েছিল এবং কার্তিক আগে আরেকটি আখড়ায় বেশ কিছুদিন ছিল— সেখান থেকেই সে লতাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল। এক্ষেত্রে পরিস্থিতি ছিল জটিল এবং তাদের জরুরিভিত্তিতে সাধনজীবনে আশ্রয় দেওয়া ছিল প্রয়োজন। আসল কথা হল, মানুষের স্থূল দেহমনের আত্মিক সংস্কার না ঘটলে, সে লজ্জা-ঘৃণা-ভয়ের ঊর্ধ্বে উঠতে না পারলে, তাকে দীক্ষিত করা যাবে কী করে? কার্তিকদাস যে অত অনায়াসে মূত্র ও বিষ্ঠা গ্রহণে অভ্যস্ত হল, এত দ্রুত, তার কারণ ব্যাপারটি তার অজানা ছিল না। সে নির্দ্বিধায় গুরুপদাশ্রিত হয়েছিল— কায়মনোবাক্যে। বাউলদীক্ষায় এই নিঃসংশয় শরণ ও আত্মসমর্পণ নিতান্ত স্বাভাবিক ঘটনা এবং গুরুর গুরুত্ব এ-সাধনায় একমাত্র লক্ষণীয়।

শিষ্যের প্রস্তুতি ও মানসিক আকাঙ্ক্ষা এক্ষেত্রে বড় কথা, কারণ দেহকে আশ্রয় করে, আত্মসংযম আর শ্বাসনিয়ন্ত্রণের সাহায্যে সে ব্রতী হবে এক বিপজ্জনক চর্যায়। বাউলগানে একে বলে 'বাঁকা নদীর পিছল ঘাটে স্নান।' এ-পন্থায় সংযুক্ত হবার আগে তাই জরুরি হল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনঃশিক্ষা। শিষ্যের মনের পাত্রটি উদার ও গ্রহিষ্ণু না হলে গুরু একা কী করবেন? বাউলরা বিশ্বাস করেন 'সিংহের দুগ্ধ রয়না জেনো স্বর্ণপাত্র বিহনে' সিংহের দুধ মানে গুরুবাক্য, স্বর্ণপাত্র মানে শিষ্যের মন। শিষ্যের সেই মন প্রথমে থাকে মৃৎপাত্রের মতো ভঙ্গুর বা অপক্ক, গুরু তাকে ক্রমে ক্রমে স্থায়ী ও পক্ক আকার দেন। তখন তা ধারণক্ষম হয়ে ওঠে, একদিনে নয়— দিনে দিনে। এবারে দেহ সাধনার কঠিন সরণিতে শিষ্যকে পদাতিক করে দেন গুরু, তাকে সাহস দেন আবার সাবধানও করেন। কামে থেকে নিষ্কামী হতে প্ররোচিত করেন অথচ বুঝিয়ে দেন সাধনার আনন্দ ও মুক্তির বার্তা। এই মুক্তি বৈরাগ্য সাধনের কঠোর তপশ্চর্যা কিংবা উপবাস ও ভোগহীনতার বিনিময়ে অর্জনীয় নয়। সেইজন্যই পদে পদে সাবধানতা, সতর্কতা ও গোপনতা লাগে।

নিজ সম্প্রদায় ও তার বিশ্বাসের জগতের বাইরে কেউ আকাঙ্ক্ষিত নন বাউলদের গুহ্য গোপ্য জগতে। ডাকা হয় শুধু সাধক ও মরমিদের, যাঁদের তাঁরা বলেন 'মর্মিকজন'। তাঁদের সাহচর্য ও উপস্থিতি শিষ্যকে উদ্দীপ্ত করে, প্রেরিত করে। সে বোঝে, যে নিঃসঙ্গ গভীর কায়াবিশ্বে সে ভ্রমণশীল হয়ে উপার্জন করবে 'রত্নধন', সেই বিশ্বে তার আগে যাঁরা প্রবেশ করেছেন সেই সব মানুষরতনরা তার সামনেই আছেন। তাঁদের জন্য কোথাও হাতড়াতে হয় না। তাঁদের সজীব উপস্থিতি, সাধনসঙ্গিনীসহ, যেন জাগিয়ে তোলে পরম্পরার বোধ।

লোকায়ত সমাজের তো এটাই সবচেয়ে বড় শক্তি ও সংগঠন। সেখানে তৈরি হয় 'কমিউনিটি' বা সংহত স্বনির্ভর সমাজবিন্যাস। একক বিচ্ছিন্ন আত্মসর্বস্ব মানুষ, যাদের নির্মাণ করে 'মেট্রোপলিটন' মন, এই পরিবেশে তারা অবাঞ্ছিত। ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন বাউল সমাজের লক্ষ্য নয়, সে অনিকেত ও ভ্রমণশীল। তার সত্য একমাত্র তার পক্ষেই আহরণীয় কিন্তু সে একা নয়— রয়েছে সংবৃত এক গোপ্য সমাজের সমর্থন— দীক্ষার দিনে সেই অলক্ষ সমাজকে সে প্রত্যক্ষ করে। গুরু তার কাছে সেই সমাজসত্যের প্রতীকরূপে দেখা দেন। গুরূপদেশ হয়ে ওঠে বিকল্প এক জীবনসত্যের ফলিত ভাষ্য।

অভিজ্ঞতা থেকে এমন অনুমান হয় যে, অঞ্চলভেদে বাউলদের সাধনদীক্ষার রকমসকম আলাদা। আগে দেখা গেছে, যে বীরভূমের অন্তর্গত পল্লিসমাজে বৈষ্ণবতার এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ আছে, যা বাউল সমাজের কিছুটা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। দেবীদাসের দীক্ষানুষ্ঠান তো বৈষ্ণবীয় দীক্ষার ঘন সংলগ্ন বলে ভ্রম হয়। এবারে তাই অন্যতর অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বা প্রতিতুলনার টানে দেখতে পারি মুর্শিদাবাদের বাউল সমাজকে, যাদের মধ্যে রয়ে গেছে ইসলামি পরম্পরা, বহুদিনের। গবেষক শক্তিনাথ ঝা দীর্ঘকাল মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ার মুসলমান অধ্যুষিত গ্রাম সমাজের বাউলদের জানেন চেনেন এবং তাদের দুঃখবেদনা ও সংকটের দিনে ছুটে যান। মৌলবাদীদের সঙ্গে বাউলদের সংঘাত ও বিপন্নতার সংবাদ তিনি পৌঁছে দেন উচ্চবর্গের জাগ্রত বিবেকের কাছে, প্রশাসন ও সংবাদ মাধ্যমের কাছে। অবিরত লেখনীতে উন্মোচন করতে চান নানা সামাজিক অন্তর্ঘাতের স্বরূপ। সেইজন্য তাঁর সুদীর্ঘ ও প্রত্যক্ষ গবেষণালব্ধ বই 'বস্তুবাদী বাউল', যা প্রধানত মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক বাউল বৃত্তান্ত, আমাদের পক্ষে আকরিক ও নির্ভরযোগ্য মনে হয়। কৌতূহলবশত এবং প্রতিতুলনার কাজে তাঁর বই থেকে বাউল দীক্ষার অন্য এক চেহারা দেখতে পারি। তাঁর বক্তব্য :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈষ্ণবদের দীক্ষা, শিক্ষা এবং ভেকের পৃথক তিনজন গুরু এবং এদের শিক্ষাপ্রণালী স্বতন্ত্র। একজন শিষ্যকে নামমন্ত্র দেয়, অন্যজন দেহতত্ত্ব ও সাধনা শেখায়, অপরজন 'ভেক' দেয় এবং তৎসংক্রান্ত আচার-আচরণ শেখায়।... কিন্তু জেলার মুসলমান বাউলদের মন্ত্র, তত্ত্ব ও সাধনা একজনই শেখায়— এ মতে গুরু একজন।
বাউল মত নিতে আগ্রহী কোন নর বা নারী নির্দিষ্ট গুরুর সঙ্গে যোগাযোগ করে। নিয়মমত গুরু তাদের এক বছর ভক্তদের সঙ্গে মেলামেশা করতে বলেন। তার বাড়িতে যাতায়াত করতে বলেন। চেনা জানার পর কাউকে শিষ্য করাই সমীচীন হলেও বাস্তবে অনেকে তৎক্ষণাৎ বা অবিলম্বে বাছ-বিচার না করেই শিষ্য করে ফেলেন।

বাছবিচার না করে অবিলম্বে বা তৎক্ষণাৎ শিষ্য করে ফেলার কারণ কি? কারণ নিশ্চয় এটাই যে, না হলে অন্য কোনও গুরুর এক্তিয়ারে বা বৃত্তে চলে যাবে শিষ্য। তাতে তাঁর গুরুত্ব কমবে, শিষ্যসংখ্যাও কমে যাবে। এর পিছনে কিছুটা সামাজিক সম্মান ও অর্থনীতি থাকতে পারে। এটা অবশ্য সত্যি যে,

শিষ্যের যোগ্যতা বিচারের কোন অনড় নিয়মবিধি বাউল সমাজে নেই। গোপন দীক্ষা ছাড়াও নানা পদ্ধতির প্রকাশ্য দীক্ষার অনুষ্ঠান বাউলদের মধ্যে চলিত আছে। গুরুর বাড়িতে, নিজের বাড়িতে ছোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ মত গ্রহণ করা হয়। কোন সাধুসভায় এ মত গ্রহণ করা হয়। একাধিকজন যৌথভাবে এ মত গ্রহণ করে। মতটি যুগলে নেওয়া হয় অথবা এককভাবে নেওয়া হয়। নারীর একক মত-গ্রহণ সর্বদা অনাড়ম্বরে বা গোপনে অনুষ্ঠিত হয়।

AMARBOI.COM

বৃত্তান্ত থেকে অনেক সংবাদ বেরিয়ে আসছে। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বাউলফকিরদের (সংলগ্ন নদিয়াতেও) সংখ্যা খুব বেশি বলে আমার প্রত্যক্ষণ সাক্ষ্য দেয়। যদিও 'বীরভূমের বাউল' কথাটি প্রবচনের মতো প্রসিদ্ধ। বাউল মতে দীক্ষা-পদ্ধতির সরলীকরণ প্রমাণ করে মুসলমান বাউলদের ঔদার্য ও বিধিলঙ্ঘনের প্রবণতা। নারীর পক্ষে এককভাবে বাউল মত গ্রহণ বিষয়টি চমকপ্রদ। এরপর শক্তিনাথ লিখছেন :

প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে সমবেত সাধুদের একজন দীক্ষা-প্রার্থীকে জিজ্ঞাসা করে যে সে কার কাছে মত নিতে চায়/ বা কাকে গুরু ধরতে চায়? তার পিতামাতার এতে অনুমতি আছে কিনা? স্বামী/ স্ত্রীর অনুমতি বা মত গ্রহণে সম্মতি আছে কিনা? প্রয়োজনীয় উত্তর পাবার পর এক গ্লাস জল এবং সামান্য চাল আনা হয়। গুরু প্রথমে চাল-জল করেন। গ্লাসে তার উচ্ছিষ্ট জল চালসহ শিষ্য এবং শিষ্যা গ্রহণ করে। অতঃপর গুরুকে বিশেষ ভঙ্গীতে প্রণাম করে। থালায় ৫ পোয়া চাল, ৫টি সুপারী, ৫টি পান, গামছা/ কাপড়/ পাঞ্জাবী এবং পাঁচ সিকে বা তদূর্ধ্ব টাকা দিয়ে গুরুকে অর্পণ করে। সবার সামনে তারা প্রতিজ্ঞা করে যে অক্ষরে অক্ষরে গুরুর কথা মেনে চলবে, গোপনীয়তা রক্ষা করবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লক্ষণীয় যে দীক্ষা গ্রহণের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপচারগুলি সুলভ ও ক্রয়সীমার মধ্যে। লৌকিক সমাজের খুব সহজ পদ্ধতি অবলম্বিত হচ্ছে এবং অনুষ্ঠানে কোনও পুজোআচ্চা বা শঙ্খ ঘণ্টার নিনাদ নেই। নেই কোনও দেবমূর্তি বা চিত্র। এর মূলে ইসলামি প্রভাব থাকাই সম্ভব, কারণ ইসলাম কোনও প্রতিকৃতি বা দেহগত রূপকল্পনায় বিশ্বাসী নয়। পরবর্তী স্তরে দেখা যায়—

> শিষ্য-শিষ্যাকে ঘরের ভেতরে নির্জনে, একেক করে বাঁদিকে বসিয়ে বাম কানে জপের জন্য একটি মন্ত্র দেন গুরু। এই মন্ত্রের তিন বা পাঁচ বা সাত অক্ষর। মন্ত্রগুলি: 'লাইলাহা ইল্লালা,' 'আল্লা হুঁ', 'হংস', 'হরেকৃষ্ণ', 'রাধার স্বামী'। হিন্দু সমাজের শিষ্যশিষ্যাকে হংস, হরেকৃষ্ণ বা পঞ্চনাম— কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ রাধে কৃষ্ণ প্রভৃতি দেয়া হয়। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ঐতিহ্যে দেয়া হয়, কামবীজ ও কামগায়ত্রী।

বিবরণ অনুযায়ী মন্ত্রের নানা বিচিত্রতা চোখে পড়বার মতো। মুসলমান সমাজ থেকে আগত বাউল এবং হিন্দু সমাজ থেকে আগত বাউলের বীজমন্ত্রের পার্থক্য, প্রমাণ করে, অন্তত মুর্শিদাবাদে, যে বাউল সাধনা এক ও ঐক্যবদ্ধ নয়। সেখানে জাতিভেদ আছে। তবে বাউল মতে দীক্ষা নিলে জেগে উঠতে পারে শমতার কোনও বোধ এমন আশা করা স্বাভাবিক। তবে লেখক একটি কথা খোলসা করেননি, দীক্ষাদাতা গুরু মূলত কোন জাতিভুক্ত ছিলেন পূর্বাশ্রমে। যদি ইসলামি পরম্পরায় তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়ে থাকে তবে বৈষ্ণবীয় কামবীজ ও কামগায়ত্রীর প্রতীক-তাৎপর্য তাঁর অধিগত থাকার কথা নয়। মন্ত্রের মধ্যে কিছুটা যে স্ববিরোধ আছে সেটাও স্পষ্ট। 'লাইলাহা ইল্লালা' উচ্চারণ ইসলামের কলেমার অন্তর্ভুক্ত, সাম্প্রদায়িক ধর্মবন্ধনমুক্ত ও শাস্ত্রবিরোধী বাউল কেন এমনতর 'আকিদা' (বিশ্বাস) নেবে যে আল্লাই একমাত্র উপাস্য?

এসব খুবই বিতর্কিত প্রসঙ্গ এবং বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, এখানেও কাজ করছে আমাদের বিমিশ্রণধর্মী মানসপ্রবণতা, বিশেষত লোকায়ত চেতনায়। শাস্ত্রবাক্য সেখানে অমোঘ নয়— হয়তো তাদের কাছে আল্লা শব্দের তাৎপর্য অনেক অন্যরকম। বাউলফকিররা তো শব্দ নিয়ে কত খেলা খেলেন, আমি নিজেই এমন কত শুনেছি। যেমন 'বিসমিল্লা'-কে তারা হয়তো বলে দিল 'বিচ মে আল্লা', তারপরে বলল, 'বীজ মে আল্লা', বীজ মানে জন্মবীজ বা বীর্য। তার মানে আল্লা মতান্তরে মূলবস্তু বীর্য। এবারে বলা হল বীর্যই আল্লা এবং তিনি থাকেন দেহে। এমনতর উচ্চারণ মারাত্মক ও অনৈসলামিক বলে নৈষ্ঠিক মুসলমানদের মনে হতে পারে, হয় এবং এমনতর সব বাউল ব্যাখ্যানই তাদের সঙ্গে বিরোধের সূত্র তৈরি করে। বাউলদের শব্দের খেলা যেমন মজার তেমনই সৃজনধর্মী। যেমন 'হংস' শব্দকে উল্টে তারা অনেক সময় বলে 'সহং' বা 'সোহং'— আমিই সে। আদম শব্দকে ভেঙে বলে আ + দম, যার মধ্যে ঈশ্বর দম বা শ্বাস রেখেছেন।

যাই হোক, শক্তিনাথ ঝা খুব বিস্তারে তাঁর বইতে দীক্ষাগ্রহণের পর শ্বাস নিয়ন্ত্রণের প্রণালী বুঝিয়েছেন। সেই পদ্ধতি বেশ জটিল ও অনুশীলন সাপেক্ষ। যেমন :

> নাভি থেকে দক্ষিণ দিকে বাঁকিয়ে দম বায়ু বাঁদিকের হৃৎপিণ্ড ডান হৃৎপিণ্ড হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কণ্ঠনালী দিয়ে উর্ধ্বে তোলার সশব্দ জপের পদ্ধতি গুরু দেখিয়ে দেন। সচরাচর মুসলমান সমাজভুক্ত শিষ্যকে 'লাইলাহা ইল্লালা' এবং হিন্দু সমাজগত শিষ্যশিষ্যাকে 'ওঁ হুঁ চন্দ্রে বিন্দু গুরুবে নমঃ' প্রভৃতি জপের মন্ত্র দেওয়া হয়। বায়ুকে উর্ধ্বগামী করার অন্যান্য মন্ত্র হল,

হু বিন্দু কর্তা হু নাম তোমার বিন্দু বিধাতা
ঐ বিন্দু নাম গণি
হু বিন্দু নামে উদ্ধার কর তুমি
উজানে যাও দয়ার সিন্ধু লাল বিন্দু মণি।

বা

রতির ঘরে বসল কালা
রতি যেন না যায় মারা
দোহাই কালা দোহাই কালা।

তথ্য থেকে আরও জানা যাচ্ছে, যোগ বা জপধ্যান এবং জিকিরের সাহায্যে পিরপন্থার সাধকরা দেহমার্জনা ও মূলবস্তু রক্ষা করে। কেউ কেউ ষটচক্রভেদ করা শেখান। বাউলরা বায়ু সাধনা করে কারণ তারা মনে করে শুধু জপ করে ক্রিয়াচর্যা বা বস্তুরক্ষা সম্ভব নয়। তার জন্য চাই রজবীজের সন্ধান ও সাধনা। সেই সাধনার নিয়ন্তা হলেন গুরু বা মুর্শিদ। প্রতীকী অর্থে যাকে বলে 'বর্জোক'— বর্জোক মানে মধ্যবিন্দু, উপাস্য আর উপাসকের মাঝখানে। তিনিই মাধ্যম, তিনিই সেতু।

বীরভূমের বাউলদের সঙ্গে মুর্শিদাবাদের বাউলদের অনেকটাই মিল লক্ষ করা যায় গুরুর ভূমিকা থেকে। আমরা যেমন বলি গুরু-শিষ্য, কথান্তরে সেটা দাঁড়ায় পির-মুরিদ। জানা যাচ্ছে গুরুশিষ্য সংবাদের আরও রহস্য। যথা—

শিষ্য বা মুরিদের আরবি প্রতিশব্দ বায়য়াৎ। কোরাণে মোবায়াৎ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ ক্রয়-বিক্রয়। শিষ্য বিক্রয়কারী, সে আপনার ধনপ্রাণ, যথাসর্বস্ব গুরুকে অর্পণ করবে। এর বিনিময়ে গুরু আজাত বা ত্রিতাপ জ্বালা থেকে মুক্ত করে স্বর্গসুখের রাজ্যে নিয়ে যাবে এবং দুঃখময় পুনর্জন্ম থেকে তাকে রক্ষা করবে। হিন্দু সমাজের অনেকে দেবতাকে প্রিয় জিনিস উৎসর্গ করে তা চিরতরে পরিত্যাগ করে। ইসলামের যথার্থ কোরবানীতে নফ্‌স্ বা কামনার ধনকে অর্থাৎ স্ত্রীকে কোরবানীর ব্যাখ্যা করে বাউল। নিজের স্ত্রীকে এবং নিজের মূল বস্তুকে গুরুকে দিয়ে দিতে হয় শিষ্যের। সে এগুলির মালিক নয় আর। স্বাধীনভাবে দেহমিলন বা সন্তান সৃষ্টির অধিকার তার থাকে না। দেহ দান এবং নিজের স্ত্রীকেও দান করে দেয়া অহং বিলোপের সাধনায় গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যান্য বাউল গবেষকদের তুলনায় শক্তিনাথ ঝা অনেক সাহসী ও খোলামেলা। সেইজন্য তাঁর বইয়ে বাউলদের কিছু ক্রিয়াকরণ বা গোপন এবং অন্যকে বলা নিষেধ, তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অত্যন্ত স্পষ্টাক্ষরে লেখা হয়েছে। তবে কি এসব তথ্য তত গোপন নয়? নিশ্চয়ই বাউল সম্প্রদায়ের সদস্যভুক্ত মানুষ এসব গুহ্য বার্তা তাঁকে বলেছেন, নইলে তিনি জানলেন কী করে? এ ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারি। সত্তর দশক পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বাউল ফকিরদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে কথাবার্তায় একটা সীমা বাঁধতে হত— অর্থাৎ এই পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, তার বাইরে আর নয়। কালু ফকির নামে এক তাত্ত্বিক আমাকে স্পষ্টই বলে দিয়েছিলেন, 'বাইরে থেকে যতদূর জানা সম্ভব তা তোমার জানা হয়ে গেছে। বাকি যা আছে তা তোমাকে নিজে করে জেনে নিতে হবে। তোমাকে তার জন্য আমাদের কাছে বাউলদীক্ষা নিতে হবে। আমরা তোমাকে সব শিখিয়ে দেব। সাধনসঙ্গিনী হিসেবে নিজের স্ত্রীকে নিতে পারো। তাকে দীক্ষিত করে নিতে পারো, না নিলেও চলবে। তবে আমাদের ক্রিয়াকরণে তাঁর যদি আপত্তি থাকে তবে আমরা তোমাকে কায়াসঙ্গিনী দিতে পারি। তাঁর সাহায্যে ক্রিয়াকরণ জেনে নিলে তোমাকে আর পাঁচজনের কাছে ঘুরে বেড়াতে হবে না। বাবা, এ জিনিস মুখে বলে বোঝানো যায় না— আচরণ করে বুঝতে হয়, তার জন্যে গুরু-মুর্শেদ লাগে, সময় লাগে, ধৈর্য লাগে, লেগে থাকতে হয়।'

তবুও লক্ষ করেছি বিশ-পঁচিশ বছর আগে বাউল সাধকরা একটা আড়াল রাখতেন। 'ওসব খুব নিগূঢ় তত্ত্ব' বলে এড়িয়ে যেতেন। এখন আর তেমন নেই, বাঁধ ভেঙে গেছে। এখন তাঁরাই সব কথা খুলে বলতে আর আপত্তি করেন না। অনেকে গড়গড় করে বলে দেন। হঠাৎ এতটা হাওয়া বদল হয়ে গেল কেন? যাঁরা নিজেদের রাখতে চাইতেন আড়ালে, বাক্য ব্যবহারে থাকতেন কৃপণ হয়ে, শহুরে ভদ্রলোকদের তত বিশ্বাস করতেন না, ভয় পেতেন— এই বোধহয় সব রহস্য সবাই জেনে যাবে— তাঁরাই এখন অনর্গলভাষী কেন? একটা কারণ এই যে, বাউলদের সংবৃত রুদ্ধ সমাজ এখন ভেঙে পড়েছে, প্রধানত অর্থনৈতিক কারণে। আর একটা কারণ, ভদ্রসমাজের সঙ্গে না হোক গ্রাম সমাজের সাধারণ স্তরে বাউল জীবন এখন তেমন আর ধিক্কৃত বা নিন্দিত নেই, চলছে অবাধ চলাচল। এ ছাড়া গায়ক বাউল সম্প্রদায় এখন রুজিরোজগার কিংবা যশ খ্যাতি প্রতিষ্ঠার তাড়নায় গ্রামসীমা ছাড়িয়ে ঢুকে পড়েছেন নাগরিক সমাজে। নাগরিক সমাজও ব্যাপক হারে অংশ নিচ্ছে গ্রাম্য মেলা ও পার্বণে, যেখানে বাউল গান তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেই গান যাঁরা শুনছেন তাঁরা জানতে চাইছেন তার গূঢ়ার্থ। সভা-সেমিনারে এখন বাউলদের অংশগ্রহণ খুব স্বাভাবিক। সরকারি কিছু প্রতিষ্ঠান, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর এবং পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র এখন বাউল-পোষণে সক্রিয় উদ্যোগ নিচ্ছে। তা ছাড়া হচ্ছে সাংস্কৃতিক বিনিময়। যেমন কলকাতায় অনুষ্ঠিত লালন-উৎসবে কুষ্টিয়া থেকে আনা হল সেখানকার একদল বাউল। এখান থেকেও তেমনই নিয়ত যাচ্ছেন বাউলরা— অনবরত ভাব ও তত্ত্বের লেনদেন হচ্ছে। জিজ্ঞাসু মানুষের সংখ্যা বাড়ছে তাই বাউলদের নিয়ে ডকুমেনটারি ফিল্ম তৈরি করা হচ্ছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা একবার তাদের ক্যাম্পাসে গাইতে নিয়ে এল কাঙালিনী সুফিয়া বা কালাচাঁদ দরবেশকে। এসবই নানা ধরনের লেনদেন এবং তার ফলে খুলে যাচ্ছে রহস্যের গুণ্ঠন, ভেঙে যাচ্ছে এতদিনকার চেষ্টিত আড়াল। ক্যাসেট সাম্রাজ্যের প্রসার রহস্যনিমীল গানকে করে দিচ্ছে সর্বত্রগামী। বেরোচ্ছে পত্রপত্রিকার বাউল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংখ্যা। বাউল তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ গবেষকরা গত দশকে বহুতর লেখা প্রকাশ করছেন দুই বাংলায়। বাউল গানের এমন কয়েকটি সংকলন বেরিয়েছে যাতে শব্দের ভাবার্থ বা সংকেত সংযোজিত হচ্ছে— তার মান বা সত্যতা যতই বিতর্কিত হোক। মোট কথা ক্ষিতিমোহন বা মনসুরউদ্দিনদের কাল আর নেই। বাউল গান এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের চর্চার আওতায় এসে গেছে— হচ্ছে নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার বিষয়ভুক্ত। বাউল গানের সুর নিয়ে সংগীতকাররা নতুন নিরীক্ষা করছেন। অবস্থা এমনই বিচিত্র যে, সেদিন এক সাংবাদিক কলকাতা থেকে টেলিফোনে জানতে চাইলেন, 'হ্যাঁ মশাই, চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে গানটার মানে কি?' বাধ্য হয়ে জানাতে হল, মানে নিশ্চয়ই একটা আছে কিন্তু সেটা এত সহজে জেনে যাবেন? এমনকী টেলিফোনে? একী কোনও তথ্য না সংবাদ না মন্তব্য? আর তা ছাড়া বললেই যে বুঝবেন তা কী করে জানলেন? টেলিফোনকারী নিশ্চয়ই প্রসন্ন হলেন না কিন্তু বোঝা গেল বাউল গান এখন সর্বজনীন কৌতূহলের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। এ-তরঙ্গ রুখবে কে?

এবারে সার কথায় আসি। ইংরিজিতে যাকে বলে 'নন-কমিউনিকেটিভ', বাউলরা বহুদিন পর্যন্ত ছিলেন সেই দলে। আর এখন তাঁরা মাস-কমিউনিকেশনের বৃহত্তর বলয়ে আসতে চাইছেন— সেটা সময়ের দাবি। গ্রামিক সমাজের একটেরে মেটে দাওয়ায় বসে অন্তর্গুপ্ত মগ্ন সাধক সন্ধান করতে গেলে এখন হতাশ হতে হবে। বিশ-পঁচিশ বছর আগেও তাঁদের দেখেছি— এখন নেই। অথচ যাঁরা আছেন তাঁদের পক্ষে গোপনতা রক্ষা বাউল জীবনের কোনও শর্ত নয়। বীরভূমের গৌরবাবা প্রাঞ্জল ভাষায় আমার টেপ রেকর্ডারে স্বেচ্ছায় বলে গেছেন তাঁর সাধনবিবরণ— বিনা দ্বিধায়। এই সব ঘটনা বলে, ভূমিকা রচনা করে, এবারে শক্তিনাথ ঝা-র বই থেকে আরেকটু উদ্ধৃত করব।

> শিষ্য-শিষ্যা যদি যথার্থ ভক্ত এবং বাউল তত্ত্ব জেনে থাকে এবং প্রার্থনা করে গুপ্ত দীক্ষা, তাহলে অন্য কতগুলি গোপন পদ্ধতি দীক্ষায় অনুষ্ঠিত হয়। যেমন ভরতপুর থানার তালগ্রামের গুরু লালবাবা শিষ্য-শিষ্যার জিহ্বা চুম্বন ও শোষণ করে দীক্ষা দেন। এতে নাকি কুলকুণ্ডলিনী জেগে ওঠে। দীক্ষার সময় নারী রজঃস্বলা থাকলে সে গুরুকে রজঃ দান করে; অন্যথায় রস বা স্তন দুগ্ধ দান করে।
>
> কলস দীক্ষায় বারো বছরের এক কিশোরীর প্রয়োজন হয়। শিষ্য বস্ত্র এবং নারী দেবে গুরুকে; তিনি রজঃস্বলা নারী দেহে রজঃবীজের মিলন করে, 'ওঁ পদ্ম শুক্রধারা' মন্ত্রে এই দেহরস সংগ্রহ করে, তা দিয়ে শিষ্য-শিষ্যাকে দীক্ষা দেবেন। অনেক সময় গুরু নিজবস্তু দিয়ে শিষ্য-শিষ্যাকে দীক্ষা দেন।

এমন আশ্চর্য অন্তঃশীল গোপ্য জগতের সংবাদ যেমন অস্বস্তিকর তেমনই রুচিহীন লাগতে পারে অনেকের সংস্কারে, কিন্তু এ বিবরণে কোনও কল্পনা নেই। কারণ,

> বাউলদের মধ্যে যথার্থ গুরুকরণ এক গুপ্ত সাধনা।... চারচন্দ্রভেদ বাউল সাধনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। 'চারচন্দ্র আলেক সাঁই তার উপরে কর্ম নাই'... এই চারচন্দ্রের সাধনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> দিয়েই বাউল সনাক্ত করা যায়। দেহ রক্ষায়, বস্তু রক্ষায়, রোগের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় বাউল পন্থায় চারচন্দ্র অনিবার্য এক সাধনা।... যৌনরোগী বা দেহসাধক যারা চারচন্দ্রভেদ করে না, বাউল তাদের বৈদিক-যৌগিক সাধক বলে।

ক্ষিতিমোহনের দাবি, তিনি এই কায়াবাদের বিরোধী যোগপন্থার সাধক বাউলদের গান সংগ্রহ করেছেন।

বাউল দীক্ষার নানা বৈচিত্র্য, রীতিনীতি, গুপ্ত-ব্যক্ত সাধনার বহুচারী স্বভাব বর্ণনা করতে গিয়ে আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গ উঠেছে। দেখতে পাচ্ছি, পশ্চিমবঙ্গের গায়ে-গা-লাগানো দুটি জেলা বীরভূম আর মুর্শিদাবাদে বাউল সম্প্রদায়ের কত কি স্বাতন্ত্র্য। এই স্বাতন্ত্র্যের কারণ নিশ্চয়ই আঞ্চলিকতা এবং পারস্পরিক সংযোগের অভাব। আধা বৈষ্ণব আধা বাউলদের সঙ্গে আধা মুসলমান আধা বাউলদের পার্থক্য দুস্তর। এরা যেন আলাদা গোষ্ঠীর মতো। দু'দলের অবস্থান ও প্রতিষ্ঠাও ভিন্ন। বীরভূমের গ্রামিক সমাজ-ছকে বাউলরা শ্রদ্ধা না পেলেও বিরুদ্ধতা পায়নি কখনও। তারা যেন আবহমান পল্লিজীবনের শরিক। তাদের মাধুকরী চলে হিন্দু গৃহস্থের বদান্যতায়। তাদের গানের শ্রোতা ও সমজদারও গ্রাম্য সমাজ। কিন্তু মুর্শিদাবাদে আলেমদের সঙ্গে বাউলদের সংঘর্ষ ও সংঘাত চলছেই। তার কারণ সেখানকার বেশির ভাগ বাউল শরিয়তি সমাজ ও নির্দেশ অগ্রাহ্য করে চলে এসেছে বাউল পন্থায়। এই আত্মবিচ্ছেদ মুসলিম মানসের পক্ষে অসহনীয়। তাদের ক্ষোভ ও আক্রোশ বাউলদের ওপর আরও বেশি এইজন্য যে বাহ্যত তারা মুসলিম সমাজের অংশরূপে থাকে এবং সেই সমাজকেই ভেতরে ভেতরে প্রতিবাদে প্ররোচিত করে। ইসলাম ধর্মে গান গাওয়া নিষিদ্ধ অথচ বাউলদের গানই একমাত্র আত্মপ্রকাশের বাণী। অন্যদিকে তারা স্বভাবত সৎ ও শান্তিপ্রিয়, অনাড়ম্বর এমনকী দরিদ্র জীবনযাপনে কৃতার্থবোধ করে। মৌলবাদী শক্তির প্রতাপে তারা অসহায় ও সংকুচিত। তাই মার খেলেও পালটা মার দিতে পারে না। মুর্শিদাবাদের একটি গ্রামে একজন বাউল আমাকে বলেছিলেন, 'আমাদের হল চোরের মতো জীবন। আমরা সমাজে আত্মগোপন করে থাকি।' হিন্দু সমাজ থেকে প্রতিবাদী মন নিয়ে যারা বেরিয়ে এসে বাউল হয় তাদের এমন দুর্গতি বা খেদ নেই। হিন্দু সমাজ কাঠামো অত্যন্ত সহনশীল ও উদার।

খোঁজ করলে সারা বাংলায় বাউল সাধনা ও দীক্ষা করণের নতুন নতুন খবর পাওয়া যাবে। কিন্তু এতক্ষণকার আলোচনায় আমরা মনে রাখিনি প্রতিবেশী বাংলাদেশের কথা। বাউল মত স্ফুরিত হয়েছিল অখণ্ড বাংলায়। রাজনৈতিক বিভাজনে দুটি দেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে কিন্তু বিশেষ করে গ্রামসমাজ ও লোকায়ত জীবনের কাঠামো, খাদ্যাভ্যাস ও ভাবনা বিশ্বাসে খুব একটা বিচ্ছেদ ঘটেনি— দুটি দেশকে অলক্ষে ধরে রেখেছে বাংলা ভাষা ও বাঙালিয়ানা, তার লয়ক্ষয় নেই। সেইজন্যই জানতে ইচ্ছা করে বাংলাদেশে বাউলদের বর্তমান অবস্থা কেমন এবং তাদের আচরণবাদ ও দীক্ষাশিক্ষার রীতিপদ্ধতি কতটা স্বতন্ত্র। অবশ্য সেই তথ্য উপস্থাপনের আগে মনে রাখা উচিত যে দেশ বিভাগের ফলে নানা প্রতিকূলতায় বাংলাদেশে বাউলরা প্রায় ক্ষয়িষ্ণু। তা ছাড়া সেখানে ইসলামের জঙ্গি ভূমিকা বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকেই বাউলধ্বংসে উদ্বুদ্ধ। তার ফলে লালন ফকির, পাঞ্জু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাহ, হাসন রজা, দীন শরৎ, শীতলাং শাহ, রশীদ, জালাল ও বিজয় সরকারের মতো উন্নত বাউল গীতিকারের দেশ এখন বন্ধ্যা। কুষ্টিয়ার আবুল আহসান চৌধুরীর পরিবেশিত তথ্য থেকে জানা যায় :

> বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকেই এখন নানাকারণে জাত-ব্যবসা ত্যাগ করে ভিন্ন পেশা গ্রহণ করেছেন। কেউ ক্ষুদে দোকানদার বা ব্যবসায়ী, কেউ নিম্ন চাকুরে, কেউ গতর খাটিয়ে জন-মুনিষ। কিছু সংখ্যক ভিক্ষাজীবীও আছে।

খোদ লালন ফকিরের আস্তানা ছেঁউড়িয়াতে এখন মাত্র কুড়িঘর বাউল থাকে। তাদের মধ্যে দীক্ষাপ্রাপ্ত বাউল স্রেফ ছ'জন। বাউল দীক্ষার অনুসন্ধান তাই সেদেশে বেশ আয়াসসাধ্য কাজ। তবু আবুল আহসান তেমন এক প্রতিবেদন পেশ করেছেন। কুষ্টিয়া অঞ্চলে প্রধানত লালন-পন্থার বাউলরা থাকে। দীক্ষা-প্রতিবেদন তাই সেই ঘরানার বলে ধরে নিতে হবে। বাংলার অন্য অঞ্চলের মতোই বাংলাদেশেও,

> সাধনায় প্রবেশের জন্য বাউলকে গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে হয়। একেক ঘরানার একেক পন্থা আর পদ্ধতি। লালনীয় মতে গুরু তিনবার কলেমা হক পাঠ করিয়ে ঘরে তোলেন দীক্ষার্থীকে। গুরুর হাত থেকে চাল-পানি 'সেবা' গ্রহণের পর দীক্ষার করণ পূর্ণ হয়। এরপর চলে সাঁইজীর নাম-গান। সবশেষে সাধুচরণে নিবেদিত হয় সাধ্য-'সেবা'। সাধারণত দীক্ষার এই অনুষ্ঠান গুরু বা শিষ্যের বাড়ি কিংবা লালন সাঁইজীর ধামে হয়ে থাকে।

কলেমা থেকে চাল-জল সেবা, শিষ্য বাড়ি বা গুরুগৃহ— কুষ্টিয়ার বাউলের সঙ্গে মুর্শিদাবাদের বাউলদীক্ষার অনুপুঙ্খ প্রায় এক, এর কারণ কি? কারণ দুই অঞ্চল খুব কাছাকাছি এবং দুই স্থানেই বাউলদের প্রধান অংশ দীক্ষিত হতে আসে মুসলমান সম্প্রদায় থেকে। কুষ্টিয়ার দীক্ষাকর্মে বাড়তি সংযোজন হল লালনগীতি এবং লালনের ধামের ঐশী অনুষঙ্গ। পরবর্তী বৃত্তান্ত,

> দীক্ষার পর শুরু হয় শিষ্যের পরীক্ষাকাল। গুরুর নির্দেশে চলতে থাকে সাধনভজনের ক্রিয়া-করণ। শিষ্য সাধনার 'স্থূল' বা 'ফাশ্‌ফির শেখ' পর্যায় অতিক্রম করলে ভেক খিলাফতের যোগ্য হয়ে ওঠেন। দীক্ষাগুরু কিংবা তাঁর অবর্তমানে গুরু-মা খিলাফত দিয়ে থাকেন। এঁদের উভয়ের অনুপস্থিতিতে তৃতীয় একজন সাধু এই দায়িত্ব পালন করতে প্যারেন। তবে তাঁকে পাঁচজন সাধুগুরুর সম্মতি নিতে হয়।

লালন পন্থা, দেখা যাচ্ছে, যথেষ্ট উদার। গুরুর বদলে গুরুমা, তাঁদের বদলে তৃতীয় কোনও সাধুজনের দীক্ষাদানের অধিকার ব্যাপারটি অভিনব। এরপরে আবুল আহসান ১৯৯০ সালের ১৯ অক্টোবর লালনের মাজারে (ছেঁউড়িয়ার) অনুষ্ঠিত এক পুরুষ-প্রকৃতির খিলাফত-পর্বের সরেজমিন বিবরণ দিয়েছেন। স্বচক্ষে দেখা বলে লেখকের ভাবাবেগ তার ভাষা-শরীরে প্রত্যক্ষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> দম্পতির নাম আবুবকর সিদ্দিক ও রাইমা খাতুন ওরফে পারুল, নিবাস জেলা যশোরের ঝিকরগাছির কালিয়া গ্রাম। খিলাফত দেবেন প্রবীণ বাউল সাধক ফকির গোলাম ইয়াসিন শাহ। দীক্ষা হবে লালন শাহের মাজারে।

অনুষ্ঠান বিবরণের ভিতরে প্রবেশ করার আগে, পাঠক, জেনে নিতে পারেন আরও কিছু জরুরি তথ্য। যথা— ভেক খিলাফতের দুটি রকম আছে। একটি বৈষ্ণবীয় আরেকটি দরবেশি। দুটির পদ্ধতি ও পোশাক আলাদা, আনুষ্ঠানিক লালনগীতি আলাদা। ভেকে আঁচলা-ঝোলা, খিলাফতে শুধু আঁচলা। ভেকে 'ভিক্ষা' আর খিলাফতে 'নজরানা'। লালনের লেখা 'কাঙাল হব মেঙে খাব' গাওয়া হয় ভেকের সময়। আর দরবেশি মতের খিলাফতে গাওয়া হয় 'কপাট মারো কামের ঘরে।' সেদিন আবুবকর-পারুলের হয়েছিল খিলাফত তবে বৈষ্ণবীয় মতে। এবারে খিলাফতের বর্ণনা—

> মাজার-আঙিনার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সবাই এসে জড়ো হয়েছেন। চারজন সাধু চাঁদোয়ার চারকোণা ধরে রয়েছেন। সৌম্য-সুঠাম দীর্ঘদেহী আবুবকরকে এনে দাঁড় করানো হলো চাঁদোয়ার তলায়। লম্বা বাবরি ও ঘন কৃষ্ণ শ্মশ্রু গৌরবর্ণের ছটাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। আমগাছের পাতার ফাঁক গলে নেমে আসা সূর্যের আভায় ঝলমল করছে সারা শরীর।
>
> আবুবকরের এতদিনের শরীয়তি পোষাক খুলে নিয়ে পরিয়ে দেওয়া হলো 'খিলকা' নামের সেলাইবিহীন একখণ্ড শাদা কাপড় আর শাদা তহবন্দ। পরানো হল 'ডোর কপনি', লেঙ্গটি বা নেংটি; রুদ্ধ হলো কামের ঘর আর সৃষ্টির দ্বার। কাঁধে উঠলো আঁচলা-ঝোলা। গুরুমা গলায় পরালেন শাদা তস্‌বিহ্ বা জপমালা। মাথায় বাঁধা হলো শাদা পাগড়ি বা তাজ। সব কিছুতেই শাদা রঙের ব্যবহার এক বিশেষ প্রতীকী তাৎপর্য তুলে ধরে। হাতে ধরিয়ে দেওয়া হলো জলপাত্র ও একটি ছড়ি।
>
> এবারে আনা হল ধর্মপত্নী পারুলকে। পাড়বিহীন শাদা কাপড়ে জড়ানো হলো তার শরীর; গায়ে চড়লো 'খিলকা'। একে একে তাঁকেও পরানো হলো ভেকখিলাফতের পোষাক। মৃতের অন্তিম-যাত্রার সাজে সাজলেন তাঁরা, 'জিন্দা দেহে মরার বসন।'

মনে হচ্ছে যেন একটা নতুন জগতে এসে পড়েছি আমরা। আধা ইসলামি আধা বাউল সংস্কারের মধ্যে দিয়ে চলছে এক নবজীবনের প্রস্তুতি। সেলাইবিহীন লম্বা ঝুলের খিলকা আর কোমরে জড়ানো তহবন্দ যেন একেবারে ফকিরি সাজ, যাতে নেই কোনও জৌলুস বা অলংকার। এসবই মৃতের সাজসজ্জা— লালনের গানে একেই বলা হয়েছে 'জিন্দা দেহে মরার বসন', ঠিকই। কিন্তু এ কেমন মৃত্যু? এ হল পার্থিব জগতের ভোগসুখকামী সত্তার মৃত্যু। মানুষটির আর কোনও সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকল না— একেবারে পরিবর্তিত সত্তা, 'জ্যান্তে মরা'। খেয়াল রাখতে হবে, শুধু বহিরঙ্গিক রূপান্তর নয়, বিশেষ মানসিক রূপান্তর ঘটে গেছে তার। ইসলামিয়া ছেড়ে সে সামিল হল লোকায়ত সাধনে। আজন্মের সংস্কার ত্যাগ করে এবারে তার অন্তরের অন্তস্তলে ঘটল নবভাবের অভ্যুদয়। বহুবর্ণরঞ্জিত জীবন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে সে শ্বেতশুভ্র রংকে আলাদা করে বেছে নিল— সাদা একরকম প্রতীকী বর্ণ। কীসের প্রতীক? অনন্তদাসের একখানা পদ পেয়েছিলাম জনৈক বাউলের সংগ্রহে। তাতে আছে :

বলো আমার বাবা কোথায় গেল?
দেখিতে দেখিতে আমার দিন গত হল।
শুধাই বৃদ্ধ মাতার কাছে
বাবা আমার কোথায় গেছে?
মা বলে তোর ঘরের ভেতর ছিল।
সহোদর বলে ভাই হাটে মিলে নাই
ভগ্নী বলে অগ্নিবেশে ঘর করেছে আলো।
বাবার দেহ বাবার মায় বাবার দোহাই দিয়ে বেড়াই
পিতাপুত্রে আলাপ নাই যে ভাল—
ইতিপূর্বে মাতৃগর্ভে দেখা হয়েছিল।

রহস্যভরা এমন দেহতত্ত্বের গানের উপজীব্য হল পিতৃবস্তু বা বীর্য— যা সন্তানের দেহেও বর্তমান। তাই মা বলছেন 'তোর ঘরের ভেতর ছিল'। ঘর মানে দেহ, দেহঘর। সেই অমোঘ পিতৃবস্তু, যা সন্তান-সন্ততিক্রমে চলছে মানবসভ্যতার ঊষাকাল থেকে, তার বিলয় নেই। তা সদা সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠে মাতৃগর্ভে গিয়ে। বাউল গানে চমৎকার কিছু পরম্পরার ছক থাকে, যেন অনন্ত সত্যের বিচ্ছুরণ। যেমন একটা পদে আছে, 'ঝিয়ের পেটে মায়ের জনম।' ঝি মানে মেয়ে বা কন্যা, সে জন্মেছে তার মা'র গর্ভ থেকে। আবার সে একদিন হবে মা, তখন বলা যাবে ঝিয়ের পেটে মায়ের জন্ম। তেমনই পিতৃবস্তু থেকে জন্মায় সন্তান, তার মধ্যে থাকে পিতৃবস্তু, যৌবনে সেই বস্তু থেকে সেও অর্জন করে পিতৃত্ব। তবে সেক্ষেত্রে মাতৃবস্তু বা রজের সংস্পর্শ চাই, অর্থাৎ ডিম্বাণু। বাউল ভারী রহস্য করে প্রতীকী আবরণ দিয়ে গানে বলেছে শুক্ররস আর ডিম্বাণুর মিলন কাহিনি— বলেছে,

বসত তাদের শুনি ভাণ্ডের মাঝেতে।
দুই দেশেতে তারা দুইজন বসত করে—
কী প্রকারে দেখা রাস্তার মাঝারে।

এদের রসান দিয়ে বলা হয়েছে 'কালা' আর 'বোবা'। চমৎকার।

পিতৃসন্ধানী সেই সন্তানের কথা হচ্ছিল, যার প্রশ্ন : 'মা, আমার বাবা কোথায় গেল?' পিতাপুত্রে আলাপ নেই তেমন, কেবল অস্পষ্ট স্মৃতি চেতনায় মনে পড়ে যেন মাতৃগর্ভে একবার চকিতে দেখা হয়েছিল পিতাকে। সেই ধূসর স্মৃতি থেকে পিতৃসন্ধান কি সম্ভব? বিভ্রান্তিও তো কম নয়—

কেউ বলে গেছে এই পথে
কেউ বলে গেছে ওই পথে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

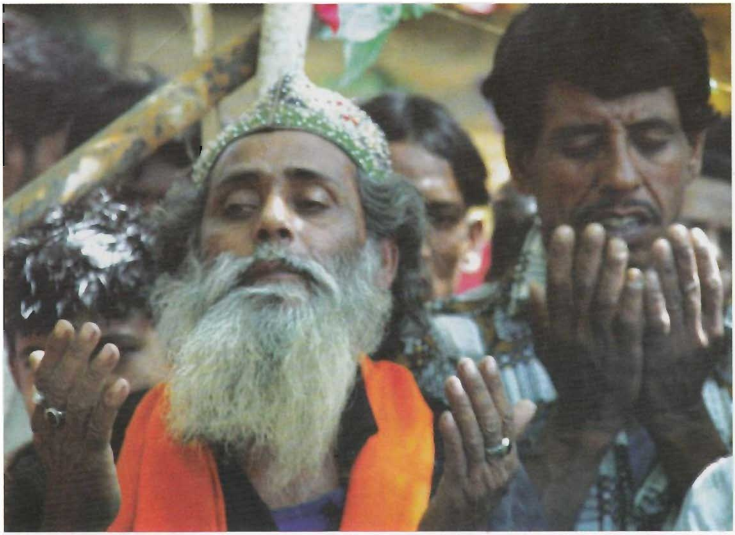

ফকিরের মোনাজাত

মেলায় অতল ঘুমের আহ্বান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্বেতশুভ্র পোশাকের ঝলক

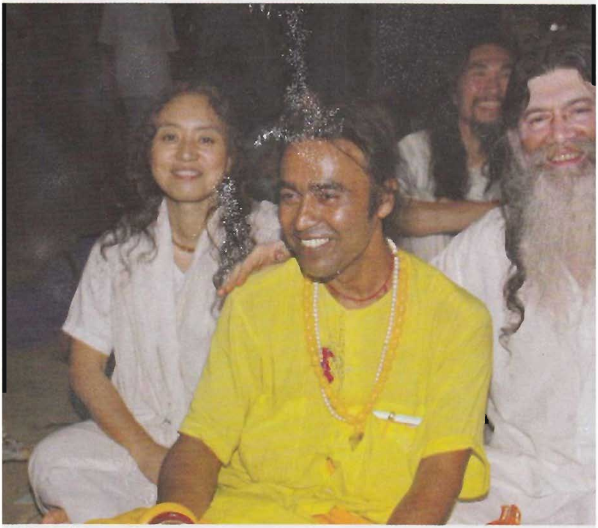

মাকি কাজুমি আর সাধনদাসের মাঝখানে দয়ালদাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

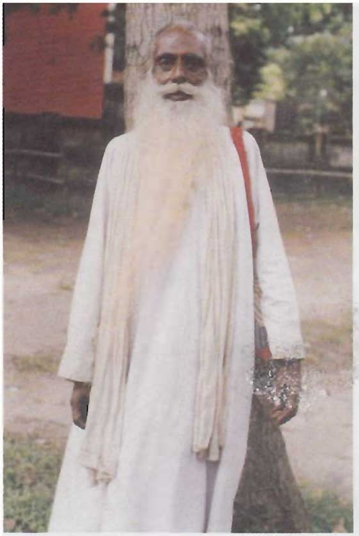
সামশের ফকির (শ্যাম খ্যাপা)

মোসলেম ফকির

যতীন হাজরা

বাউলশিল্পী গঙ্গাধর মণ্ডল ও তুলিকা মণ্ডল (হাজরা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

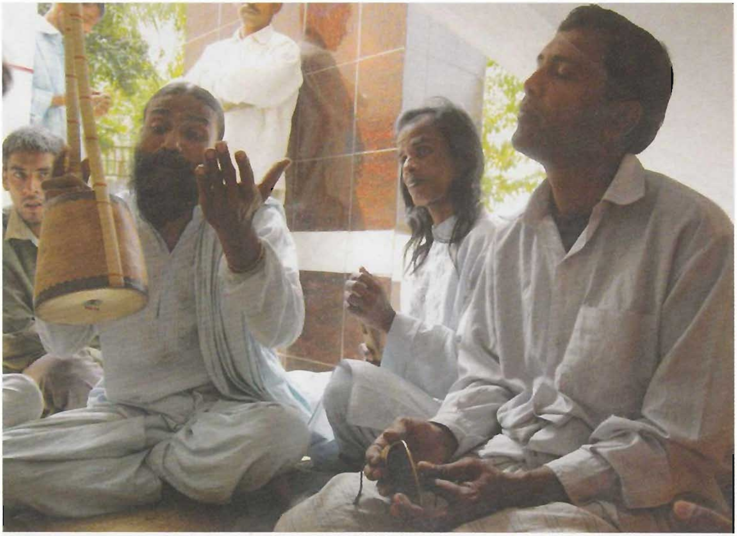
ছেঁউরিয়ায় বাংলাদেশি বাউল

লালন মাজারে গান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নানা মুনির নানা মত কোন পথে বলো?
কেউ বলে নেমেছে জলে
কেউ বলে তব অনিলে
কেউ বলে অনলে পুড়ে গেল।

বাউল কল্পনায় শূন্যতার একটি ভূমিকা থাকে— 'আছে শূন্যভরে একটি কমল।' পিতৃবস্তু, যা জনয়িতা, তা পঞ্চভূত থেকে শরীরে আসে, পুষ্টির পথে, খাদ্যে ও জলে। আব-আকাশ-খাক-বাত, এই চার উপাদানে সব কিছু গড়া, তাই অনল-অনিল-জলের উল্লেখ। এরপরে শেষ কথাটা উচ্চারিত :

আত্মতত্ত্ব যে জেনেছে বাবার খবর সে পেয়েছে
সত্য করে আমার কাছে বলো।
বলো বাবার রূপবর্ণ নাম রূপ তার ভিন্ন ভিন্ন
অনন্ত কয় বিশেষ চিহ্ন
বাবা আমার কালো নয়, ধলো।

অনবদ্য এই জীবনমুখী গান। পিতৃবস্তু অর্থাৎ সাদা। এইজন্যই দীক্ষাবস্ত্রের সবই সাদা। আবুবকর ও পারুল এতদিনে বুঝেছে পিতৃবস্তুর রূপচিহ্ন আর মর্ম। সেইজন্যই তাদের সামনে উন্মোচিত হবে এবার দীক্ষান্ত জীবন, প্রসারিত ও প্রেমময়। কামের ঘরে কপাট মেরে সেখানে যেতে হবে। ঘরের চাবি দিতে হবে গুরুর হাতে। উষ্ণ সংযত সংবেদনে ভরা অনন্ত সাধনজীবন তো বৈরাগ্যের নয়, তাই লালনপন্থী বাউল কখনও গেরুয়া পরে না। আবুবকররাও পরেনি।

এবারে আমরা ফিরে যাই ছেঁউড়িয়ায় লালনের মাজারে— যেখানে চলছে এক আগ্রহী নরনারীর খিলাফতের প্রস্তুতি-পর্ব। প্রত্যক্ষদর্শী লিখছেন,

> নিম্নস্বরে কলেমা বা মন্ত্র পাঠ করালেন খাদেম নিজাম শাহ। জীবিতের জানাজা শেষ হলে সকল দুষ্কর্ম ও পাপ থেকে দূরে থাকার হুকুম হিসেবে শাদা কাপড় দিয়ে দুজনের চোখ ও হাত বেঁধে দেওয়া হল। এরপর গুরু গোলাম ইয়াসিন শাহ্ কম্পিত হাতে মাজার-আঙিনায় একমুঠো চাল ছিটিয়ে বললেন, 'ভূ-মণ্ডলে ছড়িয়ে দিলাম তোমাদের দানা, খুঁটে খাও।' পারুল-আবুবকর গুরুর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে ভক্তি দিলেন। সকল মায়া-মোহ থেকে আজ তাঁরা মুক্ত হলেন। স্বজন-সংসারের কোনো দাবি আর তাঁদের কাছে রইল না। জীবন মরণ, সাধ-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা সবকিছু আজ তাঁরা সঁপে দিলেন সাঁইজীর চরণে। জগৎ সংসারের কাছে তাঁরা আজ মৃত।
>
> এবার শেষ দৃশ্য। হাত-চোখ বাঁধা পারুল-আবুবকরকে গুরুমা আর খাদেমের সেবাদাসী ধীরপায়ে নিয়ে গেলেন সাঁইজীর সমাধি-ঘরের পাশে, সাতবার তাওয়াফ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(প্রদক্ষিণ) করতে হবে। তাঁদের পেছনে সাধু গুরুর দল, একতারা-খঞ্জরি-জুড়ি হাতে নিয়ে ভক্ত-শিষ্যেরা গাইছেন দেলদরিয়ার তুফান-তোলা ভেক-খিলাফতের সেই গানটি :

কে তোমারে এ বেশ-ভূষণে
সাজাইল বলো শুনি।
জিন্দা দেহে মরার বসন
খির্‌কা-তাজ আর ডোর-কোপিনী।
জিন্দা মরার পোশাক পরা
আপন ছুরাত আপনি সারা
ভবলোককে ধ্বংস করা
দেখি অসম্ভব করণি।
যে মরণের আগে মরে
শমনে ছোঁবে না তারে
শুনেছি সাধুর দ্বারে
তাই বুঝি করেছ ধনি।

AMARBOI.COM

তাওয়াফ শেষ হল, গান থামল। এবার শুরু হল গ্রাম-পরিক্রমা ও ভিক্ষা সংগ্রহ।

পাঠকদের তরফে প্রশ্ন উঠতে পারে বাউলদের দীক্ষাশিক্ষা নিয়ে এতরকম ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার সাহায্যে এত বিস্তারে কী প্রতিপন্ন করা হল? এ ব্যাপারে জানানো দরকার যে, বাংলা ভাষায় বাউলদের নিয়ে সুদীর্ঘকাল যাঁরা লেখালেখি করেছেন, তাঁরা সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ খুব কমই ব্যবহার করেছেন। আমাদের নিম্নবর্গের সমাজ কাঠামোর বিশেষত্বের সঙ্গে বাউল-ফকিরদের সংলগ্ন করে তাঁরা দেখেননি। একদল তাঁদের আচরণবাদকে ঘৃণা ও নিন্দা করে কার্যসমাধা করেছেন, আরেকদল উচ্ছ্বসিত হয়েছেন বাউল গানের বাণীর তাৎপর্যে, ভাবের মরমি রহস্যে। তাদের সাংকেতিক শব্দগুলির রহস্যভেদ না করে শিষ্টসমাজের শিক্ষিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভাববাদী ব্যাখ্যা করে বসেছেন। এমনকী হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতো বস্তুবাদে বিশ্বাসী কমিউনিস্ট, বাউলদের সঠিক বোঝেননি। তিনি কোনও অজানা কারণে লিখেছেন,

> বাউলরা প্রচলিত ধর্ম, জাতি বা বর্ণবৈষম্য, দেবদেবী, পূজা-আচার, নামাজ-রোজা, মন্দির-মসজিদ কণ্টকিত সামন্ত সমাজের ধ্যানধারণাকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করতেন, এবং সেই ভাবধারাতেই আপ্লুত তাঁদের 'মনের মানুষ' এক নতুন মানবতাবাদের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। সামন্ত সমাজে নিপীড়িত জনসমাজে তাই সেই মানুষটি আসন পাততে পেরেছিল।

তিনি বোঝেননি যে 'মনের মানুষ' তত্ত্ব কোনও নতুন মানবতাবাদের প্রতীক নয়— নিতান্তই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যৌন-যৌগিক পরিভাষা। সেই 'মনের মানুষ'-কেই তাঁরা সকলের কাছে আবৃত রাখতে চেয়েছিলেন। লালন-পাঞ্জু-দুদ্দু শাহ্-র মতো মানুষতত্ত্বে বিশ্বাসী বাউলদের আসল সংগ্রাম সামন্ত সমাজের সঙ্গে ছিল না, তাঁরা চেয়েছিলেন অজ্ঞ অশিক্ষিত কুহকে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সাধারণ মানুষের ভ্রান্তিমোচন ও নতুন পথ নির্দেশ। ভদ্রলোক শ্রেণি বা সামন্তশ্রেণি নিয়ে তাঁদের কোনও উৎসাহ বা দুশ্চিন্তা ছিল না, সেই শ্রেণির জন্য তাঁরা গানের একটি পঙ্‌ক্তিও রচনা করেননি। তাঁদের ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন করেছিল গ্রামীণ সমাজে প্রবর্ধমান 'বুত্‌পরোস্তি' (পৌত্তলিকতা), 'পীরপরোস্তি' (ধর্মের অলৌকিকতায় অন্ধবিশ্বাস) এবং জাতিবর্ণভেদের তীব্রতা। দরগাতলায় হত্যে দেওয়া, আলেয়া, পেঁচোপেঁচি, ভূতপ্রেত, ফেরেস্তা, কাঠের ছবি, মাটির ঢিবি, হরিষষ্ঠী-মনসা-মাখালের মতো অপদেবতা নির্ভরতা, নামাজ রোজা, ব্রত উপবাস, তীর্থভ্রমণ ও নির্জনে গিয়ে বৈরাগ্য সাধন— এ সবই তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল। তাঁরা চাইছিলেন সাধারণ মানুষের মানস-উত্তরণ— অন্ধতা, কুসংস্কার আর আচরণবাদী শাস্ত্রসর্বস্বতা থেকে। এর পাশে মানবতার আদর্শ বা মানবতাবোধকে তাঁরা জাগাতে চাননি— কেননা সেসব উচ্চভাব তাঁদের অজ্ঞাত ছিল। যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে দেশপ্রেম বিষয়টি বাঙালির অজ্ঞাত ছিল। এগুলি বিদেশাগত ধারণা, ঔপনিবেশিক সূত্রে প্রাপ্ত।

তা হলে লোকায়ত বাউলরা মানুষ বলতে কী বুঝেছিলেন? অন্তত হিউম্যানিজম বা হিউম্যানিটি বোঝেননি। তাঁদের কথার ধরতাই আগেও ছিল এখনও আছে যে, মানুষ ধরো। মানুষ রতনকে যত্ন কর। তাঁদের স্পষ্ট কথা : 'মানুষতত্ত্ব যার সত্য হয় মনে/ সে কী অন্য তত্ত্ব মানে?' এই মানুষতত্ত্ব গড়ে ওঠে মানুষরতনদের সমন্বয়ে। কিন্তু মানুষ রত্ন জন্মসূত্রেই অর্জনীয় গুণ নয়— তা হয়ে উঠতে হয়। তার জন্য আকুলতা, গুরুকরণ ও সাধনা চাই— চাই যৌনতার পথ, নারী ও আত্মসংযম। তবেই মানুষ হতে পারে মানুষরতন। কাজেই প্রথমে চাই মানুষতত্ত্বে বিশ্বাস—দেবতত্ত্বে বা কুহকতত্ত্বে নয়, অলৌকিকতায় নয়। দেবদেবতারা পর্যন্ত এই মানুষজন্মের জন্য পাগল, লালন বলেন। বাউল আসলে 'মনের মানুষ'-চর্যার পথে মানুষকে ধরে, স্থিত হতে চায় অবিকল্প মানুষতত্ত্বে।

কখনও কখনও এমন হতে পারে যে বরাবর আমরা বাউলদের ভুল বুঝে চলেছি এবং হয়তো তাদের ভুলপথে চালনা করছি। অরুণ নাগ যেমন লক্ষ করেছেন :

> পশ্চাদপটে শোলার কাজে আল্পনার মোটিফ, কর্তারা ধুতি পাঞ্জাবিতে মঞ্চে শোভিত, তেমন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে বাউল গানও অবধারিত।

অরুণ অভিযোগের আঙুল তুলেছেন রবীন্দ্রনাথের দিকে, কেননা বাংলার বাউল নিয়ে আজ মধ্যবিত্ত শিক্ষিতজনের যে ভাবালুতা তার মূল কারণ রবীন্দ্রনাথের বাউল সম্পর্কে উৎসাহ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি বাউলদের সঠিকভাবে বুঝে তাদের যথাযথভাবে উপস্থাপিত করেছেন বাঙালির ভাবলোকে? অরুণ মনে করেন :

> বাউল সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ, দরদ সুপরিজ্ঞাত। আন্তরিকতা নিয়ে কোনোই সংশয় নেই, তবে সত্যের খাতিরে স্বীকার করা উচিত, তাঁর দর্শন খণ্ড-দর্শন। তার কারণ এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয় যে বাউলদের ধর্ম তথা জীবনাচরণ নিয়ে সমকালে যে নিন্দাস্রোত প্রবহমান, সে সম্পর্কে তিনি নীরব। নিশ্চয় তা সমর্থনের নীরবতা নয়, পঙ্কজের সমাদর করতে পঙ্কের উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা তিনি বোধ করেননি। তাঁর দর্শনের সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হবে অন্য একটি উদাহরণ দিলে। তিনি বাউল গানের রসিক, বহু গান প্রকাশ করেছেন, উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু বাউল গানের বিশিষ্ট শাখা, দেহতত্ত্বের গান তাঁর বিশেষ মনোযোগ পায়নি। বাউল ধর্ম অনুগামীর সংখ্যায় গৌণ হলেও যে-কোনো মুখ্য ধর্মের মতো তারও নিজস্ব সাধনপন্থা আছে, আছে আচার, পালনীয় অনুষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথ তাতে অনাগ্রহী। স্বয়ং কবি, তথা ধর্মের উদার মানবতাবাদী। তিনি বাউলদের দেখতে চেয়েছেন মূলত মরমীয়া কবি হিসাবে, যাদের জাত পাতের উর্ধ্বে উদার মানবপ্রেমের কথা।

অরুণ নাগ এখানে অভিযোগটি সঠিক লক্ষ্যে নিক্ষেপ করেছেন কিন্তু তাঁর বক্তব্যও সম্পূর্ণ নয়। তিনি বলাতে পারতেন, বাউলের জীবনচর্যার সামান্যই প্রতিফলিত হয়েছে বাউল গানে, কেননা তাদের মধ্যে ক'জনই বা গীতিকার? মূল বাউল স্রোতে সাধনমার্গী মানুষের সংখ্যা তো শত শত। তাদের মধ্যে ক'জনই বা গায়ক? তার মধ্যে আবার ক'জনই বা তত্ত্বজ্ঞ গায়ক? আমরা সভাসমিতিতে শোলার আল্পনার মোটিফ টাঙিয়ে রবীন্দ্র গানের পাশে যে বাউল গান শুনে থাকি, শুনতে চাই তা তো কোনও তত্ত্ব গান নয়— খানিকটা প্রহেলিকাময় গান, খানিকটা নাচ ও তালে স্পৃষ্ট মজার গান। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এমন একটা বাউল গানের নমুনা দিয়েছেন, যেমন—

এঁড়ে গরু বেড়া ভেঙে
খেজুর গাছে চড়েছে
কাল রাতের বেলা বউ আমাকে
বাবা বলেছে।
দু দু দুম দুদু দুম দুম দু-দু দুম

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে এমন উদ্ভট গান কেন বাউল গায়? উত্তরটাও জানা : আমরা শুনতে চাই বলে। এইখানটায় একটা মস্ত ফাঁকিবাজি তৈরি হয়েছে। কিছু ফন্দিবাজ মানুষ বাউল গানের নামে অদ্ভুত সব গান লিখে চলেছে। তা গাইবার মতো সাজা বাউলেরও অভাব নেই।

কিন্তু অরুণ নাগের আরও শাণিত প্রশ্ন আছে, রবীন্দ্রনাথের বাউল-অন্বেষা সম্পর্কে। তিনি বলতে চেয়েছেন, আমাদের কাছে পথিকৃৎরূপে রবীন্দ্রনাথ যে-বাউল মূর্তি রচনা করেছেন তাতে মিশেছে তাঁর আপন মনের মাধুরী। অরুণ খেদ করেছেন এই বলে যে,

জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয়ে রবীন্দ্রনাথ বারবার গর্ব অনুভব করেছেন, ধর্ম জাতের লড়াইয়ে দীর্ণ ভারত ভারতবর্ষের একমাত্র চেহারা নয়, তার অন্তরালে যুগ যুগ ধরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বয়ে আসছে, নিরক্ষর দরিদ্র সাধারণজন যে স্রোতকে সজীব রেখেছে, সেই উদার মানবপ্রেমের স্রোতস্বিনী। কিন্তু সেই সব ধর্মের বাহ্যিক রূপ, আচার, সাধনপন্থা সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল নেই। ফলে কবির বাউল হয়ে উঠেছে আধেক কল্পনা, আধেক সত্যের বাউল, রবীন্দ্রানুরাগী শিক্ষিত বঙ্গ মানসে যার গভীর ছাপ পড়েছে।

আসল সংকট এই বাউল শনাক্তকরণ নিয়ে। কোন বাউলকে আমরা শিক্ষিত সভ্য মানুষরা চাই? কোন বাউলকে আমরা প্রোজেক্ট করছি? সে কি গরিব ট্রেনে-গান-গাওয়া অসহায় বাউল? সে কি বর্ণরঙিন বেশে নেচে কুঁদে আসর-জমানো বাউল? অথবা আমরা সত্যিই কি শরিক হতে চাই সেই রুদ্ধগীত বাউলের, মৌলবাদী মুসলমানরা যাদের হাতের একতারা ভেঙে দিচ্ছে? আমরা কি সেই বিপন্ন বাউলের সামাজিক বন্ধু ও প্রতিবাদী? অথবা আমরা শুধু জয়দেব কেঁদুলির মতো বার্ষিক মেলায় গিয়ে তাদের সঙ্গে গাঁজা খেতে উৎসাহী?

সারা দেশ ঘুরলে বাউল সম্পর্কে সংকটের আরও নানা চেহারা চোখে পড়ে। বেকার সমস্যা সমাধানের পক্ষে বাউল গান গাওয়া একটা ভাল পেশা। বর্ধমান, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া সর্বত্র এমন যুবক আমি অনেক দেখলাম গত চার বছরে। বাবরি অথবা ঝুঁটি বাঁধা চুল, লম্বা ঝুলের দামি পাঞ্জাবি, মোট দশটা বিশটা বাউল গানের পুঁজি— আসর কাঁপাচ্ছে কর্ডলেস মাইক ধরে।

সারা বছর নজরুল গীতির টিউশনি করা যার জীবিকা, প্রয়াগ সংগীত সমিতির 'সংগীত প্রভাকর', মেলার আসরে তার স্বনির্বাচিত নাম সুধাকান্ত বাউল, গাইছে ভবা পাগলার গান। কিংবা ধরা যাক সেই প্রসিদ্ধ গোষ্ঠগোপাল দাসের কথা। আধুনিক ধাঁচের বাউল গানে অল্প দিনে বাজার মাত করে, কাঁচা পয়সার ঝাঁজে, অপরিমিত মদ্যপানে অকালে বিদায় নিল। কণ্ঠে জাদু ছিল, গায়করূপে যেতে পারত অনেকটা, ঝরে গেল অকালে। পুরুলিয়ায় দেখেছি নামকরা ঝুমুর শিল্পী বাউল গাইছে। কথা বলে বোঝা যায়, বাউলতত্ত্ব ও সাধনার কিছুই জানে না, কিন্তু গাইছে লালনের গান ঝুমুরের ধাঁচে। কিংবা ধরা যাক মামণি দাসের কথা। হাতে গুঁজে দিল একটা ক্যাসেট। ক্যাসেট কভারে লং শটে কালার ফোটো। টাঁর জমিতে একতারা হাতে চলেছে মামণি দাস।

এসব কি আমরা উপেক্ষা করব? দেখেও দেখব না? শহরের শিষ্ট মঞ্চে রবীন্দ্রজয়ন্তীতে গান হচ্ছে 'বাদল-বাউল বাজায় রে একতারা।' হঠাৎ উইংস থেকে মঞ্চে ধেয়ে এল এক বালিকা। চুড়ো করে বাঁধা চুল, লুঙ্গির মতো ধুতি আর গেরুয়া আলখাল্লা পরনে, হাতে একতারা (যা বাজছে না) নিয়ে দুরন্ত নাচ শুরু করে দিল। খেয়াল করলে চোখে পড়বে কপালে নাকে রসকলির ছাপ। পায়ে ঘুঙুর। মুখে বাঁধানো হাসি। ছোটবেলায় মফস্‌সলে জজকোর্টের মাঠে দেখতাম একজন ঠিক এইরকম বাউল সেজে পরিত্রাহি চেঁচিয়ে গান গাইত। তারপরে প্রচুর লোক জমে গেলে দাঁতের মাজনঅলা তার মাজনের গুণাবলি বলত। নানাভাবে বাউল আমাদের স্বার্থে ব্যবহৃত ব্যবহৃত ব্যবহৃত হয়ে...।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধনসঙ্গিনীর রহস্যলোক

ঘোর জষ্টিমাসে বসে আড়ংঘাটায় যুগলকিশোরের মেলা। লোকে চলতি কথায় বলে 'যুগলের মেলা'। আর পাঁচটা বাংলা মেলার সঙ্গে খুব একটা তফাত নেই। ওই খেলনা, হাঁড়িকুড়ি, নাগরদোলা, বাঁশি, সার্কাস আর বড় বড় মিষ্টির দোকান। না, কেঁদুলির মেলার মতো নগরজীবনের ততটা স্পর্শ পড়েনি তাই ওয়াইন শপ এখনও গজায়নি। অবশ্য মেলার আশেপাশে, লুকোছাপা করে ধেনো বা চোলাই যে চলে না তা হলফ করে বলতে পারব না। তবে যুগলের মেলায় যেটা বড় আকর্ষণ সেটা সন্ধের পরে বাউলগানের আসর, চলে অনেক রাত অবধি। আড়ংঘাটায় আশেপাশে বেশ ক'জন বাউল আছে। দু'দশক আগে খুব নাম ছিল সুধাময় দাস বাউলের। চমৎকার মানুষ, চমৎকার গাইত। তারপরে যা হয়, গাঁজার টানে গেঁজিয়ে যাওয়া। গান গাইতে বিদেশ গিয়েছিল— সাহেবমেমরা তাকে মাথায় তুলে মাটিতে আছড়ে ফেলেছে। গাঁজার বদলে হাসিস খেয়ে অবস্থা তুরীয়— গানের গলা ভেঙে গেছে, স্বাস্থ্য গেছে চুপসে। সাহেবি ট্রাউজার আর দান করা জাম্পার পরা সুধাময় এখন এক ট্র্যাজিক চরিত্র।

তবু তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, কারণ বছর পঁচিশ আগে, যুগলের মেলাতে তার আখড়ায় আমি একরাতের আশ্রয় ও আহারের সুযোগ পেয়েছিলাম। তখনও বাউলদের জীবনে তত পাকাপোক্ত হইনি। বেশ খানিকটা রোমান্টিক ধারণা নিয়ে গড়পড়তা শিক্ষিতদের মতো তাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখি। ভাবি, আহা কী মুক্ত বাউলজীবন, কী উদার মানবিকতার স্ফুরণ! মনের মানুষের তত্ত্বে একেবারে আপ্লুত যাকে বলে। খাঁচার ভিতরে অচিন পাখির আনাগোনার রূপক আমাকে রবীন্দ্রনাথের মতোই আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তখনও জানি না 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই চণ্ডীদাসীয় উচ্চারণের মানুষ কথার অর্থ হিউম্যানিটি বা হিউম্যানিজম আদৌ নয়— মানুষ শব্দের আসলে একটা যৌন-যোগাত্মক ইঙ্গিত আছে। তখনও কবীরের লেখা দোঁহা ও বীজক তেমন করে পড়িনি অর্থাৎ 'টেক্সট' রূপে। তাই লালন শাহের গানে 'ছুন্নৎ দিলে হয় মুসলমান/ নারীর তবে কী হয় বিধান' পড়ে লালনের মৌলিকতায় তো ডগমগ হয়ে আছি, পরে আবিষ্কার করি— আরে, এতো কবীরের একটি বীজকের আক্ষরিক অনুবাদ!

বাউলজীবন নিয়ে যারাই কাজ করে তাদেরই এমন দ্বিস্তরের অভিজ্ঞতা হয়— মোহ ও মোহভঙ্গ, তারপরে গড়ে ওঠে এক স্পষ্ট নবচেতনা, যা একটা বলিষ্ঠ প্রত্যয়ভূমিতে দাঁড় করিয়ে দেয়। বাউল বলে নয়, ফকিরি দরবেশি সহজিয়া ইত্যাদি বর্গের গুহ্য সাধনায় সবসময় যেমন দ্ব্যর্থ থাকে তেমনই তাদের ভেতর-বাইরের দুটো জীবন থাকে। বাইরে ভারী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোমল ও মরমি কিন্তু সাধনার ক্ষেত্রে খুব নির্মম ও নির্বিকার তারা। দেহগত সব সাধনারই এই এক তরিকা। শরীরটা বশ করতে হয়, তার জন্য দেহ নিয়ে চরম সাধনা করতে হয় এবং সেইসঙ্গে মনের সংযম আনতে হয় চূড়ান্ত পর্যায়ের। তাদের গানে বেশ সাদাসাপটা বলা হচ্ছে বড় কঠিন কথা ও প্রত্যাদেশ : 'কামে থেকে হও নিষ্কামী।' ক'জন পারে?

যুগলের মেলার কথা বলতে বলতে যুগলসাধনার কথা চলে এল এবং সেই সুবাদেই সুধাময় দাসের আখড়ার প্রসঙ্গ মনে পড়ল। সেবার তার আখড়ায় বসে আছি। দুপুরে খিচুড়িভোজন করে একটু গা এলিয়ে নিয়েছি। বিকেল-সন্ধের মুখোমুখি বসে গেছে বাউলের আসর। আখড়ার সর্বত্র মিনতি নামে একটি মেয়ে বেশ চোখ টানে। মিষ্টি দেখতে লম্বা ছিঁয়ালো চেহারা। সর্বদা ছোটাছুটি করে সবাইকে দেখাশোনা করছে। আমাকেই বার কয়েক লাল চা খাইয়েছে। বুঝতে অসুবিধে হয়নি, বৈরাগ্যের আখড়ার সবদিক এই নারী সামলে রাখে। সেবাযত্নে খরদৃষ্টি। সুধাময় তো ব্যাপক গঞ্জিকা সেবন করে দিব্যোন্মাদ, বসে বসে শুধু হাসছে। বাউল গায়করা আসরে আসছে, গেয়ে চলে যাচ্ছে। তাদের চা-মুড়ি তেলেভাজা খাওয়ানো, তাদের বসানো, দু-দণ্ড কথা বলা, রঙ্গ-রসের যোগান, কুশল নেওয়া সবই ওই মিনতি। গায়ের রং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, স্বেদ মাখানো হাস্যময়ী মুখশ্রী, সেবাদাসী। বেশ ভাল মধ্যবিত্ত বাড়িতে মানানসই বউ হতে পারত, মাথায় করে রাখত সংসার। সবরকম ঝকমারি সামলেসুমলে আবার দু'-তিনটে সন্তান পালন করত হাসিমুখে। স্নেহ মমতা তার চোখে ঝরে পড়ছে। কিন্তু আপাতত সুধার কব্জায়। তার গানেই মজেছে সন্দেহ কি?

সুধাময় দাসবৈরাগ্যের সেবাদাসী মিনতি দাসী— বেশ তো চমৎকার লোকায়ত জীবনের ফ্রেমে বাঁধানো এক তেলচকচকে আলেখ্য। মিনতিকে তো ফুসলে আনেনি সুধা। সে নিজেই এসেছে, মেনে নিয়েছে এই সুখদুঃখের দৈনন্দিন। গান শিখেছে গুরুর কাছে, শিখেছে দেহতত্ত্বের খুঁটিনাটি। কোনও সংশয় সন্দেহ নেই, ফেলে-আসা পিত্রালয়ের জন্যে দরদ বা মা-ভাই-বোনের স্নেহনীড়ের স্মৃতি তাকে উন্মনা করে কিনা কে জানে? বেশ তো গুনগুন করছে নিরন্তর কাজের ফাঁকফোকরে। গাইছে :

ঘুচিয়ে মলামাটি
হয়েছি পরিপাটি
করিনে নটিখটি—
এবার খাঁটি পথে দাঁড়িয়েছি।

সাংসারিকতার ময়লামাটি নাকি তাকে আর স্পর্শ করে না— গৃহীজীবনের 'নটিখটি' অর্থাৎ তুচ্ছ ব্যাপারে নাক গলানোর প্রবৃত্তি তার আর নেই। পরিপাটি হয়ে মিনতি দাসী এবার খাঁটি পথে দাঁড়িয়েছে। খাঁটি পথ? এটাই যে খাঁটিপথ জানল কী করে? এই বিবাহবিহীন একত্র থাকা, এই সন্তানহীন যুগলজীবন, ভবিষ্যৎ স্বপ্নহীন, বর্তমান অনিশ্চিত, এটাই খাঁটি? সামাজিক সম্মান নেই, আর্থিক স্বাধীনতা নেই, রোজকার অন্ন নেই, তবু এটাই খাঁটি পথ?

মিনতির চলে আসাটা খাঁটি, বৈরাগীর প্রতি টানটা প্রবলভাবে খাঁটি, এই দেহসাধনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবোষ্ণ তাপ সেটাও খাঁটি, কিন্তু তার জীবনসঙ্গীটি কি সৎ ও মিনতিনিষ্ঠ? না। সেটা এতক্ষণে আমি যেমন জেনে নিয়েছি এর-ওর কাছ থেকে, তেমনই আন্দাজই করতে পারি মিনতিও জেনেশুনে আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে। সবাই জানে, সুধাময় দাস মোটেই একনিষ্ঠ নয়। দু'-চারজন এমন ধরনের মিনতি তার কাছে এসেছে আবার চলে গেছে। মানুষটা বাউন্ডুলে, গ্যাঁজালে কিন্তু ভারী সুন্দর গান গায়, বড় চমৎকার দরদি ভাষায় কথা বলে। তত্ত্বগানের আসরে সে যেন বাচস্পতি। পুরাণ কোরান কণ্ঠস্থ। তার সঙ্গে গানে পাল্লা দেবে এমন কেউ নেই নদে-মুর্শিদাবাদ-বর্ধমানে। ইউসুফ ফকিরও হার মানে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এত কথায় আমার দরকার কী? সত্যিই কিছু এসে যায় না, অন্তত ওদের, যারা দিব্যি মেনে নিয়েছে অনিশ্চিত বাউল জীবনের ধূসর ভবিষ্যৎ। ধূসর তো নয়, সমুজ্জ্বল— অন্তত নিজেদের বোধে। ওরা বেশ আছে ওদের মতো, বাধাবন্ধন নেই, আসাযাওয়া দু'দিকেই দরজা খোলা। খুব আনন্দ করতে পারে। ভক্ত বা সমাগত সবাইকে সেবা দেয় হৃষ্ট মনে। স্বার্থবোধ নেই, কেরিয়ার নেই, সন্দেহবাই নেই। এগুলো সবই আমাদের শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের একচেটিয়া।

পুরুষশাসিত সমাজের কর্তৃত্বপরায়ণতা কতটা আছে বাউল সমাজে? এখানে অধীনতার তাৎপর্য কতদূর? নারীবাদের তত্ত্ব প্রয়োগ করলে আমাদের সমাজ-আদলের মতো এখানেও কী দেখা যাবে পুরুষের সদম্ভ স্বাধিকার? যৌন নিগ্রহ বা যৌন আধিপত্য এখানে কতটা? এসব প্রশ্ন এখন আমার মনে আর তত ওঠে না, কিন্তু দু'দশক আগে উঠত। যুগলের মেলায় যখন গিয়েছিলাম তখন এসব জিজ্ঞাসায় আমি জিজ্ঞাসাতুর ছিলাম। সামনে বেশি উদাহরণ ছিল না, বাউল জীবন তখনও দেখিনি সানুপুঙ্খ। তাই মিনতিকে দেখে যাচ্ছিলাম অনেকটাই সাগ্রহে, পদে পদে। ভাবছিলাম কোন উৎস থেকে মিনতি পাচ্ছে এত উৎসারিত স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের রসদ? সেকি কাম? দেহগত কামনার পরিপূর্তি? না প্রেম?

আখড়ায় চোখ মেলে দেখবারও কত কি থাকে। ধরা যাক, প্রথমেই ভূমিশয্যা। উঁচুনিচু মাটির ওপরে পুরু করে খড় বিছানো, তার ওপরে শতরঞ্চি বা পাটি। তার ওপরে আমার জন্যে বিশেষভাবে পাতা হয়েছে একটা বড় কাঁথা— বহু যত্নে বহু দিন ধরে চলেছে তার সীবনকর্ম। একেবারে সাদামাটা কাঁথা নয়, তার চারপাশে রঙিন সুতোর বর্ডার। হাতি হাঁস ময়ূরের মূর্তি আঁকা। এ প্রতীকগুলোরও আলাদা মানে আছে সে কি জানতাম? মিনতিই বুঝিয়ে বলেছিল : 'হাতি মানে মত্ত মাতঙ্গ, যাকে বলে কামনা।'

—আর ময়ূর?

—ময়ূর মানে স্ত্রীলোক। পেছনে কলাপ মেলা রূপ— চোখ ধাঁধানো। ময়ূরের রং হল নীল, চোখটা লাল। নীল মানে ঈর্ষা, লাল মানে কামনা। নারীর অন্তরে থাকে ঈর্ষা, চোখে থাকে কামনা।

কামনার কথা জিজ্ঞেস করা উচিত নয়, তাই নিরীহ প্রশ্নটা করতে পারি, 'তোমাদের অন্তরে কি ঈর্ষা থাকে নাকি? এত যে সেবা করছ, মানুষকে ভালবাসছ, কোথায় ঈর্ষা?'

'ঈর্ষা কি চোখে দেখা যায়?' মিনতি রহস্যের হাসি হেসে বলেছিল, 'ঈর্ষা আছে আমার অন্তরভরা। গোঁসাই কত বকে, তবু ঈর্ষা কি মরে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কাকে ঈর্ষা তোমার? কেন?

—ঈর্ষা হিংসা মেয়েমানুষের তো মেয়েমানুষের ওপরই থাকে। আমারও তাই আছে। গোঁসাইয়ের চোখ দ্যাখেননি তো? ভেতরে ভেতরে আরও সেবাদাসী খোঁজে। পেয়েও যায়। আমাদের এই লাইন ভাল নয়। ওই যে কাঁথাখানায় বসেছেন তার কোণে কার নাম লেখা? আসমানী দাসী। সে ছিল আমার সতীন। তাকে বিদেয় করে গোঁসাই চরণে স্থান দিয়েছেন আমাকে। সে নেই কিন্তু তার করা কাঁথাটা রয়ে গেছে।

কথার টানে মিনতি এক বিচিত্র জগতে এনে ফেলেছে। চোখ খুলে যাচ্ছে। এবারে আর প্রশ্ন করি না, বুঝতে পারি হাঁস মানে কী। হাঁস মানে সাধক— নির্বিকার পরমহংস।

এ বড় বিচিত্র জগৎ— আশ্চর্য বিশ্বাসের জগৎ। জলের ছুঁচ আর পবনের সুতো দিয়ে দিয়ে নাকি মানবদেহ গড়া। আপাতত অত ভাবালুতার প্রয়োজন নেই। আখড়ায় পাতা রয়েছে আসমানী দাসীর হাতে বানানো চিত্রবিচিত্র কাঁথা, প্রতীক প্রতিমায় দ্যোতনাময় কিন্তু আসমানী কোথাও নেই। সে কী নিজেই চলে গেছে না গোঁসাই তাকে তাড়িয়েছে? নাকি ঈর্ষাকাতর মিনতির আরেকটা রূপ আছে সেবাব্রতর আড়ালে? এখন সে কাজের ফাঁকে ফাঁকে গুনগুন করে গান গাইছে মধুরকণ্ঠে সেই হয়তো তীব্র কাংস্য চিৎকারে কলহ করতে পারে। এটা ঠিক যে লোকায়ত জীবনের নানান রূপ নানা ছন্দ।

হঠাৎ আমার চোখের সামনে থেকে আখড়ার সমস্ত উৎসব আনন্দগানের আবহ সরে গেল। জেগে উঠল এক অসহায় নারীর অদেখা চেহারা— আসমানী দাসী। নামটা শুনলে মনে হয় বুঝিবা মুসলমান ঘরের মেয়ে। সম্ভবত তা নয়, কারণ গাঁ-ঘরে নারীর কতরকম নাম থাকে। যাকে আসমানী শুনে ভাবছি মুসলমান সে হতেই পারে হিন্দু, আবার খোদ মুসলমান বাড়িতে মেয়ের নাম শুনেছি গোপালবালা। তাই এসব থেকে কিছু বোঝায় না। আমার কাছে অনেক বেশি করে জেগে উঠছে এক নারীর নিষ্ক্রমণ বার্তা। যে চলে গেছে কিন্তু রেখে গেছে তার হাতে তৈরি কাঁথা। সে-কাঁথায় আসমানী ফোঁড় তুলে এঁকে গেছে গুরুর শেখানো চিত্রমালা— হাতি-হংস-ময়ূর। অথচ সেই চিত্রণের তাৎপর্যে সে আর নেই। মত্ত কামনা, উদ্যত ঈর্ষা আর তার মধ্যে শমশান্ত সাধকের জগৎ আজ তার কাছে ধ্বস্ত, ভ্রান্ত ও অতীত।

এতদিন পরে আসমানী বা মিনতির কথা লিখতে গিয়ে মনে পড়ল হাটগোবিন্দপুরে সাধন বৈরাগ্যের আশ্রমে মাকি কাজুমির মুখ। নাদনঘাট থেকে বর্ধমান যাবার পথে বাসরাস্তায় পড়ে হাটগোবিন্দপুর। বাস থেকে নেমে মানুষজনকে জিজ্ঞেস করতেই দেখিয়ে দিল নিশানা। মিনিট দশেক হেঁটে সোজা সরান ধরে পৌঁছে গেলাম সাধনদাসের আশ্রমে। চোখ জুড়িয়ে যায় আশ্রমের শ্রী আর সমৃদ্ধি দেখলে। একেবারে ঝকমকে তকতকে। প্রচুর গাছ— আম জাম কাঁঠাল কদম্ব ছাতিম। উঠোন গোবর লেপে মোছা। এক পাশে গন্ধরাজ আরেক পাশে টগরের ঝাড়। সারিবাঁধা চিনে গোলাপ। সুন্দরের আসন বিছানো এমন সচ্ছল স্বচ্ছন্দ আশ্রমের মধ্যমণি এক ছবির মতো জাপানি মেয়ে, মাকি কাজুমি। রোগা একহারা চেহারা কিন্তু লাবণ্যে ভরা। গায়ের রং সাদাটে, চোখদুটো জাপানিদের যেমন হয় ছোট কিন্তু শান্ত। পাতলা ঠোঁট। পরনে ধবধবে সাদা শাড়ি ব্লাউজ, শীতকাল বলেই বোধহয় পায়ে সাদা মোজা কিন্তু স্লিপার নেই। মেটে দাওয়ায় জন পাঁচেক ভক্ত হাপুসহুপুস করে গরম জাউভাত খাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবেশন করছে মাকি, জননীর স্নেহ দিয়ে। এতদিনে তার বাংলা উচ্চারণে জড়তা তত নেই। স্পষ্ট বলছে, 'আর দুটো ভাত নেবে?'

'না, মা। আর নয়।' পরিতৃপ্ত জবাব তাদের। মা? ভাবতে গেলে আশ্চর্য লাগে বই কী। চিত্রশোভাময় জাপানের এক উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে এখানে এই হাটগোবিন্দপুরে এসে হয়ে বসেছে অন্নপূর্ণা আশ্রমজননী। সন্তান নেই, শিষ্যসেবকরাই সন্তানের মতো। মাকির ক্ষুদ্র কিন্তু প্রসন্ন চোখে প্রকৃত স্নেহের বাতি জ্বলছে। কবে বুঝি পনেরো বছর আগে সাধনদাস জাপানে গিয়েছিল গান গাইতে। মাকি চলে এসেছে তার সঙ্গে। অশনে বসনে ভাষায় ও ধর্মে কোনও মিলই নেই। তবু চলে আসা প্রাণের টানে। সে টান বড় অন্তরের।

ভক্তদের অন্নসেবা দিয়ে মাকি আমার কাছে এসে নত হয়ে বলল, 'প্রণাম।' দাওয়ায় একটা কাঠের চেয়ার দিয়ে বলল, 'বসুন। একটু চা সেবা করবেন তো?'

সম্মতি জানাতেই সে চলে গেল রান্নাঘরে আর আমার চোখ চলে গেল উঠোন পেরিয়ে একটু দূরে কলতলায়, যেখানে উঁচু বাঁশের বাতায় শুকোচ্ছে মাকির গেরুয়া, শাড়ি জামা ও শায়া। গড়পড়তা বাউলবাড়িতে এই দৃশ্য দেখতে আমি অভ্যস্ত কিন্তু এখানে দৃশ্যটি অপার্থিব হয়ে উঠেছে এক বিদেশিনীর আত্মউৎসর্জনের তাপে। সে তার জাপানি জীবনযাত্রার ছকটাই বদলে ফেলেছে হাটগোবিন্দপুরে এসে, সাধনদাসের সাধনসঙ্গিনী হয়ে। মনে পড়ল, 'আমি বিদেশিনী হইয়া/ বসন রাঙাইয়া/ যাব গো তোমার সঙ্গে' গানের আক্ষরিক রূপ। এক্ষেত্রে অবশ্য বিদেশিনী এখন হয়েছে আমারই ভাষায় কথা বলা স্বদেশিনী। টিউবওয়েলের পাশে একটেরে ছোট বেড়া দিয়ে ঘেরা স্নান-ঘরে ভোরের স্নান সেরে এই জাপানি নারী ফুল তুলে রাধামাধব বিগ্রহের পাট সেরেছে। ভক্তদের সেবা দিয়ে এবারে অতিথি আপ্যায়ন।

চা আর বিস্কুট নিয়ে মাকি এসে আমাকে দিয়ে সামনের মেটে দাওয়ায় বসল। সারা গায়ে খুব সুন্দর করে শাড়ি জড়ানো। ঘোমটা নেই, তাই চোখে পড়ল তার কানের দুটো ঝুলন্ত দুল। কোনও ডিজাইন নেই, শুধু 'ওঁ' লেখা। অপরূপ শোভাময় দৃশ্য। বিদেশিনীর কানে ঝুলছে দুটি ওঙ্কার। পরিচয় আগে থেকেই ছিল কাজেই এবার কুশলবার্তা নেওয়া।

—সাধনদাসকে দেখছিনে যে! নেই নাকি?

—একটা আসরে গেছেন কাল, ধাত্রীগ্রামে। টেলিফোন করেছেন একটু আগে। আপনি আসবেন খবর দিয়েছেন। রওনা হয়ে গেছেন গাড়িতে— এখনি এসে পড়বেন। দাদা, দুপুরে অন্নসেবা নেবেন তো?

পশ্চিমবঙ্গের বেশির ভাগ বাউল আখড়ার এমন শ্রীমন্ত রূপ নেই। বাড়িতে টেলিফোন, কোথাও যেতে ভাড়া করা মোটর। আশ্রমে বেশ ক'টা চালাঘর। একটা নতুন ঘরের পত্তনি হয়েছে তাতে দুজন ভক্ত নতুন বিচুলির ছাউনি দিচ্ছে। সেদিকে তাকাতে মাকি বলল, 'গোঁসাই ওখানে একটা নতুন ভজনকুটির করছেন। পুরনোটায় উঁই লেগেছে। ওটা ভেঙে ফেলা হবে।'

কেমন চমৎকার জাপানি মেয়ের সঙ্গে আমার ঘর গেরস্থালির কথা হচ্ছে। কত বাউল ঈর্ষা মিশিয়ে আমাকে বলেছে, সাধনদাসের মতো ভাগ্য ক'জনের হয়? ভাল গাইতে পারে। ফাংশনে ডাক আসে। অনেক শিষ্যশাবক। সেবাদাসী মাঝে মাঝে দেশে গিয়ে টাকা আনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অচিরে সাধনের গাড়ি ঢোকে অঙ্গনে। সাঙ্গোপাঙ্গ বাজনদারদের নিয়ে সশিষ্য সাধনদাস প্রবেশ করে উঠোনে। সপ্রতিভভাবে বলে, 'আরে সুধীরদা, এসে গেছেন? বাঃ।'

পাকা প্রোফেশনাল। কথায় বার্তায় সাবলীল। একটু পরে সবাই মিলে বসা হল আরেকটা ঘরের প্রশস্ত দাওয়ায়। প্রথমে গাঁজা তৈরি করে শিষ্য দিল গুরুকে। বিশাল ক'টা টান দিয়ে কলকে চলে গেল শিষ্যদের হাতে হাতে। তারপরে হল দুয়েকটা গান। নিমীলিত চোখে সাধনদাস গান গাইলেন ভারী সুন্দর— আত্মনিবেদনে গভীর ও উদাত্ত। এবারে মাকি কাজুমির পালা। একতারা আর বাঁয়া নিয়ে তার গানের ধরতাই : 'সত্য বলো সুপথে চলো।' জাপানি মেয়ে বাংলা ভাষায় গাইছে লালনের গান। মাকি যেন সাধনের জীবনে এক অপরূপ অর্জন। তাদের মিলনে গানের সুরের আসনখানি পাতা।

আমার মনে এ প্রশ্ন না উঠেই পারে না যে কোনটা সত্য কোনটাই বা সুপথ। মাকি গায় 'সত্য বলো সুপথে চলো,' ওদিকে মিনতি গেয়েছিল 'এবারে খাঁটিপথে দাঁড়িয়েছি'— এখানেই দ্বন্দ্ব। যেটাকে এরা সুপথ বা খাঁটিপথ বলে সেই বাউলজীবনের ন্যায়নীতিসত্য কেমনতর? সে তো আমাদের স্বাভাবিক সমাজমূল্যবোধের সঙ্গে মেলে না। দিল বা হৃদয় নিয়ে যাদের গানে এত কথা, তাদের হৃদয়হীনতা এতভাবে দেখি যে মনে কষ্ট হয়। অথচ সে কষ্টের কী মূল্য?

বাউলেরা নিজেদের বলে 'পথবৈরাগী', সংসারের নিয়ম তাই তাদের ক্ষেত্রে চলে না। এই পথের নিয়মে আসমানী যায়, মিনতি আসে... কাজুমিরাও আসে... কিন্তু থাকে কি? থাকতেও পারে, চলে যেতেও পারে। দুদিকেই দরজা খোলা বাউল বিশ্বে। তাই এই জাপানি সাধিকার স্বনির্বাচিত জীবনে প্রত্যাবর্তনের পথ খোলা আছে। কিন্তু তার ভাবজগতে এতদিন যে-তরঙ্গ উঠেছিল, যা তাকে নিয়ে এসেছে এত দূরে, এমন সুদূর সাধনায়, তা কি সে ভুলে যাবে? এই তার কপালের চন্দনরেখা, কানের দুলের ওঙ্কার, গেরুয়াবাস, নম্রবিনতস্বর, তার শিষ্যসেবা, অন্নপূর্ণারূপ সে মুছে ফেলবে একেবারে? সবচেয়ে যেটা বড়, তার দেহবাদী সাধনার দিনগুলি, তার গুরু সান্নিধ্য? তার গলার চিকন গান? ভেবে দেখতে গেলে মাকির গান তো কেবল কণ্ঠবাদন নয়, নয় কতকগুলো বাংলা শব্দের উচ্চারণ, এর প্রত্যেকটার ভাব তাকে যে বুঝতে হয়েছে। সে বোঝা বড় কঠিন, কতদিনের আয়াসসাধ্য। এমন গায়নের অন্তঃস্পন্দ, একতারায় চম্পক অঙ্গুলির সঞ্চালন, স্বরক্ষেপের মাধুর্য, বাঁয়ায় তাল রাখা অথচ নিজেকে ভাবনিবিষ্ট রাখার কৌশল— এতগুলি অর্জন বহু শ্রমে সিদ্ধ। তার সামনে ছিল অনেকগুলো লড়াই। বিদেশিনী হয়েও ভিনদেশি লোকায়তের মর্মোদ্ধার, খাঁটি বাউলসঙ্গিনী হওয়া, হয়ে ওঠা খরদৃষ্টি আশ্রমজননী, তারপরে গানের শিক্ষা, সুরের দীক্ষা এবং সবচেয়ে যেটা কঠিন— সাধনদাসের সমকক্ষ হয়ে তার গীতসঙ্গিনী হওয়া। সাধনদাস বাউল গানের একজন ভাল পারফরমার, গান তার জীবিকা। তাই তার গানে পারফেকশানের প্রশ্ন আছে, আসরে গানের তত্ত্ব বুঝে তাকে গান বাছতে হয়, তার চর্চা করতে বহু ভাবনা ও বিচার লাগে। এই পথটা— সাধনদাসের এই গতিপথটা তাকে বুঝতে হয়েছে, নিজেকে গড়ে নিতে হয়েছে।

আসরে সেটাই দেখছিলাম মুগ্ধ হয়ে। 'সত্য বলো সুপথে চলো' দিয়ে মাকি শুরু করেছিল ঠিকই কিন্তু তারপর সাধনদাস তাকে এক একটা গানের নির্দেশ দিচ্ছিল আর মাকি গাইছিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার টেপে সেগুলো ধরা পড়ছিল। 'এটা গাও' 'ওটা গাও' সাধনের নির্দেশ মেনে উদ্দিষ্ট গানটা মাকি গেয়ে দিচ্ছিল সাবলীল দক্ষতায়। একবারও তো খাতা দেখেনি, তবে? সেসব গানের ভাবে কি সে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল? এসব গান তার স্মৃতিধার্য বিষয়, এতদিনে তার জীবনের বিশ্বাসের অঙ্গ হয়ে উঠেছে নিশ্চয়। মাকির নিবিষ্ট তন্ময়তা আমাকে চমৎকৃত করছিল। এ তো আর কাজকর্মের ফাঁকে মিনতি দাসীর গুনগুনানি নয়। শান্তিদেব ঘোষের মতো মানুষ এই জায়গাটায় ভুল করেছিলেন। জাপানি বলে, বিদেশিনী বলে, মাকি কাজুমিকে তিনি শান্তিনিকেতনের বাউলমঞ্চে উঠতে দেননি, গাইতে দেননি। ভেবেছেন বাউল গান গাইতে হলে গিমিক চলবে না, হতে হবে সেই জীবনযাপনের শরিক। মাকি তো কোনও অর্থেই পোশাকি গায়িকা নয়? তা হলে গানে এমন ভাবের পরম্পরা রাখতে পারত কি? শান্তিদেব মাকিকে দেখেছেন খণ্ডরূপে, ভেবেছেন সাজা গায়িকা। আমি দেখছি তার অখণ্ডরূপ, একজীবন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেকজীবনে মিলে যাওয়ার রূপান্তর।

এইখানে এসে একটা বড় খটকা লাগে আমার মনে। বাউলজীবনে যারা আসে, গুরুর কাছে নির্দেশ নিয়ে সাধনভজন করে, তাদের জীবন আসলে রূপান্তরিত জীবন। মূল সমাজস্রোতের যে অংশে তার জন্ম সেই গ্রামসমাজে মাহিষ্য বা বাগদি, কুর্মি, কাহার, ডোম, দুলে বা হাড়ি যে-বর্গেই তার জন্ম হয়ে থাকুক সেই পরিবেশে ও নীতিবেষ্টনীতে সে বাঁধা থাকেনি। বেরিয়ে এসেছে বাউল সমাজের আঙিনায়। এখানে সামাজিক নিয়মনীতির প্রহরা নেই, সমাজপতি নেই, সমাজের কোনও প্রত্যাশা নেই তাকে ঘিরে। গ্রামেরই একটা অংশে তারা থাকে, গ্রামে বা আশপাশের গ্রামে তারা গান গেয়ে মাধুকরী করে। বৃহত্তর গ্রাম্যসমাজবোধ ও তার জীবনদৃষ্টি বাউলফকির বৈরাগীদের উপেক্ষা বা ঘৃণা করে না। গৃহস্থ বাড়ির শ্রী ও স্বাচ্ছন্দ্যের একটা অচ্ছেদ্য অংশ হল এই বোধ যে বাড়িতে বাউলবৈরাগী ফকিরমিসকিন এলে তাদের চালডাল সেবা, আনাজপাতি ফল দেওয়া উচিত, তাতে গৃহীজীবনের কল্যাণ। তাদের সঙ্গে খানিক আলাপচারি করলে কিছু জ্ঞান হয়, সে জ্ঞান সংসারজীবন দিতে পারে না। বাউলবৈরাগীর বলা কথায় সবসময় যে দিব্যজ্ঞানের অতলতা থাকে তা নয় কিন্তু তাদের বাক্যবিন্যাসে একটা মোহিনী শক্তি থাকে, একটা অব্যক্ত ব্যঞ্জনার আভাস থাকে। তাদের মতো করে কথা বলার নেশা কোনও কোনও পল্লিবাসীর জেগে ওঠে। যেমন ধরা যাক নদিয়া জেলার সম্পন্ন গ্রামে এক বাউলফকির সম্মেলনে গিয়েছিলাম সেবার। মধ্যরাতে যখন গানের আসর ভাঙল তখন প্রখর শীত, মাঘ মাস। এক চাষির অঙ্গনে বসে গরম গরম খিচুড়ি খেয়ে শীত খানিকটা কাটল। এবারে আমরা যাব কোথায়, শোব কীভাবে? এই নিষ্ঠুর শীতের রাতে? সম্মেলনের এক উদ্যোক্তা আমাদের চার-পাঁচজনকে পায়ে পায়ে নিয়ে চললেন গ্রামপ্রান্তের একটা বাড়িতে। গাঢ় অন্ধকারে সব কিছু ঠাওর হচ্ছিল না, তবে একটা বাড়ির সামনে পৌঁছলে কেউ দরজা খুলে দিল। লণ্ঠনের আলোয় দেখলাম, বাড়ির বারমহলের একটা বড় ঘরের মেঝেয় লম্বা করে বিছানা পাতা, মশারি টাঙানো। শীতে তখন আমরা জড়তাপ্রাপ্ত তাই কোনওরকমে দাওয়ায় পা ধুয়ে, গামছায় পা মুছে, বিছানায় ঢুকে নাক পর্যন্ত লেপ টেনে নিলাম। সারাদিনের শ্রান্তি ক্লান্তি, ওই তীব্র শীত আর খিচুড়ি ভক্ষণের উদরতৃপ্তি আমাদের ঘুম এনে দিল অচিরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটানে ঘুমিয়ে বেশ ভোরে উঠে পড়া আমার স্বভাব। ঘুম ভাঙতে দেখি ঘরের কারুরই নিদ্রাভঙ্গের কোনও আশু সম্ভাবনা নেই, তাই দরজা খুলে বাইরে বেরোলাম। সামনেই গ্রামের অপরিসর কাঁচা পথ, অদূরে একটি পুকুর ও বনঝোপ। পুকুরে গিয়ে মুখেচোখে জল দিয়ে, একটা কচার ডাল ভেঙে দাঁত মাজতে মাজতে বাড়িটার দিকে ফিরে চাইলাম : চকমেলানো বিশাল তিনতলা এক বাড়ি, অ্যালা রঙের। তার মানে আমাদের গৃহস্বামী একজন সম্পন্ন গৃহস্থ। বাড়ির দরজায় 'এলাহি ভরসা' দেখে বোঝা গেল মানুষটি ধর্মপ্রাণ মুসলিম। অথচ তাঁর বাড়িতে যাদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা বাউলফকিররা করেছে তারা আমার মতো ধর্মনির্লিপ্ত মানবতাবাদী। এতে কোনও বিস্ময় নেই, বিরোধও নেই। গ্রামের মারফতি ফকিররা একটা গানের আসর বসিয়েছে, তাদের দীন বাসস্থান অতিথিসেবার উপযুক্ত নয়। কিছু মান্যমান শিক্ষিত মানুষ এসেছেন আমাদের গাঁয়ে, হলেই বা আমি ধর্মনিষ্ঠ শরিয়তবাদী মুসলমান কিন্তু সেবাধর্ম তো ইসলামে 'ফরজ' মানে কর্তব্য, কাজেই দিয়েছি ঘরখানা খুলে। থাকুন মেহমানরা— এক রাতের ব্যাপার তো। হ্যাঁ ফকিরদের সঙ্গে আমাদের পথের মিল নেই, ওরা বেনামাজি, কিন্তু শান্ত ও উদার। আর সবচেয়ে বড় কথা, খুব সুন্দর ভাবের গান গায়— গৃহস্বামীর এটাই হল মনের কথা।

পুকুর থেকে ফিরে এবারে ঠাওর হল যে বাড়ির সিমেন্টের রোয়াকে এক বৃদ্ধ বসে আছেন। সাদা লুঙ্গি সাদা পিরান সাদা দাড়ি, হাতে তসবিমালা। ভোরের ফজরের নামাজ সাঙ্গ করে এসে বসে আছেন পূর্বাস্য হয়ে। গায়ে দামি শাল। স্বভাবতই তাঁকে গৃহস্বামী ভেবে বললাম, 'এ বাড়ি আপনার?'

হেসে বললেন, 'না না, এ বাড়ি পাক আল্লার।'

লজ্জিত হয়ে বললাম, 'সে তো একশোবার। তবু সামাজিকভাবে এ বাড়িতে তো আপনারই দখল। নাকি?'

'হ্যাঁ, লোকে তো তাই বলে'— বলে মানুষটা উদাসভঙ্গিতে খানিকটা বসে রইলেন। পরে বললেন, 'কী ঘর বানাইলাম আমি শূন্যের মাঝার।'

বোঝা গেল গৃহস্বামী সম্পন্ন ও বিত্তশালী কিন্তু ভূয়োদর্শী। ফকির দরবেশদের তাঁর বাড়ি আনাগোনা আছে, তাই এমনভাবে হাসন রজার গান এসে পড়ল। এসে পড়ল বাউলফকিরদের জাদুভাষা— হ্যাঁ, লোকে বলে বটে এ বাড়ি নাকি আমার। এরপরে বলবেন হয়তো, ধুস। ক'দিনের আর এই দুনিয়াদারি কীসের বা মালিকানা! এ দেহের মালিক মোক্তারন, আমি তার পরহেজগার বই তো নই।

গ্রামসমাজে এই এক অলক্ষ দান বাউলফকিরদের— তারা মহতের গান শুনিয়ে আর বৈরাগী জীবনের আদর্শে গৃহীমানুষকে উদাসীন করে দেয়। তাই বহুগ্রামে দেখেছি বাড়িতে ভিক্ষাজীবী বাউল বা বোষ্টমবোষ্টমী এলে তাদের সমাদর করে বসায়, তাদের কাছে অনেক কিছু জানার থাকে অন্দরের নারীসমাজের। দেহের কথা, ব্যাধি-নিরাময়ের পদ্ধতি, যৌনতা... কত কী। সবচেয়ে যেটা বড় আকর্ষণ তা হল অন্দরের মধ্যে বাহিরের স্রোতাবর্তকে টেনে আনা, পথের মানুষটার কাছে কতরকম খবর থাকে, কত রঙ্গকথা, কত রহস্যময় গান। এও কি কম বিস্ময় যে এদের বিয়েই হয়নি অথচ কেমন সুন্দরভাবে বেঁচে আছে... বাধাবন্ধন নেই,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্তান নেই, মুক্ত। অথচ অজস্র বাধাবাঁধনে জটিল কিন্তু মোহময় জীবনকে, সংসারজীবনকে কি নিতে পারত না এরা? নিতে তো পারতই এমনকী সেই জীবনেই তো এরা ছিল। সংসারলতার বন্ধন ছিন্ন করে এরা স্বেচ্ছায় সানন্দে এসেছে দেহতত্ত্বের গুহ্য লতাসাধনায়।

এরা তাই রূপান্তরিত মানুষ— সুধাময় কিংবা সাধন, মিনতি কিংবা মাকি কাজুমি। এদের মধ্যে মাকি বিদেশি বলে তার রূপান্তরক্রিয়া ঘটেছে একটু বেশি সময় ধরে, মিনতির অত সময় লাগেনি, তার কারণ তার যে দেশজ অভিজ্ঞতার ধারা রয়েছে। দুজনেই বাউলসঙ্গিনী ও সেবাদাসী, দুজনেই ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবে না। দুজনেই বর্তমানের সুখ আর আনন্দকে অঞ্জলি ভরে পান করছে। এদের সারা শরীরে আমি আনন্দের হিল্লোল দেখি, মনের মধ্যে গভীর তৃপ্তির স্বস্তি। 'সত্য বলো সুপথে চলো' মাকি যখন গাইছিল তখন সেটা আর লালনের গান ছিল না, হয়ে উঠছিল এক জাপানি মেয়ের রূপান্তরিত জীবনভাষ্য। 'সত্য বলো সুপথে চলো'— কথাটা কি নিজের কাছে নিজের অঙ্গীকার? নাকি বর্তমান জীবনের থেকে, তার ক্লিন্নতা থেকে মুক্তির আর্তি? এ প্রশ্নের উত্তর আছে আরেকটা গানে 'গুরু আমায় নাও গো সুপথে'। এটাই চরম কথা। সাধিকা বা সঙ্গিনী কখনই প্রকৃতপথ জানে না— জানে গুরু। এইখানে গুরুর আধিপত্য এসে যাচ্ছে। সাধনদাস না দিলে মাকির পাবার কিছু নেই। সাধনদাসও তো একজন রূপান্তরিত মানুষ। যে সমাজ পরিবেশে তার জন্ম আর বেড়ে ওঠা, তার কোনওদিকেই বাউল হবার মতো প্ররোচনা ছিল না। সে বাউলের সন্তান নয়, গানও তেমন জানত না। কেন সে বাউল হল? কীসের লোভে? আজকে হাটগোবিন্দপুরে তার যে স্বচ্ছন্দ শান্তিকল্যাণ ভরা আশ্রম তার উত্তরাধিকার সে পেয়েছে গুরুর কাছ থেকে। সাধনভজনের একাগ্রতা, গানের তত্ত্বজ্ঞান ও গায়ন, গুরুসেবা দিয়ে সে অর্জন করেছে এখানকার অধিকার। গুরুর নামেই তার আশ্রম, প্রাঙ্গণের মুখে সেই সাইনবোর্ড দেখা যায়। আজ মোটর চড়া বা টেলিফোন রাখা সাধনদাসকে দেখে বোঝা যাবে না সে কতখানি রূপান্তরিত। যতখানি পূর্ণতা ও গায়ন-ব্যক্তিত্ব পেলে বিদেশি নারীর মন জয় করা যায় সেটা সে আয়ত্ত করেছে। মাকি তার কাছে ধরা দিয়ে সফল ভাবছে নিজেকে। গুরুকে তার ধ্যানজীবনের সুপথের কাণ্ডারি করেছে। সাধনদাসের এই ব্যক্তিত্ব একটু ব্যতিক্রমী তাতে সন্দেহ নেই, কারণ সচরাচর আমরা উলটোটা দেখি। দেখি বাউল আর বিদেশিনীর যে জোট তাতে বাউলের তরফে হ্যাংলামি বেশি। আমাদের অভাব ও দারিদ্র্যের দেশে বাউলের চালাঘরে যদি একজন মেমসাহেব এসে উদয় হয় তবে সে হল ভাঙাঘরে চাঁদের উদয়। তখন সেই বিদেশিনীর কৃপাধন্য বাউলকে দেখে সমাজের সবাই ঈর্ষাবোধ করে। বাউলের মধ্যে জাগে এক ধন্যতার বোধ।

অথচ এই জোটের সংগঠনে বাউলের কতটুকুই বা ভূমিকা? মেমসাহেবকে তো সে নির্বাচন করতে পারে না, মেমসাহেবই তাকে নির্বাচন করে। তার সঙ্গী হবার জন্য সে দু'পায়ে খাড়া। তার সুবাদে বাউল যেতে পারে বিদেশেও। তীব্র আলোকচ্ছটায় উদ্‌ভাসিত বিদেশি মঞ্চে গেরুয়াপরা কালোকোলো নিরক্ষর মানুষটি নেচে নেচে 'ভোলামন' বলে গান গায়। রঙ্গপ্রিয় তরলমতি বিদেশি শ্রোতারা বাউলগানের ডুবকির তালে তালে নাচে, ভিডিও ছবি তোলে। যেন উন্মাদ হয়ে যায় প্রাচ্যদেশের অজানা গানের গর্বে তাদের প্রতীচ্য জীবনের যান্ত্রিক মন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোনামুখির বাউল সুধন্যদাস এ ব্যাপারে আমাকে তার অভিজ্ঞতা বলেছিল এইরকম ভাষায় যে, 'আমেরিকা, ফ্রান্স আর জার্মানিতে আমি গান গেয়েছি। না, আমি একা নই, বাঁকুড়ার এক নামকরা বাউল, আপনাকে তার নাম করব না, জনদশেকের দল বেঁধে গিয়েছিল। আমাকেও নিয়েছিল দলে, কারণ আমার গানের গলা তেজি, তা ছাড়া অনেকরকম বাউলগান আমি জানি।'

—অনেক টাকা রোজকার করলে?

—না। যতটা ওরা দিয়েছিল তার হিসেবটা তো ওই বাউল নেতা আমাদের বলেনি। শুধু কথা হয়েছিল পনেরো দিনের প্রোগ্রাম আর দশ হাজার নগদ টাকা।

—সেটা পেয়েছিলে তো?

—না। দিয়েছিল শেষ পর্যন্ত আট হাজার। দু'হাজার নিয়ে নিয়েছিল। কি করব? বিদেশ বিভুঁই, কাউকে চিনি না, ভাষা জানি না, অসহায়। তারপর ধরুন চটে গেলে ভবিষ্যতে আর দলে নেবে না। আমি তো সাধক বাউল নই, গায়ক, বলতে পারেন সাজা বাউল। গৃহী মানুষ। তিনটে কন্যা সন্তান। তাদের বিয়ে দিতে হবে, তাই টাকা চাই। গরিব মানুষ আমি, জাতে দুর্লভ মানে দুলে। পরের জমিতে মুনিশ খাটি দৈনিক তিরিশ টাকা রোজে। আট হাজার টাকা কখনও দেখেছি একসঙ্গে?

—ওখানে কী রকম সমাদর পেলে?

—খুব সমাদর, বলতে পারেন পাগলের মতো ওদের উচ্ছ্বাস আর নাচানাচি। সত্যি বলতে কি দাদা, সমাদর আমার এখানেও খুব। সারারাত গাইলেও গ্রামের শ্রোতারা শুনে যাবে, সাধুবাদ দেবে, তবে ওই পর্যন্তই। গরিব মানুষ তারা, শুষ্ক সমাদর তাই। দেবে যে কিছু, পাবে কোথায়? তা ছাড়া সারাবছর তো তারাই দিচ্ছে, মাধুকরীর অন্নসেবা। কিন্তু বিদেশে অন্য ব্যাপার। গান শেষ হলে ওরা মঞ্চে উঠে পাগলের মতো চুমো খায়। হ্যাঁ, মেয়েরাও। সে কি অস্বস্তি দাদা— আমাদের তো অব্যেস নেই, লজ্জা করে।

—আর কী হয়?

—কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে দেয়, গায়ের সোয়েটার বা কোর্ট খুলে পরিয়ে দেয়, হাতে ধরিয়ে দেয় দামি টেপরেকর্ডার। আরও কত কী উপহার দেয়— শার্টের কাপড়, প্যান্টপিস, ঘড়ি। সেগুলো নিয়ে আমি কি করব? রাখব কোথায়? তাই গাঁয়ে এসে বেচে দিয়ে হাজার পাঁচেক টাকা পেয়েছিলাম। তারপরের ঘটনা বড় দুঃখের।

—কী রকম?

—ধরুন তা হাজার পনেরো টাকা জমা রেখেছিলাম সোনামুখির গ্রামীণ ব্যাঙ্কে। বড় খুকির বিয়ে ঠিক করে ফেললাম ওই টাকার ভরসায়। ছেলে দেখা হল, পাকা কথা হল, বিয়ের দিন ধার্য হল। সবই দেখুন ওই গুরুর কৃপা, ওই দেখুন আমার গানের গুরু ত্রিলোকেশ্বর বাউল ছবিতে রয়েছেন। এখন তো দেহ নেই, অপ্রকট, তাঁর কাছে এই সামান্য দুলের ছেলে গান শিখেছিলাম। লাঙলটানা আর কাস্তেধরা দু'হাত আমার, তাঁর কৃপায় সেই হাতে উঠেছে দোতারা। গুরুর কৃপায় সুধন্যদাসের মতো দোতারা এ দিগরে কে আর বাজাতে পারে? অথচ সেই কাজ প্রথমে কত কঠিন ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কেন?

—গোড়াতেই কি দোতারা দাদা? প্রথমে দশ-এগারো বছর বয়সে টিনের কৌটোতে বাঁশের ফালি বেঁধে, তাতে মাছধরা সুতোর তার বানিয়ে তৈরি করেছিলাম খমক। আগে সেই খমক বাজিয়েই গাইতাম। পরে, অনেক পরে, শুশুনিয়া পাহাড়ের নীচের গাঁ কাটিগড়ে ওস্তাদের কাছে দোতারা শিক্ষা। দোতারার সুরে গান শুনে বশ হলেন গুরু ত্রিলোকেশ্বর গোঁসাই। তার থেকে এত নাম, যশ, মান— বিদেশ যাওয়া, টাকা রোজগার— প-নে-রো-হা-জা-র। কিন্তু শেষমেশ সইল না।

—কী হল?

—মেয়ের বিয়ের সাতদিন আগে সোনামুখি গিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা তুললাম। খরচপাতি, গয়নার দাম, ঘর সারানি এসব করতে হবে তো। কিন্তু সেই রাতেই বাড়িতে ডাকাত পড়ল। সর্বস্ব নিয়ে গেল দাদা। রাগে দুঃখে আমি বাস্তুগ্রাম ছেড়ে দিয়ে সোনামুখিতে ঘর বানিয়েছি। আর ও-মুখো হই না।

—কেন? গাঁয়ের কী দোষ?

—গাঁয়ের মানুষই তো ডাকাতি করেছিল। ঈর্ষা, হিংসা। ওই যে বিদেশ গিয়ে নামযশ খুব হয়েছিল— সেটা সইল না মানুষের। অথচ আমরা প্রায়ই গাই 'ভজো ভজো মানুষ ভগবান।' মানুষের যা সব রূপ দেখলাম এ জীবনে।

বাউল ফকিরদরবেশদের চেতনায় মানুষ একটা দ্যোতনাময় কনসেপ্ট, তার আবার দেহতত্ত্বগত প্রতীকী অর্থও আছে। 'ভজো ভজো মানুষ ভগবান' আর 'মানুষরত্ন সযত্ন করলে না' এই দুই উচ্চারণে মানুষ শব্দের গুহ্য অর্থ একেবারে আলাদা— অবশ্য এতসব গোপ্য তত্ত্ব সুধন্যদাসের মতো গায়ক বাউলের জানার কথা নয়। একথা বুঝবেন খয়েরবুনি আশ্রমের সনাতন দাস। প্রয়োজনে মানুষতত্ত্ব বুঝিয়ে দেবেন গান গেয়ে— নিত্য খ্যাপার সেই গান :

মানুষেতে মানুষ আছে
মানুষ নাচায় মানুষই নাচে।
মানুষ যায় মানুষের কাছে
মানুষ হইতে।

মানুষ মানুষ বলতে বলতে রূপান্তরিত মানুষের কথা আবার এসে গেল। সাধনদাসের মতো সাধকদের জীবন রূপান্তরিত আর সুধন্যদাসের জীবন সন্তাপ ও মর্ত্য কান্নায় আচ্ছন্ন। জমির কাজে মুনিশের তিরিশ টাকার রোজ থেকে নিছক গান গেয়ে থোক পনেরো হাজার টাকা পাওয়ার যে অলীক আর্থিক উত্তরণ তা শেষ পর্যন্ত ধোপে টেকে না কারণ বস্তু তো সঞ্চয়যোগ্য নয়, তা ক্ষয়িষ্ণু। উত্তরণ চাই ভাবের দিকে খাড়াখাড়ি। তার জন্য প্রয়োজন আত্মসংবরণ ও কাম মুক্তি।

সাধনদাসের আশ্রম, সেখানকার শ্রী ও স্বাচ্ছন্দ্য, তার বিদেশিনী সঙ্গিনী দেখে মনে হতে পারে বোধহয় এসবই ভোগবাদ এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর অন্যতর রূপ। তা কিন্তু নয়। আশ্রম তার গুরুর দান, গান তার প্রযত্নলব্ধ, মাকি তার অর্জন। পঁচিশ বছর আগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুধাময় দাসের আড়ংঘাটার আখড়ার এমন পূর্ণাঙ্গ শান্তি ও উজ্জ্বলতা দেখিনি। বরং দেখেছিলাম এক অদ্ভুত দৃশ্য। সন্ধের পর পবনদাসের গানের সঙ্গে নাচতে নাচতে মিনতি হঠাৎ পেট চেপে ধরে শুয়ে পড়ল আর কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করতে লাগল। সুধাময় তাতে ভ্রূক্ষেপও করল না, গানও থামল না। ছুটে গিয়ে ক'জন শিষ্য আর মহিলা টেনে তুলল মিনতিকে। সে তখন অর্ধচেতন। খানিকটা সুস্থ হলে জানা গেল তার পেটে গুরুতর পেপটিক আলসার। খাওয়াদাওয়া থেকে সব কিছুতেই তার অনেক নিষেধাজ্ঞা আছে ডাক্তারের। কিন্তু কে তাকে দেখবে? অন্তত বৈরাগীর সে দরদ নেই। মিনতি তাই একদিন আসমানীর মতো বিদায় নিতে বাধ্য হবে।

এর সম্পূর্ণ বিপরীত একটা ঘটনা এবং দুটো আশ্চর্য চরিত্রের কথা মনে পড়ছে। সেবার পিরনিবাসে গিয়েছিলাম প্রতিবন্ধী কল্যাণ কেন্দ্রে। কেন্দ্র মানে একটা দুটো হল ঘর, বেশ খানিকটা জমি যাতে রয়েছে সবজিবাগান আর টিউবওয়েল, এই সংগঠনে রবিবার রবিবার ডাক্তার আসেন। প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা হয়। এরা দৈহিক প্রতিবন্ধী। কেউ অন্ধ, কেউ খোঁড়া, কেউ বিকলাঙ্গ। প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির এই কেন্দ্রীয় সমাবেশে আমার আসার কারণ হল সরেজমিনে প্রতিবন্ধী লোকশিল্পীদের সঙ্গে পরিচয় করা। তাদের মধ্যে অনেকে নাকি বাউল গান গেয়ে সংসার চালায়। ট্রেনে বা বাসে, বাসস্ট্যান্ডে, মেলামচ্ছবে তারা গায়। আজকাল সরকারি অনুষ্ঠানে বা লোকসংস্কৃতি উৎসবে প্রতিবন্ধী বাউল শিল্পীদের ডাক পড়ে— কিছু অর্থপ্রাপ্তি ঘটে। এরা গায়ক বাউল বটে তবে জীবনাচরণে কেউ বাউল নয়। কোনও সাধু বা গোঁসাই গুরুর কাছে দীক্ষা শিক্ষা হয়ে থাকতেও পারে, নাও পারে। গেরুয়া পোশাক আছে এক সেট। অনুষ্ঠানের আগে সেটা পরে নেয়। যেসব গান গায় তার তত্ত্ব জানে না। গোষ্ঠগোপাল, পূর্ণদাস বাউল, পরীক্ষিৎ বালার হিটগান গাইতে পারে। কেউ শিখেছে দু'-চারখানা ভবা পাগলার গান। কেউ একতারা বাজিয়ে গায়, কেউ হারমোনিয়াম। সহশিল্পীর হাতে থাকে খমক বা খঞ্জনি। এরা করুণাভিক্ষু, অসহায় ও বিনীত। নিজেদের জোরে বাঁচতে পারে না।

কিন্তু 'প্রতিবন্ধী বাউল' শব্দবন্ধটি ভারী অস্বস্তিকর, কারণ বাউল তো সচলতার প্রতীক— সে সাধনা মুক্ত ও স্বয়ম্বশ, তাতে কোনও প্রতিবন্ধ নেই, সাংসারিকতা নেই, সংস্কার নেই। তবু অনুষ্ঠানের ঘোষক বলেন : 'এবারে গান গাইবেন প্রতিবন্ধী বাউল উদ্ধবদাস।'

উদ্ধবদাস বাউলের গান সত্যিই ভাল লাগল। সুন্দর সুমিষ্ট কণ্ঠ, স্পষ্ট উচ্চারণ, গায়নপদ্ধতিতে নিজস্বতা আছে। গানের শেষে তার বসার জায়গাটায় হাত ধরে নিয়ে গেল যে-মেয়েটি সে সম্ভবত তার স্ত্রী, সে-ই তাকে খানিকক্ষণ আগে অতি যত্নে মঞ্চে এনে হার্মোনিয়ামের সামনে বসিয়ে দিয়েছিল। গানের শেষে উদ্ধব যখন বসল তখন মেয়েটি জননীর মমতায় তার ঘাম মুছে দিল শাড়ির আঁচলে, জল খেতে দিল এক গেলাস। সস্তা সিনথেটিক শাড়ি পরা, কপালে সিঁদুর আর হাতে দু'গাছি পলার চুড়ি, একটা নোয়া। মেয়েটির নাম পাপিয়া। সে মিনতি বা মাকি কাজুমি গোত্রের নয়, গানও জানে না। কথায় কথায় জানা গেল উদ্ধবদাসের পদবি 'বালা', জাতে নমঃশূদ্র, উদ্বাস্তু পরিবারের সন্তান, এখনকার নিবাস উত্তর চব্বিশ পরগনার গাড়াপোঁতায়। মাতৃপিতৃহীন, কিশোর বয়স থেকেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গান গেয়ে চলে। বনগাঁ স্টেশনে গান গাইত। স্টেশন-চত্বরেই আলাপ এই পাপিয়ার সঙ্গে। পাপিয়া দাসবৈরাগ্য, জাতি-বৈষ্ণব। তার বাবা সম্পন্ন গৃহস্থ, জোতজমি প্রচুর, দাদা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। পাপিয়া নিজেও মাধ্যমিক পাশ। উচ্চ মাধ্যমিক পড়তে ট্রেনে করে বনগাঁ আসত। উদ্ধবের সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে আলাপ, ভাললাগা ও বিয়ে।

শুনতে যত সোজা কাজটি তত সোজা হয়নি। অন্ধ গায়ক তায় নমঃশূদ্র, সহায়সম্বলহীন উদ্ধবের সঙ্গে সচ্ছল গেরস্থ বাড়ির মাধ্যমিক পাশ বৈষ্ণববংশের মেয়ে পাপিয়ার কি স্বাভাবিক বিয়ে হতে পারে? পাপিয়া বলল, 'দাদা প্রচণ্ড মেরেছে। বাবা-মা ঘরে বন্ধ করে রেখেছে, এই মানুষটার ওপরেও শাসানি মারধর করেছে কেউ কেউ। কলেজে আসতাম সঙ্গে একজন না একজন থাকত পাহারা দিত। তবু শেষ পর্যন্ত পারল কি?'

—কী করলে?

—একদিন পালিয়ে এলাম সোজা। রানাঘাটে গিয়ে দু'জনে রেজিস্ট্রি বিয়ে করলাম। দু'-চার গাছা গয়না যা ছিল তাই বিক্রি করে গাড়াপোঁতায় একটা টিনের চালার ঘর করেছি। একটু স্নানের ঘর, পায়খানা, টিউকল। চলে যায় দাদা, সুখে দুঃখে। মানুষটা গান গেয়ে কিছু রোজকার করে হাটে বাজারে। আমি ক'টা মেয়েকে পড়াই, অবসরে ঠোঙা বানাই। না, বাপদাদারা সম্বন্ধ রাখেনি। তাদের মুখ পুড়িয়েছি তো, মানে মর্যাদায় লেগেছে।

আশ্চর্য এমন নবীন দম্পতির দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকি। নবীন দম্পতি বই কী। একজনের বয়েস যদি বছর পঁচিশ হয়, আরেকজনের কুড়ি-বাইশ। দু-বছর ঘরসংসার করছে, সন্তান আসেনি এখনও। স্বাভাবিক বুদ্ধিবিবেচনা থেকে মনে হল উদ্ধবদাসের গান শুনেই নিশ্চয় পাপিয়া আকর্ষণ বোধ করেছে—এমন সিদ্ধান্ত করার কারণ পূর্ব অভিজ্ঞতা। মিনতি বা মাকি বলে নয়, দেখেছি বেশির ভাগ বাউলের সঙ্গিনী জুটে যায় গানের মোহে, কেউ কেউ আসে যৌন আকর্ষণে। পাপিয়ার ক্ষেত্রে কোনটি? নিরপেক্ষ বিচারে বলতেই হয় উদ্ধবের গান ভাল, তবে পাগল করা আবেদন নয় তার। উদ্ধবকে দেখতে একেবারে সাধারণ। বেশ কালো, বেঁটে, জন্মান্ধ। সাধারণত পথে ঘাটে ট্রেনে বাসে কিংবা স্টেশনচত্বরে যেসব অন্ধকে গান গাইতে দেখি তাদের সঙ্গিনী বা স্ত্রীরাও হয় অন্ধ। পাপিয়ার মতো চক্ষুষ্মতীর পক্ষে অন্ধ গায়ককে বিয়ে করা, ভালবেসে, বেশ কঠিন কর্ম। সেকথা ভেবেই জিজ্ঞেস করি, 'উদ্ধবের গান শুনেই কি তোমার তাকে ভাল লেগেছিল?'

—না তো। একদিন ট্রেন থেকে নামতেই এল ঝেঁপে বৃষ্টি। ছুটে গিয়ে দাঁড়ালাম প্ল্যাটফর্মের সেই জায়গাটায় যেখানে ও বসে গান গাইত। কোনওদিন তেমন করে ওর গান শুনিনি আলাদাভাবে। ওই গান কানে আসে এইরকম আর কী। কিন্তু সেদিন ব্যাপারটা হল অন্যরকম। বৃষ্টির ছাটে ভ্যাবাচাকা খেয়ে যাচ্ছে, কোনওদিকে যে সরে বসবে ঠাওর করতে পারছে না, ভাবলাম, আহা রে কত অসহায়!

উদ্ধব ফুট কেটে বলল, 'আসলে দাদা ওর মনটা খুব নরম তো... নইলে ভাবুন আমার মতো পথের ভিখিরিকে ভালবাসে? কী আছে আমার? বাপ-মা নেই, চালচুলো নেই, এমনকী চক্ষু হেন রত্নও নেই...'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাপিয়া সজোরে উদ্ধবের মুখ চেপে ধরে বলে, 'চুপ চুপ। সব আছে তোমার। আমি আছি না?'

উদ্ধবের অন্ধচোখে জল পড়ে আর পাপিয়া সুন্দর করে হাসে— সেই হাসি অবশ্য উদ্ধব দেখতে পায় না, তবে বুঝতে পারে নিশ্চয়। তার নীরব কান্না থামে। আর আমি দেখি কী সুন্দর মর্ত্যমানবী। সস্তা সিনথেটিক শাড়ির উদ্ভাসে রিক্ত গহনার শূন্যতা সত্ত্বেও সিঁথির সিঁদুরে রক্তিম যৌবনশ্রী— অথচ কোথাও এক চিলতে ত্যাগের অহংকার নেই, রয়েছে উৎসর্জনের পুণ্য। উচ্চশিক্ষার মোহ ছেড়েছে, ফেলে এসেছে বিত্তবাসনা, সম্পন্ন পিতৃগৃহের আওতা, সচ্ছল দাম্পত্যের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন।

এদের কি বলা যাবে বাউলের চরণদাসী? কোনও ভাবেই না। অন্যোন্য সম্পর্কের চিরবন্ধনে বাঁধা প্রকৃত মানবমানবী। অন্তরের দৃষ্টিপ্রদীপের আলোয় মেয়েটি বরণ করেছে ছেলেটিকে। প্রতিবন্ধী বাউল কে বলবে একে? হাত ধরেছে চিরন্তনী নারী। সামান্য অন্নপানের পরিতৃপ্ত সংসার। টিনের চালার ছোট মাথা গোঁজার আস্তানা, একটা টিউকল, দুটো একটা পেঁপে বা কলা গাছ। উদ্ধব মাঝে মাঝে গান বানায় মুখে মুখে,পাপিয়া একটা খাতায় লিখে রাখে যত্ন করে। আহামরি গান কিছু নয়, তবু তো সৃষ্টি। তাতে আছে চলমান জীবনের বেঁচেবর্তে থাকার চিহ্ন। পিরনিবাসের প্রতিবন্ধী কল্যাণকেন্দ্রে না এলে আমার জীবনের একটা বড় স্বপ্ন দেখা অচরিতার্থ থেকে যেত। নারীর কত বড় শক্তি।

এমন যে নারীর কল্যাণময়ী রূপ তার ব্যতিক্রমও কি দেখিনি? মনে পড়ে অগ্রদ্বীপের মেলায় সম্বৎসর তমালতলায় জাঁকিয়ে বসে মীরা মোহান্ত-র আখড়া। এককালের গৌরবর্ণা রূপসী মীরা এখন আসর পরিচালিকার ভূমিকায়— একেবারে নিখুঁত মা-গোঁসাই। উনিশ শতকে কলকাতার সংস্কারান্ধ তিমিরাচ্ছন্ন অন্তঃপুরে মীরার মতো মধ্যবয়সিনী মা-গোঁসাইরা যেতেন। লোকশিক্ষা দিতেন, অক্ষরজ্ঞান শেখাতেন নিরক্ষর অন্দরবাসিনীদের। শোনাতেন কীর্তন ও দেহতত্ত্বের গান। লোকচিকিৎসা, জড়িবুটিতে ছিলেন ওস্তাদ। মীরা যেন অবিকল সেই মা-গোঁসাইয়ের স্থির প্রতিমা। মাঝে মাঝেই মেটেরির স্থায়ী আখড়া ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে শিষ্যদের বাড়ি হেথাহোথা। কুশল নেওয়া, ধর্ম কথা বলা, গান শোনানো অথচ গুরুদক্ষিণা আদায় করতেও তৎপর, সতর্কচক্ষু।

সারা বছর আখড়া চালানো, চালডাল সবজির জোগান বজায় রাখা, শিষ্যদের সানুপুঙ্খ খবর নেওয়া ও তা মনে রাখা সবই মীরার সহজ ভজনার মতো। তমালতলায় সে যখন বাঁধানো শানে গালিচা পেতে বসে আসর পরিচালনা করে সে দেখবার মতো। একেবারে যেন জন্মনেত্রী। কে কোথায় বসবে, কাকে বেশি আপ্যায়ন করতে হবে, কাকে চা দিতে হবে, কাকে পান, সবই তার খেয়াল থাকে। পদ্মাসন করে বসে আছে, গেরুয়া বসন, নাকে রসকলি। আয়ত দুটি শান্ত চোখ এককালে বিদ্যুৎপ্রভ ছিল— তখন অনেক বাউল বৈষ্ণব পাক খেয়েছে ঘূর্ণিঝড়ে। এখনও হ্যাজাকের আলোয় স্পষ্ট দেখি মীরার চোখের অগ্নিকোণে পরিতৃপ্তির ঝিলিক, ঠোঁটের ফাঁকে কর্তৃত্বের অদৃশ্য সফল হাসি। শিষ্যরা ভৃত্যের মতো নির্দেশ নিচ্ছে আর পালন করে কৃতার্থ বোধ করছে। মীরা নির্দেশ দিচ্ছে কোন শিল্পীর পর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোন শিল্পী আসরে উঠে কর্ডলেস মাইকটা হাতে নেবে। গানের আগে তারা মীরাকে কুর্নিশ করে। দেখবার মতো।

এই অনুষঙ্গে মনে পড়বেই কালিদাসীকে। সত্তর পেরোনো বৃদ্ধা গায়িকা—বাউলতত্ত্ব জানে। সারাবছর এ মেলা থেকে সে মেলা। একটা ঝকমকে র-সিল্কের সাইডব্যাগ বানিয়েছে কালিদাসী— মোটামুটি হোল্ডঅল। চলেছে জেলা তথ্য অফিসে, লোকসংস্কৃতি পর্ষদে, বিধায়ক বা পঞ্চায়েত সভাপতির দরবারে। 'গানের সুযোগ করে দাও গো বাবাসকল, পেনশন দেবার ব্যবস্থা করো, গান করতে এলে রাহাখরচ বাড়াও। খাব কী?' যেমন তেমন যখন তখন বেশ ক'টা তত্ত্বগান গেয়ে দিতে পারে। কেউ নেই, নিঃসম্বল। সত্যি সত্যি শেষ পারানির কড়ি তার কণ্ঠের গান। কিন্তু সে গানের সমাদর কি থাকতে পারে বরাবর?

পশ্চিমবঙ্গ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র-র উদ্যোগে বসেছিল বাউল সম্মেলন ও সেমিনার গুসকরার এক কলেজে। বাউলদের সান্নিধ্যে কাটল দু'রাত দু'দিন। একদিন সকালে ঘরোয়া আলোচনা চক্রে আলোচ্য বিষয় ছিল : 'বাউল গানের ভবিষ্যৎ'। নানাজনে উঠে নানা কথা বলছেন। আমরা বিশেষজ্ঞরা ফুট কাটছি, গোঁজামিল বহুরকমের আশ্বাস দিচ্ছি। হঠাৎ বর্ধমানের এক বাউল গায়িকা, খানিকটা বর্ষীয়সী, বলে উঠলেন, 'বাউল গানের ভবিষ্যৎ কী হবে তা নিয়ে ভেবে কী হবে? বলুন তো আপনারা, আমার কী হবে?'

—কেন? কেন?

—আগে যারা গান শুনত, আদর করত, টাকা পয়সা দিত, তারা তো কই আর ডাকে না। তা হলে কি আমি শুকিয়ে মরে যাব?

আমরা চুপচাপ। এক যুবক বাউল নীরবতা ভেঙে বলল, 'দিদি... ফুলে যখন মধু থাকে তখন ভ্রমর আসে। মধু শুকোলে কি ভ্রমর আসবে? সেটা আপনার ভাবা ভুল।'

ফুলের ওপর ভ্রমর বসে আছে এমন ধরনের লোকচিত্র আঁকতে পারেন নবাসনের হরিপদ গোঁসাই। তাঁর আশি-পেরোনো নির্মেদ চেহারা একহারা, শ্মশ্রুগুম্ফজটাজুট মূর্তি। আপনমনে বসে বসে বাউলতত্ত্বের ছবি আঁকছিলেন। পদ্মের মৃণাল, জলস্তর আর সবুজ লতাপাতা। জিজ্ঞেস করলাম : 'এসব কী আঁকছেন?'

'মানুষের জন্মবৃত্তান্ত। জননীগর্ভের মধ্যেকার অবস্থা।' খাতা বোঝাই চিত্রমালা— নিজের ভাবনাচিন্তা দিয়েই আঁকেন, কেউ শেখায়নি। ছবি আঁকতে আঁকতে গুনগুন করেন :

> সে দেশের যত নদনদী
> উর্ধ্বদিকে জলস্রোতে বহে নিরবধি—
> আবার জলের নিচে আকাশ বাতাস
> তাতে মানুষ বাস করতেছে।

দীন শরতের লেখা দেহতত্ত্বের গান। হরিপদ গোঁসাইয়ের নাম অনেক শুনেছি, এই প্রথম দেখছি। ভাল হঠযোগ, প্রাণায়ামে দক্ষ বাউল। শুনেছি প্যারিসে যান যুবক যুবতীদের যোগ শেখাতে। তারাও আসে শীতকালে এই নবাসনে। বাড়িঘরদোর বেশ আধুনিক ধাঁচের, স্যানিটারি পায়খানা, পাতকুয়ো আর টিউবওয়েল। ফরাসি ভক্তভক্তাদের জন্য, তাদেরই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বদান্যতায় তৈরি। গোছানো মানুষ। হাসতে হাসতে দেখালেন নানা রাজপুরুষের সঙ্গে তাঁর ফোটোর অ্যালবাম। তারপরে চমকে দিলেন প্যারিস থেকে প্রকাশিত একটা সিডি রেকর্ড বার করে। হরিপদ গোঁসাই আর নির্মলা গোঁসাইয়ের কণ্ঠে বাউলগান, তাঁদের রঙিন ছবি। ইনলে কার্ডে লেখা Inde : Chants D'initiation Das Bauls Du Bengale.

হরিপদ-র প্রসন্ন হাসি দেখে বুঝলাম মানুষটা সবাইকে মেরে বেরিয়ে গেছেন— কোথায় লাগে সুবলদাস বা সাধনদাস? এবারে আশ্রমবিহারিণী নির্মলা মা-কে দেখি। সবাই নির্মলাকে মা-ই বলে। ষাট বছর পেরোনো একটু পৃথুল চেহারা, পান খেয়ে দাঁত কালো, গেরুয়া বসন, পাকা চুল। সিডির কভারে তাঁর ছবিটা উত্তরচল্লিশ বয়সের। তখনও চেহারায় কটাক্ষে খানিকটা রং ছিল, এখন একেবারে সদানন্দ হাস্যময়ী। হরিপদ বেশ প্রত্যয় নিয়ে বললেন, 'নির্মলা সেবাদাসী নয়, সাধনসঙ্গিনী। কুড়ি বছরে দুই মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়েছিল। মেয়েদের বিয়ে দিয়েছি, তার পরে ওকে আশ্রমে এনে সাধনভজন আর গান শিখিয়েছি।'

—আপনাদের সন্তান নেই?

—বাউল সাধনায় কি সন্তান জন্ম দেয়? দেয় না। গানে তাই বলছে : 'শরিক কোরোনা না রে মন/ করি বারণ।' আমাদের উর্ধ্বযোগ। শেখা কি সহজ? এই নির্মলা আমার কাছে কত মারধর খেয়েছে। জিজ্ঞেস করুন।

জিজ্ঞেস করতে হয় না। নির্মলা নিজেই উজিয়ে বলে, 'কী মার যে মেরেছে গোঁসাই— চড়চাপড় লাথি পর্যন্ত খেয়েছি। রাগ অভিমান কত করেছি। গোঁসাই কত ভালবেসে রাগ ভাঙিয়েছে, পায়ে ধরেছে। এখন তো আমরা বুড়োবুড়ি, তবে সাধনায় আছি। শিষ্যসেবক অনেক। গোঁসাই যায় শিষ্যদের বাড়ি। আমি যেতে পারিনে, কোমরে বাত, তা ছাড়া এই আশ্রমের দেখাশোনা কে করবে?'

আশ্রমটা বেশ বড় করেই ফেঁদেছে এরা। প্রশস্ত উঠোনের চারপাশে আট-দশখানা ঘর। গোরু আছে তিনটে। হলস্টিন গাই। তার জন্য খড়ের আয়োজন। একপাশে ধানের মরাই। উঠোনে গাঁয়ের বোষ্টম ভক্তরা দিনান্তে সন্ধ্যাকীর্তন গাইছে। বাড়ির কাজকর্ম করছে জনাকয় শিষ্যসেবক, বউ-ঝি। হরিপদ গর্বিত গলায় বলেন, 'আমি বরিশালের মানুষ, এসে পড়েছি নবাসনে। এখানে একবার গান করতে এসে বাঁধা পড়ে গেছি। গাঁয়ের লোকজনই আশ্রমের জমি দিয়েছে। বেটারা সব সন্ধেবেলা তাড়ি খেয়ে পড়ে থাকত, নইলে ঝগড়া কাজিয়া করত। এখন সায়ংসন্ধ্যা নামগান করে। দু'-চারজন বাউল গান গায়। আমাকে বলে বাবা, নির্মলাকে মা।'

'প্যারিস থেকে যারা আসে তারা কী বলে?' আমি জানতে চাই।

'তারাও বাবা বলে, মা বলে, এই দেখুন ফোটো।' দেখলাম দুই স্বর্ণকেশী ফরাসিনী হরিপদ-র গালে গাল ঠেকিয়ে ছবি তুলেছে। 'মিশেল আর জেনিপা... আমাদের দুই মেয়ে।'

নির্মলা বলেন, 'জেনিপা বেশি দুষ্টু... মিশেল খুব শান্ত।'

পৃথিবীতে যত আশ্চর্য জিনিস দেখেছি তার মধ্যে একটা হল হরিপদ-নির্মলার ফরাসি সন্তানদের আলেখ্য। ওরা যোগ শিখতে আসে। হরিপদ বলেন, 'ওদের খুব সাদা সহজ ভাববেন না। আমাকে ওরা টেস্ট করে তবে বাবা বলে মেনেছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—তাই নাকি? কী রকম?

প্রথমবার যেবার প্যারিসে যাই, তিরিশ বছর আগে, তখন যোগ শেখাতে যেতাম। একদল ছেলেমেয়ে যোগ শিখত, তা ধরুন জন পনেরো। খুব দুষ্টু। একদিন গাড়ি করে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। তিনটে গাড়ি। হঠাৎ একটা নদী দেখে বলে স্নান করবে। সবাই হুড়মুড় করে নেমে পড়ল। সবাই জামাকাপড় খুলে ফেলল। বুঝুন কাণ্ড। একেবারে বেবাক নাঙ্গা। আমাকেই নিয়ে নিল সঙ্গে। জাপটে ধরল জলের মধ্যে। আমি কুম্ভক করে থাকলাম। দেখেশুনে ওরা হার মেনে বলল, 'বাবা তুমি কঠিন লোক।' আমি বললাম, 'আমি যে সাধক।'

হরিপদ শুধু সাধক নয়, তান্ত্রিক ও যোগী, চিত্রকরও। ছোটখাটো টোটকা চিকিৎসাতেও যশ আছে। তবে সব অর্থে দরদি বাউলপ্রেমিক, তাদের অভিভাবকও বটে। বিপদে আপদে বাউলদের পাশে দাঁড়ান, টাকা পয়সা দেন। মা নির্মলা বললেন, 'বাউলদের মধ্যে বড্ড ব্যাধি বাবা। সংযম নেই। ইতরপনা বেশি। পুরুষের রোগ এসে যায় মেয়েদের মধ্যে। তখন এই নির্মলা মা ভরসা। গোঁসাই চিকিৎসা করেন আর আমি করি সেবা। ভাল কথা, আপনাকে একটা মজার জিনিস দেখাই।'

নির্মলা দ্রুত ঘরে ঢোকেন। না জানি আরও কী দেখাবেন। সিডি দিয়ে শুরু হয়েছে, ফরাসি শিষ্যশিষ্যাদের ফোটো দেখেছি। এবারে নির্মলা এলেন একতাড়া কাগজ নিয়ে। তাতে রয়েছে অপটু সই কিংবা নিরক্ষরের টিপছাপ, ওপরে মুচলেকা।

'এসব কী জানেন?' নির্মলা বিশদ করে বোঝান, 'এসব হল ব্যভিচারী ভণ্ড কিংবা বজ্জাত বাউলদের মুচলেকা। সাধনার নামে যারা মেয়েদের নষ্ট করে। এখানে এনে আমি তাদের নাকে খৎ দেওয়াই আর মুচলেকা লিখে নিই। নির্মলা মা-কে সবাই ভয় করে বুঝলেন।'

নির্মলা মা এককালে নাকি খুব ভাল গাইত আর নাচত। তার নাচে প্যারিস মজেছে এককালে। সিডির কভারে নির্মলার যে গানরত চেহারার রঙিন ফোটো রয়েছে তার সঙ্গে এখনকার চেহারার মিল পাওয়া শক্ত। এবারে তাই নাচ নয়, শুধু গান শুনলাম। আশ্রম থেকে বিদায় নেবার সময় নির্মলাকে মনে হল বটগাছের মতো। চারদিকে ডালপালা মেলে তৈরি করেছে স্বস্তি ও সান্ত্বনার একটা আশ্রয় ও আত্মতা। তার সন্তানকুল দেশেবিদেশে ছড়ানো। চলে আসবার আগে বললেন, 'রামনবমীতে বসে সোনামুখির উৎসব আর বাউল মেলা। তিনদিন পর এটা ভেঙে এখানে নবাসনে চলে আসে সব বাউল। তখন আসবেন। ভালমন্দ সবরকম বাউল দেখাব। তাদের সেবাদাসীদের দেখবেন।'

পরে নির্মলা মা-র সূত্রে খবর পাই গৌরবাবার। সিউড়ি থেকে মহম্মদবাজার হয়ে তার আস্তানায় যেতে হয়। একদিন সকালে সঙ্গীসাথিদের নিয়ে চলে গেলাম। গরিব গ্রাম, বিশেষত্বহীন, চাষিদের বাস। খোঁজ নিয়ে গৌরবাবাকে পাওয়া গেল তার ঘরে। সবাই বলল এটা একটা সৌভাগ্য, কারণ গৌরবাবা বড্ড ঠাঁইনাড়া স্বভাবের।

'আসুন আসুন'— গৌরবাবার আহ্বান বড় আন্তরিক, কিন্তু চেহারাটার সঙ্গে বাবা কথাটা মেলে না। বড়জোর পঁয়ত্রিশ বয়স। সুঠাম সুগঠিত শরীর, বলশালী। কাঁচা দাড়িগোঁফ, বাবরি চুল। খালি গায় সাদা খাটো অধোবাস। মুখে প্রত্যয়ের হাসি। এবারে দেখা গেল তার সাধনসঙ্গিনীকে। গৌরবাবার মাথায় মাথায় চেহারা, খাড়া পিনদ্ধ শরীর। সাদা সস্তা জামা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর থান পরনে। চোখেমুখে সাধিকাভাব একেবারে নেই। গাঁয়ের নিচুঘরের নিরক্ষর মেয়ে। ডাঁটো চেহারার খাটুয়ে দেহ। গৌরবাবা একে নির্ঘাত সাধনার জন্য এনেছে। এ গান বাজনা জানে না, ভাবভঙ্গিও তেমন মোহিনীমার্কা নয়। চোখের কোণে বিদ্যুৎ নেই। হাসিটা সরল।

গৌরবাবার দাওয়ায় বসেছিল জনচারেক মানুষ মুগ্ধ দৃষ্টিতে। গৌর বললেন, 'এদের বাড়ি হল আপনাদের নদে জেলার তামাঘাটায়। নাম শুনেছেন? এরা আমার ভক্ত শিষ্য। আমাকে নিতে এসেছে দল বেঁধে। তামাঘাটা চেনেন? সেই ধর্মদা পেরিয়ে, নদী পার হয়ে। এই সুবল রমেশ তোমরা তামাঘাটার গল্প বলো বাবুকে।'

—হ্যাঁ গল্পই বটে। বাবু তামাঘাটা খুব অধম জায়গা ছিল। গরিবদের গ্রাম। কোনওরকমে কৃষিকার্য করে চলত। ফসল ভাল হয় না ওদিকে, জমির স্বভাব খারাপ। তো আমাদের বাপ পিতেমো সহায় সম্পত্তি বিশেষ করতে পারেনি, হাতের কাজও কেউ জানত না, তাই গরিবানা ঘোচেনি, লেখাপড়া শেখেনি, দিগরে একটা প্রাইমারি বিদ্যালয়ও ছিল না।

সুবল এই পর্যন্ত বলার পর রমেশ বলতে লাগল, 'এবারে ধরুন সেই সেবার নকশাল আমলে নবদ্বীপে খুব কাটাকাটি খুনজখম হচ্ছিল। নবদ্বীপের বসাক পরিবার ছিল বাস্তুহারা তাঁতি। তাদের ছিল পঞ্চাশটা তাঁত। প্রচুর টাকাপয়সা করেছিল। নকশালরা তাদের নোটিস দিল, চাইল দু'লাখ টাকা। বলতে পারেন একরকম প্রাণের ভয়ে বা তাঁত বাঁচাতে বসাকরা চলে আসেন তামাঘাটায়, দুটো পরিবার। তখন আমরা সবে জন্মেছি।'

AMARBOI.COM

—তামাঘাটা কেন?

—কেউ তাদের বুদ্ধি দিয়েছিল। অসার জায়গা, দুর্গম আর মানুষজন কম। তা ধর্মদা থেকে দু' ক্রোশ হেঁটে নদী, সেই নদী পেরিয়ে জলা জমি ধরে এক ক্রোশ মাঠ ভেঙে তবে তামাঘাটা। বসাকরা গোরুর গাড়িতে তাঁত চড়িয়ে চলে এল নবদ্বীপের বাড়িতে তালা লাগিয়ে। বেশি নয় পাঁচটা তাঁত এনেছিল। ধরুন, তা থেকেই তামাঘাটার ভাগ্য ফিরে গেল। একেবারে গুরুর কৃপা, অলৌকিক।

—তাই নাকি? কী হল?

—তামাঘাটার চাষারা শিখে গেল তাঁতের কাজ। বসাকরা ছিল শিল্পী, ভাল টাঙ্গাইল শাড়ি বানাত। তামাঘাটায় তারা কমপয়সায় মজুর পেয়ে গেল। রমরমা ব্যাবসা। তারপর দেশকালের অবস্থা শান্ত হলে বসাকরা নবদ্বীপ ফিরে গেছে, তাঁত ক'টা বেচে দিয়েছে আমাদের। এখন ধরুন তামাঘাটায় চল্লিশ পঞ্চাশ ঘর আমরা তাঁত বুনি। লোন নিয়ে ঘরে ঘরে তাঁত বসেছে। মহাজনরা দাদন দেয়। বসাকরা আরেকটা কাজ করে গেছে। নিজেরা সায়ংসন্ধ্যা হরিনাম করত, আমাদেরও বোষ্টম বানিয়ে গেছে। তামাঘাটায় এখন চার চারটে সংকীর্তনের দল। আর শাড়ির ব্যাবসা করে খুব সচ্ছল অবস্থা। তাই গ্রামে ইস্কুল বসেছে। তামাঘাটার বুটি শাড়ি আর জামদানির এখন খুব নাম। চাষের বদলে এখন তাঁতি, গলায় কণ্ঠিধারী বোষ্টম।

আত্মগর্বের হাসি হেসে গৌরবাবা বললেন, 'এখন রমেশরা মাকু চালায় আর দেহতত্ত্বের গান গায় : "অতি সাবধানে ঘুরাই প্রেমের নাটা"। তাঁতের বুনন দিয়ে দেহের কথা বলা হচ্ছে গানে। আমারই শিক্ষা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কিন্তু তোমার বাড়ি বীরভূমের এত ভেতর দিককার গাঁয়ে। তোমাকে এরা পেল কোথায়? হদিশ দিল কে?'— আমি জানতে চাই।

—হ্যাঁ! সেটা এক ঘটনা। রমেশরা বর্ধমানের সমুদ্রগড়ে যায় প্রতি হাটে শাড়ি বেচতে গুরুবারে। সেখানে সুফল জানা আমার শিষ্য। বছর দুই আগে সেবার সুফলের বাড়ি গেছি আমি। রাতে গানের আসরে ওরা এল। তারপরে আলাপ, গুরুবরণ, ক্রমে দীক্ষাশিক্ষা। তামাঘাটায় এখন আমার একচেটিয়া শিষ্যসামন্ত। পঁচিশ ঘর। এই তো সামনের মাসের পুণ্যিমায় ওদের গাঁয়ে অন্নমচ্ছব, চলে আসুন। গান শুনবেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তো যাবই। কী তুমিও যাবে তো?

সুবল রমেশরা সমস্বরে বলে উঠল, 'গুরুমা না গেলে হয়?'

গুরুমা? এতক্ষণে তার নামটা জেনেছি: সাধনাবালা। একে কোথা থেকে জোটালো গৌরবাবা? আমার সঙ্গী উৎপল বলল, 'আপনাকে পরে বলব।'

সাধনা এক ধামা মুড়ি আর এক কেটলি চা আনল। রমেশরা কাপে ঢেলে চা দিল। বাটি করে মুড়ি। আমাদের সঙ্গে মিষ্টি ছিল এক প্যাকেট, সেটা খোলা হল। গৌরবাবা একমুঠো মুড়ি কপালে ঠেকিয়ে বলল, 'জয় গুরু।' সাধনাও বলল, 'জয় গুরু।'

এবারে গৌরবাবা আর সাধনাকে পাশে বসানো হল, তাদের ফোটো তোলা হবে। তাতে সাধনার ঘোর আপত্তি আর লজ্জা। মনে ভাবলাম, এ তো আর হরিপদ-নির্মলা নয় যে সিডি কভারে রঙিন ফোটোর জন্য একতারা উঁচিয়ে পোজ দেবে। সাধনদাস-মাকি কাজুমির মতো অকুণ্ঠিত স্টেজ পারফরমারও নয়। এ একেবারে গ্রাম্য সাধক— অকুলীন ও জড়তাগ্রস্ত। অবশ্য খুবই আন্তরিক তাদের ব্যবহার। খুবই বিনীত। গৌরবাবা বলেই ফেলল, 'আমাদের বাড়িতে অন্নসেবা নিতে আপনার কষ্ট হবে। সাধনা ভাল রাঁধতে জানে না। জাতে রুইদাস, যাকে বলে মুচি।' কথায় বলে, 'মুচি হয়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে।'

হরিভজনের উদার সমন্বয়বাদ দিয়েই মহাপ্রভু সব জাতকে এক করতে চেয়েছিলেন— খানিকটা পেরেছিলেনও। এখন অবশ্য বৈষ্ণব ধর্মে অতটা উদারতা নেই, জাতপাত আছে। উচ্চবর্গ ব্রাহ্মণ কায়স্থরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে কবজা করেছে। নিম্নবর্গের বৈষ্ণব ভক্ত বলতে বোঝায় সহজিয়া আর জাত-বৈষ্ণব। তামাঘাটায় যে বসাকরা গিয়েছিল তারা সহজিয়া। গৌরবাবা জাত-বৈষ্ণব, তবে এখন বাউলপথে আছে। সাধনাবালা হয়তো রুইদাসী বোষ্টম বা চামার বোষ্টম। সত্যিই সে রান্নাবান্নার রকমসকম তেমন জানে না, বরং দেহতত্ত্বের করণকারণ অনেকটা জানে, সেইজন্য গৌর ওকে আশ্রয় দিয়েছে।

কে যে কাকে আশ্রয় দিয়েছে বলা কঠিন অবশ্য, বিশেষত নিম্নবর্গের গৌণধর্মে। নামাশ্রয়ের পর গুরু দেন মন্ত্রাশ্রয়। শিষ্য সবশেষে পায় রূপাশ্রয়ের সাধনপন্থা, যাকে বলে 'দমের কাজ' অর্থাৎ দেহগত সাধনা। তাকে কামে থেকে হতে হয় নিষ্কামী, বিন্দুসাধনের কঠিন ব্রতে লাগে 'রূপ' মানে নারী। যে সে নারী নয়, লক্ষণযুক্ত, শান্ত ও প্রেমময়ী। সাধনাবালা নিশ্চয়ই সে ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য। গৌরবাবা তাকে সামাজিক আশ্রয় দিয়েছে না সাধনাবালার কাছে অনুগত হয়ে আছে সে রূপাশ্রয়ের তাগিদে, কে জানে?

চা-মুড়ি খেয়ে তামাঘাটার শিষ্যরা গেল গুরুপাটের রান্নাবান্নার আহার্য কিনতে, আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গীরা বার হল গ্রাম পরিক্রমায়। এবারে আমি মুখোমুখি বসলাম বাউল দম্পতির। সাধনা বলল, 'বসলে চলবে? কাজ আছে না?'

গৌর সাবলীলভাবে তার নারীসঙ্গীর উরুতে থাপ্পড় মেরে বলল, 'আরে বোসো বোসো। জানেন বাবু এত ভালবেসেও এই মেয়েটার মন পেলাম না। সর্বদা পালাই পালাই করছে। দাঁড়ে বসে না মোটে। অথচ ওকে দেখে আগের শক্তিটা চলে গেল।'

সাধনা বলল, 'চলে গেল কেন? আমি কি তাড়িয়েছি?'

'ওইটেই তো গোলমাল। তোমরা পরস্পরকে ভাবলে সতীন। আরে ওসব সতীন টতীন সংসার-ধর্মে হয়, বাউলের আবার সংসার কোথায়? তোমরা হলে আমাদের শক্তি। আমার তো ইচ্ছে যে তিনজন শক্তি নিয়ে সাধনা করে সিদ্ধ হব।'

এ যে একেবারে অন্য জগতের সংলাপ! ভাবলাম গোপ্য সাধনার গভীর নির্জন পথে আমি অনেকটাই গেছি কিন্তু তার নানা বাঁক তো দেখিনি। এখানে যেমন এসে পড়েছি একেবারে নিম্নবর্ণের বাউলসাধনার জাদুবাস্তবে। গৌরবাবা হরিপদ গোঁসাইয়ের মতো প্যারিস যায় না, তার কাছে আসে না মিশেল বা জেনিপা। সাধনদাসের কাছে মাকি এসেছে জাপান থেকে সেটা এখানে অকল্পনীয়। কিন্তু গৌরবাবাই কি কম চমকপ্রদ? রূপাশ্রয়ের সংকল্প নিয়ে নিম্নবর্ণ থেকে টেনে আনছে কায়াসাধনার সঙ্গিনী। মানুষটা তার সাধনপথের জন্য কি খুব স্বার্থপর? তিনজন সঙ্গিনী চাই তার অথচ তারা তিনজন থাকবে মিলেমিশে? তাদের মধ্যে কলহবিবাদ হবে না? তারা তো সাধিকা নয় কেউ, পুরুষের সাধনার নিমিত্তমাত্র, কিন্তু তারা কি মনহীন যন্ত্র? কেন তারা পরস্পরকে সইবে?

গৌরবাবাকে বললাম, 'তিনজন শক্তি নিয়ে সাধনা করা যায়? তন্ত্রে শুনেছি চক্রসাধনায় বসে সাধক ও সাধিকারা। বাউলমতেও এমন আছে?'

—আছে। আমার তো তবু তিনশক্তির সাধনা। আমার গুরু করেছিলেন এগারোজন নারী নিয়ে সাধনা। সিদ্ধ হয়েছিলেন। আর আমি অধম, একজনকেই বশ করতে পারলাম কই?

এতক্ষণ পরে আত্মগর্বী লৌকিক সাধকের আননে ফুটে উঠল ম্লান অসহায়তা। কায়াবাদী সাধনপথে প্রকৃতিশক্তির এমন জোর আগে দেখিনি। হীন বংশে জন্ম কিন্তু যৌবনগরবে দৃপ্ত সাধনাবালার সাধারণ বেশবাস আর কৃষ্ণকান্ত চেহারায় ফুটে আছে চমৎকার নির্লিপ্ত না কি বিজয়িনীর অভিমান? গৌর বলে, 'ক'মাস ধরে কেবলই শাসানি দেচ্ছে "চলে যাব চলে যাব।" কেন গো চলে যাবে? থাকো না।'

সাধনা অবহেলে বলল, 'কতদিন আছি বলো তো? চারটে জয়দেব হয়ে গেছে।'

এবারে আমার চমকের পালা। বছর গোনার এমন ভাষা আমার জানা ছিল না। জয়দেব কেঁদুলির পৌষ সংক্রান্তির মেলায় একত্রে যাওয়া এদের বছরের একক। সেই হিসেবে গৌর আর সাধনাবালা চার বছরের জুটি। এবার তাতে ভাঙন লেগেছে। কিন্তু কেন চলে যাবে? গৌর বলল, 'সেটা ওকেই জিজ্ঞেস করুন বাবু। আমি দেখি একটু ওধার পানে যাই।'

জীবনের এক অবিশ্বাস্য কিংবা অপূর্বকল্পিত এই অভিজ্ঞতা সন্দেহ কি? আমার মতো একজন নাগরিক বুদ্ধিজীবী বসে আছি নিম্নবর্ণের রুইদাসীর সামনে। তার জীবন আর আমার জীবন একেবারে আলাদা, সমান্তরাল রেখা যেন, কোনওদিন মিলতে পারে না। প্রায়ান্ধকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাটির দাওয়া, ওপরে খড়ের ছাউনি, দরিদ্র বাউলের আস্তানা। সাধনাবালা বসে আছে লজ্জানত মুখে। বললাম, 'কেন থাকবে না তুমি? মানুষটা কি খারাপ? অত্যাচার করে?'

মুখর প্রতিবাদে মাথা ঝাঁকিয়ে সেই নারী বলল, 'না না। মানুষটা খুব ভাল। বড় দরদি। ভালবাসার কাঙাল। কিন্তু ও আমাকে কোনওদিন সন্তান দেবে না, খুব নিষ্ঠুর। তাতে নাকি ওর ভজন সাধন নষ্ট হয়ে যাবে।'

আশ্রম থেকে দিনান্তে সিউড়ি ফেরার পথে উৎপলের কাছে জেনেছিলাম সাধনাবালার কাহিনি। বক্রেশ্বরে ট্যুরিস্ট লজের আশেপাশে ছিল সাধনার ঘর। তার কেউ নেই। লজের পাশে অন্ধকার বালিয়াড়িতে কুপি জ্বেলে সে খদ্দের ধরত। গৌর তাকে উদ্ধার করে এনেছে। সেই পথবেশ্যা হয়েছে তামাঘাটার গুরুমা। তবু মন ভরেনি। সন্তানবতী হয়ে ভরন্ত জীবনের স্বপ্ন এখন তার চোখে। কিন্তু তা পূরণ হবার নয়।

গৌরবাবাকে শেষ দেখি পরের বছরে। পোস্টকার্ড পাঠিয়েছিল, সমুদ্রগড়ে সে গণেশ প্রামাণিকের বাড়ি আসছে একটা দিবসী উৎসবে। বাউলগানের আসর বসবে। টেপরেকর্ডার নিয়ে গেলে অনেক গান তুলতে পাব। গেলাম বেলাবেলি। শিষ্যবাড়ির দোতলায় বসে আছে গৌর— প্রসন্ন চোখ, হাসি মুখ। বললাম, 'সাধনা তোমার কাছে আছে এখনো, তাকে তো দেখছিনে।'

—ওই তো ওই কোণে বসে আছে, মেয়েদের মধ্যে।

শিষ্যবাড়ির মেয়ে বউদের মধ্যে বসে আছে সাধনা। চোখাচোখি হল, ম্লান হাসল। তার কোলে একটা দু'-তিন বছরের ডাগর ছেলে, জাপটে ধরে আছে তৃষিত বুকের মধ্যে। না, এ তার নিজের সন্তান নয়, শিষ্যবাড়িরই কারুর সন্তান। গৌরবাবা তাকে সন্তান দিলে বাউলধর্মে পতন ঘটবে। আর সে যদি গৌরকে ছেড়ে সত্যিই চলে যায়? কোথায় যাবে? সেই বক্রেশ্বরে কুপি ধরে খদ্দের খোঁজার জীবন না আরেক বাউলের সাধনপথের উপচার হওয়া?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফানা থেকে বাকা

সচরাচর বাউল-ফকির কথাদুটি আমরা শব্দদ্বৈতের মতো হাইফেনবদ্ধ করে উচ্চারণ করি, লিখি, কিন্তু তাদের কি এক বলে ভাবি? সাধারণ মানুষের কাছে, গবেষকদের কাছে গানের রসিকদের কাছে বাউল যে-পরিমাণ সমাদৃত, ফকিররা কি তার এক-দশমাংশ মনোযোগ পেয়েছে কোনওদিন? আজকাল চল হয়েছে বাউল গানের পাশে কোথাও কোথাও ফকিরি গানের আসর। সরকার ফকিরদের দিকে নজর দিচ্ছেন গত দু'-এক দশক—সেটা শুভলক্ষণ। শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায় বাউল আর ফকিরদের আলাদা দুই আস্তানা, আলাদা অনুষ্ঠান— সেটা নিন্দার্হ। নদিয়া-মুর্শিদাবাদের বাউল আর ফকিররা মৌলবাদীদের হাতে অত্যাচারিত ও নিগৃহীত হতে হতে শেষ পর্যন্ত রুখে দাঁড়াতে সম্মিলিত হয়েছেন, তাঁদের সংগঠনের নাম 'বাউল-ফকির সংঘ'— এই প্রয়াস অভিনন্দনীয়। কিন্তু একটু নজর করলে নানা ভাঁজ চোখে পড়ে। দৃশ্যতই বোঝা যায়, সমাজে বাউলদের যে মান্যতা ফকিরদের তা নেই। আমাদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভা-সমিতি সম্মেলনে আমরা বাউলদের ডাকি, ফকিরদের নয়। বেশ ক'জন বাউল গান গেয়ে সম্পদশালী হয়েছেন, গাড়িবাড়ি করেছেন এতো কোনও অলীক বার্তা নয়, কিন্তু ফকিরদের আজ পর্যন্ত কোনও সামাজিক বা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার খবর আমার কাছে নেই। বিদেশে গত তিন দশক যাঁরা বাউলদের নিয়ে যাচ্ছেন ও মঞ্চে নাচাচ্ছেন গাওয়াচ্ছেন, লিখছেন গালভরা হ্যান্ডআউট তাঁদের অনুষ্ঠানপত্রীতে, তাঁদের বিন্দুমাত্র উৎসাহ বা আবেগ নেই ফকিরদের বিষয়ে। প্রতিবছর বীরভূমের পাথরচাপুড়িতে 'দাতা বাবার' নামে যে বার্ষিক জমায়েত হয় ফকিরদের, সেখানে বাবুসম্প্রদায় কিংবা ছাত্রছাত্রী গবেষকদের বড় একটা দেখা যায় না। ফকিরদের নিয়ে দূরদর্শন প্রতিবেদন কিংবা ডকুমেন্টারি ফিল্ম ততটা হয়নি। তাঁদের গানের ক্যাসেট যদি বা হয়ে থাকে তবে তার প্রচার বা সমাদর হয়নি। ফকিরদের মধ্যে থেকে কোনও পূর্ণদাস বা পবনদাসেরা এখনও উঠে আসেননি, যাঁরা আন্তর্জাতিক গানের বিশ্বে দাপাবেন। প্রকৃত ফকিরদের নিয়ে আজ পর্যন্ত সবিস্তারে প্রকৃত বাংলা ছোটগল্প লেখা হয়েছে কিনা সন্দেহ, সফল উপন্যাস তো অসম্ভব। অথচ বাউলদের নিয়ে অনেক লেখা রয়েছে কথা সাহিত্যে। ফকিরিগানের সংকলনও করেননি কেউ। তবে রাজ্য সংগীত আকাডেমির পক্ষে কঙ্কন ভট্টাচার্য ফকিরি গান টেপরেকর্ডারে ধরেছেন, গ্রামে গ্রামে ঘুরে, সেটা জানি। 'লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র' ফকিরি গানে উৎসাহ দিচ্ছেন— এগুলি ব্যতিক্রম। আরেকটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রমী উদাহরণ দুবরাজপুরের ফকিরডাঙার 'অচিনপাখি', সংস্থা, যাঁরা তাঁদের পত্রিকায় ফকিরিগান ছেপে চলেছেন এবং বেশ ক'বছর 'অচিনপাখি'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামে গরিব ছাত্রদের সঙ্গে ফকিরদের সন্তানদের প্রাথমিক বিদ্যাচর্চার পরিবেশ গড়েছেন।

কিন্তু সাধারণভাবে পশ্চিমবঙ্গে ফকিররা পড়ে আছে সমাজের একটেরে। উপেক্ষিত, অনাদৃত। অসহনীয় দারিদ্র্য আর অনপনেয় অশিক্ষা তাদের জন্ম জন্মান্তরের বিধিলিপি। হিন্দু সমাজ বাউলদের দেখে, ফকিরদের উপেক্ষা করে। মুসলমান সমাজ ফকিরদের ঘৃণা করে, কারণ তারা বেনামাজি, রোজা রাখে না, গান করে প্রকাশ্যে (যা নাকি ইসলামে নিষিদ্ধ) এবং ধর্মনেতাদের মান্য করে না। কিন্তু অনীহার আসল কারণ অন্য। ফকিররা মুসলমান শরিয়তি নির্দেশ না মেনে বেরিয়ে গেছে নিজেদের পথে, খুব একটা গ্রাহ্যও করে না মূল স্রোতকে। ধর্মের বাহ্য আচারে তাদের আস্থা নেই। লোকদেখানো আন্দাজি পথ তাদের অপছন্দ। তারা আত্মমগ্ন উদাসীন ও আত্মতৃপ্ত।

আমাদের প্রতিদিনের জীবনে ফকিরদের নিয়ে যে কোনও ভাবনা নেই, করণীয় কর্তব্য নেই, পরিকল্পনা নেই তার মূলে কিন্তু ফকিরদের অদ্ভুত জীবনশৈলী। তাদের তো কিছুমাত্র ভোগসুখ বা ভালভাবে বাঁচার বাসনা নেই। উপাস্যকে তারা অন্তরে চায় বলে পার্থিব কিছু চায় না, অথচ বৈরাগীও নয়। অনেকেই জন্মনিয়ন্ত্রণে অবিশ্বাসী, বেশ ক'টি সন্তান সন্ততি নিয়ে চালাঘরে খেয়ে না-খেয়ে বেঁচেবর্তে থাকে। চাহিদা নেই, প্রতিষ্ঠাকামী নয়, ঘরে বিদ্যুৎ নেই, আসবাব নেই, আদবকায়দা নেই। অথচ আশ্চর্য সেবাপরায়ণ এবং অতিথিসৎকারে সদা সতর্ক। বিনীত, অকৃত্রিম, অনভিজাত ও অনাড়ম্বর। সবকিছু ত্যাগ করে তবে তো ফকির হওয়া যায়। ওরা নিজেরাই বলে ফকিরের কোনও ফিকির নেই। বাউল-ফকির উভয়েরই অবশ্যমান্য লালন শাহ একটা গানে বলেছেন :

ফেরেব ছেড়ে কর ফকিরি।
আসল ফকিরি মতে
বাহ্য আলাপ নাইগো তাতে।

'ফেরেব' শব্দটার অর্থ বোঝা যাবে 'ফেরেব্বাজ' কথাটির অনুষঙ্গে, অর্থাৎ প্রতারক, মিথ্যাবাদী, ধান্দাবাজ। এইসব ত্যাগ করে তবে ফকিরি ধর্ম পাওয়া যাবে। আসল ফকিরি মতে বাহ্য আলাপ থাকে না, অর্থাৎ তার সবটাই অন্তর্জগতের ব্যাপার, ধ্যানময় ও নীরবতালব্ধ। এমনতর, উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন ফকিরিপথও খুব নিষ্কণ্টক নয়— কারণ চারপাশে বহুতর প্রতিকূল ও প্ররোচনা। লালন তাই বলতেন :

ফকিরি করবি খ্যাপা কোন্ রাগে।
হিন্দু মুসলমান দুইজন দুই ভাগে ॥
আছে বেহেস্তের আশায় মোমিনগণ
হিন্দুদিগের স্বর্গের মন ॥

ফকিরি সাধনায় এটাই বড় বিঘ্ন। সমাজের হিন্দু মুসলমানে মিলমিশ নেই, দুইজন দু'ভাগে বিভাজিত। তবে তাদের দু'জনেরই লক্ষ্য এক, ঐহিক নয়— পারত্রিক। ধর্মনিষ্ঠা মোমিন মুসলমান চায় বেহেস্ত, হিন্দুরা চায় স্বর্গ। ফকির এর কোনওটাই কামনা করে না। সে চায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মস্থ হতে। জপ ধ্যান জিকির তার কাম্য। কাম্য আল্লা। তাই তাঁর ধ্যানে সে 'ফানা' হতে চায়। হতে চায় দিওয়ানা। তার কাছে পার্থিব সবকিছু ম্লান, তাৎপর্যহীন, অসার। সেইজন্য প্রকৃত ফকির কোনওদিন আলোকিত মঞ্চে উঠে বৃত্তাকারে নাচবে না বাউলদের মতো, সাজবে না বর্ণময় চোখধাঁধানো বস্ত্রে, অলংকারে। আনন্দলহরী, ক্যাসিও, ডুগি তবলা, আড় বাঁশি, সারিন্দা, কিছুই তার লাগে না। বড়জোর একতারা বা দোতারা, ক্বচিৎ বেহালা। কিছু না থাকলে থালা বাজিয়ে চলে তাদের গান, চিমটেয় রাখে তাল। 'ভোলামন' বলে চেঁচিয়ে ওঠে না— মোটকথা কোনও ব্যাপারে তাদের ফিকিরি বা বাহ্য কিছু আড়ম্বর নেই।

ফকিররা জীবনবিমুখ বৈরাগী নয়, গেরুয়া পরে না। দীনবেশে একেবারে রাজভিখারি। এই জন্যই তাদের কথা কেউ জানল না— কেউ সমাদর করল না। তারাও সেটা চায়নি। সবার অধম হয়ে দীনাতিদীন হয়ে খোলামেলা নিসর্গের মধ্যে তাদের উপাস্যসন্ধান। তাদের কোনও পাঠ্যবই নেই, পাঠ্য হল 'দেলকেতাব'— আত্মপাঠ। শরীরের মধ্যেই নাকি মসজিদ। সেখানে সর্বদাই চলছে দায়েমি নামাজ। রোজা মানে কায়মনোবাক্যের সংযম— সেতো রোজকার কাজ— সর্বদাই রোজা। হজ বা তীর্থে তাদের মতি নেই।

আমার গবেষণা-সহকারী দুবরাজপুরের সাতকেন্দুরির লিয়াকত আলিকে ভার দিয়েছিলাম বীরভূমের ফকিরদের সম্পর্কে পায়ে হেঁটে খোঁজ নিতে। লিয়াকতের নিজের বাড়ির খুব কাছে ফকিরডাঙা। সেখানে দায়েম শা ফকিরের সাধনার স্থান ও সমাধি। দায়েম শা-র সন্তানরা ওখানেই থাকেন। একবার সেখানে গিয়ে ফকিরি আস্তানা চাক্ষুষ দেখে এসেছি বছর দশেক আগে। লিয়াকতই নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে মহম্মদ জালাল শাহ-র কণ্ঠে শুনেছিলাম দায়েম শাহ-র গান— সংগ্রহ করেছিলাম তার বেশ ক'টি। পরে লিয়াকত ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে ওই ফকির পরিবারের সঙ্গে এবং আপ্ত ইচ্ছায় জালাল শাহ-র ছোটমেয়েকে বিয়ে করেছে। ব্যাপারটা খুব অভিনব, কারণ সাধারণত ফকিরদের সঙ্গেই ফকিরদের মেয়ের বিয়ে হয়। স্বাভাবিক সাংসারিকতাময় আমাদের যে জীবন, যাতে থাকে কিছুটা ভোগবিলাস, সাজাগোজা, ঘরগোছানো, সঞ্চয়স্পৃহা, দেখনদারি, আসবাব ও সম্পদ, সেতো ফকিরদের থাকে না। সেই বাড়ির মেয়ে কী করে এসে খাপ খাওয়াবে নিম্ন মধ্যবিত্ত সংসারের বাঁধা ছকে?

মেয়েটিকে লিয়াকতের মনে ধরেছিল বলেই বিয়ে করেছে নিশ্চয়। তবু কিছু মজা থাকে সবসময় তার মধ্যে। স্বভাব বাউন্ডুলে লিয়াকত। শিক্ষিত যুবক সে, আধুনিকমনস্ক। জাতিবর্ণভেদ বোঝে না। চমৎকার কবিতা লেখে। বাউলদের সঙ্গে চরম ঘনিষ্ঠতা। ইচ্ছে হলে প্রচণ্ড গাঁজা টানে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম : 'লিয়াকত, তুমি একজন ফকিরের মেয়ে বিয়ে করলে কেন?' লিয়াকতের চোখে কৌতুকহাস্যের ছটা খেলে গেল। বলল, 'ফকিরের মেয়ে তো? কোনও ডিমান্ড নেই। কিছু চাইবে না। হা হা হা।'

আসলে ফকিরের সঙ্গেই ফকিরের মেয়ের বিয়ে হয়েছে। ভাবতে গেলে লিয়াকত মর্মে মর্মে পাকা ফকির। তারও কোনও চাহিদা নেই এই জীবনের কাছে। কিন্তু বিয়েটা একদিক থেকে জোড়কলমী। মুসলমান বংশের ছেলের সঙ্গে ফকির কন্যার বিয়ে। লিয়াকত অবশ্য জন্মেই মুসলমান, কিছুই মানে না। তবে মরমি মানবতাবাদী। তার শ্বশুরবংশটি বেশ। সেটা বলার মতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহম্মদ ভ্রমর শাহ্-র বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলার চুরুলিয়ায়। জাত ফকির। তাঁর সন্তান দায়েম শাহ্। আলমবাবা নামে এক ফকির দায়েমকে শিষ্য করে ডেকে নেন দুবরাজপুরের এই আলমডাঙায়। এখন সেটাই মুখে মুখে ফকিরডাঙা। দায়েম শাহ্ ছিলেন মগ্ন সাধক ও গীতিকার। ফকিরডাঙার শান্ত নির্জন গাছতলায় আলমবাবা আর দায়েম শাহ্-র সমাধি দেখলে মনে তৃপ্তি আসে। আখড়ার গা বেয়ে চলে গেছে রেললাইন। দিনে যত আপ-ডাউন ট্রেন যায় ভক্তযাত্রীরা সমাধি তাক করে পয়সা ছোড়ে। খুব জাগ্রত থান হয়ে উঠেছে লোকবিশ্বাসে। কতজন মানসা করে।

দায়েম শাহ্-র ছেলে জালাল শাহ্। পেশা ফকিরি গান। ঘুরে বেড়ান গলায় গান নিয়ে। লিয়াকত এই ফকির বাড়িতে বিয়ে করে একটা নতুন ঢেউ তুলেছে। সে দেখল এদের হতদরিদ্র জীবনে কোনও অভিলাষ বা পার্থিব বাসনা নেই, শিক্ষাও নেই এক ফোঁটা। এখানে সে কয়েকজন হৃদয়বান বন্ধুর সাহায্য ও সহযোগে 'অচিনপাখি' বিদ্যালয় খুলেছে। ফকিরদের সন্ধানে এসে লিয়াকতকে আবিষ্কার ও তার বন্ধুতা অর্জন আমার জীবনের একটা বড় অভিজ্ঞতা। আর একটা সত্য এই যে, বাউলদের জানতে বুঝতে তাদের ডেরায় না গেলেও চলে কিন্তু ফকিরদের জানতে গেলে তাদের আস্তানায় যেতেই হবে।

বলা বাহুল্য, ফকিরদের হালহকিকত আমার চেয়ে লিয়াকত অনেক বেশি জানে, তবু সে বীরভূমের শাসপুরে আমিন শাহ ফকিরের সন্ধানে গিয়ে থ হয়ে যায়, কারণ তাকে দেখে একজন ফকির বলে মসজিদে নিয়ে যেতে। লিয়াকতের বিস্ময় মসজিদ শুনে। ফকিরদের মসজিদ হয় নাকি? কিংবা ফকিররাও কি তবে মসজিদে যায়? আসলে আলম শাহ বাড়ি ছিলেন না। আসবেন, এসে পড়বেন, সন্ধের আগে। ফকিরের বউ অচেনা অজানা লিয়াকতকে বলে, 'চিন্তা নেই। ভাত খান, আরাম করুন— আজ থাকুন। কাল যাবেন।'

একেবারে খাঁটি ফকির পরিবারের অভ্যর্থনা, সেবাকুশল সত্তার উন্মোচন। অজ্ঞাতকুলশীলকে ভয় কীসের? চুরি ডাকাতি? বাড়িতে সামগ্রী বলতে কিছুই তো নেই। বেচারি লিয়াকত দুবরাজপুরের সাতকেন্দুরি থেকে বেরিয়ে তিন ঘণ্টা বাসে করে এসে, তারপরে শাসপুর পৌঁছেছে। একেবারে রুদ্ধশ্বাস অবস্থা। আমিন শাও নেই, অগত্যা থাকতেই হবে। কিন্তু মসজিদে নিয়ে যেতে বলছে কেন? তার অস্বস্তি লাগে। মসজিদের দিকে সে ঘেঁষে না। লিয়াকত ভাবল।

কাকে বোঝাব— মসজিদ মানে মিনার খিলান ও গম্বুজের আঙ্গিক অপরূপ সৌধ। যার ভিতরে থাকেন মৌলবি ও নামাজি মানুষজন। আমি নামাজি নই, আবার মৌলবিদের সঙ্গ ভাল লাগে না বলে দূরে থাকি।... বলতেই হচ্ছে আজ পর্যন্ত কোনও মৌলবি হাফিজকারী আলেম অর্থাৎ কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় মুখপাত্রের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়নি বা প্রগাঢ় আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। বরং মৌলবি-না-মানা বেনামাজি (বাহ্যিকভাবে) ফকিরদের সঙ্গেই আমার প্রাণের টান, নাড়ির নিবিড় একাত্মতা। এমনকি আনুগত্যও।

লিয়াকত মাঝে মাঝে নিজে নিজে গেয়ে ওঠে আপন মনে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুরশিদ যার সখা তার কীসের ভাবনা?
যার হৃদয়মাঝে কাবা নয়নে মদিনা।

তার লেখা কবিতায় আছে আরেকটু ভেতরের কথা। যেমন :

মন্দির মসজিদের নামে ইঁটপাথরের খাঁচা নয়।
সহজ বংশীধ্বনির মতো—
নীড়ের থেকে নীড়
'আয়না মহল' যেখানে গড়ে উঠল
লালনের নৃত্য অপরূপ একতারা উঁচানো হাত ধরে।

অনেকদিন আগে জালাল শা ফকির তাকে বলেছিলেন মৌলবিদের সঙ্গে কেন ফকিরদের কোনওদিন মিলমিশ হয় না। জালালের বক্তব্য :

> মৌলবি আলেম হাফিজকারীদের সঙ্গে ফকিরদের কোনওদিন মিল হবে না। চিরদিন বিরোধ আছে এবং কিয়ামত (মহাপ্রলয়ের দিন) পর্যন্ত থাকবে। আসলে কি, ওরা কোরআনের হাড়মাংস নিয়ে টানাটানি করে, আর আমরা ফকিররা আছি মগজ নিয়ে। একসঙ্গে ওঠা বসা সম্ভব?

এতসবের পরেও তাকে কিনা যেতে বলছে মসজিদে? লিয়াকত শ্লথ পায়ে এগোয়। পথ দেখাচ্ছে এক কিশোর। মৌলবি বা আলেমদের সঙ্গে ফকিরদের আরেকটা গুরুতর অমিলের কথা লিয়াকতের চোখে পড়েছে। সে তাই উল্লেখ করেছে :

AMARBOI.COM

> মুলসমানত্বের নামে উর্দু— আংশিক হিন্দিরও— ভাষা-সংস্কৃতির ছাপ মৌলবির কথাবার্তা, পোষাক ও আচরণে যতখানি সুস্পষ্ট, তার কণামাত্রও বাংলা বা বাঙালির নয়। এখানেও ফকিরের অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীত। উর্দু-হিন্দি পরিত্যাগ করে এরা বাংলা ভাষাতেই রচনা করেছে গান, গাইছেও বাংলাতে। সাধনতত্ত্বের ভাবকে প্রকাশ করতে এরা আরবি ফারসি কখনও বা উর্দু শব্দ ও ভাবধারাকে আত্মীকরণ করে বাংলার ভাবধারা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে বাঙালির নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিকে আরও ব্যাপক, প্রসারিত ও প্রকাশক্ষম করে তুলেছে। মৌলবিদের মতো বাঙালি জাতিসত্তাকে উপেক্ষা করেনি, বরং সুহৃদ ও বন্ধু হয়ে উঠেছে। বাঙালির সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের প্রশ্নে ফকিরের উদার, মানবিক ও সমন্বয়বাদী ভূমিকাকে যে গোঁড়া ও পরগাছা মৌলবিরা হিন্দুয়ানীর ছাপ বলে অপব্যাখা করবে এবং শুদ্ধকরণের নামে খড়্গহস্ত হয়ে সাধারণ মুসলমানদের লেলিয়ে দেবে তাতে আশ্চর্য কি?

এবারে কিশোরটি ছোট্ট একটা মাটির ঘরের সামনে লিয়াকতকে এনে খাদিমকে খুঁজতে লাগল। লিয়াকতের আবার ধন্ধ লাগে। মসজিদে তো খাদিম থাকেন না, খাদিম হলেন পিরের মাজারের সেবাইত। তবে? তালা খুলে ছেলেটা মাটির ঘরে ঢুকল। পেছনে লিয়াকত। দেখল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিতরটা নিকানো, পরিচ্ছন্ন। এক কোণে জলের কলসি, পাশে গ্লাস। অন্য কোণে খেজুরপাতার দু'-তিনটে তালাই। দেওয়ালে ঝোলানো লণ্ঠন। তাকে কয়েকটা বই ও খাতা। ... মেঝের উপর একটা তালাই বিছিয়ে ছেলেটি বসতে বলল। একটা ধাঁধার মধ্যে ভাবছি— মসজিদ বলে এ আমি কোথায় এলাম? এমন সময় একজন ঘরে ঢুকলেন। ছোটখাটো সাধারণ চেহারা, লুঙ্গির মতো করে পরা ধুতি, গায়ে গেঞ্জি। বললেন, 'আমিই খাদিম।'

'আমাকে মসজিদে নিয়ে যেতে বলল একটা লোক। আমি তো ঘাবড়ে গিয়েছিলাম'। খাদিম আমার দিকে চোখ ফেরালে বললাম, 'যাক ছেলেটি সে কথা না শুনে আমাকে এখানে এনে ভালই করেছে।'

'ছেলেটি আপনাকে মসজিদেই এনেছে। এটাই মসজিদ। এটা ফকিরের মসজিদ। আমরা ও মসজিদে যাই না।'

খাদিম ব্যাখ্যা করলেন, 'মসজিদ কি? এবাদতখানা তো? আকার-প্রকার তো গৌণ। এটাই আমাদের এবাদতখানা।'

বিস্মিত হতবাক লিয়াকত্‌কে খাদিম শোনালেন ফকিরিয়ানার সবচেয়ে সরল সত্য। খুব গরিব, রিকশাঅলা, ফেরিঅলা, জন-মজুর, ভিক্ষাজীবী গায়ক— যাদের জমি নেই, আছে সামান্য ভিটে, তারা ঘরে ঘরে চাল পয়সা জমিয়ে বহুদিনের চেষ্টায় গড়েছে এই মসজিদ। কারোর সাহায্য নেয়নি। ফকিরদের তৈরি ফকিরদের জন্য মসজিদ। লিয়াকত ঘুরে ঘুরে ফকিরদের অনেক গান সংগ্রহ করেছে সেটা বড় কথা নয়, তার চোখ দিয়ে সে চিনিয়েছে ফকিরিতন্ত্র সেটাই তার সবচেয়ে বড় কাজ। ওই যে একবার একজন আমাকে বলেছিল, 'বাইরে বাইরে যতটা বোঝার তোমার বোঝা হয়ে গেছে। বাকিটা বুঝতে গেলে তোমাকে দীক্ষা নিয়ে শরীরে আচরণ করতে হবে।' আশ্চর্য যে একবার পাথরচাপুড়ির মেলায় এক ফকির লিয়াকতকে হুবহু একই কথা বলেছিলেন। সে আমার মতোই ফকিরিপন্থার ভেদ বা রহস্য বুঝতে চেয়েছিল, আর আমি চেয়েছিলাম বাউলতত্ত্ব জানতে, এটুকুই যা তফাত। লিয়াকত লিখছে:

আভাসে ইঙ্গিতে ফকির এমন দু' একটা কথা বলেছিলেন, আমার পক্ষে বোঝা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল ঠিক কি বলছেন। একটু তফাতে চুপচাপ বসে অন্য একজন ফকির কথাগুলো শুনছিল। বেশ বয়স্ক, চুলদাড়ি সব শাদা। হতাশ হয়ে যখন উঠে চলে যাচ্ছি, বুড়ো ফকির আমাকে ডাকল। ...কিছুক্ষণ অন্তর্ভেদী চোখে আমাকে দেখে বলল, 'শোনো বাবা, ফকির-বাউলের সঙ্গ করো সেটা কথাতেই টের পাচ্ছি। ভাল। তবে কি জানো, ভেতরের খবর সবাই জানে না, জানলেও দেবে না। দেওয়ার নির্দেশ নেই। বাইরে থেকে যা জানার অনেকটাই জেনেছ— এরপর যদি জানতে চাও ফকির-বাউলের পেছন পেছন ঘুরে আর লাভ হবে না। গুরু ধর। মুরশীদ ছাড়া কোনোভাবে আসল ভেদ পাবে না।'

দুজনেরই আমাদের একই অভিজ্ঞতা হল কেন? কারণ, একটা জায়গায় বাউল-ফকিররা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিলেমিশে গেছে। সেটা তাদের সাধনার ক্ষেত্রে। বাউলদের খানিকটা বাহ্য খানিকটা গোপ্য। ফকিরদের খানিকটা জাহির খানিকটা বাতুন। অর্থাৎ আধেক প্রকাশ্য আধেক গোপন।

কথাটা হয়তো ভুলই বলা হল— ব্যাপারটা ঠিক আধাআধি নয়। অনুপাত হবে চার ভাগের একভাগ প্রকাশ্য, তিন ভাগ গোপন। এই গোপনকে জানতে গুরু লাগে, দেহ লাগে, নারী চাই, চাই আত্মসংযম। কিন্তু দুনিয়াদারি তো আছে— বেঁচে বর্তে থাকার নানা কৌশল। বাউলদের এই দুনিয়াদারি বেশ দৃষ্টিনন্দন। আলখাল্লা, পাগড়ি, কোমরবন্ধ— একহাতে একতারা কোমরে বাঁধা বাঁয়া। পায়ে ঘুঙুর, শরীর ভরা নৃত্যনাট্য। তাকে জানতে গেলে এই নাট্যকে ভেদ করতে হবে। ক'জন পারে? সবাই তো গানে মজে যায়। ঢলে পড়ে আত্মহারা গায়ন শুনে। কেউ কেউ তাদের গানের নাম দিয়েছে শব্দ গান। সত্যিই তো শব্দের ছটা। তার দীপ্তিতেই শ্রোতারা মুগ্ধ, বিবশ। গানের ভেতরে লুকিয়ে রাখা সত্যকে ক'জন বোঝে? সেই যে একজন আমাকে শুনিয়েছিল :

> পানি থেকে বরফ হয়
> বরফের মধ্যে পানি রয়—
> বরফ কিন্তু পানি নয়
> পানি কিন্তু বরফ নয়।

এতো শব্দের খেলা নয়, হেঁয়ালিও নয়। জীবাত্মা আর পরমাত্মার তত্ত্ব, পিতা আর সন্তানের তত্ত্ব, এমনকী গুরু আর শিষ্যের তত্ত্ব।

অবশ্য কবুল করতে হবে, ফকিরিতত্ত্ব বুঝে ওঠা বেশ কঠিন। তারা বেশবাসে নাচেগানে মেলা মচ্ছবে কাউকে আকর্ষণ করতে চায় না। তারা দীনবেশে খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে দিব্যি মিশে আছে। কাউকে আহ্বান করছে না। মাইক লাগিয়ে জয়দেব মেলার বাউল আখড়ার মতো আসর জমানোর চেষ্টা করছে না। একেবারে জনস্রোতে মিশে আছে কিন্তু গভীরভাবে আত্মস্থ ও আত্মপ্রচ্ছন্ন। ওই যে শাসপুরের রিকশাঅলা, সবজিঅলা, জনমজুর, ফেরিঅলারা নিজেদের ক্ষুৎকাতর দৈনন্দিন থেকে অতিকষ্টে চাল আর পয়সা বাঁচিয়ে, তিলে তিলে সঞ্চয় করে, একটা চালাঘরের ইবাদতখানা বানিয়েছে তার অন্তর্মূল্য অপরিসীম। তার জন্য তাদের গর্বের শেষ নেই। মিনার নেই, গম্বুজ নেই, কাবাব তসবির নেই, বোররাখ ঘোড়ার ছবি নেই, আছে খেজুর পাতার তালাই, হাতপাখা, লণ্ঠন আর পানীয় জল কিন্তু সগর্বে বলছে 'এটাই মসজিদ।'

তার মানে তারা অনুক্ত উচ্চারণে বলছে 'ওটা মসজিদ নয়' অর্থাৎ ওই যে মিনার-খিলান-গম্বুজ শোভিত বহু দূর থেকে শোভমান সাম্প্রদায়িক মসজিদ, ওটা একটা দেখনদারি জিনিস, দুনিয়াদারির উচ্চারিত ঘোষিত অংশ। ওইখান থেকে রোজ মাইকের নিনাদে মোয়াজ্জিনের আজান বেজে ওঠে। তাতে বলা হয়, 'ওহে ইমানদার মুসলমান, তোমরা চেতন হও, আল্লার আরাধনার সময় হয়েছে।'

ফকিররা অবাক হয়ে বলবে, আল্লাকে ডাকার আবার সময়-অসময় কি? সে তো সর্বদা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলছে। তার জন্য অত ডাকাডাকির কী আছে? শাসপুরেও লিয়াকতের নতুনতর একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সেদিন ওই চালাঘরের মসজিদেই তার দিনটা কেটে গিয়ে সন্ধে নেমে এসেছিল। অতখানি প্রশস্ত সুযোগ হাতছাড়া করেনি সে, আলাপ-আলোচনা করেছে, বেশ কিছু ফকিরি গান টুকে নিয়েছে। তার বেশির ভাগই মহম্মদ শাহ-র রচনা। মন দিয়ে বহুক্ষণ ধরে শুনেছে ফকিরিগান মুরিদদের কণ্ঠে। তারপর রাত নটা নাগাদ তার ওপর নির্দেশ হল মসজিদ থেকে বেরিয়ে কবর চত্বরে বসার। ফকিরতন্ত্রের মুরিদ বা বায়েদ এমন ক'জন আর লিয়াকত বাইরে এসে বসল। লক্ষ করল, দরজা বন্ধ করে মসজিদের অভ্যন্তরে শুরু হল গুরুনির্দেশিত ক্রিয়াকরণ ও জপজিকির ধ্যান। এতক্ষণকার চেনা কয়েকজন সহৃদয় মানুষের সঙ্গে তার একটা আড়াল তৈরি হয়ে গেল। একরকম দূরবর্তিতা এসে গেল। আধঘণ্টা পরে আবার তাদের ডাক এল ঘরে যাবার। তার সবকিছু জানার জন্য কৌতূহল ছিল কিন্তু বায়েদ না হলে তারা কিছু জানাবে না।

তার চেয়েও বড় প্রশ্ন, জানালেও লিয়াকত বুঝত কি? আমাদের বিষয়সর্বস্ব ভোগী ও প্রদর্শনকামী জীবনের অবস্থানে থেকে কী করে স্বেচ্ছারিক্ত অথচ ভাবসম্পদে ধনী, ফকিরদের মর্মকথা আর ইবাদতের গহন পথে পৌঁছব আমরা? তবে কি আমাদের মতো পুথিপড়া পণ্ডিতদের ফকির-গবেষণা ও নিবন্ধ রচনা নিষ্ফল? লিয়াকত একেবারে এইখানে ঘা মেরে প্রশ্ন তুলেছে :

> বাস্তবিকই আমি তো তেমন কিছুই জানি না। প্রশ্ন হয়, এই যে বাইরে থেকে এদের নিয়ে এতো গবেষণা, লেখালেখি ও পুস্তক প্রকাশ, নানাদিক থেকে সেগুলি অত্যন্ত মূল্যবান হওয়া সত্ত্বেও কোথাও এক বিশাল ফাঁকি থেকে যাচ্ছে। একটা হল ফকিরিতত্ত্ব ও তাকে আয়ত্ত করার প্রয়োগসংক্রান্ত ক্রিয়াকরণ বিষয়ে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কথা। অন্যদিকে এটাই ফকিরদের যাবতীয় জীবনবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও চালচলনের মূলে— এ কথাও অস্বীকার করা যাবে না। ভিন্ন ও প্রায় বিপরীত জায়গায় অবস্থানকারী কোনো ব্যক্তির (গবেষকের) পক্ষে এগুলো যথার্থভাবে বোঝা ও মূল্যায়ন করা প্রায় অসম্ভব।
>
> এ জন্যই কি পণ্ডিতদের টীকাভাষ্য পুস্তককে ফকিররা গুরুত্ব দিতে চায়ই না, উল্টে বিরোধিতা করে? এমনকি শাস্ত্রকেও তারা গুরুত্ব দিতে নারাজ।

AMARBOI.COM

লিয়াকতের এ-জাতীয় অনুভব ও অনুধাবনে অনেক সংগত কথাই উঠেছে কিন্তু তার সঙ্গে আরও দুয়েকটা কথা আমরা তুলতে পারি।

প্রথমেই বলা দরকার ফকিরিপন্থা কোনও ধর্ম নয়, বরং একটি বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসের পথে সৎভাবে থেকে জীবনাচরণ। সেই জায়গাটায় কিন্তু কোনও সংশয় বা তর্ক নেই— একেবারে সবল আর দ্বিধাহীন উচ্চারণ। স্পষ্ট করেই বলা— এটাই মসজিদ, এটাই ইবাদতখানা, এটাই সঠিক পথ এবং ওরা ভ্রান্ত, ওরা অন্ধ, ওরা আচার-সর্বস্ব। ওদের মূলেই গণ্ডগোল। স্ববিরোধিতা ও অধার্মিক হালচাল পদে পদে। লিয়াকত চমৎকার এক উদাহরণ দিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> ঈদে বা বকরীদে প্রায় সব মুসলমান যায় ঈদগায়ে নামাজ পড়তে। তাদের সঙ্গে যায় অনেক ছোট ছেলেমেয়ে। নামাজের সময় তারা মাঠের বাইরে থাকে। নতুন রঙচঙে পোষাকে শিশুবালকদের এই অনামাজী আনন্দউজ্জ্বল সমাবেশও উৎসবের এক উপরী পাওনা। এটা হলে ভাল ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। এই শিশু-বালকদের অনেককে বড়দের খুলে রাখা জুতো-চপ্পল আগলানোর ভার দেওয়া হয়, যাতে চুরি না হয়ে যায়। পয়সার বিনিময়ে তারা অচেনা লোকেরও চটি-জুতো আগলায়। এখানে পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়ুক না পড়ুক, ঐ পবিত্র দিনটাতে ঈদগায়ে উপস্থিত হয় সকল নামাজী। এই নামাজীরাও তাদের মধ্যে ঢুকে থাকা চোর সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। ঐ পবিত্র দিন, ঐ পবিত্র নামাজ পাঠ, অন্তত সাময়িকভাবে হলেও মানুষের ভিতরের আবর্জনাকে পরিষ্কার করা দূরে থাক ধামাচাপাও দিতে পারেনি। শরিয়তের বাহ্য আচরণ পালনে যে মানুষের চারিত্রিক ত্রুটিগুলি দূর হয়ে যায় না, এর থেকে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে? ফকিরেরা তাই বলে— যতই পড়ো লোকদেখানো শরার নামাজ, মারফতি চেতনা ছাড়া না হবে তোমাদের নামাজ, না হবে তোমরা মানুষ। মারফত-ই আত্মপরিচয়, যা না পেলে যতই পড়ো সে শুধু কাগজ আর কালি— জীবন সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান হবে না।

এসব তাদের চাপা কথা নয়, প্রকাশ্য। এ কথা তারা বলে, বলছে চিরকাল। অগ্রাহ্য করছে শরিয়তের অনুশাসন, যাচ্ছে না মসজিদে, রাখছে না রোজা। বিবাহ দিচ্ছে নিজেদের মধ্যে, কবর দিচ্ছে নিজের জমিতে। এতে গোঁড়া মুসলমানদের ক্রোধ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তার ফলে ফকিরদের একতারা ভেঙে, দাড়িগোঁফ কেটে, বাড়িঘর জ্বালিয়ে, সমাজে একঘরে করে এমনকী শারীরিকভাবে নিগ্রহ করে, তাদের গ্রাম্যবাস্তু থেকে তাড়াতে চায়।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, পশ্চিমবঙ্গে বাউলরা অতটা বিপন্ন নয়, যদিও তারা ফকিরদের বিপন্নতায় মথিত ও সমব্যথী। বাউলরা কেন নিগ্রহমুক্ত তার একটাই কারণ— তাদের মধ্যে প্রতিবাদী অংশ ততটা নেই।

ফকিরিপন্থার সূচনাই হয়েছে একরকম দ্রোহ বা প্রতিবাদ থেকে। একে বলা যেতে পারে গূঢ় অন্তর্দ্রোহ এবং তা ইসলামি শরিয়তি নির্দেশের বিরুদ্ধে। ফকিরদের এই অন্তর্দ্রোহের ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে সুফিদের সাধনায়। ইসলামের বাহ্য আচারের বিরুদ্ধে সুফিরাই প্রথম অন্তর্দীপ্ত ও আত্মস্থ হবার আহ্বান জানায়। শুষ্ক শাস্ত্রগ্রন্থের নির্দেশ একদিকে, আরেকদিকে তাদের সজীব অনুভববেদ্য গহন জীবনের আমন্ত্রণ। উপাস্যকে তারা পেতে চায় প্রেমে, তাই ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি, লোকদেখানো নামাজ রোজা জাকাত ও হজ তাদের কাছে গৌণ। ধর্মনেতাদের অনুশাসনের চেয়ে আত্মার নির্দেশ সুফিদের কাছে অনেক বড়। বিজ্ঞজনের ধারণা :

> ঈশ্বরের সহিত মিলনাভিসারী সাধককে সুফীরা বলেন 'পর্যটক' এবং মানবের ঈশ্বরলাভের প্রচেষ্টাকে বলা হয় 'পর্যটন'। পর্যটক হইবার জন্য গুরুর ('শেখ' বা 'পীর') নিকট হইতে সুফীসাধনমার্গের নিগূঢ়তত্ত্ব শিক্ষা করিতে হইবে। তাঁহার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগ্যতায় গুরু সন্তুষ্ট হইলে তাঁহাকে দীক্ষিত করিবেন এবং তালি দেওয়া পোশাক (বৈরাগ্য ও দারিদ্র্যের চিহ্ন) দিবেন।

ধর্মসাধনাকে যখন বলা হয় পর্যটন এবং সাধক যেখানে পর্যটক, সেখানে অনুক্ত কথাটি হল এই ভ্রমণ আসলে খাড়াখাড়ি বা উর্ধ্বগ। নিজের শরীর-মন-সত্তাকে উত্তরণের পথে নিয়ে যেতে গেলে পার্থিবভাবে ভারমুক্ত হতে হবে— অর্থাৎ বিষয়বৈভব সাজসজ্জা ত্যাগ করা দরকার। সেইজন্য গুরু শিষ্যকে দেবেন সরল অঙ্গবাস, যাতে কোনও জেল্লা নেই, দৃশ্যতও যা বৈরাগ্যসূচক। নানা টুকরো কাপড়ের তালি, অনেকের মতে, ঔদার্যের ব্যঞ্জনা। নানা মত নানা পথের উদার সমীকরণ করে এই সুফিপন্থা গড়ে উঠেছে।

এসবই অনুমানের কথা। সুফি কথাটা নাকি এসেছে 'স্বুফ' থেকে। শব্দটি আরবি, অর্থ হল পশম। তার মানে এদেশে প্রথম যখন সুফিরা এসেছিলেন তখন তাদের পরনে থাকত পশমের জোব্বা। তারপরে গ্রীষ্মপ্রধান ভারতে পশমের বিকল্পে এসে গেছে তালিদেওয়া সুতি আলখাল্লা। সুফি-সন্ত-বাউলদের নিয়ে নিবিড় গবেষণা করে রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন :

> পশমের পোশাক-পরা লোকজনরা ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিলাসিতাহীন, অনাড়ম্বর এবং অনাসক্ত জীবনের প্রতীক ছিলেন। দ্বিতীয় খালিফা হজরত ওমর নিজেও এই পশমি পোশাক বা জোব্বা পরতেন। আদর্শ খালিফাদের পর যখন ইসলামে আড়ম্বর, বিলাসিতা এবং ইহলৌকিক আসক্তি বাড়তে থাকল, তখন একদল মানুষ ব্যক্তিগত আচার-আচরণের মাধ্যমে সেই প্রবণতার বিরুদ্ধে পালটা আদর্শ হয়ে দাঁড়ালেন। সরব হয়ে নয়, নিরুচ্চারভাবেই এই সংখ্যালঘু মানুষজন বিশাল এক জাতির সামনে তাদের আড়ম্বরপূর্ণ, বিলাসপ্রিয়, ভোগাসক্ত জীবনের বিপরীত মেরুতে নম্র প্রতিবাদ হয়ে রইলেন নির্জন সাহসে। এঁরাই তখন 'সুফি' বা পশমের জামা-পরা লোক হিসেবে পরিচিত হয়ে গেলেন।

মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, সুফিবাদ ইসলামের ঠিক উপজাত নয়, বরং সমান্তরাল বিশ্বাস।

কিন্তু এসব তত্ত্ব বা তথ্য বিশদে জানতে গেলে বা তার অন্তর্বিশ্লেষণ করতে হলে প্রথমে ইসলাম সম্পর্কে খানিকটা ধারণা গড়ে নেওয়া দরকার। জানা যাচ্ছে :

'ইসলাম' মূলে এক আরবি শব্দ, যার মানে শান্তি আর আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণ কার কাছে? একটা বিশ্বাসের কাছে। যে-বিশ্বাসের উচ্চারণ হল, আল্লা অদ্বিতীয় এবং তাঁর সব নির্দেশ সম্পর্কে প্রশ্নাতীতভাবে অনুগত থাকা। এই আত্মসমর্পণের যে প্রশান্তি সেটাই ইসলাম শব্দের লক্ষ্য। তাই যারা আত্মসমর্পণকারী তারাই 'মুসলমান'। অর্থাৎ মুসলমান এই আরবি শব্দের মানে আত্মসমর্পণকারী।

এবারে বোঝা দরকার ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতে আছে কতকগুলি 'আকিদা' বা বিশ্বাস। মুসলমান হতে গেলে কতকগুলি বাক্য মুখে বলতে হয়, অন্তর দিয়ে সেই বাক্যে বিশ্বাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে হয় এবং সেই বিশ্বাসের বশে আচরণ করতে হয়— একেই বলে 'কলেমা'। কলেমার পাঁচটি ভাগ, তার প্রথম ভাগকে বলে 'কলেমা তৈয়ব'। কলেমার এই প্রথম পাঠের আরবি শব্দবন্ধের বাংলা বয়ান হল আল্লা ছাড়া কোনও উপাস্য নেই এবং মহম্মদ তাঁর প্রেরিত রসুল। রসুল মানে দূত। আল্লার পবিত্র বাণী রসুলের দ্বারাই প্রচারিত।

ইমানদার মুসলমানদের পক্ষে বেশ ক'টি কৃত্য বা করণীয় কাজ আছে, তা 'ফরজ' অর্থাৎ অবশ্যপালনীয়। প্রথম কৃত্যকে বলে 'কলেমা', দ্বিতীয়টি 'নামাজ', তৃতীয় 'রোজা', চতুর্থ 'জাকাত' এবং পঞ্চম হল 'হজ'। এই পাঁচটি অবশ্য পালনীয় কাজকে বলে 'পঞ্চবেনা' অর্থাৎ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ। কলেমায় আস্থা বা বিশ্বাসস্থাপন ব্যাপারটা আগে বলা হয়েছে। 'নামাজ' হল ভোর থেকে রাতের প্রথম ভাগ পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ে দিনে পাঁচবার মসজিদে বা ঘরে বা যে যেখানে আছে সেখানে নামাজ পড়া। তার কতকগুলি বাঁধা নিয়ম ও কসরত আছে, সেগুলি শিখে নিতে হয়। শুক্রবার দুপুরে মসজিদে গিয়ে জুম্মার নামাজ বিশেষভাবে করণীয়। 'রোজা' হল সূর্যোদয়ের আগে থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস— একমাস ব্যাপী— যা চান্দ্রমাসের গণনা করে নির্দিষ্ট হয়। 'জাকাত' মানে দান। ধর্মাচারী মুসলমান তার উদ্বৃত্ত রোজগারের চল্লিশ ভাগের একভাগ দান করে। 'হজ' হল ধার্মিক মুসলমানের তীর্থযাত্রা, জীবনে অন্তত একবার, বছরের নির্দিষ্ট একটা সময়ে যেতে হয় মক্কা শরীফের উদ্দেশে।

এ সমস্তই ইসলামের ব্যাবহারিক আচরণবিধি, যার নিয়ন্ত্রণ থাকে ধর্মীয় মোল্লামৌলবিদের শক্ত হাতে। প্রকৃত ইমানদার মুসলমান এই পঞ্চকৃত্য পালন করে অন্তরে শান্তি পান কিন্তু বিচারশীল ও ভাবুক মুসলমানদের মধ্যে অনেকে এ সব কৃত্যের মধ্যে 'কলেমা' ছাড়া অন্যগুলিকে নিতান্ত বাহ্যিক কিংবা লোকদেখানো বলে মনে করেন; বিশেষত ফকিরি পন্থার অনুগামীরা এ ধরনের বাহ্য আচরণকে প্রতিবাদ শুধু নয়, খানিকটা উপহাস করেন। যেমন লালন বলেছেন :

AMARBOI.COM

পাঁচরোক্ত নামাজ পড়ে
শরা ধরে কে পায় তারে?

এখানে 'শরা' মানে শরিয়ত। ফকিরেরা শরিয়ত মানেন না তাই গোঁড়া মুসলমানরা তাঁদের বলেন 'বেশরা'। আল্লা অদ্বিতীয় ও একমাত্র উপাস্য কলেমার এই বিশ্বাস না মেনে ফকিররা গুরু বা মুর্শেদকেও মানেন। এমনকী বলেন 'যে হি মুরশেদ সে হি খোদা।' এতো মারাত্মক কথা। আল্লার শরিক আছে একথা ঘোর অনৈসলামিক। ইসলাম বিশ্বাস করে আল্লা লা-শরিক, তাঁর শরিক নেই। ফকিররা সেটা না মেনে গুরুকে আল্লার শরিক করেন বলে মোল্লারা তাঁদের বলেন 'শের্ক বা মুশরিক'— বলেন 'বেদ্বীন' অর্থাৎ ধর্মহীন।

এমনতর সওয়াল-জবাব, তর্ক-কুটতর্ক নিয়ে পরে ভাবা যাবে, তার আগে জেনে নেওয়া দরকার, ইমানদার মুসলমানদের সমান্তরালে যে সুফিবাদ গড়ে উঠেছিল তাদের ধর্মকর্ম আচার বিশ্বাস কী ধরনের ছিল। ইসলামের ক্রিয়াকরণের বাস্তবতা ও বাধ্যতা অনেক ভাবসাধকের ভাল লাগেনি। অদৃশ্য উপাস্যের সঙ্গে অন্তরের ঘনিষ্ঠতা অর্জনের আবেগে সুফিরা ধ্যানের পথ নিতে চাইলেন। রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার পক্ষে একমাত্র শরিয়ত (কলিমহ্, নামাজ, রুযহ্, হুজ্জ, যকাত্) মেনে খাঁটি মুসলমান হিসাবে ধর্মীয় পরিচয়ের নির্দিষ্ট কোনো বাতাবরণে থাকলেই চলে না, তার চাই মর্মের সাধন অর্থাৎ 'ত্বরিক্বত'।...শরিয়তের পঞ্চাঙ্গ কর্মের মতোই সুফিরাও তরিকতের ত্রিবিধ কর্ম সম্পাদনে ব্রতী হয়। 'জিক্‌র্' অর্থাৎ জপ, 'রাবিতা' অর্থাৎ সংযোগসূত্র এবং 'মুরাক্বিবহ্' অর্থাৎ সতত জপ করার সঙ্গে সংসার অনাসক্ত মনকে শুদ্ধ করে রাবিতা অর্থাৎ সংযোগসূত্র বা গুরুর মাধ্যমে বিশুদ্ধ মনে শান্ত হয়ে আল্লার ধ্যান অর্থাৎ মুরাক্বিবহ্ করে আলোকময় পরমে (নূর) নিজেকে বিলীন করতে অহং লোপ হলো সবিশেষ জরুরি। অহং লুপ্ত 'ফনা ফিল্লাহ্' অবস্থাও শেষ নয়, সেই অবস্থার ভেতর শাশ্বত হয়ে থাকা অর্থাৎ 'বক্বা বিল্লাহ্' হল শেষ পরিণতি।

নানারকম আরবি শব্দের ঝংকারে পাঠকদের অস্বস্তি লাগতে পারে। তাই ওই সব শব্দের লোকায়ন ঘটে যেসব সরল শব্দ তৈরি হয়েছে সেগুলি ব্যবহার করলে সুবিধা হবে। প্রথমে বুঝে নেওয়া যাক সাধনার চারটি পথ— শরিয়ত, তরিকত, হকিকত ও মারফত। শরিয়ত মানে যা শরাসম্মত। ধার্মিক মুসলমানরা দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যেসব বিধান মেনে চলেন সেগুলি 'কোরান' ও 'হাদিস' থেকে পাওয়া। এ ধরনের বিধানগুলিকে একত্রে বলে 'শরিয়ত'। 'তরিকত' মানে যা বিভিন্ন তরিকা বা মার্গসম্মত। 'হকিকত' অর্থে যা হক (ন্যায়) সম্মত। আর 'মারফত' বা মারিফত হল অধ্যাত্ম জ্ঞানের পথ। সুফিরা নেন তরিকতের মার্গ। এ পন্থায় জিকির সহযোগে মুরাকিবা বা সতত সাধনার সাহায্যে পরম প্রেয়র সঙ্গে অভেদ হওয়ার প্রয়াস পান সাধক। এই প্রয়াসে 'ফানা' বা অহং লুপ্ত হওয়াই চরম নয়, শেষ কথা হল 'বাকা' অর্থাৎ ফানায় চিরন্তন হয়ে যাওয়া।

পর্যালোচনা করে এটা বোঝা গেল যে, সুফিরা ভাবসাধক ও আত্মস্থ। ইসলামের নানা কর্মকাণ্ড ও আকিদা-র বাড়াবাড়ির চেয়ে তাঁরা নিভৃত নির্জনে একক ধ্যানে ও অনুভবে একীভূত হতে চান এবং সেই একীভূত অবস্থাতেই থেকে যেতে চান বরাবরের জন্য। দিব্যোন্মাদ সুফিরা অন্তঃস্পন্দে এতটা নির্ভরশীল যে ভাবাবিষ্ট হয়ে গান গেয়ে ওঠেন, যখন তখন। সেই গানকে বলে 'সামা'। অথচ শুদ্ধতাবাদী ইসলামে গান গাওয়া নিষিদ্ধ। সুফিদের দর্শন আর আচরণ থেকে বোঝা যায় তাঁরা ঠিক ইসলাম বিরোধী নন। কিন্তু শরার নির্দেশে অনন্যশরণ নন। সুফিবাদকে কেউ কেউ 'Interpretation of Islam' বলেছেন কেউ বলেছেন 'parallel faith'। আসলে সুফিবাদ ইসলামের এক ভিন্ন দিশা, যা মুক্তমনা ও বিচারশীল মুসলমানদের ভাবাশ্রয় দিয়েছে বহুদিন ধরে। বলা বাহুল্য এদেশে ফকিরি মত গড়ে উঠেছে বহুলাংশে সুফিবাদের অনুপ্রেরণায়।

এ ধরনের আলোচনায় সব সময়ে একটা সরলীকরণের ঝোঁক এসে যায়। যেমন কত সহজে বলে ফেলা গেল ইসলাম মূলত কর্মবাদী আর সুফিরা ভাবমার্গের সাধক। মন্তব্যের মধ্যে বেশ ফাঁক থেকে গেল নাকি? বহু নৈষ্ঠিক মুসলমানকে দেখেছি নামাজ রোজা পালন করে আত্মতৃপ্ত ও শান্ত। তবে এটা ঠিক যে ইসলামের ভিত্তিমূলে আছে শাস্ত্রের অনুশাসন ও আচরণবাদের বাধ্যতা। নামাজ পড়তেই হবে, বছরে অন্তত ঈদের দিনে, রোজা রাখা উচিত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনতর অনুজ্ঞা সকলের পক্ষে রোচক না হতেই পারে। যাঁরা এসব মানেন না, তাঁদের ধর্মনেতারা ভয় দেখান— দোজখের ভয়। সমাজে নিন্দামন্দ রটে। কিন্তু অদৃশ্য এক ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করতে কারুর যদি অন্তর না মানে? পশ্চিমদিকে তাকিয়ে এক কাতারে দাঁড়িয়ে সমবায়ী ধর্মাচরণে কেউ যদি অনীহ হন? আল্লার রূপ চেহারা নেই, তাই সাধারণ মানুষ যদি তাঁর বন্দনা না করে প্রত্যক্ষ বাস্তব দেহধারী সদাচারী ও বান্ধব মুর্শেদের কাছে অবনত হন, যদি তাঁকে 'সেজদা' (প্রণতি) দেন তবে মৌলবিরা খুশি হন না— কিন্তু মানুষটির তো আত্মপ্রসাদ ঘটতে পারে। কুবির গোঁসাইয়ের একটা পদে আছে :

> নামাজ পড় যত মোমিন মুসলমানে—
> আল্লাজি সদর হন না দিদার দেন না
> সেজদা কর কার সামনে?

মোমিন মানে ধর্মনিষ্ঠ, সদর মানে প্রকাশ্য, দিদার মানে দর্শন, সেজদা মানে প্রণিপাত। সরল অর্থ এই দাঁড়াল : হে ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানগণ, তোমরা নামাজ পড়ছ কিন্তু তোমাদের উপাস্য আল্লা তো নিজেকে প্রকাশ করেন না, দেখা দেন না, তা হলে প্রণতি কর কাকে?

প্রসঙ্গত মনে পড়ল, একবার নদিয়া জেলার হাঁসপুকুর গ্রামে আবু তাহের ফকির নামে এক তাত্ত্বিকের ডেরায় সারাদিন ছিলাম। সেখানে তাঁর এক ফকির শিষ্য জলিলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সে মুসলমান হয়েও শরিয়ত ছেড়ে মারফতি ফকির হয়েছিল। আবু তাহেরের বায়েদ (শিষ্য) জলিল একজন সাধারণ অশিক্ষিত কৃষিজীবী। কেন ইসলাম ছেড়ে সে ফকিরি পথ নিয়েছে জানতে চাইলে সে খুব স্পষ্ট ভাষায় আমাকে বলেছিল, 'বাবু, আন্দাজি ধর্মে আমার পেট ভরলো না। তার চেয়ে সামনে এই যে খাড়া রয়েছেন গুরু বর্জোক, আমার সুখে দুখে সর্বদা আছেন, কত ভালবাসেন, কাছে এলে শান্তি পাই, দুদণ্ড বসি, দুয়েকটা ভালো কথা উপদেশ শুনি— এই আমার ভালো।'

আন্দাজি ধর্ম কথাটা বেশ দ্যোতক। বর্জোক অর্থে 'বরজখ' অর্থাৎ উপাস্য আর উপাসকের মধ্যেকার ব্যক্তি যিনি। সাধারণ মানুষের ধর্মোপলব্ধি ও ধর্মধারণার সারল্য জলিলের বাক্যে সুন্দর ফুটে উঠেছিল। এ যেমন সরল সত্য তেমনই কৌশলী বিবরণ এবারে দেব। বহরমপুরে একটি মুসলিম যুবার কাছে গণসংগীত শুনছিলাম। তাকে হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, 'তুমি মুসলমান?' সে আমাকে অবাক করে উত্তর দিল, 'ক্লাস নাইন পর্যন্ত ছিলাম। তারপরে আর আচার-আচরণ পালন করি না। তেমন বিশ্বাসের জোর নেই। জাত ধর্ম বর্ণ এসব মানি না তো।' না, তার কোনও অসুবিধা হয় না। গা ঢাকা দিয়ে থাকে মোল্লাদের দৃষ্টির আড়ালে। এরপরে সে নিজের থেকে বলল, 'তবে ঈদের নামাজের দিন বেশ লুকোচুরি চলে। শুনবেন মজা? আমার বাড়ি হল গ্রামে, কান্দিতে। ভোরে উঠে বহরমপুর থেকে পালাই। ভাই বেরাদাররা প্রশ্ন করে, "ঈদের নামাজ পড়বে না?" তাদের বলি, "গাঁয়ে গিয়ে পড়ব সেইজন্যে যাচ্ছি।" তারা নিশ্চিন্ত হয়। এরপর কান্দিতে পৌঁছলে বয়োজ্যেষ্ঠরা জিজ্ঞেস করেন, "বাপ, নামাজ পড়বে না?" আমি বলি, "সে তো সকালেই পড়ে এসেছি বহরমপুরের বড় মসজিদে।" তাঁরাও নিশ্চিন্ত হন। আসলে কি জানেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের ধর্ম খুব কড়া। সকলে নজরদারি রাখে। কিন্তু আমি ফাঁক দিয়ে পালাই। বুঝলেন তো?’

এমন স্পষ্ট কথা না-বোঝার মতো কি? সাধারণ মানুষ, কি হিন্দু কি মুসলমান, চায় নিজের মতো করে বাঁচতে। হ্যাঁ, তাদের ধর্মভয় আছে, স্বর্গনরকের অস্পষ্ট ধারণাও আছে, তবু মানুষ সুযোগ সুবিধা পেলে ফাঁকি দেয়, এটা মানুষের মজ্জাগত স্বভাব। সমাজবদ্ধ জীবনযাপনে এমনি মানুষকে নানা বাধাবন্ধ নিষেধ আর অনুশাসন মেনে চলতে হয়, কত লড়াই কত প্রতিবন্ধ, তাকে পেরিয়ে খুঁজে নিতে হয় আনন্দের রসদ, রঙ্গ ব্যঙ্গ কৌতুক। ধর্মের বিধান যদি তার মধ্যে এসে আরও এক প্রতিকূলতা গড়ে তোলে— স্বচ্ছন্দ জীবনপ্রবাহের মধ্যে মন্ত্র, শাস্ত্র, মন্দির, মসজিদ, পুরোহিত, মোল্লা এসে পড়ে, আসে ধর্মের আচারগত বাধ্যতা তবে ভেতর ভেতর একটা দ্রোহ আসে। প্রতিবাদের এক ক্ষীণ সাহস জাগে। তারপরে কোথাও সেই দ্রোহের সমর্থন পেলে জলিলের মতো ইসলামের আচারকৃত্যে সংশয়ী মানুষ ঢুকে পড়ে সেখানে। তা ছাড়া গরিব খেটে খাওয়া মানুষ তার প্রত্যক্ষ প্রতিদিনের জীবনে দেহগত অনুভব আর ইহগত অস্তিত্বকে বেশ বুঝতে পারে— তাতে কোনও আন্দাজি বিষয় নেই, কল্পনাও লাগে না। তার জায়গায় অদৃশ্য ঈশ্বরানুভূতি, তার উপাসনার নানা নটিখটি, মসজিদে যাবার বাধ্যতা, কঠোর শ্রমকিণাঙ্ক দিনপাতের মধ্যে সারাদিন নির্জলা রোজা রাখা— ভাববিলাসিতা কিংবা অর্থবানদের ব্যাপার বলে মনে হতে পারে। এই রকম ভাবনা থেকেই একজন লোককবি লিখেছিলেন : ‘নামাজ আমার হইল না আদায়/ নামাজ আমি পড়তে পারলাম না বিষম খান্নাতের দায়।’ খান্নাত মানে অভাব।

ইত্যবসরে ফকির গুরুরা তাদের আশ্রয় দেন। বোঝান, শরিয়তকে অতিক্রম করে মারফত পৌঁছতে হবে। তাতে বেহেস্ত না মিললেও ইহজীবনে সুখ শান্তি পরিতৃপ্তি মিলবে। আল্লাকে ধরো গুরু বর্জোকের প্রদর্শিত সরল অনুভবের পথে। রোজা বা দেহসংযমের চেয়ে আত্মসংযম অনেক জরুরি। দম আর শ্বাসের কাজ গুরুর কাছে বুঝে নিয়ে কায়াসাধন করে সন্তানের জন্মরোধ কর। ঊর্ধ্বরেতা হও। সন্তান মানেই শরিক। শরিক মানেই তোমার ব্যক্তিগত শান্তি স্বস্তির অবসান। অভাব, দারিদ্র্য, কান্না, অসুখ, শোক, তাপ, দুঃখ। এরপরে আছে মুর্শেদের বলা দারুণ সব যুক্তির প্যাঁচ। তাঁরা রঙ্গ করে বলেন, ‘আরে বোকা শোন, সারাদিন উপোসী থেকে রাতে খেয়ে যদি আল্লাকে পাওয়া যায় তবে মানুষের চেয়ে অনেক আগে বাদুড়রা বেহেস্তে যাবে, তাই না?’ ‘আর হজ? সেকি গরিবের জন্যে? কতদূরের পথ, কত টাকার ব্যাপার। ওসব বড়লোক শরীফ আদমিদের ব্যাপার স্যাপার। কেন গরিব কি আল্লাকে পাবে না? সবখানেই তো আল্লা, তবে মক্কা যেতে হবে কেন? আল্লা গরিবেরও। এই দেহই মক্কা। এই দেহ-মক্কাতেই নিয়েত বাঁধ্। মুর্শেদকে ধর্।’ এই সব বলে মুর্শেদ গান ধরেন কিংবা কোনও শিষ্যকে দিয়ে গাওয়ান :

এই দেহ মিথ্যে নয় মন
এই দেহেই আছে আছে রতন।

এমন গান শুনলে কার না মন ভিজবে? শিষ্য তখন গুরুকে জিজ্ঞেস করে, এই গান করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না-জায়েজ' বলেন মোল্লা-কাজিরা। অথচ গান করতে, গান শুনতে খুব মিষ্টি লাগে, মন ভরে যায়। গান গাওয়া কি হারাম?

গুরু তখন দুদ্দু শাহ-র লেখা একখানা মোক্ষম গান শোনান। তাতে বলা হচ্ছে :

গান করিলে যদি অপরাধ হয়
কোরান মজিদ কেন ভিন্ন এলহানে গায়?
আরবি পার্শি সকল ভাষায়
গজল মর্সিয়া সিদ্ধ হয়।
বেহেস্তের সুর নাজায়েজ নয়
দুনিয়ায় কেন হারাম হয়?

এমনতর যুক্তির কাছে মোল্লাদের অনুশাসন কেমন করে দাঁড়াবে? আরবি পারশি ভাষায় লেখা গজল বা মর্সিয়া গান যদি এত সমাদর পায় গুণীসমাজে, শ্রোতাদের ভাল লাগে, তবে বাংলা ভাষার গানে দোষ কোথায়? তার চেয়েও বড় কথা, স্বর্গে গান যদি নিষেধ না হয় তবে মর্ত্যে কেন তা অপবিত্র বা নিষিদ্ধ হবে? কাজেই গান করো প্রাণ ভরে। নামাজ রোজা জাকাতের পণ্ডশ্রম না করে গানে গানে তাঁকে ডাকো। লালন বলেছেন :

শুনতে নাই আন্দাজি কথা
বর্তমানে জানো হেথা।

হেথা মানে সুখদুঃখে ভরা আমাদের বড় প্রিয় এই মর্ত্য পৃথিবী। যাতে আমরা বর্ত রয়েছি। এবারে গুরু একটু একটু করে মুরিদকে বোঝাবেন—

আছে আদি মক্কা এই মানবদেহে।

তারপরে বলবেন :

মানুষ-মক্কা মুরশিদ পদে।

এসবই লালনের বাণী, ফকিরের মধ্যে সেরা ফকির। সেই লালন আরও এক পা এগিয়ে যা বলেছেন তার তাৎপর্য অপরিসীম। বলেছেন :

পড়গে নামাজ ভেদ বুঝে সুঝে—
বরজখ নিরিখ না হলে ঠিক
নামাজ আরও মিছে।

ভেদ মানে রহস্য। নামাজের মূল রহস্য মসজিদে ওঠাবসা নয়, মানবদেহই মসজিদ। গুরু বরজখের কাছে নিরিখ ঠিক না করে যে বাহ্য-নামাজ তা মিথ্যা, ভ্রান্তিপূর্ণ। এইবারে এইখানে লিয়াকতের সংগ্রহ করা চমৎকার গানখানি শোনা যেতে পারে। শাসপুরের সেই মেটে চালাঘরের নিরাভরণ ফকিরি মসজিদে জালাল শাহ আর তালেব শাহ দ্বৈত কণ্ঠে গেয়েছিলেন:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আল্লা কি মসজিদ বানাইলেন দুনিয়ার ভিতরে
তিন গম্বুজ তিনটি সিঁড়ি ভিতরে তার খোদার ঘড়ি
রেখেছে নয় দরজা ছয়জনা মৌলবী ফিরে
আল্লা কি মসজিদ...

এটি দেহতত্ত্বের গান। শরীরের নয় দরজার (দুই চোখ, দুই নাসারন্ধ্র, দুই কান, মুখবিবর, পায়ু ও উপস্থ) প্রসঙ্গ এদেশের দেহবাদীদের খুব পুরনো কথা, কিন্তু ছয়জন মৌলবি বলতে যে শরীরের ছয় রিপু (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য) বোঝানো হয়েছে যেটা রীতিমতো ব্যঙ্গমূলক। এ হল ফকিরদের তরফ থেকে মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ উষ্মা ও জেহাদ। এর ভাঁজে বলার কথাটা হল শরীরের ভেতরকার রিপুদের যেমন দমন বা পরিত্যাগ করতে হবে, তেমনই মৌলবিদেরও। এরপরে গানের শেষের কথা হল :

দেহের মসজিদে নামাজ পড়লে রত্ন মিলে—
সেই মসজিদের মতল্লি হয়ে
থাকো তাহার মসজিদ আগলে।

'দেহ-মসজিদ' 'দেহ-মক্কা' 'দেল-কেতাব' এসব উচ্চারণ ফকিররা পরপর গেঁথে দেন। এই পরম রত্নময় দেহকে রক্ষা করতে হবে, থাকতে হবে আগলে। মুর্শেদের সেটাই নির্দেশ।

শরিয়তনিষ্ঠ মুসলমানদের যে-পাঁচরোক্ত নামাজ পড়তে হয়, ফকিরদের নামাজ সে ব্যাপারে ভিন্ন নির্দেশ দেয়। লালনের গানে বলা হয়েছে :

পড় রে দায়েমি নামাজ এ দিন হল আখেরি।
মাশুক রূপ হৃদয় রেখে
দেখ আশক বাতি জ্বেলে
কিবা সকাল কিবা বিকাল
দায়েমির নেই অবধারি।

এ হল ভাবের নামাজ, শ্বাস নিয়ন্ত্রণের শরীরী সাধনায় সর্বক্ষণ অন্তরে চলবে 'দায়েমি' নামাজ, তার সকাল বা বিকাল কেন, কোনও কালাকালই নেই। উপাস্যের প্রেমময় রূপ হৃদয়ে প্রস্ফুট রেখে, প্রেমের প্রদীপ জ্বেলে নিরন্তর সাধনাই প্রকৃত নামাজ। শরিয়তি নামাজ হল বাহ্য ও পোশাকি।

ফকিরি পন্থায় নানা যুক্তি-বুদ্ধির কৌশল দেখা যায়, সমন্বয় ও উদারতার কথাও থাকে, প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ না থাকতেও পারে, থাকে প্রচ্ছন্ন নির্দেশ। যেমন একটা গানে বলা হচ্ছে :

মুরশিদ ভজনা বিনে ও জীবের উপায় নাই—
রোজা নামাজ হজ্জ জাকাত মানা কিছু নাই
মুরশিদ ভজনা বিনে জীবের আর গতিক নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে স্পষ্টই বলা আছে, রোজা নামাজ হজ্জ জাকাত এসব ইসলামি বাহ্যাচার করার কোনও নিষেধ নেই ফকির হয়ে গেলে। কিন্তু মুরশিদ ভজনা করতেই হবে, সেটা আবশ্যিক। ভেতরে যে কথাটা প্রচ্ছন্ন রয়ে গেল তা সূক্ষ্ম ও দ্যোতনাময়— অর্থাৎ মুরশিদ ভজনা করলে তিনি বুঝিয়ে দেবেন ইসলামের পঞ্চবেনা কতটাই ভ্রান্ত, কতটাই বাঁধা গতের একঘেয়েমি। সেটা বুঝলে শিষ্য নিজে নিজেই ওই বাহ্যপথ ত্যাগ করবে।

বাহ্য ছেড়ে অন্তরের দিকে মানুষের অভিযাত্রা খুব নতুন কথা নয়, অন্তত এদেশে। সেই কোন মধ্যযুগের সন্তরা, সেই কবীর-দাদূ-রজ্জবরা মানুষের মধ্যে জাগাতে চেয়েছিলেন আন্তরধর্মকে। সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি, জীববলি বা কোরবানি, অসার শাস্ত্রনির্দেশ, পাথরের দেবতা আর মন্দির-মসজিদের বিপরীতে তাঁরা চেয়েছিলেন আত্মবোধন ও মুক্তমনের স্বাধীনতা। মানবতার যথার্থ লক্ষ্য তো সেটাই। তার সঙ্গে পরে যুক্ত হয় সুফিদের রহস্যভাবনা, ধ্যান-জপ-অনুভবের একান্ত আত্মস্থ জগৎ। সেই আত্মস্থতা অর্জনের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হল দেহ। দেহ মানে কামনাবাসনাবদ্ধ অস্তিত্ব, লোভে মোহে বন্দিসত্তা, আলস্যপ্রবণ, বিরামপ্রয়াসী, ভোগী আর ইহজগতের দাস। অথচ এই দেহকে ঘিরেই কায়াবাদীদের সাধনা। সুফিরা যে নিরন্তর জিকির আর মুরাকাবার সাহায্যে স্থিত হতে চান 'ফানা' স্তরে এবং তাকেই শাশ্বত করে হতে চান 'বাকা', তার জন্যে দেহের নিয়ন্ত্রণ দরকার। অর্জন করতে হয় দেহের ওপর মনের কর্তৃত্ব। সুফিসাধনায় সে রকম কিছু তরিকা আছে। দুটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা জানাই।

খুব ছোটবেলায় আমাদের শহরে বড় রাস্তার ধারে ধুলোয় বসে থাকত এক পাগল। সবাই তাকে পাগল বলেই জানত। কারণ লোকটি ছিল বাহ্যজ্ঞানহীন, নির্লিপ্ত স্বভাবের। একটা ছেঁড়া কাপড় আর জীর্ণ ফতুয়া পরে একমুখ দাড়ি গোঁফ নিয়ে সে দিনরাত বসে থাকত পথে। রোদে জলে ঝড়ে নির্বিকার। পুরো গ্রীষ্ম আর বর্ষা চলে গেল তার শরীরের ওপর দিয়ে। মানুষটি নির্বাক ও আত্মমগ্ন। পরে একদিন কোথায় উধাও হয়ে গেল। কোথা থেকে এসে কোথায়ই বা গেল কেউ জানল না। জানতে চেয়েছিলও কি? উন্মাদের নিজস্ব পাঠক্রমে আমাদের মতো মানুষের, উন্নতিকামী জীবের কীইবা কৌতূহল থাকতে পারে?

পরে, প্রায় চল্লিশ বছর পরে, বিশেষ এক সূত্রে জানতে পারলাম লোকটা পাগল ছিল না (যা সবাই ভেবেছিল) বা ব্রিটিশের গোয়েন্দা (কেউ কেউ বলত), ছিল সুফিপন্থার সাধক। তার মুর্শেদ তাকে শরীর চেতনা থেকে মুক্ত হবার জন্য ওই ভীষণ কষ্টকর তরিকা দিয়েছিলেন। পরে কলকাতার সেই মুর্শেদ তাকে নির্দেশ দেন মানুষ-টানা রিকশা চালাতে। সেই কষ্টও অতিক্রম করার পর তাঁর ভাবসাধনা ও জপধ্যানের অধিকার এসেছিল এবং শেষ পর্যন্ত তিনি হয়ে ওঠেন কাদেরিয়া খান্দানের নাম করা পির ফকির। পার্ক সার্কাসের কবরখানায় রেললাইনের ধারে তাঁর ঐশী সমাধিতে এখনও ভক্ত সমাগম হয়।

এই সিদ্ধ সাধককে আমি দেখেছি আবার দেখিনি। চাক্ষুষ তো দেখেছি ছেলেবেলায়, স্কুল যাবার পথে। সত্যদৃষ্টি ছিল না, ভেবেছি উন্মাদ। আসলে দিব্যোন্মাদ, কিন্তু তা বোঝার বয়স হয়নি, কেউ বলেওনি। তাঁর মুখাবয়বটি পর্যন্ত মনে করতে পারি না, কিন্তু তাঁর সেই স্থির বসে-থাকা মূর্তিটি মনে আছে। নিশ্চয়ই আত্মস্থ। অন্তরে চলছিল অনুভবের সংলাপ তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাশুকের সঙ্গে। এসব কথা আমি জানতে পারি তাঁর মুরিদ নূর শাহ-র কাছে। পুরো নাম নূর শাহ বাবা। উর্দুভাষী ভিন্ন প্রদেশী মানুষ। সুফিসাধনার টানে এসেছিলেন তাঁর মুর্শেদ রজা শাহ বাবার চরণাশ্রয়ে।

নূর শাহ বাবাকে যখন দেখেছি তখন তাঁর বয়স সত্তরের কোঠায়, আমার চল্লিশ। অধ্যাপনা করি আর গ্রাম গ্রামান্তে খুঁজে বেড়াই বাউলবৈরাগী উদাসীনদের। ফকিরি পন্থার কিছুই জানি না। নূর শাহ বাবার সঙ্গে আমার-দেখা বাউলবৈরাগীদের কোনও মিল খুঁজে পেলাম না। মানুষটির মুখমণ্ডল সৌম্য ও প্রশান্ত। চোখ দুটি সুদূরসন্ধানী। সত্তরেও খাড়া নির্মেদ শরীর। একমুখ সাদা দাড়ি। মাথা পরিপাটি করে কামানো। পরনে সাদা ফতুয়া আর সাদা তহবন্দ, গলায় পাথরের মালা, হাতে তসবি বা জপমালা।

আমাদের শহরের এক ধনী মাড়বার নন্দন জীবনের অনেকটা অংশ ভোগসুখ আর ব্যাবসাবাণিজ্য করে কাটিয়ে হঠাৎ হয়ে পড়েন উদাসীন বৈরাগী স্বভাবের তাঁর অন্ত্য জীবনে। বরাবরই ভজন ও খেয়াল গাইতেন, শিখেছিলেন গুরুর কাছে নাড়া বেঁধে। বাড়িতে গৃহদেবতা গোপাল বিগ্রহকে ঘিরে মহাসমারোহে রাস ও ঝুলন উৎসব হত। কোন সূত্রে কার প্ররোচনায় কে জানে, তিনি হঠাৎ পার্ক সার্কাসে তিলজলায় গিয়ে নূর শাহ বাবার কাছে রহস্যনিমীল সুফিপন্থায় দীক্ষা নেন সস্ত্রীক এবং সাধনায় মগ্ন হয়ে পড়েন গভীর উৎসাহে। তাঁর বাড়িতেই আমি প্রথম নূর শাহ-র মতো উন্নত মার্গের সুফিসাধক দেখার সৌভাগ্য অর্জন করি। সৌভাগ্য, কেননা অত উচ্চস্তরের সুফি মুর্শেদ সকলকে দেখা দেন না, তাঁদের আস্তানায় প্রবেশাধিকার অর্জন তো অসম্ভব। ওই মাড়বার শিষ্যের বাড়িতে তিনি ক'দিন ছিলেন এবং সেই উপলক্ষে একসন্ধ্যায় বসেছিল কাওয়ালি গানের আসর। আসর বসেছিল সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ, শেষ হয়েছিল ভোর ছটায়। মনে আছে, তখন গ্রীষ্মকাল। আসরে আমি আমন্ত্রিত ছিলাম আরও ক'জন ভাগ্যবানের সঙ্গে।

www.amarboi.com

সত্যি বলতে, আমি কখনও কাদেরিয়া সুফি খান্দানের হালচাল জানিনি, দেখিনি তাদের সমাবেশ। যখন গেলাম তখন সন্ধ্যা ছুঁই ছুঁই বিকাল। গৃহস্বামীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে প্যান্ডেল বাঁধা হয়েছিল। একটু উঁচু মঞ্চে গানের আসরের বন্দোবস্ত। প্রাঙ্গণের সর্বত্র শতরঞ্চি পাতা শ্রোতাদের জন্য। মাঝখানে একটি প্রশস্ত গালিচায় শ্বেতশুভ্র চাদর পাতা, ফকির বাবার বসার জন্য। বসবার জায়গায় দু'পাশে ও পিছনে মোট তিনটে তাকিয়া, মুর্শেদ হেলান দেবেন প্রয়োজনে। সমস্ত পরিবেশ শান্ত, অদৃশ্য গন্ধ ধূপ ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। খুবই সীমায়িত সংখ্যক শ্রোতা, সাকুল্যে বিশজন হয়তো। তার মধ্যে টানা মোটর গাড়িতে এসেছেন জন পনেরো ভক্ত, তাঁরা দৃশ্যত মুসলমান এবং বেশ ধনী বলে মনে হল। অন্তত আটজন কাওয়ালি গায়ক এসেছেন যন্ত্রীদের নিয়ে। সকলেই চোস্ত উর্দুতে কথা বলছেন। জানা গেল নূর শাহ বিকাল থেকে আছেন ঠাকুর ঘরে। সেখানে উঁকি মেরে দেখলাম তিনি চাদরের ঘোমটা টেনে একেবারে নিঃসাড়ভাবে ধ্যানস্থ, এ-জগতেই যেন নেই। সামনে তাঁর গুরু রজা শাহ বাবার ফোটো। অসামান্য শান্ত পরিবেশ।

ওদিকে মাঝে মাঝে ছোট গেলাসে শরবত আর চা এসে যাচ্ছে। কেউ অসহিষ্ণু নন, নিচুস্বরে কথালাপ চলছে। দু'জন কাওয়াল যন্ত্র বেঁধে মঞ্চে প্রস্তুত, বাবা এলেই গান শুরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে। সন্ধ্যা উতরে যাবার একটু পরে হঠাৎ ঠাকুর ঘরের দরজা খুলে নূর শাহ্‌ এসে তাঁর নির্দিষ্ট আসনে বসলেন। কোনও কথা নয়, শুধু প্রসন্ন চোখে সবাইকে দেখলেন, ঠোঁটে ফুটল একটু হাসি। একজন ভক্ত টাটকা আনকোরা একশো টাকা, পঞ্চাশ-বিশ-দশ টাকার নোট তাঁর সামনে রেখে গেলেন। দেখে মনে হল অন্তত হাজার পাঁচেক টাকা। ভাবলাম, একি ফকিরের নজরানা? মন একটু একটু বিরূপ হচ্ছিল। ভাবছিলাম যত সব বড়লোকী কাণ্ড, ধর্মের নামে বিলাস। পরে, সারারাত ধরে বিস্ময় পরিকীর্ণ চোখে দেখব ওই পাঁচ হাজার টাকাই বাবা দান করে দেবেন কাওয়ালদের গানের সমজদারি করে। একে বলে কদরদানি। খুব ভাবের গানে গায়কের চেতনা যখন উর্ধ্বস্তরে উঠে যাবে, সকলে বিবশ হয়ে পড়বেন সুরের জাদুতে, সেই মায়াময় অপরূপ ক্ষণে নূর শাহ্‌ বাবা দশ বিশ পঞ্চাশ একশো টাকা যেমন মনে হবে তুলবেন। একজন ভক্ত এসে সেই টাকা নিয়ে শিল্পীকে দেবেন। শিল্পী জানাবেন আভূমি কৃতার্থ কুর্নিশ।

যেন একটা অত্যাশ্চর্য অমা নিশিথিনী— পরিপূর্ণ, উদ্‌বেল অথচ সংযত। চারদিকে শুধু সুরের গুঞ্জরন, তাতে শুদ্ধতম স্বরক্ষেপণের কৌশলে মন বিবাগী হতে চাইছিল। গান তো নয়, যেন অপার্থিব অনুভবের মায়াবী উৎসারণ। উর্দুভাষায় রচিত বাণী একটু আড়াল টানছিল ঠিকই কিন্তু সেসব গান ঠিক অর্থবোধের বাধ্যতায় সীমাবদ্ধ নয়, অনেক ব্যাপ্ত আর সম্ভ্রান্ত। গায়ক যেন সেই গানের বেদনায় নিজের আকুতিকে নিংড়ে দিচ্ছিলেন। তাঁদের মুখাবয়বে সে কী আততি, সে কী সমর্পণ। কাওয়ালি গানের ভক্তিমার্গ এই একবারের মতো আমার জীবনে অনর্গলিত হয়ে কোন অজানা ঐশী মায়ায় ভরে দিয়েছিল কিছুক্ষণ।

কিন্তু আমি ভাবছিলাম অন্য একটা কথা— দেখছিলাম স্থির নির্বিকল্প মুর্শেদের মূর্তি। যেন শ্রুতিলোকের ওপারে, গানের সুরের আসনখানি ডিঙিয়ে, বাবার চৈত্যপুরুষ (Psychic Being) পর্যটন করছিল অন্য কোনখানে। সুফি সাধনার লব্জে পর্যটন আর পর্যটকের প্রসঙ্গ আগেই বলেছি। লিখতে গিয়ে মনে পড়ল অনন্ত দাসের একটা পদ :

মন চলো যাই ভ্রমণে—
কৃষ্ণ-অনুরাগের বাগানে।

চমৎকার ভাবনার বুনোট। কৃষ্ণ-অনুরাগ রূপ একটা পুষ্পবিকশিত সৌরভময় বাগান যেন সাধকের মনের মধ্যে তৈরি হয়ে আছে। সেইখানে চলে যেতে ইচ্ছে পরিভ্রমণে। সেই স্থান বড় মধুর বড় হৃদয়হরা, কাওয়ালির আসরে নূর শাহ্‌ বাবার শরীরটা স্থির উপবিষ্ট কিন্তু তাঁর মন আনন্দিত ভ্রমণে নিরত। সেই গভীর চলা আমাদের কাছে একেবারে অদৃশ্য, গোপন।

ভাবছিলাম নিজের কথাও। কী চঞ্চল মন, কিছুতেই কি সুরের পদ্মে বসতে পারছে আমার প্রাণভ্রমর? পারছে না। শুধু এটা দেখছি, ওটা দেখছি। দেখছি কাওয়ালি শিল্পীদের বিচিত্র রঙিন কারুকাজ করা অঙ্গবাস। তাদের মাশুকে নিবিষ্ট চোখের কোণে সলাজ নিবেদন— তাও দেখছি। শুধু গান আমাকে নিয়ে যেতে পারছে না কোনও শান্ত ভ্রমণের উৎসমুখে। কী অস্থির আর অপটু আমার শরীর। একজায়গায় স্থির হয়ে বসার অভ্যাস নেই, কেবলই ঠাঁইবদল করছি, অস্বস্তি সারা শরীরে। মাঝে মাঝে যাচ্ছি প্রকৃতির ডাকে। মাঝে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝে চা খেয়ে ঘুম তাড়াচ্ছি। বুঝতে পারছি এই স্থূল দেহের কী পরাক্রম। আমি দেহগতভাবে কত অসহায়, মনের নিয়ন্ত্রণ কত অসম্ভব।

অথচ ওই সামনে-বসা নূর শাহ বাবা, শান্ত অচঞ্চল জাগর স্থির। শরীরের তিনপাশে আরামে ঠেস দেবার তাকিয়া কিন্তু একবারও এলাচ্ছে না সত্তরোর্ধ্ব কাঠামো। সেই বিকেল থেকে ছিলেন ঠাকুরঘরে ধ্যানস্থ, সেখান থেকে সটান আসরে এসে উপবেশন। প্রকৃতির ডাক তো অনেক দূর, কোনও বাহ্যাচারই নেই। হাতের ওঠাপড়া কিংবা বসার ছাঁদ একটুও বদলাচ্ছে না। শুধু টাকা দেবার সময় যা একটু নড়াচড়া। চা পানের প্রশ্নই নেই— কোন অলৌকিক স্বর্গীয় মদে যেন নেশাতুর। কেবল স্থিরদৃষ্টি, অন্বেষী ও অন্তর্গূঢ়। এই তা হলে 'রাবিতা'— উপাস্য আর উপাসকের মধ্যে আন্তঃসংযোগ। এই কি তবে সুফিসাধনার চরম বা পরম স্তর 'ফানা'? উনি কি চিরন্তন প্রেমবন্ধনে বাঁধা পড়ে পরম প্রেয়র সঙ্গে সেতুসম্ভব সম্পর্কে গড়ে তুলে একেবারে 'বাকা' হয়ে গেছেন। চলছে অশ্রুত অনুচ্চারিত সংলাপ?

তখন মধ্যযাম— পৃথিবীর সবচেয়ে মায়াবী প্রহর। এ সময়েই নাকি জীবনের গভীর অনুভব জেগে ওঠে সাধকদের মনে ও মননে। দু'জন করে কাওয়ালি গায়ক মঞ্চে আসছে তারপর টানা ঘণ্টাদুয়েক গেয়ে নূর বাবাকে সেলাম দিয়ে নেমে যাচ্ছে। যেন তাঁকে শোনানোর জন্যই তাদের গানের শিক্ষা। গুরুর কদরদান তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন। তারা তৃপ্ত।

এইভাবে একাদিক্রমে গানের পর গান শুনতে শুনতে ভোর হয়ে গেল। ভৈরোঁ রাগে বিলম্বিত ছন্দে গান ধরলেন গৃহস্বামী। সে গান অর্থমূলক শব্দবহুল কাওয়ালি নয়, ধ্বনিময় ধ্রুপদ। সমাসন্ন ভোরের অরুণছটার মাঝে সুরের সুরধুনী অপার্থিব আবহ সৃষ্টি করলেও তাতে নিশীথ রাতের প্রাণ ছিল না। গানের মাঝখানে নূর শাহ উঠে আবার চলে গেলেন ঠাকুরঘরে। আসর শেষ হল। অনন্য এক অভিজ্ঞতার তাপ বুকে নিয়ে যখন বাড়ি ফিরছি তখন শরীরে কোনও গ্লানি নেই কারণ মন যে কানায় কানায় ভরা।

পরদিন বিকেলে শুভ্রসুন্দর দীপ্তি উজ্জ্বল সেই সুফিসাধকের কাছে বসে শুনতে পেলাম নানারকম কথা। রজা শাহ বাবার বৃত্তান্ত। নূর শাহ বাবার কত কি অনুভূতি। উত্তরপ্রদেশের জাতক, পাকা গমের মতো বর্ণোজ্জ্বল সেই বৃদ্ধ ভাঙা বাংলায় আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন শান্ত স্বরে, প্রসন্ন প্রশ্রয়ের হাসি মুখে ছিল। তারপর কত বছর কেটে গেছে। তাঁর মাড়বার শিষ্য কর্কটরোগে আক্রান্ত হয়েও কোনও ওষুধ খাননি, শুধু বাবার দেওয়া মাটি খেতেন। তাঁর প্রতি অকলঙ্ক বিশ্বাস রেখে প্রয়াত হলেন। এখনও পার্ক সার্কাস স্টেশন সংলগ্ন কবরখানার দিকে নজর গেলে নূর শাহ বাবার স্মৃতির প্রতি বন্দেগি জানাই। ভাবি, কী আশ্চর্যভাবে সুফিসাধনার সবচেয়ে দুর্লভ দৃশ্য দেখেছি। বাহ্যদশা কাটিয়ে অন্তর্দীপ্ত ধ্যানতন্ময়তায় লব্ধ 'মুরাক্কিবহ্' তারপরে ক্রমশ 'ফনা ফিল্লাহ্' পেরিয়ে 'বক্কা বিল্লাহ্'-তে স্থিতি।

সুফি সাধনার এই ঝলক দর্শনের স্মৃতি এখানে উঠে এল এটা বোঝাতে যে ইসলামের নামাজ রোজা হজ জাকাতের ব্যবহারিক পৌনঃপুনিকতার স্থানে সুফিতত্ত্ব কী ভাবে অন্তঃশীল অনুভবের সঙ্গে জীবনকে মিশিয়ে দিতে পারে। নিজের অস্তিত্বকে করে তোলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহীয়ান। ফকিরিতন্ত্র— সুফিতত্ত্ব থেকেই সম্ভবত আত্মতত্ত্ব উদ্‌বোধনে ব্রতী হয়েছে। লালনের ভাষায় 'আত্মতত্ত্ব যে জেনেছে / দিব্যজ্ঞানী সে হয়েছে।' এই আত্মতত্ত্বে অধিকার এলে শরার কেতাব খসে পড়ে, কায়েম হয় 'দেল-কেতাব' বা আত্ম-নির্দেশ। ফকিরদের স্বরূপ তথা ফকিরিয়ানা বুঝতে গেলে ইসলাম বুঝতে হবে প্রথমে, তারপরে অনুধাবন করতে হবে সুফিতত্ত্ব। এতক্ষণ সেই প্রয়াস নেওয়া গেল। এবারে ফকিরি পন্থার কথা।

বহুকাল আগে, সেই ১৮৯৮ সালে মৌলবি আবদুল ওয়ালী তাঁর ইংরাজি গদ্যে লেখা নিবন্ধে ('On some curious Tenets and Practices of a certain class of Fakirs of Bengal') একটা পদাংশ ব্যবহার করেছিলেন। তাতে বলা হয়েছে :

আউলে ফকির আল্লাহ্ বাউলে মুহাম্মদ
দরবিশ আদম সফী এই তক হদ।
তিন মত এক সাত করিয়া যে আলী
প্রকাশ করিয়া দিল সাঁইমত বলি ॥

এ ধরনের পদ ব্যাখ্যা করবেন যথাযথভাবে সেরকম মননশীল পণ্ডিত বা সাধক পাওয়া কঠিন। একজন লোকায়ত সাধকের কাছে এই পদটি আউড়ে ওয়ালীসাহেব ব্যাখ্যান চেয়েছিলেন। তিনি মোটামুটি যা বলেছিলেন তা হল, আউলদের মধ্যে আল্লা আছেন ফকিররূপে, বাউলদের মধ্যে মহম্মদ রসুল আর আদম তনের মধ্যে রয়েছেন দরবেশ। এই তিন মতের সমন্বয়ই হল সাঁইমতে। আমাদের লালন সাঁই সেইজন্য এতবড় মান্যতা পান। তাঁর মধ্যে ফকির-বাউল-দরবেশ সব কিছুর মিলন।

এ সব ব্যাখ্যা শুনে যাওয়া ছাড়া উপায় কী? নিতান্ত মনগড়া কিংবা গোঁজামিল ভাষ্য যদি ভাবি তাতেও দোষ নেই। একালের শিক্ষিত পণ্ডিতদের মধ্যে আরবি-পারশি লব্জ জানা গৌতম ভদ্র খুব সতর্ক বিশ্লেষক এবং তথ্যের ভাণ্ডারী। তাঁর লেখা থেকে কিছু ইঙ্গিত আমরা নিতে পারি ফকির বা দরবেশ প্রসঙ্গে। তিনি মনে করেন,

দরবেশের প্রতিশব্দ রূপে নানাভাবে নানা শব্দ এসেছে। ফকির, কলন্দর, আজাদি বা মিসকিন। কোনটা আরবি, কোনটা বা ফারসি।... দরবেশিয়ানায় ব্যাখ্যায় আছে, 'ফকিরিয়ানা, গরিবিয়ানা, দরবেশিয়ানা গুজরান ইয়া মেজাজ।' ফকির, গরিব, মিসকিন ইত্যাদি শব্দের মধ্যে দারিদ্র্য, নিঃসম্বলতা, নিঃস্ব অবস্থাও বোঝায়। সেটা যে আদৌ আধ্যাত্মিক তা কিছু নয়। গরিব গুর্বোর সাধারণ প্রতিশব্দ ফকির। কিছু না থাকা যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানোই যেন এদের চিহ্ন, আস্তানা তো মানুষকে আটকে দেবে।

তলিয়ে ভাবলে মনে হতে পারে ফকিরিয়ানার দুটো চেহারা। একটা হল দীন দরিদ্র নিঃসম্বল নিঃস্ব মানুষ। আরেকটা হল একরকম ত্যাগব্রতী প্রবণতা, স্বেচ্ছায় মেনে নেওয়া দরিদ্র ঠাঁইনাড়া জীবন। এক্ষেত্রে বোঝা দরকার, জীবনকে গ্রহণ করবার দুটো ছক আছে— হয় দীনদারি না হয় দুনিয়াদারি। দুনিয়াদারি হল ভোগসুখ সহায় সম্পদ সম্পত্তি কর্তৃত্ব এবং তার পরিণামে অনিবার্য দুঃখ শোক বেদনা। আর দীনদারি মানেই বাহ্য উপভোগের সম্পদ আহরণের পথ ছেড়ে স্বেচ্ছায় দরিদ্র নিরুপাধি জীবনকে মেনে নেওয়া। ব্যাপারটা বোঝাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা গানের সাহায্য নিতে পারি, গানটা আগে একবার উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হচ্ছে :

আমি দালান কোঠা ত্যাজ্য করি
গাছতলা করেছি সার।
ধুতি চাদর ত্যাজ্য করি ডোরকৌপীন করেছি সার।

অর্থাৎ মানুষটা সর্বাংশে ত্যাগী নয় কিন্তু ভোগের পথ থেকে স্বেচ্ছায় সরে এসেছে, জীবনের আয়োজনকে খানিকটা খর্ব করে নিচ্ছে। দালান কোঠাতে থাকাই যায়, ছিলামও সেখানে, কিন্তু এখন সার করেছি বৃক্ষতল। সভ্যসজ্জা আভরণ ছেড়ে ডোরকৌপীনে নিজেকে বেঁধেছি। এর ইঙ্গিত বেশ পরিষ্কার। অনিকেত যোগজীবনে বৃক্ষতলই আশ্রয়, ডোর কৌপীন দেহসংযমের প্রতীক। আমাদের প্রাচীন চিত্রকলায় দরবেশ বা ফকিরদের যে ছবি পাই তাতে হয় তাঁদের ভ্রাম্যমাণ রূপ, না হয় বৃক্ষতলে বসে উপদেশরত রূপে দেখা যায়। সর্বত্রই তাঁদের দীনবেশ।

মানুষের পক্ষে এই রাজভিখারি হবার বিকল্প কারুর কারুর জীবনে আসে। গৌতম ভদ্র সুন্দর লিখেছেন :

> বাদশাহি ও দরবেশি দুই পৃথক জীবনযাত্রা, আচরণবিধি। এরা আলাদা কোন সম্প্রদায় নন। লোকেরা বাদশাহি পথে যেতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে দরবেশি পথও বেছে নিতে পারে। ব্যক্তি বিশেষে বাদশাহও দরবেশ হন, দরবেশেরও বাদশাহ হতে কোন বাধা নেই।

কিন্তু বাস্তবে আমরা কী দেখছি? নদিয়া-মুর্শিদাবাদ-বীরভূম-বর্ধমানে আমি গত কয়েক দশকে অনেক ফকিরের সঙ্গ করেছি। লিখিত সাহিত্যেও ফকির চরিত্রের সন্ধান মেলে। জলধর সেন লিখেছেন কেমন করে কাঙাল হরিনাথ ফিকিরচাঁদ ফকির নাম নিয়ে গান রচনা করলেন তার বৃত্তান্ত। লিখছেন :

> সেদিন প্রাতঃকালে লালন ফকির নামক একজন ফকির কাঙালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।... তাঁহার এক অমোঘ অস্ত্র ছিল— তাহা বাউলের গান।... সেই লালন ফকির কাঙালের কুটিরে, সেইদিন আসিয়াছিলেন এবং কয়েকটি গান করিয়াছিলেন।
>
> প্রাতঃকালে যখন গান হয়, তখন আমরাও উপস্থিত ছিলাম, গানও শুনিয়াছিলাম : কিন্তু আমরা যে সে গানের মর্ম ধরিতে পারিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। ...বাউলের গান তখন তেমন প্রচলিত হয় নাই; ক্বচিৎ কখনও দুই একজন ফকির বা দরবেশের মুখে এক আধটা দেহতত্ত্বের গান আমরা শুনিয়াছি।

উনিশ শতকীয় এই অকপট জবানি থেকে দুয়েকটা সাময়িক তথ্য ও বিচার উঠে এসেছে। জলধর সেন লালন শাহকে একজন ফকির বলে চিহ্নিত করেছেন অথচ তাঁর কণ্ঠে শুনেছেন বাউল গান। এরপরের মন্তব্য হল বাউল গান তাঁর দুর্বোধ্য লেগেছে এবং বাউল গান তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকসমাজে তত প্রচলিত ছিল না। বরং ফকির দরবেশদের (বলা বাহুল্য তারা স্বভাব ভ্রাম্যমাণ) মুখে এক-আধটা দেহতত্ত্বের গান শোনার অভিজ্ঞতা ছিল। এই ভাষ্য খুব মূল্যবান, কারণ এর থেকে বোঝা যাচ্ছে ফকিরি গান অনেক আগে থেকে প্রচলিত ছিল, বাউল গানের ধারা তার পরের। ফকির আর দরবেশ যে দুটি আলাদা সম্প্রদায় তাও বোঝা যায়।

লালনের সেদিনকার গান অবশ্য জলধর সেন কিংবা অক্ষয়কুমার মৈত্রের মতো শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনে খুব নতুন করে অনুপ্রেরণা জাগায় এবং তার ফলে তাঁরা এক ধরনের নির্বেদমূলক গান লিখে বসেন বাউলগানের ধাঁচায়। গান লেখা হলে তাতে ভণিতা দেন 'ফিকিরচাঁদ ফকির'। পরে সেই গানে কোনও চলতি সুর কাঠামো লাগিয়ে হরিনাথকে শোনান। হরিনাথ তাতে উৎসাহিত হয়ে নিজেও গাইতে গাইতে শেষে নৃত্যপর হলেন। এবারে তাঁর নবজন্ম হল। তিনি লিখতে শুরু করলেন একরকম পারমার্থিক ভাবনার গান, গানের পর গান, গড়ে উঠল গানের দল, ফিকিরচাঁদি গানের ঢং, তার সুরে সারাদেশ পরিপ্লাবিত হল।

কাঙাল হরিনাথের গানে ফিকিরচাঁদ ফকির ভণিতাটি সমারূঢ়। এটা তাঁর নিজের উদ্ভাবন নয়। তাঁর বান্ধববর্গ এই ভণিতার নির্মাতা। কেমন অনায়াসে জলধর সেন লিখেছেন, 'আমাদের ত ধর্ম্মভাব ছিল না, কোনও "ফিকিরে" সময় কাটানোই আমাদের উদ্দেশ্য।' সেই ফিকির অবশ্য কাঙালের বেশ মনঃপূত হয়ে গেল। ১২৯৩-১৩০০ সালের মধ্যে ১২ পৃষ্ঠা করে 'কাঙাল-ফিকিরচাঁদ ফকিরের গীতাবলী' ১৬ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

ফকিরদের আলোচনায় নানা ধরনের তথ্য আর বৃত্তান্ত ব্যবহার করে বোঝাতে চাইছি কী কারণে কে জানে ফকির সাজতে অনেকে চেয়েছেন ইতরভদ্র দু'-তরফেই। ফকির নামে আত্মপরিচয় দিতে অনেকে চেয়েছেন। গ্রাম বাংলার গত দেড় শতক ধরে ফকির নামে বহুজনকে পাওয়া গেছে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে। অনেক গীতিকার বা মহাজন ফকিররূপে পরিচয় দিয়েছেন নিজের। রবীন্দ্রনাটকে দাদাঠাকুর মঞ্চে এসেছেন ফকিরবেশে। কিন্তু কোনও অনিবারণীয় কারণে ফকিরদের অনুষঙ্গে মুসলমান পরিবেশের একটা ছাপ থেকে যায়। অর্থাৎ অনেকে মনে করেন শরিয়তের পথ ছেড়ে যাঁরা মারফতির পথে এসেছেন তাঁরাই বুঝি ফকির। কিন্তু হিন্দু ফকিরও বহু আছেন। ফকিরিয়ানা একটা Life style বা জীবনপ্রবণতা বলাই ভাল।

কিন্তু মুসলমানদের সঙ্গে ফকিরদের প্রত্যক্ষ যুযুধান সম্পর্ক বহুদিন ধরে রয়ে গেছে। একটা সময়ে ফকিরদের বাউলদের অন্তর্ভুক্ত যে ভাবা হত তার প্রমাণ রেয়াজউদ্দিনের বই 'বাউল ধ্বংস ফৎওয়া' থেকে পরিস্ফুট। উত্তরবঙ্গে একসময়ে বাউলখেদা আন্দোলন হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা কি বাউল ছিলেন না মারফত পন্থার ফকির ছিলেন?

বাংলাদেশের গবেষক হাবিবুর রহমান পূর্ব ও নিম্নবঙ্গে বাউল সংগীতাঞ্চলের রূপরেখা এঁকেছেন সরেজমিন ঘুরে। তাঁর সিদ্ধান্ত :

> সমগ্র কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা (সুন্দরবনাঞ্চল অর্থাৎ রামপাল, সরোনখোলা, মোরেলগঞ্জ, পাইকগাছা, দাকোপ ও শ্যামনগর থানা ব্যতীত), ঢাকা, টাঙ্গাইল (মধুপুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থানা ব্যতীত), ময়মনসিংহের জামালপুর মহকুমা (শ্রীবর্দী, ঝাড়িয়াগীতি, নাক্‌লা দেওয়ানগঞ্জ, শেরপুর ও নলিতাবাড়ি ব্যতীত) ও সদর দক্ষিণ মহকুমা এবং সিলেট জেলার সদর মহকুমা (জয়ন্তিয়া ও গোরাইন ঘাট ব্যতীত), মৌলভীবাজার মহকুমা ও সুনামগঞ্জ মহকুমার ছাতক, জগন্নাথপুর সুনামগঞ্জ থানা এবং হবিগঞ্জ মহকুমার সদর, চুনারুলঘাট, বাহুবল ও নবীনগঞ্জ থানা নিয়ে বাউল সংগীতাঞ্চল রূপায়িত হয়েছে।

এই বিশাল বিস্তীর্ণ জনপদ আজকের বাংলাদেশে এমন প্রশাসনিক বিভাজনে শনাক্ত করা যাবে না, কারণ বহু জেলা ও উপজেলায় এখনকার নববিন্যাসের অন্য চেহারা। তবে এসব অঞ্চলে লোকায়ত জীবন এখনও অনেকটা আছে। তবে বাউল গানের বদলে 'বাউল্যা' বা 'বাউলিয়া' গান, কিংবা 'ফকিরালি' গান সংজ্ঞাই এদিকে বেশি প্রচলিত। সিলেটের মানুষ খালেদ চৌধুরী, নির্মলেন্দু চৌধুরী ও দিনেন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে আলাপচারিতে জেনেছি তাঁদের শৈশব কৈশোরে তাঁরা যেসব গান শুনেছেন শিখেছেন তা হয়তো ততটা বাউলবর্গীয় নয়। বরং ফকিরালি গান তাঁদের অধিকতর চেনা। মারিফতি ফকিরদের গান তাঁদের স্মৃতিতে এখনও সজীব।

হাবিবুর রহমান একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন মুসলমান কট্টরবাদীদের সঙ্গে মারফতি ফকিরদের দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে। তাঁর ধারণা :

> উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে তদানীন্তন নিম্ন বাংলায় (যশোহর-বরিশাল-ফরিদপুর) ওয়াহাবী ও ফারায়েজী আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে। এ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সমাজ থেকে শের্ক ও বেদাতী দূর করা। এদের অভিযানের ফলে অনেকে গান-বাজনা ছেড়ে দেয়। কেউবা পালিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার সাটুরিয়া থানা এমনিতর একটি পলাতক বাউলদের মূল কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে।

AMARBOI.COM

এ রকম কোনও পলাতক বাউল বা ফকিরকেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গে গড়ে ওঠেনি, কারণ এখানকার মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সে সময় তেমনতর উগ্রপন্থী সংগঠন ছিল না। কিন্তু নিম্নবঙ্গে উত্তরবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গের বিস্তৃত অংশে ধর্মোম্মাদ কট্টর ইসলামি জনসমাজ বিশেষত মোল্লাতন্ত্র বাউল ও মারফতি ফকিরদের বিতাড়নে ও চিত্তশুদ্ধিতে সক্রিয় ছিল। তার ফলে ওই বঙ্গে যা ঘটেছিল তা হাবিবুর রহমানের মন্তব্যে আমরা জানতে পারি। তাঁর সিদ্ধান্ত :

> বাউল সাধনা মূলত দেশজ ও সুফীতত্ত্বের সমন্বিত সাধনা। কিন্তু ফারায়েজী ওয়াহাবী আন্দোলনের ফলে বাউলের সাধনসংগীতে দেশীয় তত্ত্বের বিয়োজন ঘটে। এ গানে হেদায়েতি (হিদায়েত শব্দটির অর্থ সঠিক পথে পরিচালিত বা নির্দেশিত হওয়া) বিষয়ক ভাব ও সুফীতত্ত্বের অবতারণা করা হয়। বস্তুতপক্ষে এই সময় থেকেই বাউল গানের বিচার শাখার সূচনা হয়। বাউলের মধ্যে সাধন-ভজনে মৌলিক বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে সেগুলোর সুচারু ব্যাখ্যারই অপর নাম বিচার গান। ঢাকা জেলা ও এর সন্নিহিত অঞ্চলে বাউল গান 'বিচার গান' নামে পরিচিত। অন্যদিকে টাঙ্গাইল ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ময়মনসিংহের পশ্চিমাঞ্চলে ও জাতীয় গান 'ফকিরালী' এবং পূর্ব সিলেটে 'বাউলা' গান নামে পরিচিত। কুষ্টিয়া যশোহর ও খুলনা জেলায় ও গান 'ভাব' 'ধুয়া' ও 'শব্দগান' নামে বহুল পরিচিত।

হাবিবুর রহমানের মন্তব্য পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়, তথ্যের ভ্রান্তিও আছে, কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন আছে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে। হেদায়েতি প্রয়াসে বাংলার মৌল বাউল গানের দেশজ ভাব ঝরে গিয়ে গড়ে উঠেছে বিচার গানের নতুনত্ব এমন সিদ্ধান্ত অন্য কারুর লেখায় পাইনি। তা যদি হয়ে থাকে তবে বুঝতে হবে একদল বাউল পালিয়েছিল, আরেকদলের গানের অন্তঃশরীরে ধর্মব্যবসায়ীরা পরিবর্তন এনেছিলেন, যাকে বলে Thematic variation। তা কেন হবে? গানকে অনৈসলামিক বিবেচনা করলে তাকে সমূলে উৎপাটন করাই স্বাভাবিক। কারণ এখনকার দিনে মুর্শিদাবাদে বাউল ফকিরদের সঙ্গে কট্টর ধর্মান্ধ মুসলমানদের যে বিরোধ তা হল গান গাওয়া নিয়েই। গান করাই তাঁদের মতে গোনাহ্ বা পাপ। তারপরে আসে গানের বিষয়গত বিরূপতা। একতারা বা অন্য বাদ্যযন্ত্র ভেঙে দেওয়া আসলে গানের বিরুদ্ধেই লড়াই। নদিয়ার গোরভাঙার মনসুর ফকির আমাকে বলেছে, 'এই যে দেখছেন বাড়ির বাইরে আমরা এই ঘরখানা বানিয়েছি, সন্ধেবেলা ওখানে আমরা গান গাই। ওরা বলেছে গান বন্ধ কর। অবিশ্যি আমরা সেকথা মানিনি। গান চলছে।'

কিন্তু বিচার গানের উদ্ভব মারফতি ফকিরদের নিজেদের প্রয়োজনেই হয়েছে। ফকিরি পথ সর্বদাই বিচারশীল। প্রতিপক্ষের সঙ্গে তাদের 'বাহাস্' বা বিতর্ক চলে, নিজেদের মধ্যেও সর্বদা চলে গানে গানে তত্ত্ব তালাশ। শরিয়তি বড় না মারফতি বড়? আল্লা না নবি? নবি কে মুর্শেদ কে? ভজে পাই কি পেয়ে ভজি? এ ধরনের তর্কমুখর তত্ত্ব ও প্রতিতত্ত্বের বুনোট, উত্তর-প্রত্যুত্তরের আসর সর্বদাই আছে গায়ক সম্প্রদায়ে। সে সব বিষয়ে প্রত্যেক বড় গায়কই সচেষ্ট ও সচেতন। তাঁদের শিক্ষাদীক্ষাও ব্যাপক। গানের সঞ্চয় ঈর্ষণীয়। ভাল বিচার গানের সভা শ্রোতাদের শিক্ষিত হবার পক্ষে অনবদ্য পাঠশালা।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা গুরুতর কথা সেরে নিতে হবে। আমাদের সমাজ কাঠামো এমন যে, কোনও গ্রামে মুসলমান সমাজে ঘৃণিত ও অবমানিত হয়েও ফকিরদের থাকতে হয় তাদের মধ্যেই। মুসলমান পরিবারের নানা প্রথা প্রকরণ উৎসবে অংশ নিতে হয়। ছেলেমেয়েদের আরবি নাম রাখতে হয়। বিয়েশাদিও ফকিরের সন্তানের কোনও হিন্দুর ঘরে হবার নয়। এ নিয়ে সমস্যাও হয়। একটা সংকটের কথা মনে পড়ছে। পরানপুরের এনায়েতউল্লা ফকিরি মতে আছেন। তাঁর পিতা পাঁচরুল্লা বিশ্বাসও ওই মার্গে ছিলেন। বেশ কিছু জমিজমা আছে, সমাজের মান্যমান ব্যক্তি। তাঁর সাধনার মার্গ হল ফকিরি, কিন্তু তাই বলে তিনি দীনহীন ফকির তো নন। দালানকোঠা ত্যাজ্য করে গাছতলাও সার করেননি জীবনে। দিব্যি বড় দোতলা বাড়ি, ধানের মরাই, জেনারেটর। গ্রামের আলেম মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর প্রণয়ও নেই বিরোধও নেই। মানুষটি মধ্যশিক্ষিত এবং মুর্শিদাবাদে কোথাও বাউলফকিরদের নিগ্রহ হলে তিনি সেখানে হাজির হন, প্রতিবাদী ভূমিকা নেন।

সাধারণত আমরা ভেবে দেখি না, কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখেছি ফকিরদেরও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রেণিগত থাক আছে। বীরভূমের গ্রামে যেসব ফকির পরিবার দেখেছি তারা মরা গরিব, যদিও সেই গরিবিয়ানায় তাদের কোনও গ্লানি নেই। পাথরচাপুড়ির মেলায় প্রচুর ফকির দেখেছি, একেবারে কপর্দকশূন্য ভিক্ষাজীবী। এরকম রিক্ত দরিদ্র ফকির পরিবারের সন্তানদের ফকির পরিবারেই বিয়ে হয়। আবার গ্রামের মধ্যে কিছু অবস্থাপন্ন ফকির দেখেছি যাঁদের সহায় সম্পদ আছে। যেমন হাঁসপুকুরের আবু তাহের, গোরভাঙার আজহার খাঁ, পরানপুরের এনায়েতউল্লাও তেমনই। তাঁর মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন মুসলমান পরিবারে, কারণ অর্থনৈতিক অবস্থার দিক থেকে তারা সমান সমান। মেয়েকে কষ্ট দেবে না।

আশ্চর্য যে ফকিরদের মত ও পথ আলাদা কিন্তু সম্ভ্রান্ত ফকিরদের সামাজিক ওঠাবসা সেই শরিয়তি মুসলমানদের সঙ্গেই। অবশ্য গ্রামবাংলায় শহরের মতো অত শ্রেণিভেদ নেই, থাকার কোনও বাস্তবতা নেই। তাই কোনও কোনও মুসলমান পরিবার ফকির পরিবারের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেন। ফকিরবাড়ির ছেলেকে পাত্র হিসাবে মুসলমান শ্বশুর খুব পছন্দ করেন। কারণ? কারণটা আবু তাহের ফকির হেসে হেসে বলেছিলেন : 'কারণ ফকিরদের ছেলেমেয়েরা খুব শান্ত প্রকৃতির হয়। ফকিরের ছেলে মদ মাংস ছোঁয় না, নেশাভাং নেই, ঠান্ডা স্বভাবের। শান্তিপ্রিয়, তাই কখনও বিবিকে তালাক দেবে না এই ভরসায় আলেম মুসলমানরাও মেয়েকে ফকিরবাড়িতে বউ করে পাঠায়, খুব আগ্রহ তাতে।'

এনায়েতউল্লার অভিজ্ঞতা বিপরীত। তাঁর সুদর্শনা ফরসা মেয়েটিকে যে মুসলমান বাড়ি বিয়ে দিয়েছিলেন সেখান থেকে ফেরত এনেছেন। কারণ তারা গোমাংস খায়। ফকিররা বড় একটা মাংসই খান না, বেশির ভাগ নিরামিষাশী, বড়জোর মাছ চলে। এনায়েত ফকিরের মেয়েকে তার শ্বশুরবাড়িতে শুধু গোমাংস খেতে বাধ্য করা নয়, হুকুম করেছে সেই মাংস রেঁধে পরিবেশন করতে হবে। মেয়েটিকে বাধ্য করা যায়নি। ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ভেবে দেখতে গেলে এও কিন্তু একরকম সামাজিক অত্যাচার। অন্য মোড়কে এটা হল ফকিরদের ওপর মৌলবাদীদের সামাজিক নির্যাতন। আখড়া ভেঙে দেবার হুমকি, একতারা কেড়ে নেওয়া, বা গান গাইতে না দেওয়ার সঙ্গে জোর করে গোমাংস খাওয়ার অত্যাচারে তফাত কতটা?

এককথায় বলা চলে, শরাওয়ালাদের সঙ্গে বেশরা ফকিরদের নীতিগত লড়াই বহুদিনের এবং তাতে দৈহিক শক্তি ও সামাজিক প্রতিপত্তির ব্যবহার চলে আসছে নানাভাবে ও নানামাত্রায়। একটা কথা সচরাচর মনে থাকে না যে, শরিয়তিই হোক মারফতিই হোক, আমাদের এই বাংলায় বেশির ভাগ মুসলমানই ধর্মান্তরিত। কেউ দুই পুরুষ কেউ তিন পুরুষ আগে ছিল হিন্দুধর্মের আওতায়, তাঁদের মধ্যে একটা বড় অংশ আবার নিম্নবর্গের গ্রামিক হিন্দু। তার ফলে গ্রামীণ সংস্কৃতির বহু আচার ব্যবহার ও কুসংস্কার তাঁদের মধ্যে রয়ে গেছে। তাই তাঁরা যখন ইসলাম ধর্মে চলে এলেন তখন কলেমা তৈয়বের প্রথম নির্দেশ বা বিশ্বাস 'আল্লা একমাত্র উপাস্য' একথাটা সর্বাংশে মান্য করতেন না। লা-শরিক আল্লার উপাসনার পাশে তাঁরা 'বুৎপরোস্তি' বা পৌত্তলিকতা এবং 'পিরপরোস্তি' বা পিরমুর্শেদের আরাধনাও করতেন। সাধারণ মানুষ তাঁরা, গ্রাম্য ও অশিক্ষিত— তাই নানা গ্রাম্যদেবতা, শীতলা-ষষ্ঠী-লক্ষ্মীপুজো ইত্যাদিতে বিশ্বাস রাখতেন। দেওয়ালি, হোলি, ভাইদ্বিতীয়া, লক্ষ্মীবার, নবান্ন মানায় ছিলেন উৎসাহী। শরিয়তিরা এসব বরদাস্ত করতেন না অর্থাৎ আল্লার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে অন্য শরিকের উপাসনা। গাল দিতেন তাঁদের 'মুশরিক' বলে। তাতে কি তাঁদের নিবৃত্ত করা যেত? তাঁরা তাঁদের অন্ধবিশ্বাসে দরগাতলায় সিন্নি মানত করতেন, পিরের কাছে কবচ তাবিজ ধারণ করতেন, সন্তান কামনায় গাছে বাঁধতেন ঢেলা। ইতিমধ্যে গ্রামে গ্রামে পিররা ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের প্রত্যক্ষ প্রভাবের কাছে অদৃশ্য আল্লার উদ্দেশে কলেমা পাঠ অনেক নিষ্প্রভ লাগত। ইসলামিয়ায় দাখিল হলেও ইসলামি রীতিকৃত্য অনেকে জানতেনই না। রফিউদ্দিন আমেদের বই থেকে জানা যায় :

> Despite the reformists' eloquent claims, the rural Muslims continued with their older way of life to a marked degree. A late-nineteenth-century observer was appalled at the 'pauparism, lethargy and negligence' of the average Bengali Muslim in matters of their own faith that he went so far as to describe them as a 'sect' which observed 'none of the ceremonies of its faith, which worships at the shrines of a rival religion and tenaciously adheres to practices which were denounced as the foulest abominations by its founder'. Not one in ten could reportedly recite the simple *Kalimah*, or creed, considered indispensible for every Muslim.

প্রতিবেদনে যে-চিত্র ফুটে উঠেছে তা মুসলমান ধর্মনিষ্ঠদের পক্ষে বেদনাদায়ক কিন্তু বাস্তব। ইসলামি রীতিকৃত্য তথা বাহ্যাচার পালনে তথা নামাজ-রোজায় সাধারণ মুসলমানের আলস্য ও অবহেলা তখনও ছিল, এখনও আছে। প্রতি দশজন মুসলমানের একজনও কলেমা আবৃত্তি করতে পারত না এ তথ্য পরিতাপজনক কিন্তু সত্য। কিন্তু কেন পারত না? ব্যাপারটি মনস্তাত্ত্বিক—কারণ কোনও ধর্মান্তরিত মানুষই সদ্য সদ্য তার পুরনো ধর্মাভ্যাস ও আচরণ ভুলতে পারে কি? একদিকে তার লৌকিকজীবন ও তার বিশ্বাস-সংস্কার, আরেকদিকে আনকোরা নতুন ইসলামিয়ার অজানা নির্দেশিকা— সে কোনদিকে যাবে? তা ছাড়া সংসারের বিপদে আপদে, সন্তানের আকস্মিক রোগ বালাইয়ে যে পিরফকির আর দরগাতলায় হত্যে দিতে অভ্যস্ত, দেবদেবীর নাম নিয়ে বুকে সাহস পায়, সে কেন এসব রাতারাতি বাতিল করে অদৃশ্য আল্লাতে শরণ নেবে? প্রকৃতপক্ষে এই যে লোকায়ত গ্রামীণ ইসলাম ধর্ম এ যেন এক মিশ্র বিশ্বাস, না-হিন্দু না-মুসলমান।

এই জায়গাটাই ফকিরিয়ানার উৎস। অপ্রত্যক্ষ আল্লার বদলে মুর্শেদ, শরিয়তের আচার মার্গের বদলে মারিফতের ভাবমার্গ, নামাজের বদলে গান, মসজিদের বদলে নিজদেহ, কোরানের বদলে দেলকেতাব। এর পাশে সমাজে আরেকটা চোখে-আঙুল-দিয়ে-দেখানো ভেদবাদ ছিল। যাকে বলা চলে মুসলমানের জাতিভেদ। বাউল ফকিরদের নিয়ে যাঁরা প্রত্যক্ষ গবেষণা করেছেন তাঁদের অনুধাবন এইরকম যে,

ক) এরা মূলত এক ছোটখাটো ধর্মগোষ্ঠী এবং গোষ্ঠীসংগঠনের মূলে রয়েছে স্পষ্ট প্রতিবাদী মনোভঙ্গি। এই প্রতিবাদ গড়ে উঠেছে জাতিভেদ থেকে। সমাজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে তারা নিজেরাই এক ক্ষুদ্র সমাজ গড়ে নিয়েছে। তার মানে হিন্দু আর মুসলমানদের বৃহত্তর সমাজ কাঠামোর ভেতর ভেতর রয়ে গিয়েছিল বর্ণবৈষম্য, তারই প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ায় ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতন্ত্রের সূচনা। অভিজাত মুসলমান আর নবাব বাদশাদের প্ররোচনায় সেখ সৈয়দ মোঘল পাঠানরা মুসলমান সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে ও বর্ণে স্থাপিত হন অন্যপক্ষে এ দেশের অগণিত ধর্মান্তরিত মুসলিম নিম্নশ্রেণিভুক্ত হয়ে পড়েন।

খ) তত্ত্বগতভাবে অবশ্য ইসলামে জাতিবর্ণভেদ থাকার কথা নয়, তবে বাস্তবে অন্তত গ্রামিক সমাজস্তরে শ্রেণিভেদ প্রত্যক্ষ। সেই ভেদের চেহারায় ধরা পড়ে যে 'আশরাফ' বলতে উচ্চবর্ণ আর 'আতরাফ' বলতে নিম্নবর্ণ বোঝায়। আশরাফ বা শরীফ আদমি তাঁরাই যাঁরা আরব, পারসিক ও আফগান খানদান থেকে ভারতে এসে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে উঠেছিলেন অথবা উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজ থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। তাঁদের আভিজাত্য ও কৌলীন্য বেশি। আর এদেশের ধর্মান্তরিত মুসলিমরা যেন খানিকটা হেয়, ভদ্রেতর বর্গের। তাদের নাম আতরাফ বা আজলফ। এই আতরফের মধ্যে আরও যারা নিচুস্তরের (যেমন জোলা, নিকিরি, কাহার, নলুয়া বা বেদে) তাদের নাম 'অর্জল' বা 'রাজিল'।

তথ্যত দেখা গেছে আশরাফ-আতরাফে তেমন সামাজিক লেনদেন ছিল না এবং বিবাহ সম্পর্ক হয়নি। আতরাফদের সঙ্গে অর্জলদেরও সম্পর্ক স্বাভাবিক ছিল না।

গ) স্বভাবত এসে পড়ে সামাজিক সুযোগ সুবিধা ও অর্থনৈতিক ছকের কথা। বোঝাই যাচ্ছে আশরাফরা ছিলেন সুবিধাভোগী জমিদার ও উচ্চ পদাধিকারী। আতরাফরা খেটে খাওয়া মানুষ। অর্জলরা একেবারে গতরজীবী।

আশরাফদের মধ্যে আবার চিত্তাকর্ষক শ্রেণিভেদের বৃত্তান্ত পাওয়া গেছে। যেমন সৈয়দরা সবচেয়ে মান্য বা উঁচু থাকের যেহেতু তাঁরা মহম্মদ কন্যা ('Prophet's daughter') ফতিমার বংশধারার। সৈয়দদের পরে সেখ, মোঘল ও পাঠান। মুসলমান শাসনাধীন ধর্মান্তরিত দেশি মুসলমানদের কোনও উচ্চপদে নিয়োগ করা হত না। ইলতুৎমিস তাঁর প্রশাসন থেকে তিরিশজনকে খারিজ করে দিয়েছিলেন তাঁরা জন্মসূত্রে ভারতীয় ছিলেন বলে। এ ব্যাপারে একটি মজার তথ্য পাওয়া যায় ইমতিয়াজ আমেদের বই থেকে। জানা যাচ্ছে :

> নিজামুল মুল্‌ক্‌ জুনাইদির সুপারিশে সম্রাট ইলতুৎমিস যখন জামাল মারজাককে নিয়োগ করলেন কনৌজের এক উচ্চপদে তখন তাতে আপত্তি জানালেন আজিজ বাহ্‌রুজ নামে এক উচ্চ আমলা, কারণ জামাল নিম্নবর্ণজাত। সঙ্গে সঙ্গে ইলতুৎমিস সেই নিয়োগ তো বাতিল করলেনই উপরন্তু নিজামুলের বংশ বৃত্তান্ত নিয়ে তদন্ত করতে আদেশ দিলেন। তদন্তে ফাঁস হল নিজামুল জাতে জোলা, সঙ্গে সঙ্গে বরখাস্ত হলেন।

এসব বিবরণ থেকে প্রতিভাত হচ্ছে একসময় মুসলমান সমাজে শ্রেণিঘৃণা কী পর্যায়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও কত হিংস্র ছিল। মুসলমান সমাজ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের বই থেকে এমন তথ্য উঠে এসেছে স্বাধীনতার আগে কলকাতার উচ্চশিক্ষিত ধনী মুসলমানরা বাংলা বলতেন না। তাঁরা ছিলেন উর্দুভাষায় স্বচ্ছন্দ।

শাহ্ ফকিরদের নিয়ে দীর্ঘদিনের গবেষণা করে নৃতাত্ত্বিক রণজিৎকুমার ভট্টাচার্য তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত করেছেন :

> They, however, feel that they are regarded low by the high status Muslims, because the common Muslims have no ability to appreciate their deep philosophy of life and consider them not much above the class of ordinary beggars.

এমন ধরনের তথ্যের মধ্যে ইতিহাসের ও সমাজের কিছু সার কথা আমরা খুঁজে পাই এবং রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে : এরে ভিখারি সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে।

উচ্চবর্গের মানুষ ও অভিজাত জীবন একটা সত্য কখনই বোঝে না যে, মানুষের মনের শক্তি অদম্য এবং তার ভিতরে প্রতিবাদের বহুরকম ভাষা ও কৌশল আছে। যে সময় মুসলিম সমাজ তার পবিত্র ধর্ম ও শুদ্ধ জীবনদর্শনের উচ্চ মাচায় বসে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের ভাবছিল ভিখারি, গরিব ও নিম্নস্তরের জীব— তখন তাদের শোষিত সত্তা পরম অভিমানে চাইছিল মুক্তি ও মানবাধিকারের মর্যাদা। লক্ষ করা যাচ্ছে লালন ফকির তাঁর জীবন সায়াহ্নে কুষ্টিয়ার অন্তর্গত ছেঁউড়িয়ায় এসে বাঁধলেন তাঁর আস্তানা। ওই গরিব মহল্লায় থাকতেন মোমিন কারিগর সম্প্রদায়, তাঁত বোনা ছিল তাঁদের জীবিকা। পরিচয়ে আতরাফ কিংবা অর্জল। তাঁদের মধ্যেখানে বাস করে তিনি গানে লিখলেন, 'লালন বলে জাতের কী রূপ দেখলাম না নজরে।' তাঁর গান সব কিছুকে ছাপিয়ে ঘোষণা করল অপরাজেয় মনুষ্যত্বের জয়। জাতিবর্ণহীন শ্রেণিহীন মানুষ। তাঁর ফকিরিপন্থায় দলে দলে নির্জিত অপমানিত শোষিত মানুষ এসে যোগ দিলেন। শোনা গেল প্রতিবাদের এক নতুন ভাষা লালনশিষ্য দুদ্দু শাহ্-র গানে। ব্যঙ্গ করে তিনি লিখলেন :

এ দেশে জাত বাখানো সৈয়দ কাজী দেখিরে ভাই
যেমন বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ সবাই।
ব্রাহ্মণের দেখাদেখি
কাজী খোন্দকার পদবী রাখি
শরীফি কওলায় ফাঁকি দিয়ে সর্বদাই।
জোলা কলু জমাদার যারা
ইতর জাতি বানায় তারা
এই কি ইসলামের শরা
করিস তার বড়াই?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গানের মধ্যে যুক্তিজালের ঠাস বুনোট। মারফতি ফকিরদের পক্ষ নিয়ে দুদ্দু শাহ-র মর্মান্তিক প্রশ্ন : ওহে সব শরাওয়ালা ইসলামি ধর্মধ্বজী, ব্রাহ্মণদের দেখাদেখি মুসলমান সমাজে যে উচ্চনীচ ইতরভদ্র ভেদাভেদ আমদানি করেছ তা কি শরিয়ত সঙ্গত? তারপরের প্রশ্নটি সাংঘাতিক, সেটা রয়েছে আরেক গানে :

এ দেশের মুসলমানে বড়াই করে
আমরা বাদশাই জাতির খান্দান রে।
সহস্র বৎসর পূর্বে ভাই
মুসলমানের গন্ধ দেখি নাই
যত অনার্য শূদ্র ওরাই
ধর্ম ভারত হয় রে।

এ একেবারে মূল ধরে টান। এদেশে হাজার বছর আগে মুসলমান ছিল না। দেশের আদি ভূমিপুত্র অনার্য আর শূদ্ররাই। ফকিররা তাদেরই অনুযাত্র। ব্রাহ্মণরাও যে বহিরাগত তার ইঙ্গিত অবশ্য নেই। তবে সব লোকায়ত ধর্মই নিজেকে বেদবিধিছাড়া বলে ঘোষণা করে।

ফকির পন্থার উদ্ভবে সুফিতত্ত্বের প্রেরণা থাকতে পারে এমন কথা প্রায় সকলেই বলেছেন। কিন্তু ফকিররা যে আচার-আচরণে ততটা ইসলামনিষ্ঠ নন তার কারণ কি শুধুই প্রতিবাদ বা জাতিভেদ জাত অবিচার? ভেবে দেখা দরকার নেই কি যে, একেবারে অজ গাঁয়ে অশিক্ষিত খেটে খাওয়া মানুষের নিম্নস্তরে শরিয়তের নীতি নির্দেশ কতটা পৌঁছানো সম্ভব এবং কাদের দ্বারা? পক্ষান্তরে এ তথ্য জানা যায় যে, সুফিপন্থীরা ও সাধকরা পদব্রজে ঘুরে বেড়াতেন সর্বত্র। তাঁদের বাণী ও উপদেশ অনেক ব্যাপ্ত ছিল। ফকির, দরবেশ, মিসকিনরা তো স্বভাবেই ভ্রাম্যমাণ। তাঁদের জমিজমা ছিল না, তাই জমির টানে কোথাও স্থায়ী বাস্তু স্থাপনের নেশায় ছিলেন উদাসীন। ভিক্ষাজীবী, তাই সাধারণ মানুষের অন্দরমহল পর্যন্ত তাঁদের যাতায়াত ছিল। সেই সঙ্গে রোগ আরোগ্যের নানা টোটকা জড়িবুটি থাকত ঝোলায়। জাদু শক্তির একটা আলাদা জোর বরাবর আছে অনুন্নত সমাজে। আবদুল ওয়ালী লিখেছেন উনিশ শতকের গ্রাম্য ফকিরদের বিষয়ে যে, এরা পাকা চিকিৎসক। সাধারণ চিকিৎসকের কেরামতি যেখানে কূল পায় না সেখানে এরা রোগ সারিয়ে তোলে। আর এই বিদ্যাকে কাজে লাগিয়েই এরা শিষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ধরা যাক, কোনও ফকিরের এক শিষ্য দেখল, কোনও মানুষ কঠিন রোগে ভুগছে। সেই শিষ্য তখন রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে কিছু উপদেশ এবং সম্ভবত জড়িবুটিও দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে গান ও প্রার্থনা করতেও শেখানো হয়। রোগী সুস্থ বোধ করতে শুরু করলে তার ভক্তি ও বিশ্বাস বেড়ে যায়। তখন গুরু বা মুখ্য ফকিরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। 'সাধুসেবা' দেওয়া হয়। রোগীর সাধ্য অনুযায়ী কিছু লোককে আপ্যায়িত করা হয়। এইভাবে শিষ্যের সংখ্যা বাড়ানো হয়।

লালন ফকির এমন রোগ সারানোর নিদান বাতলাননি কোনওদিন কিন্তু ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াতেন বহু জায়গায়। তাঁর নাকি বিশ হাজার শিষ্য বা বায়েদ ছিল। হতেই পারে, কারণ তিনি ছিলেন দিব্যজ্ঞানী ও উচ্চস্তরের ভাবসাধক গায়ক। তিনি যে ভাল গাইতে পারতেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং বাইরে গিয়ে গাইতেন নিজের লেখা গান তার লিখিত প্রমাণ রয়েছে জলধর সেনের জবানিতে। গানের শক্তি অপরিসীম, তাই তাঁর গানেই যে বহু মানুষ বশ হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। বাউল ফকিররা তাঁর সময় থেকে আজ পর্যন্ত এই গানের চাবি দিয়ে কেবলই খুলে চলেছেন মানুষের মনের তালা। কোরানের আয়াতের আরবি ভাষার চেয়ে বাংলা গানের বাণী অনেক সরাসরি ও অন্তরস্পন্দী।

এ ছাড়া আহমদ শরীফের বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় কেন গ্রাম সমাজের মানুষ আগেকার দিনে ব্যবহারিক ইসলামের চেয়ে ফকিরি মতের দিকে ঝুঁকেছিল। তাঁর হিসেব অনুসারে দেখা যায় ১৮৭১ সাল নাগাদ অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষদিকে উভয়বঙ্গে শতকরা বত্রিশজন মুসলমান ছিলেন। এঁদের এবং

> এঁদের বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য সমাজভুক্ত জ্ঞাতিদেরও কোনো লেখাপড়ার অধিকার ও ঐতিহ্য ছিল না। সুনির্দিষ্ট বৃত্তিজীবীতে বিভক্ত ও বিন্যস্ত সমাজে পেশান্তরের সুযোগ-সুবিধেও ছিল বিরল, তাই বৌদ্ধ-হিন্দু-মুসলিম সমাজে বৃত্তি ও অর্থসম্পদগত দুঃস্থতার দুরবস্থার এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থানগত পরিবর্তন ছিল দুর্লক্ষ্য।

সমাজ প্রগতির সবচেয়ে বড় লক্ষণ হল জ্ঞানচর্চা আর বিদ্যালাভের অধিকার তথা পারিপার্শ্বিক সুযোগ। নবাবি শাসনে ও ব্রিটিশ রাজের আমলে গ্রামের মানুষের সে সুযোগ ও অধিকার ছিল না এবং সবচেয়ে যেটা ক্ষতিকর সেই সমাজে বৃত্তিত্যাগ বা জাতিবৃত্তি ছেড়ে অন্যতর জীবিকার জীবনে যাবার বিকল্প ছিল না। ভাগ্যবাদী সব মানুষ অন্ধ শাস্ত্রশাসনের দাপটে আর কুসংস্কারের তামসে আবদ্ধ ছিল। তাই বাঙালি হিন্দু মুসলমান বা অন্য ধর্মীদের আর্থিক দুরবস্থা ও সমাজ অবস্থানের কোনও ফেরফার হত না। এর মধ্যে যুক্তিতর্কের অবকাশ, শাস্ত্র-কোরান-পুরাণ ব্যাখ্যানের মতো মুক্ত মনন অর্জন, প্রতিবাদী চেতনা গড়ে উঠতে পারে কি? সাধারণ মানুষ তাই উদরপূর্তি আর অন্ধকার জীবনকেই মেনে নিত। কেবল, শরীফের তথ্য অনুযায়ী,

> কেনা-বেচা, জমি-জমা সংক্রান্ত হিসেব নিকেশের প্রয়োজনবোধে এবং কোরআন পড়ার ও নামাজ-রোজা সম্বন্ধীয় আবশ্যিক নীতি-নিয়ম-রীতি-পদ্ধতি জানার-জানানোর গরজ-চেতনা বশে কেউ কেউ সন্তানকে বিদ্যালয়ে মক্তবে পাঠশালায় পাঠান। এমন লোক হয়তো ছিল হাজারে একজন।

হাজারে একজন যেত পাঠার্থী হয়ে এবং সেই পাঠ তার অর্ধাংশের কাছে থেকে যেত অসম্পূর্ণ। কারণ দু'-চার পাঁচ ক্রোশ অন্তর হয়তো ছিল একটি বিদ্যালয়, মক্তব আরও কম। গ্রামে শিক্ষকই বা কই? আর ছিল সীমাহীন দারিদ্র্য। কাঙাল হরিনাথের মতো মেধাবী ছাত্র 'পান্তাভাত, জামীরের পাতা আর লবণ' খেয়ে পাঠশালাতেই পাঠ সাঙ্গ করতে বাধ্য হন সেকালে। আহমদ শরীফ আরেকটা জরুরি মন্তব্য করে বলেছেন:

> কলকাতার, মুর্শিদাবাদের এবং অন্যত্র নিবসিত উর্দুভাষী শিক্ষিত অভিজাত মুসলিমরাই নিজেদের বাংলার মুসলিম বলে আত্মপরিচয় দিয়েছেন প্রমাণ দেওয়ান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খান বাহাদুর ফজলে রচিত গ্রন্থ *(Origin of the Mussalmans of Bengal 1895)* এবং নবাব আবদুল লতিফের লিখিত উক্তি। লতিফ বাংলাভাষী দেশজ মুসলিমদের 'ছোটোলোক' মুসলিম বলেই জানতেন।

শুধু আশরাফ-আতরাফ ভেদ নয়, অর্থনৈতিক তারতম্য, বৃত্তিবদ্ধতা, অশিক্ষা এবং ভাষাগত ব্যবধানও উনিশ শতকের শেষ দশকে প্রকট হয়ে উঠছিল। ভদ্রলোক-ছোটলোক বিন্যাস ব্যাপারটি চূড়ান্তভাবে ইসলামবিরোধী। এই পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে ফকিররা এগিয়ে এসে গ্রামীণ জনতাকে দীক্ষিত করতে শুরু করলেন মানবিক মন্ত্রে ও সুবোধ্য বাংলা গানের জাদুস্পর্শে। ফকিররা নিজেদের মুসলমান বলেই পরিচয় দিতেন এবং জনসমাজে মিশে গিয়ে ক্রমে ক্রমে তাদের মারফতি তত্ত্বে শিক্ষিত ও মুর্শেদ-ভক্তে পরিণত করতেন। শরিয়ত-তরিকত-হকিকত সব পথের কথা বলেও শেষ আশ্রয় যে মারফত তা বোঝাতেন। লৌকিক ঢঙে গ্রাম্য ভাষায় বোঝাতেন শরিয়ত হল গাছ আর মারফত ফল। ফল পেতে গেলে তো গাছে উঠতেই হবে। কিন্তু ওই পর্যন্তই, এবারে বলো তো গাছ খাব না ফল খাব? এসব লোক লৌকিক প্রত্যক্ষ ব্যাপক প্রচারের পাশে মোল্লা মৌলবিদের সংখ্যা আর কত ছিল সেই ব্রিটিশ রাজত্বে? তা ছাড়া আহমদ শরীফের যুক্তিতে,

> কোরআন-হাদিস অনুগ বিশুদ্ধ ইসলাম বিশ্বাসে ও আচরণে মানা সম্ভবও ছিল না দুটি কারণে। প্রথমত, শাস্ত্র ছিল আরবি ভাষায় লিখিত, বিদেশীর বিভাষা আয়ত্ত করা বিদ্যালয়-বিরল সেই যুগে ক্বচিৎ কারুর পক্ষে সম্ভব ছিল, আলিম মৌলবী আজও সর্বত্র শত শত মেলে না। দ্বিতীয়ত, স্থানিক কালিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক যে পরিবেশে মানুষ আশৈশব লালিত হয়, তার প্রভাব এড়াতে পারে না। শাস্ত্রীয় গোত্রীয় ও স্থানীয় ঐতিহ্যের আচারের, সংস্কারের মিশ্র ও সমন্বিত প্রভাবেই মানুষের মন-মনন-আচার-আচরণ নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে বাঙালির ধর্ম সাধারণভাবে বিশুদ্ধ 'ইসলাম' নয়,— মুসলমান ধর্ম যাতে রয়েছে যুগপৎ শরীয়ত ও মারফত, কোরআন-হাদিসের পাশে পির-দরবেশ-দরগাহ, মন্ত্র, মাদুলি, তাবিজ, দোয়া, ঝাড়-ফুঁক-তুক-তাক।

এতক্ষণে আমরা স্থিত হতে পারলাম খাঁটি বাঙালি মুসলমানদের মন আর মর্জির চেহারায়। বাঙালি জাতি হিসেবেও মিশ্র, ধর্মবোধেও মিশ্র। এদেশে বিশুদ্ধ 'ইসলাম' ধর্ম যেমন নেই, বিশুদ্ধ 'হিন্দু' ধর্মও কি আছে? তাতে বৌদ্ধতান্ত্রিক-যোগীদের সংযোগ আছে। বৈদিক সংরাগ যেমন আছে, তেমনি আছে বেদবিরোধী চেতনা। সেই সঙ্গে বৈষ্ণব অনুষঙ্গও উপেক্ষণীয় নয়। ফকিরি মতেও সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনার ধারা মিশে গেছে। এমনকী বাঙালি চিত্ত এমনই উদার ও সমন্বয়ী যে বাংলা ভাষায় মুসলমান গীতিকাররা লিখেছেন বৈষ্ণব পদ ও শাক্তগীতি। তার জন্য আলেম মোল্লারা কোনওদিন তাঁদের, এমনকী ধর্মান্ধ মধ্যযুগেও, কোতল করেননি বা 'মুশরেক' বলে গান দেননি। ফকিরদের ক্ষেত্রে তবে কেন এত নিপীড়ন ও হুমকি? কেন এত আখড়া জ্বালানো আর একতারা ভাঙা। তার কারণ তারা দরিদ্র ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসংঘবদ্ধ, তাদের পেছনে নেই উদার মধ্যবিত্তের সমর্থন ও রাজশক্তির আনুকূল্য। তারা শুধু নির্জন একক।

উনিশ শতকের শেষ দশকে লালন ফকিরের প্রয়াণ ঘটলেও ফকিরিপন্থার অবসান ঘটেনি, বরং দ্বিগুণ তেজে গানে গানে তা বাংলার গ্রামে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। পাঞ্জু শাহ, দুদ্দু শাহ, জালাল, রশিদ, হাসন রজা থেকে শুরু করে ফুলবাসউদ্দিন, নসরুদ্দিন, শীতলাং শাহ হয়ে বিশ শতকের প্রথম দু'দশক ফকিরি গানে সমাচ্ছন্ন ছিল। সেই বাড়বৃদ্ধি দেখেই ১৯২৫ সালে রেয়াজউদ্দিন রংপুর থেকে 'বাউল ধ্বংস ফৎওয়া' প্রকাশ করে ইসলাম রক্ষণের জিগির তুলেছিলেন। বইটির নাম 'বাউল ধ্বংস ফৎওয়া', কিন্তু আক্রমণের লক্ষ্য ফকিররা, কারণ সেসময় বাউল ও ফকিররা ছিল সমার্থক। বইটির উদ্দেশ্যই ছিল ফকিরিপন্থার উচ্ছেদ। কারণ, এই ফকিররা,

> ভিতরে অমোছলমান, বাহিরে মোছলমানী নামে নাম, মোছলমান মহল্যায় বাস, মোছলমান কন্যাগণের সহিত বিবাহসাদী ও মোছলমানের সকলপ্রকার সামাজিকতায় ভুক্ত। এই অপরিচিত অপ্রকাশ্যভাবে ইহাদের মোছলমানের সহিত মেলামেশার ফলে দলে-দলে অশিক্ষিত মোছলমান ইহাদের ধোকাবাজী বুঝিতে না পারিয়া সনাতন এছলাম ধর্ম্মকে ও পবিত্র কোরআনকে ত্যাগ করতঃ কাফের মোরতেদ হইয়া যাইতেছে।

রেয়াজউদ্দিনের মতো হাজী মৌলবিদের দুশ্চিন্তা ও উত্তেজনার সঠিক কারণটা এবার বোঝা গেল। দলে দলে ধর্মত্যাগের ঘটনা কট্টর ধর্মনিষ্ঠদের পক্ষে অসহনীয় হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। সেইসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, বেশরা ফকিররাও খুব দুর্বল ছিল না সেসময়। খবরে দেখা যাচ্ছে আফজল আলী নামে একজন শরিয়তবাদী মুসলিম নেতা বেশরাদের ভয়ে গ্রাম ত্যাগ করে ভিন্ন গাঁয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। 'তবু পীর রুস্তম শাহের নামে আধা মুসলমানদের পুরো মুসলমানে রূপান্তরিত করার আশা ছাড়েননি।'

এই সংবাদ থেকে আরেকটা সত্য প্রকাশিত হচ্ছে: সমাজে আধা মুসলমান আর পুরো মুসলমান একসঙ্গে সহাবস্থান করত এবং আধা মুসলমানরা ফকিরপন্থার সূত্রে পির উপাসনায় উৎসাহী ছিল। এই পিরবাদ ইসলামের সমান্তরাল শক্তি ছিল। যারা পিরকে ভজনা করত তারা আল্লার কালাম বা কলেমায় বিশ্বাসী ছিল না। ইসলামিয়ায় সামিল হবার চেয়ে তাদের বেশি ব্যগ্রতা ছিল পিরের মুরিদ হবার। এটাও সত্য যে ইসলামি রীতিকৃত্যের খুঁটিনাটি সবাই জানতও না।

যাই হোক, সমাজে ফকিরদের পরাক্রম ও সংখ্যাধিক্য মৌলবাদীদের আশঙ্কিত করেছিল। তাঁরা ফকিরদের 'ইসলামবিরোধী, শরিয়তবিরোধী, বেশরাহ, বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট' বলেই ক্ষান্ত হননি, তাদের 'শৃগালের ন্যায় বিতাড়িত করা উচিত' বলে রায় দিয়েছেন। 'জবাবে ইবলিস' বইতে ফকিরদের সম্পর্কে কঠোরতম ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছিল:

> ইহারা... কখনও শতচ্ছিন্ন কাপড় আলখেল্লা পরিয়া চিম্‌টে হাতে ঘুরিয়া বেড়ায়; কখনও দেখা যায় মারেফতীর নামে ইসলামের কূট সমালোচনামূলক গান গাহিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেড়ায়; আবার মন্ত্রপূত করিয়া মলমূত্রেরও সৎ ব্যবহার করিতে দেখা যায়। কখনও লোক দেখাইবার জন্য নামাজ রোজা করিয়া থাকে, আবার একতারা ডুগী তবলা বাজাইয়া গান গাহিয়া পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় এবং যৌন নিয়ন্ত্রণের কোন বালাই নাই।

অভিযোগের তালিকা ক্রমশ বাড়ছে। ইসলামের সমালোচনার গান মানে বিচারমূলক বিশুদ্ধ মারফতি ফকিরি গান, সেইসঙ্গে চারিচন্দ্রের সাধনা ও যৌন স্বাধীনতা— সবই আক্রমণের লক্ষ্য। ফকিরদের কাজকর্মকে 'কুফরী' (আল্লাকে অস্বীকৃতি) বলা হয়েছে। ইসলামের সঙ্গে ফকিররা 'ফিৎনা' বা ঝগড়াঝাঁটিতে লিপ্ত বলা হয়েছে। তারা 'মুতখোর' 'নাপাক' (অপবিত্র) আল্লার 'লানৎ' বা অভিশাপ তাদের শিরোধার্য এবং তাদের কার্যকলাপ 'ছিরাতে মুস্তাকিম' অর্থাৎ সহজ রাস্তা থেকে স্খলিত। তারা গোপনতায় ('বাতুনী') বিশ্বাসী বলে সন্দেহজনক ব্যক্তি।

ইসলাম মৌলবাদের চোখে দেখলে মারফতি ফকিরদের আর দোষের অন্ত থাকে না। কিন্তু ইসলামকে একেবারে অবিকল্প অনড় বলে যে চিরকাল ভাবা হয়েছে বা সবাই চোখ বুজে মান্য করেছে তাও নয়। প্রশ্ন, প্রতিপ্রশ্ন, বিচার, মতভেদ বরাবর চলছে এবং সেটাই প্রাণের লক্ষণ। প্রাচীন প্রথা ও অনুশাসন অন্ধভাবে অনুসরণ কবেই বা মানুষ করেছে? তাই ইসলামের বহুতর ওঠাপড়ার গূঢ় পাঠ নেওয়া দরকার। তাতে দেখা যাবে মুসলমানরা মূলত ইমানদার বা বিশ্বাসী। কীসে বিশ্বাসী? তাঁদের ধর্মের আকরগ্রন্থ কোরান ও হাদিসে বিশ্বাসী।

প্রথমদিকে ইসলামে খুব একটা মতভেদ ছিল না, আচরণে ছিল দ্বিধাহীন সাম্য। কিন্তু কালক্রমে শরিয়তের বিধান আর কোরান-হাদিসের ব্যাখ্যান ও ভাষ্য নিয়ে মতভেদ দেখা দিলে গড়ে ওঠে কিছু কিছু গোষ্ঠী বা 'মজহাব'। প্রথম বিভাজন ঘটে শিয়া আর সুন্নিপন্থীদের। মুসলমানদের মধ্যে সুন্নিরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সারা বিশ্বে একমাত্র ইরানে শিয়ারা সুন্নিদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি। সুন্নিদের মধ্যে, অন্তত বাংলায়, চারটি মজহাব। হানাফি, সাফি, হামবিলি ও মালেকি। এর বাইরে আছে আহলে হাদিস বা ফরাজি সম্প্রদায়, যারা হল লা-মজহাব বা কোনও মজহাবভুক্ত নয়। তারা শুধু কোরান ও হাদিসে বিশ্বাসী এবং কঠোরভাবে।

কোরান ও হাদিস ছাড়াও ইসলামে আরও দুটি নির্দেশিকা আছে, যা অনেকটা অন্যরকম। তার একটা হল 'ইজমা ই উম্মত' অর্থাৎ মহাজনদের দেখানো পথ, আরেকটা হল 'কিয়াস' অর্থাৎ ব্যক্তিগত অনুভব বা চিন্তাভাবনা। একজন মুসলিমের জীবনে কোনও গুরুতর সমস্যা এলে সে প্রথমে কোরানের নির্দেশ দেখবে, তাতে সমাধান না হলে দেখবে হাদিস কী বলছে। হাদিসেও যদি হদিশ না মেলে তখন ইজমা বা কিয়াস সমাধানসূত্র দিতে পারবে। এতে বোঝা যায় শরিয়ত মুসলমানদের ব্যক্তিগত বিচার বিশ্লেষণ ও মহাজনপন্থাকে বর্জন করতে বলেনি। তা হলে ফকিররা কী দোষ করলেন? তাঁরা মারেফতপন্থী অর্থাৎ শরিয়তের বহিরঙ্গ নির্দেশকে গুরুত্ব দেন না। তাঁদের একটা কথা হল আল্লার অনুভব হতে পারে 'সিনা'-য় অর্থাৎ হৃদয় দিয়ে, 'সফিনা'-য় অর্থাৎ শাস্ত্রগ্রন্থ মাধ্যমে নয়। তাই অন্তরঙ্গ অনুশীলনই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মারেফত। 'সাধারণ প্রথাগত শাস্ত্রীয় পথে মানসিক শান্তি, আত্মগত জ্ঞানলাভ, আত্ম-উৎসর্গ ও আত্ম-সংযম সম্ভব নয়।' তাই শরিয়তকে পেরিয়ে তবে মারেফতে পৌঁছতে হয়। মারেফত মানে প্রকৃত জ্ঞান, যার নির্দেশ জাহেরি কোরানে নেই, আছে অতি গোপনে। সেটা জানতে হয় মুর্শেদের কাছে দীক্ষা নিয়ে। সেই জ্ঞান শাস্ত্রপথে আসেনি, চলে আসছে বহুকাল থেকে সিনায় সিনায়। মারফতি ফকিরদের আলেমরা সহ্য করতে পারেন না, তার কারণ, মারফতিরা শরিয়তকে চরম বা পরম বলে মানেন না— আরও এগোতে চান আত্মদীপনের গহন পথে। সেই দীপন বা দর্শন তো মানুষকে দেখানো যায় না, উপলব্ধি করতে হয়। ব্যাপারটির সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা লালন চমৎকার বুঝিয়েছেন,

শরিয়ত আর মারফত যেমন
দুগ্ধেতে মিশানো মাখন।
মাখন তুললে দুগ্ধ তখন
ঘোল বলে তা জানে সবাই।

শরিয়তের মধ্যেই অন্তঃশীল হয়ে আছে মারেফত, যেমন দুধের মধ্যে মাখন। কিন্তু মাখন তুলে নিলে দুধ যেমন মূল্যহীন ঘোলে পরিণত হয় তেমনই মারফতি তত্ত্বে নিষ্ণাত হলে শরিয়ত হয়ে পড়ে নগণ্য।

মুর্শিদাবাদের এক ফকির আমাকে তাঁদের গোপন সাধনা সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমাদের ধর্ম স্যার, চোরের ধর্ম। কেন জানেন? সমাজের মধ্যে গ্রামের মধ্যেই চোর বাস করে, সকলের সঙ্গে মেলামেশা করে, কিন্তু লক্ষ্য থাকে চুরিদারির দিকে।'

—চুরিদারি কি?

—এই যেমন দোকানদারি, ব্যাবসাদারি, তেমনই কবিওয়ালাদের গাঁয়ে বলে, 'লোকটা কবিদারি করে বেড়ায়।' চুরির জীবিকা যার তার হল চুরিদারি। এই যেমন আমরা ফকিরি করি গোপনে, বাইরে সামাজিক ওঠাবসা, এমনকী মাঝে মাঝে কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ি মসজিদে। কেউ কেউ সন্দেহ করে, যেমন চোরকে করে। এই দেখুন আমার চেহারা। কিছু বুঝছেন?

সত্যিই কোনও বাহ্যচিহ্ন নেই। দিব্যি সোনালি ফ্রেমের চশমা, ফিটফাট টেরিকটনের পাঞ্জাবি আর সাদা লুঙ্গি, হাতে ঘড়ি। গানের আসরে নাকি গায়ক, আবার দক্ষ তবলিয়া। জমিজিরেত আছে। এইট পাশ। অন্তর্গোপন একটা হাসি হেসে বললেন, 'আমাদের হল বাতেনি কাজ, মানে গোপ্ত— ব্যক্ত নয়। লালনের গানে আছে "শরিয়তের দলিল হইল মারফত বাতনে রইল"। তার মানে শরিয়ত দেখতে পাবেন, আমাদেরটা দেখতে পাবেন না। নাঃ, এ ব্যাপারে লালনের গানটা আপনাকে শুনিয়েই দিই, শোনেন।'

'হোক, হোক— ফকির সাহেবের গান হোক' সবাই মুখিয়ে উঠল। জায়গাটা হল জিয়াগঞ্জের ফুলতলার একটা চায়ের দোকান। দু'জনেই বসে আছি বহরমপুরের বাস ধরব বলে। কথায় কথায় আলাপ তার থেকে গোপ্ত ফকির নিজেই নিজেকে জাহির করতে চাইলেন গানের মধ্যে দিয়ে। এটাই হয়। ফকিররা তো ভীষণ গানপাগল। গানই যেন তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মরমের বাণী, যুক্তির শান দেওয়া, দ্যোতনাময়। বললাম, 'সবাই আপনাকে ফকির সাহেব বলল যে? সেকথাটা তা হলে বাতনে নেই, জাহির হয়ে গেছে?'

'বিলক্ষণ', ভদ্রবেশধারী ফকির হেসে বললেন, 'এসব দিকে অনেক ফকিরি গানের আসরে আমার গান শুনেছে তো ওরা। চেনে, বুঝলেন?'

—শুনেছি মুর্শিদাবাদে ফকিরদের মারে, একতারা কেড়ে নেয়, চুল কেটে দেয়?

—হ্যাঁ, দেয়। তবে অঞ্চলবিশেষে। সময় সময় ঘটে উত্তেজনা। মারপিট করে বই কী। তবে এদিকে ওসব নেই। এদিককার মুসলমানরা শান্তিপ্রিয়। তা ছাড়া আসলে গান-পাগল। গানের আসরে আবার শরিয়তি মারফতি কীসের? নাকি বলো হে তোমরা?

'ন্যায্য কথা। গান হল গান— ধর্ম হল ধর্ম— আলাদা ব্যাপার।' জনতার একজন বলে, 'নিন, ওসব ভ্যানতারা রাখুন। ফকির মানুষ, ধরা পড়ে গেছেন যখন, গান একটা দুটো গাইতে হবে বই কী।'

—আর বাস এসে গেলে?

—সে পরের বাসে যাবেন। কেন বাড়িতে বিবি কি দানাপানি নিয়ে বসে আছেন? অপেক্ষা করে হেদিয়ে পড়ছেন নাকি গো ফকির সাহেব?

'না। এবারে হেরে গেলাম। গিন্নি বিবি তুলে কথা? তা হলে শোনো বাবাসকল।' বাবাসকল লালনের গানের তাৎপর্য কতটা বুঝলেন তা জানি না। আমাদের কথার পুরনো ধরতাই নিয়ে গোপ্ত ফকির একটা মুড়ির ক্যানেস্তারা টিনে তাল রেখে গাইলেন সেই মোক্ষম গানখানা, যার অন্তরা হল:

চোরে যেমন চুরি করে
ধরে ফেললে দোষে পড়ে
মারুফতি সেই প্রকারে
চোরা মালের তেজারতি।
সেইজন্যেতে কর গোপন
অনুমানে বুঝলাম এখন
লালন বলে এসব যেমন
মেয়েলোকের উপপতি।

সোনালি ফ্রেমের আড়ালে আমার দিকে ঝিলকিয়ে উঠল গায়কের দুষ্টু চোখের চাহনি। তারপরে গান চলতেই থাকল, বাস এল, গায়ককে শ্রোতারা ছাড়ল না, কিন্তু আমি বাসের জানলার ধারের নিরালা সিটে বসে, যেতে যেতে, গানটার প্রকাশ ক্ষমতার গভীরতা ভাবতে লাগলাম। গানের মধ্যে দিয়ে লালন মারফতি তত্ত্বের সারকথাটাই যেন বলে দিয়েছেন।

সত্যিই তো চোরের ধর্ম। আর চোরাই সামগ্রী যেমন গোপনে রেখে দিতে হয় লুকিয়ে, তেমনই দেহের কন্দরে লুকানো থাকে মারফতি সাধনা, তার চাবিকাঠি থাকে গুরু-মুর্শেদের হাতে। একেই তাই বুঝি গানে বলে, 'আমার ঘরের চাবি পরের হাতে?' লালনের উপমার উজ্জ্বলতাও কত দীপ্র। তন্ত্রের গোপ্য সাধনার বিষয়ে বলা হয়েছে 'ইয়ত্তু শাম্ভবী বিদ্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোপ্যা কুলবধূরিব'— এই গুহ্য বিদ্যা কুলবধূর মতো গোপন রাখতে হবে। লালন আরও নিগূঢ় ইঙ্গিতে বলছেন, স্ত্রীলোক যেমন উপপতিকে প্রচ্ছন্ন করে রাখে মনের গহনে, অথচ বৈধ স্বামীর সঙ্গে সংসার করে, মারফতি সাধনাও তেমনই প্রচ্ছন্ন কিন্তু বাইরে শরিয়তি মুখোশ। কুলবধূর উপমা যেন অনেকটা পরিবার আর সমাজকে ঘিরে কিন্তু স্ত্রীলোকের উপপতি নিতান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্কের আত্যন্তিকতা বোঝায়। উপপতি শব্দের সঙ্গে দেহগত ইঙ্গিত ও গোপন যৌনতার প্রশ্রয় আছে।

গানটা আগে শুনেছি কিন্তু এমন করে ভাবিনি। ভাবিনি, কারণ মারফতি আসলে তত্ত্বগান, তাই ভাঁজ খুলতে সময় লাগে, বয়স লাগে, বারবার শোনার অভিজ্ঞতা লাগে, তবে খোলে রহস্যের দরজা। এই ভদ্রবেশী ফকির যেমন একটুখানি ফাঁক করে দিলেন দরজা। মনে পড়ল আরেক ফকিরের কাছে শুনেছিলাম মারিফত মানে জ্ঞান। কীসের জ্ঞান? আল্লাকে প্রত্যক্ষ জেনে যে উপাসনা সেই সচেতনতাই হল প্রকৃত জ্ঞান। সুফিরা একেই বলেন, 'আইনুল একিন।' 'মারিফতের কিস্তি' বলে একটা বইতে লেখা আছে: শরিয়ত-তরিকত-হকিকত এই তিনধারার যে সাধনা তাতে হৃদয় মন থাকে কাচের মতো স্বচ্ছ, কোনও ছাপ বা প্রতিফলন পড়ে না। কিন্তু মারফতি পথে গুরুর নির্দেশ অন্তরে যেন পারা লাগিয়ে দেয় তখন মূল তত্ত্ব বা সত্যদর্শন তাতে ধরা পড়ে। মন তখন আর কাচ থাকে না, হয়ে ওঠে আয়না। লালন তাঁর খাঁচার পাখির গানে 'আয়না-মহলের' কথা বলেছেন। মারফতি গান সেই আয়না মহলের গুপ্ত স্বরলিপি।

ফকিরদের মধ্যে গান রচনার ঝোঁক কম। তাঁদের নিজেদের জীবনযাত্রার নানা সমস্যা, দারিদ্র্য ও ভিক্ষাজীবিতার চাপে গান লেখার মতো শান্ত আত্মস্থ অবকাশ কম থাকে। মুর্শিদাবাদ জেলা এদিক থেকে বেশ ব্যতিক্রমী। সেখানে আলেপ সর্দার, বাহার কিংবা নৈমুদ্দিনের মতো সজীব মনের রচয়িতাদের গানে যেমন ভাব তেমনই ভাষার বাঁধুনি। নদিয়ার আজহার খাঁ ফকিরের লেখা প্রচুর গান আছে। বীরভূমে বেশ কিছু ফকিরি গান পাওয়া গেছে যা সাম্প্রতিক কালের রচনা। কবু শাহ নামে এক গায়ক ফকিরের কণ্ঠ থেকে তেমন কিছু গান সরাসরি যন্ত্রে তুলে নিয়েছেন রাজ্য সংগীত একাডেমির গবেষক কঙ্কন ভট্টাচার্য। তাঁর সংগ্রহ থেকে কয়েকটি গান এখানে উদ্ধৃত করবার বিশেষ প্রয়োজন। তা থেকে বীরভূমের হালের ফকিরি গান সম্পর্কে খানিকটা ধারণা হবে। প্রথমে যে গানটি উদাহরণীয় তার বাণী:

পীর সালাম করি তব চরণে
আমি অবোধ শিশু রেখো যতনে।
একে একে করি সালাম যত পীর আস্থানে ॥
তারপরে করি সালাম আমি একিন মনে—
পাথরচাপুড়ির দাতা বাবা সেলাম তেনার চরণে
আজমীরের খাজা বাবা সেলাম তেনার চরণে
লাভপুরের ফুল্লরা মা সেলাম তেনার চরণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বরঘাটের শামীদবাবা সেলাম তেনার চরণে
দুবরাজপুরের মামা-ভাগ্নে সেলাম তেনার চরণে
তারাপীঠের তারা মা সেলাম তেনার চরণে।

এঁকে খাঁটি ফকিরি গান বলা যাবে না— কিন্তু পথে ঘাটে গ্রামে হাটে ফকিররা এমন গান গায়। গানের মধ্যে ধর্মীয় উদারতা এবং হিন্দু মুসলমান ভেদরেখা মুছে বন্দনীয়দের প্রতি বন্দনা ধাবিত হয়েছে। ভূগোল বা নিজস্ব পরিবেষ্টনীর বেড়া ডিঙিয়ে এ-গান এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করে স্থানীয় পাথরচাপুড়ির দাতাবাবা আর আজমীর শরীফের খাজা মইনুদ্দিন চিস্তিয়ার মহত্ত্ব। বীরভূমের চারটি স্মরণীয় ও অর্চনীয় স্থান গানে জায়গা করে নিয়েছে— লাভপুরের ফুল্লরা, বরঘাটের শামীদফকিরের থান, দুবরাজপুরের মামা-ভাগ্নে পাহাড় এবং তারাপীঠের তারা মা-র মন্দির। এ ধরনের গান যে-ফকির প্রকাশ্যে গেয়ে বেড়ায় তার জনাদর দেখার মতো। সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ, হাটের মানুষ দোকানদার ও গৃহস্থ এমন গান শুনতে ভালবাসে, ডেকে ডেকে শুনতে চায়।

এর পাশে সম্পূর্ণ অন্যরকম একটা গান পাওয়া যাচ্ছে যার গীতিকারের নাম নেই কিন্তু গানের মধ্যে শরিয়তি সাধনার প্রসঙ্গ এসেছে। ইসলামে 'নেকি' (পবিত্র) আর 'বদি' (নোংরা) বলে দুটি কথা আছে। বদিকে বর্জন করার পরামর্শ দিয়ে বলা হচ্ছে:

ধুয়ে ফেল্‌গা মনের বদি
আল্লার সনে ভাই মিশবি যদি।

আল্লার সঙ্গে মিশে যাবার ইচ্ছা ঠিক শরিয়ত সংগত বাসনা হতে পারে না— ভাবনার মধ্যে মারেফতের ছাপ খুব স্পষ্ট। এরপরে বলা হচ্ছে:

পাঁচ কলমা নামাজের গুঁড়ো
রোজা রাখো নামাজ পড়ো
দিলেতে সবুর করো
একল তিরিশ ভাই মানো যদি।

এখানে তিরিশের উল্লেখ আসছে শরিয়তের তিরিশ পারা কোরানের জাহির অংশ। ফকিরদের বিশ্বাস আছে বাকি দশপারা বাতুনের প্রতি। গানের শেষটুকু বেশ মজার:

যেমন বান্দা বেহেস্তে যাবে
মেওয়া ফল ঝুঁকে পড়বে—
'খাও খাও' বলে বান্দার মুখে এসে লাগবে
খাওয়ার ইচ্ছা ভাই থাকে যদি।

ফকিরদের স্বর্গকামনা নেই, মানবদেহেই বেহেস্ত তাদের। কিন্তু নেকবান্দারা যখন স্বর্গে যাবে তখন স্বর্গীয় প্রাপ্তিফল বা মোক্ষ তাদের দিকে ঝুঁকে পড়বে। কিন্তু তখন কি সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোপেড-চড়া বাউল

গানে আত্মহারা বাউল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাদা পোশাকে বাংলাদেশি বাউল

লালনের আখড়ায় গান

কালিদাসী অধিকারী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাউল চিত্রকলা অঙ্কনরত হরিপদ গোঁসাই।

হরিপদ গোঁসাই-এর আঁকা ছবি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরিপদ গোঁসাই-এর আঁকা ছবি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

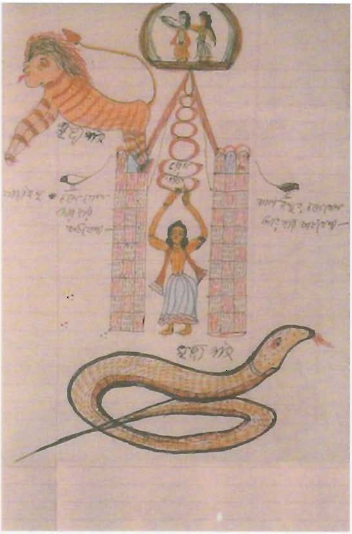

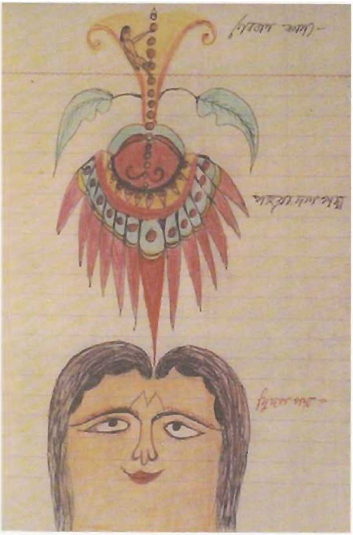

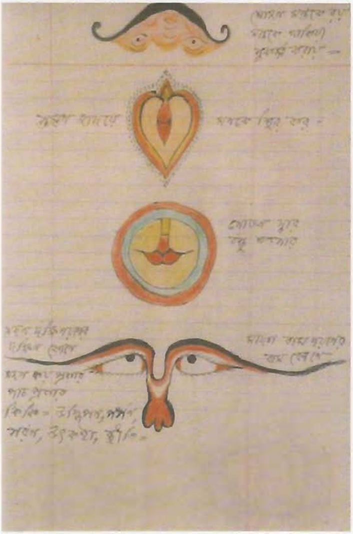

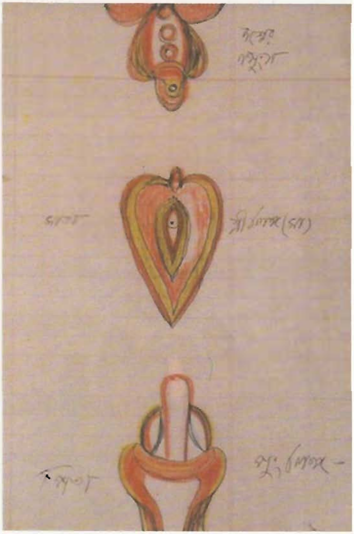

হরিপদ গোঁসাই-এর আঁকা ছবি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরিপদ গোঁসাই-এর আঁকা ছবি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

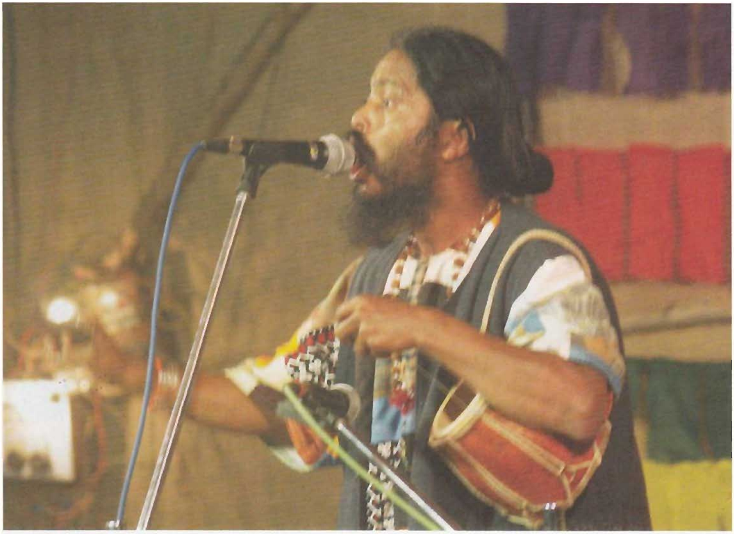

মারফতি ফকির

গীত সঙ্গিনীর দোতারার সুর মেলানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাচের বিক্ষেপে

প্রদর্শনকামী গায়ক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দয়ালদাস

দীনহীন বাউলের আখড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুমিত্রা দাসী

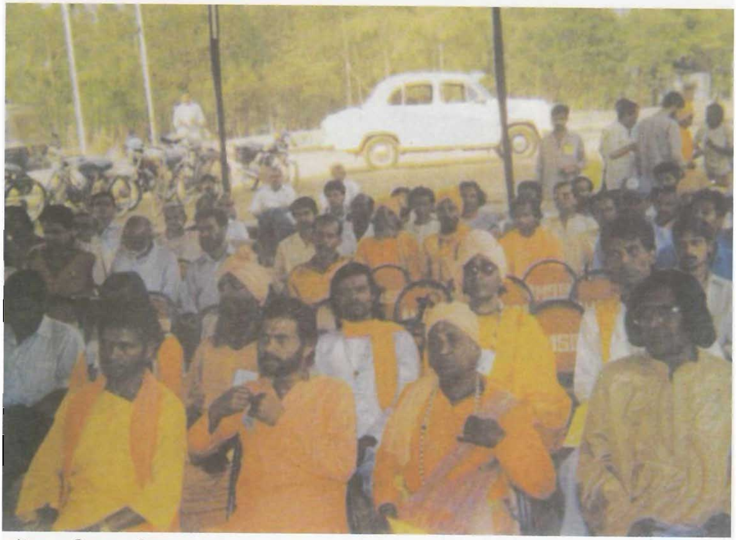

বাউলদের বিষয়ে সেমিনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরুণী শিক্ষার্থিনীদের মহড়া

হালিম ফকির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুবলদাস গৌর-খ্যাপার পাল্লাদারি

বাউল গানের শ্রোতৃসমাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাঁজার আসরে সিদ্ধগুরু

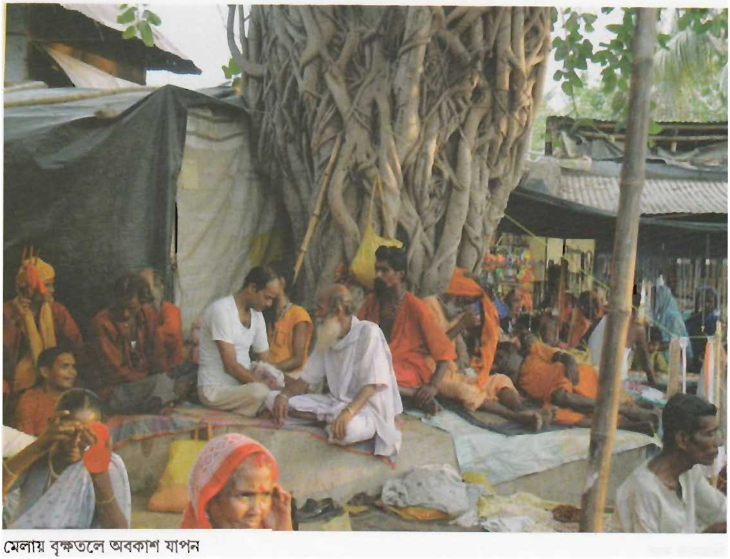
মেলায় বৃক্ষতলে অবকাশ যাপন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাকি কাজুমির গান

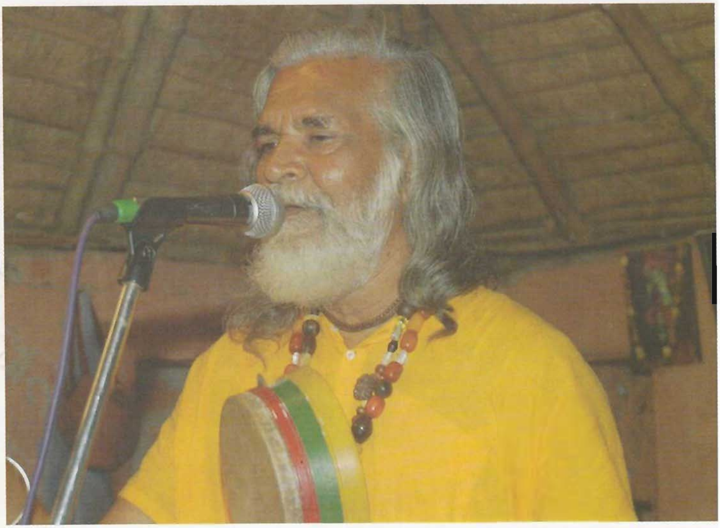

বিশ্বনাথ দাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাড়িতে নোট গাঁথা

মেলায় গানের আসর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্থল বাউলের ভজন কুটির

গরিব ফকিরের ডেরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাপ্তিফলের প্রতি আসক্তি থাকবে? এ হল ফকিরের সন্দিহান প্রশ্ন। একেবারে খাঁটি ফকিরিগান এবারে:

কেউ ছিল না বে-নমুনা
কুদরতে হয় তাহার আসন
বিম্বুরূপে ভাসিলেন আমার সাঁই নিরঞ্জন।
উঠিল একটা প্রেমধারা
তার উপরে বিম্বু খাড়া
আমি শুনতে পাইলাম আগাগোড়া।
ভাসিতে ভাসিতে বিম্বু তুফানের উপরে
ভাসিতে ভাসিতে লাগিল কুহুতরে
আল্লা নবী একাসনে যুক্তি করে মনে মনে
করিল রে জাহের বাতুন।

জাহের-বাতুনের উৎস কল্পনায় ভাবালুতাটুকু কী চমৎকার। এরপরের অংশ আরও মর্মগ্রাহী:

আগেকার বিম্বু বলিতেছিল লাইলাহা ইল্লাললাহ
পেছকার বিম্বু বলিতেছিল মহম্মদ রসুলুল্লাহ
দীনের নবীকে রাখো স্মরণ।

AMARBOI.COM

এইরকম ফকিরিগান কিংবা এর চেয়ে একটু উচ্চ ভাবের গান যাতে ভেদ (রহস্য)-য়ের কথা থাকে, তা বুঝতে গেলে ফকিরদের সঙ্গ করতে হয়। বাউল গানে খানিকটা সুবোধ্যতা থাকলেও ফকিরিগান বিচার বিশ্লেষণ সাপেক্ষ।

তাই ফকিরদের কথা ফকিরদের কাছ থেকে শোনাই ভাল। তাঁদের সঙ্গে মৌলানা মৌলবিদের কী নিয়ে এত ধুন্ধুমার সেটা জানতে চাইলে তাঁরা যা বলবেন, সকলে প্রায় একই কথা বলবেন, তা এইরকম। বাচনিক ভঙ্গিতে বললে দাঁড়ায় এইরকম যে,

> দেখুন, ফকিরি মত ইসলামের আগে থেকে ছিল। ধরুন, আল্লা যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করলেন সেই ইস্তক ফকিরি চলছে। তবে একটা হিসেবের ব্যাপার আছে। মোল্লা মৌলবিরা বলছেন, সাধারণ কোরানের হল তিরিশটা পারা, আর ফকিররা বলছেন চল্লিশটা। দশ পারার তফাৎ হচ্ছে। এই দশ পারা তো লিখিত নেই, সেটা রয়ে গেছে ফকিরদের কাছে বাতুন বা গোপন হয়ে। মুসলমানরা ঐ জাহির হওয়া তিরিশ পারা নিয়ে বাহ্য আচার আচরণে রয়েছেন। আমরা সেটা বর্জন করে গোপন দশপারা নিয়ে কাজ কারবার করি মুর্শিদের বায়েত হয়ে। এতেই ওঁদের যত রাগ।
>
> আবার দেখুন মূল কোরানে আছে নব্বই পারা। তার তিরিশ পারা আলেমদের, দশ পারা হল ফকিরদের, হল গিয়ে চল্লিশ পারা। বাকি পঞ্চাশ পারার মধ্যে বিশ আছে আরশে, বিশ আছে কুরশে, আর কবরস্থানে আছে দশ। এই হল সাকুল্যে নব্বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারা। এখন কথা হল নব্বই পারা কোরানের মধ্যে নব্বই হাজার কথা আছে। তার তিরিশ হাজার জাহির আর ষাট হাজার হল গিয়ে বাতুন। এবারে শুনুন গান কি বলছে। বলছে:

মারফতি বিচার কর বসিয়ে শরীয়তের কোলে—
ষাইট হাজার গোপনের কথা নিষেধ করেছে রসুলে।

ফকিরের এই বাচনিক ভাষ্য তথা কথকতার তোড়ে পাঠকরা ভেসে যাবেন, তাই মাঝখানে থেকে আমাদের দুয়েকটা কথা বলতে হবে। নইলে সব গুলিয়ে যেতে পারে। মনে রাখতে হবে, ইসলাম বিশ্বাসে বলা হচ্ছে আল্লার রসুল মহম্মদের সঙ্গে মেহরাজে (শূন্যের এক কল্পিত উচ্চস্তর) আল্লার কিছু গূঢ় কথা হয়েছিল। সেই গূঢ় কথার মধ্যে তিরিশ হাজার কথা প্রকাশ্য। বাকি ষাট হাজার কথা রসুল গোপন রেখেছিলেন। সেটাই নাকি ফকিররা পেয়ে গেছেন সিনায় সিনায়। এখানে আবার কূটকচালি কথা আছে একটা। লালন কূট প্রশ্ন তুলেছেন:

মেয়ারাজের কথা শুধাব কারে
আদমতন আর নিরূপ খোদা
নিরাকারে মিলে কী করে?

এখানে আদমতন মানে মানবদেহধারী মহম্মদ রসুল। তাঁর সঙ্গে নিরূপ নিরাকার খোদার দেখা বা মিলন কী করে হতে পারে? লালন অব্যক্ত ইঙ্গিতে বলতে চান আল্লা নিরাকার নন, তাঁকে দেখা যায়। এ তো ভয়ংকর ইসলামবিরোধী উচ্চারণ। কিন্তু লালনকে প্রতিহত করা কঠিন। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় হল:

খোদা প্রাপ্তি মূল সাধনা
রসুল বিনা কেউ জানে না।
জাহের বাতিন উপাসনা
রসুল দ্বারায় প্রকাশিলে।

লালন একেবারে মূল তত্ত্বটা বলে দিলেন এই চার পঙ্‌ক্তিতে। অর্থাৎ, কিবা মোল্লা মৌলবি, কিবা ফকির দরবেশ, খোদাপ্রাপ্তি হল সকলেরই মূল লক্ষ্য। সাধনা মারফত সেই প্রাপ্তির পথ রসুলই জানেন শুধু। সেই পথ দু'রকমের— জাহের আর বাতুন। রসুলের দ্বারাই সেই দুই পথ বাতলেছেন খোদ আল্লা।

কথাটা মেনে নিলে গোলমাল মিটে যায়। ফকিরদের এটা মানতে আপত্তি নেই, কারণ কথাটা তাদেরই, কিন্তু নৈষ্ঠিক মুসলমান এমন কথা মানবে কেন? তাঁদের মনের যে ক'টি অটল বিশ্বাস বা 'আকীদা' আছে তার মধ্যে একটাকে বলে 'ঈমানে মোফাছ্ছাল'। তাতে বলা হয়: আমি আল্লাকে, তাঁর ফেরেস্তাগণকে, তাঁর প্রেরিত যাবতীয় কিতাব, তাঁর প্রেরিত সমস্ত পয়গম্বরকে মান্য করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই আকিদা বা বিশ্বাসের খেলাপ করা চলে না কোনও ইমানদার মুসলিমের পক্ষে। তার নিজেরই তো বিশ্বাস যে আল্লার প্রেরিত কিতাব (অর্থাৎ কোরান) পবিত্র ও প্রশ্নাতীত ও মান্য। তবে সে কেতাবের বাইরে গোপন নির্দেশ মানবে কেন? দশ পারা বাতুনী নির্দেশের ষাট হাজার কথা তার পক্ষে বর্জনীয় শুধু নয়, অবিশ্বাস্য ও ধিক্কারযোগ্য। কিন্তু ফকিরদের জোর ওই জায়গাতেই। তাদের গানে বলা হচ্ছে:

নবীহজে মে'রাজে যেদিন যায়
সেদিন খোদার সাথে আশকেতে কত কথা হয়।
সেদিন নব্বই হাজার কালাম হল
খোদা তিনরকমের হুকুম দিন—
দলিলে প্রমাণ হল মিথ্যা কথা নয়।
কতেক ছিনায় কতক ছপিনায়
আবার কতেক গায়েব রয়।

এই পর্যন্ত পড়লে বোঝা যায় মেহরাজে নবির সঙ্গে খোদার কথাবার্তায় ফকিরদের সংশয় নেই। তবে তাদের ধারণা যে, খোদা সেদিন যে নব্বই হাজার কালাম দিয়েছিলেন তার তিনরকম বিলিব্যবস্থা হয়েছিল। যথা 'সিনা' বা হৃদয়ে হৃদয়ে সঞ্চারিত, 'সফিনা' বা গ্রন্থে নির্দেশিত এবং 'গায়েবি' বা অদৃশ্য উধাও। এবারে শোনা যাক হিসেব নিকেশ। সেটা হল:

পহেলা কালাম তিরিশ হাজার তুমি জারি করবে
উম্মতের পর—
করে খবরদারি হুঁশিয়ারি যেন বেতরিক না হয়।
আর তিরিশ হাজার বলি তবে তুমি ব্যক্তিবিশেষে জানাবে
ছিনার ভেদ না জানিলে মিথ্যা সাধন হয়।
আর তিরিশ হাজার বাকি রইল খোদা ফুরকানে তা রেখে দিল
ভেদাভেদ কেউ না পেল এহি দুনিয়ায়—
বাহার কইছে নাচার পীর পয়গম্বর তারাও ভেদ না পায়।

এই পদ বাহার ফকিরের রচনা— যাঁর ভাবনায় একটা নতুন কথা জানা গেল যে খোদার প্রথম তিরিশ হাজার কালাম প্রচারের জন্য নির্দিষ্ট। পরবর্তী তিরিশ হাজার ব্যক্তিবিশেষের মাধ্যমে বিকশিত হবে তবে হৃদয়ের গূঢ় গুপ্ত রহস্য না জানলে তার ব্যঞ্জনা ব্যর্থ হয়ে যাবে। শেষ তিরিশ হাজার বাণী খোদা স্বতন্ত্র করে রেখে দিয়েছেন বলে এই পৃথিবীর কেউ তার রহস্য ভেদ করতে পারেনি, এমনকী পির পয়গম্বররাও নয়।

এ ধরনের কথাবার্তা বা ধ্যানধারণা ফকিরদের সঙ্গে মিশলে নিয়তই জানা যায় এবং এ ব্যাপারে ফকিরে ফকিরে কিছু মতভেদও দেখেছি। তার কারণ যে যেমন মুর্শেদের কাছে দীক্ষিত সে তেমন ভাবনা ধারণা নিয়ে থাকে। তবে এটা দেখেছি যে, কোনও কোনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপলক্ষে যখন ফকিররা সমবেত হন কোথাও, তখন নানা বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা তর্কবিতর্ক হয়। সেই প্রসঙ্গে লাগসই গান গেয়ে থাকেন তাঁরা। কোরানের নানা আয়াত তাঁরা আওড়ান ও ব্যাখ্যা করেন কিন্তু সেই ভাষ্য শরিয়তি ভাষ্যের সঙ্গে নাও মিলতে পারে। তবে সব মিলিয়ে এটা বোঝা যায় যে ম্লান পোশাক আর অতি সাধারণ জাঁকজমকহীন জীবনযাপনের অন্তরালে ফকিরদের অন্তর্জীবন এতটাই উদ্দীপ্ত ও শান্ত যে বাইরের বাসনাময় আহ্বান তাঁদের টানে না।

তার মানে তাঁরা একটা অন্তরের সত্য পেয়ে গেছেন, একটা স্থির প্রত্যয়, যার জন্য তাঁদের মধ্যে অটল বিশ্বাসের বনিয়াদ গড়ে উঠেছে। বীরভূমের ফকিরডাঙা থেকে দায়েম শা-র যে ক'টি ফকিরি গান আমি সংগ্রহ করেছিলাম এখানে তার থেকে একটা উদ্ধৃত করছি ফকিরদের সেই দ্বিধাহীন বিশ্বাসের বনিয়াদটা স্পষ্ট করে বোঝাতে। এ ধরনের গানে বাউল গান রচনার দক্ষতা, অন্ত্যমিলের বয়ন ও ধ্বনিসাম্য ততটা নেই, কিন্তু বলার কথাটা স্বচ্ছ। যেমন:

ও তুমি দেল-হুজুর না চিনলে পরে
তোমার নামাজ হবে কী করে?
দেল-হুজুরে পড়ো নামাজ আপনার মোকাম চিনে।
ওরে ভুলে যাবি ইশ্‌কের জ্বালা
উঠবে নূর তাজেল্লা
খ্যাপা সামনে দেখবি আল্লাতালা
ঠিক রাখো দুনয়নে।

একেবারে অবিন্যস্ত রচনা। আঙ্গিক শিথিলতা আর মিলের চমৎকৃতিহীনতা রীতিমতো শোচনীয় কিন্তু এর মধ্যে জ্বলজ্বল করছে দায়েম শা-র বিশ্বাসের গভীর উচ্চারণ। 'দেল-হুজুর' শব্দটাই অভিনব, যার অর্থ আত্মস্থ সত্তার নির্দেশ। সেই নির্দেশে আপনার 'মোকাম' অর্থাৎ অবস্থান জেনে নিয়ে তবে নামাজ পড়তে হবে অবিরত। তাতেই সামনে বিভাসিত হবে শুভ্রজ্যোতি 'নূর' এবং প্রত্যক্ষ দেখা দেবেন আল্লাতালা। গানের পরবর্তী এক অন্তরা অংশে দায়েম বলেছেন আরও গুহ্য কথা। যেমন:

বে-আকারে সিজ্‌দা দিলে
খ্যাপা সেই সিজ্‌দা কি হয় দলিলে?
আকার ধরে দাওরে সিজ্‌দা
বসে থাকো এক ধ্যানে।

এখানে দ্বিধাহীন সাকার উপাসনার কথা রয়েছে। আল্লার সাকার রূপকেই 'সিজ্‌দা' বা প্রণতি দিতে হবে। বেআকারে সিজ্‌দা কায়েম হয় না। কিন্তু তার আগে, সবচেয়ে আগে, নিজের মোকাম ধরতে হবে। লালন তাঁর গানে বলেছিলেন: 'নিজ মোকাম ধরো বহু দূরে নাই'—নিজের মধ্যেই আছে আত্মোপলব্ধির পথ। শুধু বহির্বৃত্তি ত্যাগ করলেই সেই পথের দিশা মেলে। নিরাকার সাধনায় যে আল্লা পাওয়া যায় না সেকথা দায়েমের আগে লালন বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেছেন, তবে অনেক কবিত্বে উপমায় ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ করে। তাঁর গানের ব্যক্ততা:

নৌকা ঠিক নয় বিনা পারায়
নিরাকারে মন কি দাঁড়ায়?
লালন মিছে ঘুরে বেড়ায়
　　　অধর ধরতে চায় বর্জখ বিনে।

অসামান্য উচ্চারণ ও ভাবের বিন্যাস অথচ যুক্তির সমবায়ে। বলার কথা হল, নৌকা যদি ঘাটে বাঁধা থাকে তবে তার সার্থকতা কোথায়? পারাপারই তো তার কাজ, তার ধর্ম। সেই পারাপারে চাই মাঝি বা কান্ডারি। বেঁধে রাখা নৌকার মতো উদ্দেশ্যহীন হল নিরাকার সাধনা, তার সঙ্গে মনের যোগ থাকে না। অতএব দেহনৌকা বাইতে হবে সাকার মুর্শেদকে মাঝি করে। অধরাকে ধরার এই হল বাস্তব পদ্ধতি।

মুর্শেদকে ধরে কায়া সাধনাই ফকিরি-পন্থার সার কথা, আর সবই এ-মতে বহির্বৃত্তি বলে পরিত্যাজ্য। নসরুদ্দিন ফকিরের রচনায় বলা হচ্ছে:

মালা জপে পাঁচবেলা
কে কোথায় পেয়েছে আল্লা?
মক্কা ও মদিনা গেলে
কই তাহার ঠিকানা মিলে?
হাজীগণকে শুধাইলে
　　　সেথা হয় মানুষের মেলা।
যেয়ে দেখি জুম্মাখানা
তথায় গিয়ে খোঁজ পেলাম না
মানুষে খায় মানুষের খানা
　　　আল্লা খায় না একতোলা।

AMARBOI.COM

মালা জপের উপাসনা আর হজের নিরর্থকতা গানটির উপজীব্য। তাতে আল্লাকে পাওয়া যায় না। মক্কাফেরত হাজীদের কাছে জানা যায়, হজ মানে মানুষের মেলা, মানুষের জন্য মানুষের তৈরি খানাপিনার আয়োজন। তার একদানাও আল্লার ভোগে লাগে না। লালন অবশ্য মানব সমাগমের গভীরার্থ অন্যভাবে ভেবেছিলেন। তাঁর বচন: 'কাশী কিংবা মক্কায় যাওরে মন/দেখতে পাবে মানুষের বদন'। অর্থাৎ অলৌকিক ভাবসাধনা নয়, তীর্থব্রতের চেয়েও অনেক বড় মানবতন্ত্র— মানুষতত্ত্ব।

কিন্তু নসরুদ্দিনের যে-ফকিরি গান আমরা পড়ছিলাম, তার পরবর্তী অংশের কথা হল:

খোদার তৈয়ারি ঘরে
খুঁজলে পরে মিলতে পারে—
ঘর বানায়ে তার ভিতরে
　　　বসে আছে সেই মৌলা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফকিরদের কথা, মানুষের তৈরি মক্কার কাবা-ঘরে তাঁকে পাওয়া যায় না। তাঁর তৈরি যে মানবদেহ তার গভীর অভ্যন্তরে নিজের ঘরটি বানিয়ে তাতে বসে আছেন স্রষ্টা। এখানে স্রষ্টা অর্থে সৃষ্টিবিন্দু— বীর্য। হজরত আলী নামে এক অজানা ফকিরের গানে চকিত এক পঙ্‌ক্তি পেয়েছিলাম: 'দেহতে মক্কা গোপন সব জানাজানি।' হঠাৎ শুনে স্ববিরোধী মনে হয় কিন্তু ঠিকই তো এই সত্য যে, দেহ-মক্কা এক অর্থে গোপন, আরেক বিচারে জানা। ফকিরদের রহস্যময় কল্পনা স্রষ্টা আল্লা আর সৃষ্ট আদমের দেহ নিয়ে কত রঙ্গ, কত বস্তুবিবরণ বানায়। যেমন মজিদ নামে ফকিরের গানে পাই:

আদমের কালেবের মাঝে
পাক এলাহির বারামখানা।
দেহের পিঞ্জরের মাঝে
কী আজব কারখানা।

মানুষের দেহের মধ্যে পবিত্র আল্লার নিবাস। সেই দেহকে জানলে চিনলে, সেই দেহকে সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারলে আরও কত অগোচর রহস্য জানা যায়। জানা যায় এমনতর বিচিত্র সংবাদ যে,

নাভীর মধ্যে মক্কা শরীফে
কইরাছে ঠিকানা—
নাভীর উপর বয়তুল মকাদ্দাম
কালিজাতে খানা—
দেলের ভিতর রাখিয়াছে
সোনার মদিনা।

AMARBOI.COM

তবে তো দেহ-তীর্থ ভ্রমণ সর্বতীর্থসার। এ ধরনের কথা ও কল্পনা গড়পড়তা ভাবনায় পাওয়া সম্ভব নয়। ইসলামি ধর্ম বিশ্বাস আর আকিদার অন্য পিঠে এই কল্পজগৎ। যেমন মধুর কল্পনায় চিত্তগ্রাহী তেমনই রহস্যসুন্দর। বাহার ফকিরের ছোট একটি মারফতি গানে জগতের অন্তর্গোপন কত সংবাদ পর্যুষিত হয়ে আছে, যখন পড়ি,

যেভাবে সাঁই-এ মিশে রয় খোদা
ছিনায় ছিনায় ঘুরে বেড়ায় ছপিনায় জুদা।

গোড়াতেই বলে দেওয়া হল, ফকিরদের মৌল প্রতীতি যে, সত্য পেতে হবে হৃদয় দিয়ে, সফিনা বা শাস্ত্রগ্রন্থের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক বিরোধী ও ব্যবধান রচনাকারী। একমাত্র হৃদয় সংযোগে বোঝা যায় সাঁইয়ের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে নিহিত হয়ে আছেন খোদা। যেমন দুধের মধ্যে ননী, ননীর মধ্যে ঘৃত। পরপর সাংসারিক বাস্তবের হাতে হাতে করা অভিজ্ঞতা উঠে আসছে— ভাবনার কোনও ধূসরতা নেই। বাহার এই ইঙ্গিতটুকু দিয়েই ক্ষান্ত হন না। মরমি শ্রোতাদের তুলনার ছটায় ভরিয়ে দিয়ে বলে যান:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসমানে সূর্যদেব আছে
তার জ্যোতি লাগে কাছে
হায়রে তেমনি ভাবে আল্লা
মানুষে সর্বদা।

যাকে ভাবছি সুদূরের সামগ্রী, অধরা ও অপ্রাপণীয়— তার তাপ যেমন দেহলগ্ন হয়ে যায়, ঠিক তেমনই করে আল্লা সুদূর তবু মানুষের সঙ্গে উষ্ণ সাহচর্যে অস্তিত্ববান। তাকিয়ে দেখলে চোখে কি পড়ে না এই সত্য যে,

মিশে রয় গাছে বীজে
হায়রে ফুলে মিশে বাস রয়েছে
ফলে মিশে সুধা।

যুক্তির ক্রম ক্রমশ অনুভবের গভীরে যাচ্ছে— দৃশ্য থেকে ভাবে। আমরা বুঝে নিই গাছে যেমন বীজ থাকে গোপন হয়ে, কিংবা বীজেরই অভীপ্সা গাছ, তেমনই অচ্ছেদ্য ফুল আর তার সৌগন্ধ্য, ফলের অন্তঃশায়ী মাধুর্যের স্বাদ। এর পরের কথাটা অনুক্ত কিন্তু প্রকাশ্য— অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে খোদা, সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টা। তাঁকে কেন তবে খুঁজব মন্দিরে-মসজিদে, শাস্ত্রে, শাস্ত্রী-মোল্লায়, কাশী-মক্কায় কিংবা রোজা-উপবাসে? ফকিরিয়ানার শেষ কথা হল গোপনীয়তা। জাহির নয় বাতুন। তাকে তালাশ করতে হবে অতলতার গোপনে। কারণ—

গোপন রয়েছে খোদা তাঁকে চিনিনি।
কাম গোপন প্রেম গোপন লীলা নিত্য সবই গোপন
আরসে আল্লা গোপন নীরের নিশানী।
জলেতে মীন গোপন ঝিনুকে মুক্তা গোপন
ফুলেতে গন্ধ গোপন আপে রব্বানী।
আদমে আহাদ গোপন মীমেতে নূর গোপন
কোরানে কলমা গোপন আপে গোপনী।
নামাজে মারুফত গোপন ষাট হাজার কলমা গোপন...

গভীর চলাকে গোপন রেখে ফকিররা রয়ে গেছেন যুগে যুগে তাঁদের অচলপ্রতিষ্ঠ বিশ্বাসে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফকিরদের সঙ্গে দ্বিরালাপ

বাউলদের ব্যক্তিগত জীবনের কথা এতদিনে আমরা ইতস্তত কিছু কিছু লেখায় জানতে পারছি। বাউলরা তাঁদের জীবনের বলয় থেকে এখন অনেকটা বেরিয়ে আসছেন। রহস্যের ঘেরাটোপ কিংবা গুরুর নিষেধ ছিন্ন করার প্রবণতা তাঁদের এসেছে এই জন্য যে, প্রচারমাধ্যম তাঁদের আমজনতার মুখোমুখি করে দিচ্ছে। দেশে, বিশেষত বিদেশে তাঁদের গান গাইতে হচ্ছে, মেলা মচ্ছবে সাংবাদিক ও সংগীতানুরাগী ব্যক্তিরা তাঁদের বহুরকম প্রশ্ন করছেন। পত্র-পত্রিকায় তাঁদের ইন্টারভিউ এখন দুর্লভ নয়। তাঁদের নিজেদের গুহ্য সাধন কথা বাইরে বলা নিষিদ্ধ কিন্তু ব্যক্তিজীবনের খুঁটিনাটি অভিজ্ঞতা, গানের স্বীকৃতি, উপেক্ষা বা সমাদর, দারিদ্র্য ও অত্যাচারের বিবরণ দেওয়ার কোনও নিষেধ নেই। তাঁদের সম্পর্কে বেশ কিছু উলটোপালটা মন্তব্য নিন্দা কিংবা ভুল তথ্য তাঁদের বিচলিত করে। তাই কেউ কেউ আজকাল তাঁদের বক্তব্য জানাতে এগিয়ে আসছেন। সনাতনদাস বাউল তো দু'খানা চটি বই লিখে বসেছেন। পূর্ণদাসও বেশ মুখর ব্যক্তিত্ব। বহু ধরনের সমাবেশ হয় আজকাল, সেমিনার ধরনের, তাতে বাউলদের মঞ্চে ডাকা হয় নিজেদের সুখদুঃখ, হতাশা, বেদনা কিংবা অভাব অভিযোগ চাহিদার কথা জানাতে। তাঁরা সেসব ব্যক্ত করতে শুরু করেছেন।

কিন্তু ফকিরদের কথা আমরা এখনও বিস্তারে জানতে চাইনি। তাঁরা তো স্বভাবকুণ্ঠ এবং সংখ্যালঘু। দীন ভিখারির মতো দরিদ্র জীবনযাপনের ব্রত নিয়েছেন স্বেচ্ছায়। কিন্তু তাঁদের নীরবতাও অনেকটা বাঙ্ময়। এখানে দু'জন ফকিরের আত্মবিবৃতি প্রকাশ করা হচ্ছে তাঁদের মুখের জবানিতে। সেই সঙ্গে থাকছে আমার মন্তব্য বা টিপ্পনী।

গোলাম শাহ্-র কথা—১

আমার নাম গোলাম শাহ। পিতার নাম জানেব শাহ। মাতা রফিয়া। যেখানে থাকি সেই পাড়াটার নাম ঘুড়িষা-ইসাপুর। ফকিরপাড়াও বলে। ইসাপুর-ফকিরপাড়া। বাংলা ১৩৫০ সনে ভাদ্রমাসে আমার জন্ম। এখানে প্রায় কুড়ি বছর বাস করছি। আগে লাভপুর থানার শাসপুরে থাকতাম। আমার ওটা জন্মস্থান। চারপুরুষ ওখানে আমাদের বাস। বিয়ে হবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর থেকে আমি এখানে বাস করছি। এখানে আমার শ্বশুরবাড়ি। শ্বশুরবাড়ি বলেই ঘুড়িষায় বাস করছি— এ ছাড়া অন্য কোনও কারণ নাই। আমাদের শাহ বংশ— বংশ পরম্পরায় ফকির। আমি বংশগত ফকির নিজের ইচ্ছাতেই ফকিরি পথে এসেছি। ফকির মহম্মদ শাহকে (কেষ্টপুর, বর্ধমান) গুরু ধরে উনার কাছ থেকে কিছু তত্ত্ব জ্ঞান নিয়েছি। তখন আমার বয়স চোদ্দো-পনেরো বছর। তখন থেকে আমি গানবাজনা করছি। বাচ্চা বয়সে বারো বছর বাংলাদেশে কেটেছে। বাংলাদেশে খয়রা গ্রামে আমার মামার বাড়ি। যখন থেকে ফকির হলাম— তখন থেকেই ফকিরিটাই আমরা সাধনা। এ ছাড়া আমি আর কিছু করি না। গান-বাজনা করি— প্রতিমাসে আমার কুড়ি থেকে পঁচিশটা প্রোগ্রাম হয়। প্রায় জেলাতেই প্রোগ্রাম করি।

আমার মন্তব্য

গোলাম শাহ ফকির এখন বছর সাতান্নর একজন মানুষ। শরীর স্বাস্থ্য মজবুত, নইলে বিভিন্ন জেলায় ঘুরে ঘুরে মাসে কুড়ি পঁচিশটা অনুষ্ঠান করা সম্ভব হত না। জন্মসূত্রে ফকির তিনি এবং বাঙালি। চারপুরুষের হিসেব ধরলে শ' দেড়েক বছরের উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হয়। বর্ধমানে গিয়ে ফকিরি মতে দীক্ষা নিয়েছেন, কিছু তত্ত্বজ্ঞানও অর্জন করেছেন কমবয়সে কিন্তু সাধক ফকির নন— প্রধানত গায়ক। সেটাই জীবিকা। চোদ্দো-পনেরো বছর থেকে স্বেচ্ছায় এ পথে রয়েছেন। ঠিক অনিকেত মানুষ নন। বাস্তুবাড়ি-মামার বাড়ি-শ্বশুরবাড়ি ঘিরে বেশ তৃপ্ত মানুষ।

AMARBOI.COM

গোলাম শাহ-র কথা—২

আমার তিন ছেলে, চার মেয়ে। দুই ছেলে গান করে, অন্যরা ঘরেই থাকে। ছেলে তিনটি বড়। বাকিরা ছোট। আমার স্ত্রীও বায়েদ। মহম্মদ শাহের ছেলে সাদব শাহের কাছে বায়েদ হয়েছেন। আমার ছেলেরাও সাদব শাহের কাছে বায়েদ হয়েছে। আমার স্ত্রী আমার সাধনসঙ্গিনী।

আমাদের বিয়েতে ফকিরের ঘর থেকে মেয়ে আনতে হবে, মেয়েও দিতে হবে ফকিরের ঘরে। এখন অবশ্য অন্য ঘরেও বিয়ে হচ্ছে। কিন্তু হওয়াটা ঠিক নয়। আমাদের মধ্যে এখনও এমন হয়নি।

আমার বিয়ে দুটি। দুই স্ত্রীই এখানে থাকেন। পরিবার-পরিকল্পনা বা জন্মনিয়ন্ত্রণ— এগুলো আমাদের নাই। আমরা মেনেও চলি না। ওই পরিবার পরিকল্পনা— এটা গুরুর কাছে আছে। ওই জিনিস যদি গুরুর কাছে জানা যায়— তা হলে আপনা-আপনি বন্ধ করে দেওয়া যায়। গুরুর কাছে চাইলে তিনি এটা কর্মের মাধ্যমে দেবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মন্তব্য

ফকিরদের পরিবার বেশির ভাগ অতিপ্রজ, এটাই দেখেছি। তাঁদের সীমাহীন দারিদ্র্য-দুর্গতির সেটাই কারণ। কিন্তু সেজন্যে তাঁদের খুব একটা গ্লানি বা দুঃখ দেখিনি। গোলাম শাহ্-র স্ত্রীও ফকিরিতন্ত্রে মন্ত্র দীক্ষা ও ক্রিয়াকরণের অংশী। দুই সন্তানেরও ফকিরি দীক্ষা হয়েছে। কায়াসাধনে গোলাম ফকির দাম্পত্য বৃত্তের মধ্যে সুখী। হয়তো বীরভূমে ফকিরদের সঙ্গে সাধারণ মুসলমানদের বিয়ে শাদি তাঁর দেখার অভিজ্ঞতা নেই। অন্য জেলাতেও এমন বিয়ে ভালই চালু আছে। তবে নদে-মুর্শিদাবাদের অনেক ফকির বেশ ভাল গৃহস্থ, জমিজিরেত আছে। পরিবার পরিকল্পনা বা জন্মনিয়ন্ত্রণে এখন সচেতনতা আমি লক্ষ করেছি। গোলাম শাহ্-র গুরুনির্ভরতা খুব বেশি। অন্যত্র এতটা দেখিনি।

গোলাম শাহ্-র কথা—৩

আমি ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়েছি। তারপর আর পড়াশোনা করিনি— গান-বাজনাতে গেলাম। ...ছেলেমেয়েরা পড়ে— তারা ইস্কুলে যাচ্ছে। এই বর্তমান পড়াশোনা, এই সমাজব্যবস্থা— এ তো মানতেই হবে। এই পড়াশোনা ভাল— খারাপ বলা যায় না। এই শিক্ষা বহিরঙ্গ, যেটা পির-মুর্শিদের শিক্ষা— সেটা অন্তরঙ্গ।

সম্পত্তি আমার কিছুই ছিল না— এখনও কিছুই নাই। ভিটে নাই, জমিজমাও নাই। আমার গানটাই হল আসল। গান থেকেই আমার আয়।

সরকারি সাহায্য আমি কিছু পাইনি। তবে যখন সরকারি প্রোগ্রাম করি তখন আমাকে টাকাপয়সা দেয়। সরকারের কাছ থেকে বছরে তিন-চারটে ডাক পাই। তখন টাকা-পয়সা ভালই পাই। এ বিষয়ে সরকারের বিরুদ্ধে কোনও ক্ষোভ নাই।

AMARBOI.COM

আমার মন্তব্য

বাউল ফকিরদের লেখাপড়ার দিকটি সারা বাংলাতেই বেশ দুর্বল। তবে লক্ষ করেছি সকলেই প্রায় সাক্ষর। গোলাম শাহ লেখাপড়াকে বহিরঙ্গ ভেবে মুর্শিদের শিক্ষাধারাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন সেটি তাঁর পক্ষে সংগত। জমিজমা নেই তার জন্যে খেদও নেই। যথার্থ ফকিরি দৃষ্টিকোণ এটা। সরকারি অনুষ্ঠানে ডাক পান অর্থ পান, তাতেই তুষ্ট। ফকিররা স্বভাবত স্বল্পে তুষ্ট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলাম শাহ্-র কথা—৪

আমার জীবিকা বলতে গান। আমি মাধুকরী করি না। আমার জীবনের প্রথম শেখা গান লালন শাহ্ ফকিরের গান। লালন শাহ্ ফকিরের গান শিখি একজন বাংলাদেশের লোকের কাছে। তার নাম হারেম শাহ্। তারপর মহম্মদ শাহের কাছে দীক্ষা নিই— মহম্মদ শাহের কাছে কিছু গান শিখি। তারপর আমি বিভিন্ন গান শিখেছি। বিভিন্ন গান গাই। মানুষ-তত্ত্বের গান গাইতে আমার ভাল লাগে। আমার সবচেয়ে প্রিয় গান, যেটা বারবার গাইতে ইচ্ছে করে, সেটা হল—

মানুষ মানুষ বলে সবে মানুষ বড় মানুষ তবে
মনের মানুষ আছে খামুস হৃদয় মাঝে গোপনভাবে।

যন্ত্র বলতে— গানের সঙ্গে আমার নাল বাজে, বেহালা বাজে। ডুবকি খঞ্জনি বাজে। চিমটেও ব্যবহার করি। জীবনে প্রথমে ছিল দোতারা। যন্ত্রসংগীতে আমার একজন ওস্তাদ ছিলেন— তিনি আমাকে বেহালা বাজাতে শিখিয়েছিলেন। তার নাম মহম্মদ শাহ্। শাসপুরের কাছে মীরবান গ্রামে বাড়ি।

আমার মন্তব্য

AMARBOI.COM

গোলাম শাহ্ প্রধানত গায়ক। সে বিষয়ে তাঁর অনুরাগ ও অনুশীলন প্রগাঢ়। লক্ষণীয় যে লালনগীতি তিনি বাংলাদেশ-সূত্রে শিখেছেন, কারণ আঞ্চলিকভাবে বীরভূমে ওই গানের বেশি চল নেই। এটাও দেখবার যে, গোলাম ফকির নিজে ফকিরিপন্থায় থাকলেও শুধু ফকিরি গান করেন না। অন্য গানও করেন— এন্টারটেনার। তাঁর প্রিয় গানটি বিশুদ্ধ ফকিরি গান নয়। ফকিরি গানের অনুষঙ্গে যেসব যন্ত্রবাদ্যের কথা তিনি বলেছেন তার মধ্যে নাল ও চিমটে ব্যবহার খুব টিপিকাল— ফকিরদের পক্ষে। তবে গোলাম শাহ্ ও তাঁর সন্তানদের গানের সঙ্গে বেহালাবাদন একটা ঘরানার মতো। গানের ব্যাপারে তিনি খুব সতর্ক ও সচেতন, যন্ত্র শিখেছেন ভালভাবে। তাঁর গানের গুরু ও ধর্মগুরু একজন, যন্ত্রবাদ্যের গুরু আরেকজন।

গোলাম শাহ্-র কথা—৫

ফকির-বাউলরা মাথায় চুল রাখেন— এঁরা চুলটা কোনওমতে কাটতে চান না। আমি চুল কেটে ছোট করে দিই। তেল-টেলের বহুরকম অসুবিধা হয়— তাই কেটে দিই। কিন্তু কাটাটা নিয়ম নয়— রাখাটাই নিয়ম। চুল রাখাটা ধর্মের অঙ্গ বলা যায় না। কারণ ধর্ম জিনিসটা আলাদা। ধর্ম চুলে দাড়িতে টুপিতে নাই। লোকে জানে— ফকির-বাউল এরা উদাসী, এদের চুল-দাড়ি এসব থাকে। ফকির-বাউলেরা অত লক্ষ করেন না, চুল-দাড়ি বাড়ছে বাড়ুক— থাকছে থাকুক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোশাকের ব্যাপারে ফকিররা কেউ পরেন ধুতি-পাঞ্জাবি, কেউ লুঙ্গি, কেউ আবার বিভিন্নরকম কামিজ জামা শার্ট পরেন। পোশাকে রংও থাকে। মাথায় কেউ পাড় বাঁধে, কেউ আবার টুপিও লাগায়। আমি ধুতি পাঞ্জাবি পরি। খাওয়া-দাওয়া কন্ট্রোল হল আলাদা জিনিস— সেটা সাধক-মানুষ করতে পারেন। আমরা সামান্য মানুষ— আমি করতে পারব না।

ফকির-বাউলদের যে বিন্দু-সাধনা আছে— সে সাধনা আমার নাই। সে সাধনা করতে হলে গুরুর কাছে জানতে হবে— সেই কর্মটা জানলে পরে তবে করা যাবে।

আমার মন্তব্য

গোলাম শাহ উদারপন্থী বিবেচক মানুষ। ধর্ম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা আছে বলে গোঁড়ামি নেই। সর্বকেশ রক্ষা ব্যাপারটি প্রথাহিসাবে মানতে রাজি নন। 'ধর্ম চুল দাড়িতে টুপিতে নাই' চমৎকার উপলব্ধি। বাস্তববাদী মানুষ, তেল টেলের খরচ বেশি, তাই চুল কাটেন। জাঁকালো পোশাক না পরে স্রেফ ধুতি পাঞ্জাবি। খেতে ভালবাসেন। সাধক তো নন, অতএব তাতে নিয়ন্ত্রণের দায় নেই। বিন্দু-সাধনার দীক্ষা নেননি— সম্ভবত আগ্রহও নেই। মানুষটি অকপট।

গোলাম শাহ-র কথা—৬

AMARBOI.COM

ফকিরি সাধনার গুরুত্ব কথা হল— তারা আল্লাকে পাওয়ার জন্য সাধনা করে। একমাত্র আল্লা-ওলীর পথটাকে তারা ধরে রাখে। এই সাধনায় দমের কাজ আছে, দমের নামাজ আছে, দমের জিকির আছে। আমার সাধনায় দমের জিকির আছে। জিকিরটা সবসময় হবে না। আসনে বসে সেটা করতে হবে।

ফকিরি সাধনার মূল তত্ত্ব হল— ঈশ্বরপ্রাপ্তি আর মানুষকে ভালবাসা। এ ছাড়া আর কিছু সাধনা নাই। মানুষকে ভালবাসতে হবে আর ঈশ্বরের জপতপ, আল্লার জপতপ করতে হবে। এজন্য কিছু ক্রিয়াকরণ আছে। যেমন— এবম্, গাম, গিল— এগুলো চিনতে হবে গুরুর কাছে। তারপর মুশাহারা, মুরাকাবা— এসব গুরু দেখিয়ে দেবে। তখন আসন করে ওই মূল তত্ত্বটাকে কায়েম করতে হবে। এগুলো সব দমের কাজ— দম ছাড়া তো হবে না। আসনের মাধ্যমে দমের কাজ হবে, তার মাধ্যমে জিকির। আইনাল জিকির, হককেল জিকির, এলমি জিকির— এমন বিভিন্ন জিকিরের নাম আছে।

আমাদের ফকিরি মতে মানুষ যে-রূপ সেইরূপে ঈশ্বরকে দেখতে পাওয়া যায়। মানুষের রূপে। ঈশ্বরকে কেউ বলছে নিরাকার, আবার কেউ বলছে আকার। ফকিররা বলছে— আকার। আকার না থাকলে তো জীব সৃষ্টি হত না। গাছের সঙ্গে গাছই গেছে, মানুষের সঙ্গে মানুষ গেছে, পানির সঙ্গে পানি। এই ঈশ্বর, যাকে আল্লা বলছি— তিনি সমস্ত বিশ্বের মধ্যে মিশে আছেন।

ফকিররা মানুষের ভজন-সাধনটা বেশি করে— কেননা মানুষ হল মূল্যবান জিনিস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের কাছে সব কিছু আছে। কেউ যদি ঈশ্বরকে পায় তো মানুষই পাবে। তাই নিজেকে চিনলে আল্লাকে চেনা যাবে— নিজেকে না-চিনলে মক্কা মদিনা কাশী বৃন্দাবন গয়া করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না। ...তাই মানুষের সন্ধান হলে পরে আল্লার সন্ধান পাওয়া যায়— আর নিত্য নিজের মধ্যে আল্লাকে পাওয়া যায়। এর জন্য মুর্শিদ ধরতে হবে— মুর্শিদ ছাড়া হবে না।

আমার মন্তব্য

গোলাম শাহ্ ফকিরিতত্ত্ব সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখেন এবং তিনি আচরণবাদী। সেই আচরণ আয়ত্ত করেছেন মুর্শিদ ধরে। তার ক্রিয়াকরণকে বলেছেন দমের জিকির— অর্থাৎ শ্বাসনিয়ন্ত্রণের এক বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে ঈশ্বরের ধ্যান। সে সম্পর্কে তাঁর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দুটি জ্ঞানই আছে। তিনি ভাববাদী নন— সাকার আল্লার রূপ বিষয়ে সচেতন ও বিশ্বাসী। 'আকার না থাকলে জীবসৃষ্টি হত না' এমন মন্তব্য সচরাচর শোনা যায় না। তবে আল্লাকে পেতে হবে মানুষের রূপে এটা ফকিরদের সার কথা। তীর্থ করলে আল্লা মেলে না, তাঁকে পেতে হবে মানুষের মধ্যে এ ধরনের কথা প্রচুর শোনা যায়— গোলাম তা আরও একবার আউড়েছেন মাত্র। সাধক হিসাবে তাঁর ভাবনার তেমন কোনও মৌলিকতা চোখে পড়ে না।

AMARBOI.COM

গোলাম শাহ্-র কথা—৭

মানুষ কোনটা? হাত-পা-চোখ-নাক-কান থাকলেই কি মানুষ? আমরা কি মানুষ? না। মানুষ আলাদা। মানুষের কর্মক্ষেত্রে মানুষকে চেনা যায়। ইসলাম শাস্ত্রে বলে— বিবেক-বুদ্ধি-বিচার, এই তিনটে যে অন্তরে রাখতে পারে সে মানুষ।

নবির মধ্যে মারফতিটাও ছিল। শরিয়ত আর মারফতে তফাত একটাই— অন্য কিছু নয়। শরিয়তে দেখার ও বাহ্যিক, আর মারফতে গোপন। নামাজ দমে পড়তে হয়, জিকির করতে হয়— এগুলো মারফতের কাজ। দমের সাধনা না করলে আল্লাকে পাওয়া যাবে না।

ফকিরি সাধনার পথে বহু লোকে বাধা দেবে। ভাল কাজে তো বাধা আছেই। আমিও বাইরে থেকে বাধা পেয়েছি, পরিবার থেকে বাধা পেয়েছি। যখন জানত না, তখন আমার পরিবারও বাধা দিয়েছে। যখন জানতে পারল যে এই পথ খারাপ নয়— তারপর আর কোনও বাধা নাই।

গোঁড়া মুসলমান বা মৌলবিরা এসব জিনিসের কিছু জানে না। তারা নিজেকে বড় ভাবে— যে আমার উপর আর কেউ নাই। ...ভাবে— এরা কিছুই না, কিছু জানে না, ব্যোমভোলার মতো ঘুরে বেড়ায়, চিমটে বাজায় আর গাঁজা খায়। এদের কী দাম আছে? কে কি জানে সে সম্পর্কে লালন ফকির বলেছেন:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুতর্ক কুস্বভাবী তাদের ঘরে নেয় না নবী
ভেদের ঘরে মেরে চাবি শরার মতে চালায়।

যারা নবির কাছে কুতর্ক, সুস্বভাব নিয়ে গেছে, নবি তাদের বলেছেন— তুমিই বড় জানলেওয়ালা বাবা, তুমি মক্তব-মাদ্রাসায় চলে যাও। আর যারা নতি স্বীকার করেছে, তাদের তিনি ভেদ খুলে দিয়েছেন। যাও বাবা, তুমি মাল নিয়ে যাও। ...তবে ফকিররা মৌলানা-মৌলবিদের আসল কথাটাকে স্বীকার করে না। ওরা যেমন ফকিরদের পছন্দ করে না, তেমনি ফকিররাও বলে— ওরা কিছু জানে না, ওদের কাছে কিছু নাই। তবে ওরা কিছু না জানলেও ওদের পছন্দ করতে হয়; কেননা ওদের ক্ষমতা বেশি, দল বেশি।

আমার মন্তব্য

এতক্ষণে গোলাম শাহ মূল কথায় এসে পড়লেন। ফকিরদের পথ আর গোঁড়া মুসলমানদের পথ একেবারে আলাদা। মুসলমানদের কুতার্কিক বা কুস্বভাবী বলাটা হয়তো কিছুটা প্রান্তীয় মন্তব্য। তবে ভেদের (রহস্যের) ঘরে চাবি মেরে নবি তাঁদের শরিয়তি মতের বাহ্য করণকারণে পরিচালিত করেন আর আত্মসমর্পিত শান্ত ফকিরদের তিনি বুঝিয়ে দেন মূল রহস্যের জ্ঞান (মারেফত) এই তত্ত্ব বহুদিনের বিশ্বাসী ফকিরি তত্ত্ব। বলতে গেলে এটাই তাঁদের দাঁড়াবার জায়গা। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষমতা বেশি, দল বেশি বলে, ফকিররা তাদের বাধ্য হয়ে পছন্দ করে এ হল নির্মম সামাজিক সত্য। কারণ ফকিরদের মুসলমান মহল্লায় বসবাস করতে হয়। তাদের রীতিমতো বহু সময় অন্তত লোকদেখানো ভাবে পালন করতে হয়।

কিন্তু গোলাম শাহ-র একটা মন্তব্যে খটকা লাগে। তিনি জন্মসূত্রে ফকির এবং ফকির পরিবারেই বিয়ে করেছেন, তা হলে ফকিরি সাধনায় বাধা আসবে কেন? বাইরের বাধা হতেই পারে কিন্তু আত্মজনরা এমনকী স্ত্রী কেন প্রথমে বাধা দিয়েছিলেন?

গোলাম শাহ-র কথা—৮

আমাদের ওপর কোনও অত্যাচার হয়নি। এ ধরনের অত্যাচার হলে প্রতিবাদ কী করব? এতো সহ্যের রাস্তা। হজরত মহম্মদকেও অনেকে ঢিল মেরেছে, ফকিরদেরও যদি কেউ মারে, ঢিল ছোড়ে— সহ্য করতেই হবে।

ফকির হয়েছি বলে আমার মনে কোনও আপশোস নাই। কোনও প্রতিবন্ধকতাও নাই। প্রতিবন্ধকতা করতে হলে আমাদের বোঝাতে হবে। আমরা জোর গলায় বলি— যদি পারো আমাদের বোঝাও, না হলে আমাদের কাছে তুমি বোঝো।

আমার টাকাপয়সা নাই, সম্পত্তি নাই— আর আমি এসব চাইও না। ওসব পেতে আমার কখনও মন হয় না— অন্য কারও হয় কিনা জানি না। আমি যা আছি খুবই ভাল আছি— ওসব সম্পত্তিঅলা লোকেদের থেকেও ভাল আছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলাম শাহ ফকিরের আত্মতুষ্টি বেশ তারিফ করার মতো। টাকাপয়সা সম্পত্তি তিনি চান না, এমন মনোভাব সংসারী মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক নয়— তার মানে তিনি মনেপ্রাণে ফকির। এ প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে বাউলদের কথা মনে আসে। তাদের মধ্যে ঘুরে দেখেছি, অন্তত এখনকার বয়স্ক বাউলদের মধ্যেও খুব অতৃপ্তি, খুব প্রতিষ্ঠাকামিতা, খুব প্রচারপ্রবণতা। দুয়েকজন ব্যতিক্রম। এই বহিরঙ্গ জগতের প্রতি সাম্প্রতিক আকর্ষণ বহুরকম সুযোগ সুবিধার সূত্রে তৈরি হচ্ছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘটনা হল শহরে বাউলদের গানের সমাদর ও ব্যাপক চাহিদা। প্রচার-মাধ্যম খুব তৎপর বাউলদের তুলে ধরতে। ফকিরদের ক্ষেত্রে এমন ঘটেনি, তাই তাঁদের মধ্যে এখনও সহজ সরল জীবনবোধ অবিচল আছে।

গোলাম শাহ মানুষটি আসলে গান পাগল এবং মধ্যপন্থী স্বভাবের। উচ্চাশা যেমন নেই তেমনই কোনও বিরোধী ভূমিকাতেও যেতে রাজি নন। কখনও তাঁর বা তাঁর চেনাজানা বীরভূমের ফকিরদের ওপর অত্যাচার হয়নি বলে প্রতিবন্ধকতার আসল চেহারা তাঁর দেখা নেই। সেটা নিয়ত দেখছেন গত দু'-তিন দশক ধরে নদিয়া-মুর্শিদাবাদের ফকিররা। সামাজিক বয়কট, শারীরিক নিগ্রহ এবং ধর্মীয় উৎপীড়ন তাঁদের মরিয়া করে তুলেছে। তাঁরা সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছেন। মহম্মদকে ঢিল ছুড়েছিল তিনি সয়েছিলেন, তাই এখন যদি কেউ ফকিরকে মারে তবে সইতে হবে— গোলাম শাহ-র এই সহনশীলতা এখনকার দিনে অচল। আসলে বীরভূমের ফকিররা পরস্পর বিচ্ছিন্ন, দরিদ্র ও অলস প্রকৃতির। অনেক সন্তানসন্ততি আর দুই পত্নী নিয়ে ভিটেমাটিহীন চাহিদাহীন এমন ফকির আমাদের সমাজের একটা স্ববিরোধ আর বৈপরীত্যের চেহারা ফুটিয়ে তুলছেন নিজের অজান্তে। হেমাঙ্গ বিশ্বাস লক্ষ করেছিলেন, লোকায়ত বাউল মতবাদে বিভিন্ন পশ্চাদমুখী ধর্মীয় মিশ্রণ। তার ফলে বাউল ফকিররা শ্রমজগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আত্মকেন্দ্রিক দর্শনের মধ্যে নিমজ্জিত করতে চেয়েছিলেন। উৎপাদনকারী শ্রমজীবন থেকে সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট ফকিরদের আত্মরতি তাঁকে ব্যথিত করেছিল।

গোলাম শাহ একজন টিপিকাল ফকির। ধনমান তো নয়ই, এমনকী 'একটুকু বাসা করেছিনু আশা'-ও তার মধ্যে নেই। আশ্চর্য।

মহম্মদ জালাল শাহ-র কথা—১

আমার নাম মহম্মদ জালাল শাহ। পিতার নাম মহম্মদ নায়েব শাহ। জন্ম দুবরাজপুরের ফকিরডাঙায়। বয়স এখন ১৪০৭ সালে বিয়াল্লিশ বছর।

আলম বাবা ডেকেছিলেন— তাই আমাদের পূর্বপুরুষরা এই স্থান বেছে নিয়েছিলেন। আমার দাদু, মানে বাবার বাবা, এখানে প্রথম আসেন। দাদুর নাম মহম্মদ দায়েম শাহ। আমার দাদুর বাবার নাম ছিল মহম্মদ ভ্রমর শাহ। থাকতেন বর্ধমানের চুরুলিয়ায়। আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাদুর জন্মমাটি চুরুলিয়া। তারপরে তিনি এখানে চলে আসেন। আমাদের বংশটা ফকিরের বংশ। ফকিরের সঙ্গে ঘোরা আর বাবাদের সেবাই আমাদের কাজ। বংশের ধারা অনুযায়ী আমি ফকির হয়েছি। ছেলেবেলা থেকেই আমার মনে এই ভাবনা ছিল। এই শিক্ষাদীক্ষার দিক দিয়ে আমি বাবার কাছে বায়েদ হয়েছি। ফকিরি সাধনা আর গানবাজনা করি।

আমার মন্তব্য

ফকিরদের স্বভাবের মধ্যে স্থায়ী বাস্তু এবং সেখানে বরাবর থাকার বাসনা কম থাকে। এর কারণ তাঁদের কোনও জমিজিরেত বা চাষবাস বড় একটা থাকে না। মাটি-জমি-ফসল মানুষের একটা বড় বন্ধন। দায়েম শাহ্ খুব বড় মাপের ফকির ছিলেন, ভ্রমর শাহ্-র সন্তান। কিন্তু বর্ধমানের অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রাম থেকে দায়েম শাহ চলে এলেন দুবরাজপুরে আলম শাহ নামে এক উচ্চস্তরের ফকিরের আহ্বানে। তাঁকে ধরে এখন ফকিরডাঙায় চার পুরুষের ভিটে। কিন্তু ঠিক ভিটে নয়, কারণ জমিটা তো আলমবাবার। তাঁর সমাধিও ওখানে।

জালাল শাহ্-র ক্ষেত্রে যেটা নতুনত্ব তা হল পিতার কাছেই ফকিরি দীক্ষা। পিতা থেকে পুত্র এমন ক্রমে ফকিরি দীক্ষা হয়ে থাকে। বাউলদের ক্ষেত্রে হয় না। তাঁদের তো প্রধানত জন্মরোধের সাধনা। শিষ্যই সন্তানের মতো। তাই শিষ্যসেবক না বলে শিষ্যশাবক বলেন অনেকে।

AMARBOI.COM

জালাল শাহ্-র কথা—২

ফকিরি সাধনা একটা অন্য জগৎ। ওই ফকিরি জগতে থেকে তাকে পাওয়া যায়। তাকে পেতে গেলে কিছু ধ্যান-জ্ঞান, নাম-চর্চা আর ক্রিয়াকরণ করতে হয়। সে সাধনা নিরিবিলি জায়গায় হয়। যে খুঁজে নেবার নিরিবিলি জায়গা সে ঠিক খুঁজে নেবে।

ফকিরি মত বলে— সর্বজনের কাছে যাও। ফকিরি মত মানেই সর্বমত। এই মতটা ইসলাম ধর্মের মধ্যেই আছে।

ফকিরি মত হচ্ছে— আমরা নির্জনে আল্লাকে পেতে চাই, আর সেটা পেয়ে আলোকারী করতে চাই। কিছু জানা হল; কিছু মানুষে জানল, কিছু বাতনে থাকল— এইটা হচ্ছে আলোকারী। মৌলানা-মৌলবিরা সবসময়ে বলছে জাহির, আর আমরা চাইছি বাতন। আমাদের কিছু বাতনের দরকার, উনাদের জাহেরের দরকার।

ফকিরি সাধনার মূল কথা— নিজেকে চিনতে হবে, না-চিনলে কিছু হবে না। নিজের ভেতরটাকে আগে সাফ করতে হবে, তবে বাইরের সবকিছু সাফ দেখা যাবে। আমার ভেতরটা যদি সাফ না থাকে, ময়লা থাকে, তা হলে আমি সব ময়লা দেখব।

আর নূরের সাধনা হচ্ছে— আলোকারী। সেটা গোপন— বলতে নিষেধ আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মন্তব্য

ফকিরি জগৎ সম্পর্কে জালাল শাহ্-র মন্তব্য পড়ে বোঝা কঠিন যে, এসব অনুভব তাঁর নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ না অন্যের মুখে শোনা। 'তাকে পাওয়া যায়' বা 'তাকে পেতে গেলে' বলতে উপাস্য বা আল্লাকে বোঝানো হচ্ছে ঠিকই কিন্তু 'ধ্যান-জ্ঞান, নাম-চর্চা' কথাগুলি ধূসর। ফকিরি সাধনায় নাম-চর্চা ব্যাপারটা কী? এমন কথা আমরা আগে শুনিনি।

ফকিরি মত বলেছে সর্বজনের কাছে যাও, এমন কথায় কোনও বিরোধ নেই কিন্তু 'এই মতটা ইসলাম ধর্মের মধ্যেই আছে' মন্তব্য বিভ্রান্তিকর। ইসলামে এমন কথা কোথায় আছে?

'আলোকারী' শব্দটি বেশ নতুন, অন্য কোনও ফকিরের কাছে আগে শুনিনি। নূরের সাধনাও আলোকারী কি করে হবে? তার কিছু প্রকাশ্য কিছু গোপন কে বলেছে? এক কথায় বলা যায় চল্লিশোত্তর বয়সের জালাল শাহ্ সাধক হিসাবে খুব একটা অগ্রসর নন বলে মনে হয়। তাঁর কথাগুলি সাজানো এবং পুনরুক্তিতে ভরা।

জালাল শাহ্-র কথা—৩

আমার জীবিকা গান। এ ছাড়া কিছু দেখাশোনা করি— অর্থাৎ কিছু কিছু ব্যাধির চিকিৎসা করি। আর কিছু করি না। লেখাপড়া হয়নি। অভাবের সংসার ছিল— বাবা পড়াতে পারেননি। কিছুদিন ইস্কুলে গিয়েছিলাম, কিছু হয়েছিল— কিন্তু সেটা খেয়ে ফেলেছি। আমার ছেলেমেয়েরা এখন সবাই ইস্কুলে যায়।

AMARBOI.COM

বর্তমানে আমার ছয় মেয়ে। এক ছেলে। দুটি ছেলে মারা গেছে। ছেলে এখনও ফকিরি লাইনে আসার মতো হয়নি। দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। ...আমার স্ত্রীও ফকির বংশ। উনি বায়েদ হননি। আগে শাহ্ না হলে শাহের ঘরে মেয়ে যেত না, মেয়েও আসত না। তবে এখন ফকির সম্প্রদায়ের বাইরেও মেয়ের বিয়ে হচ্ছে। আমার বিয়ে একটাই।

আমার স্ত্রী বায়েদ না হয়েও ফকিরি সাধনায় আছেন। গোপনে কিছু বায়েদ আছে। গোপনে যদি মারফত পাওয়া যায়, তা হলে গোপনে বায়েদও পাওয়া যায়।

আমরা জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করি না। সেটা কিছু লোকের জন্য আছে। ফকিরি মতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ মানছে না।

আমার মন্তব্য

একজন অসহায় মানুষের সংলাপ কি এখানে শোনা গেল? অভাবের সংসারে বাবার সামর্থ্য ছিল না সন্তানকে পড়ানোর, লেখাপড়া হয়নি। অথচ জালাল শাহ্ মাত্র চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে আটটি সন্তানের জনক হয়েছেন, যার মধ্যে দু'জন অকাল প্রয়াত, বলা উচিত শিশু মৃত্যু। জন্মনিয়ন্ত্রণ তাঁদের ফকিরি মতে গ্রহণীয় নয়। অথচ মানুষটি বেশ আত্মসুখী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গানের জীবিকা ছাড়াও জালাল ফকির কিছু টোটকা চিকিৎসা করেন। বিশুদ্ধ ফকির তাঁকে বলা যায় না। সংসারী মানুষের মতো তাঁর আত্মোপলব্ধি।

জালাল শাহ্-র কথা—৪

বাস্তুভিটা ছাড়া আমার কোনও জমি-জায়গা নাই। বাবার স্থান থেকে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যা পাই তা থেকে সংসার চলে। এ ছাড়া গান-বাজনা করি, তাগা-তাবিজ করি— এ থেকেও কিছু চলে আসে। এইভাবে মোটামুটি কোনওরকমভাবে চলে। এ ছাড়া আর কোনও রোজগার নাই কিন্তু আমি ফকিরই থাকতে চাই— অন্য কিছু করার কথা কখনও মনে আসে না। সরকারের সাহায্য কখনও পাইনি। বাবা থাকতে আগে সরকারি অনুষ্ঠানে গান করতে গেছি। এখন যাওয়া হয় না বাইরে। এরকম ডাক অনেকদিন আসেনি। সরকারি সাহায্য কখনও চাইনি, আশা করিনি।

আমার জীবনে প্রথম শেখা গান— 'বন্ধুর বাড়ি হতে রে মন/আইছি অনেকদিন গো আমি' দায়েম শাহ্ ফকিরের লেখা। এই গানটা সবসময় গাইতে ইচ্ছা করে। আমার নিজের গানও আছে দু'-একটা।

আমার মন্তব্য

AMARBOI.COM

জালাল শাহ একেবারে রিক্ত ফকির। ফকিরডাঙার দায়েম শা-র যে আস্তানা ছিল তার দাতা সম্ভবত তাঁর মুর্শেদ আলমবাবা। সেই আস্তানাই জালাল-কথিত বাস্তুভিটা। আলম বাবা আর দায়েম শা-র সমাধি মুখোমুখি আছে ফকিরডাঙায়। ভারী শান্ত ও নিস্তব্ধ স্থান, দেখলে মনে ভক্তিভাব জাগে। জায়গাটা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের খানিকটা শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম আছে, তাই অনেকে মানসিক করে, টাকাপয়সা দেয়। এ ছাড়া এই আশ্রমের গা বেয়ে, আক্ষরিক অর্থে ছুঁয়ে, দিনেরাতে ক'জোড়া অন্ডাল-সাঁইথিয়া ট্রেন চলে। তার যাত্রীরা টাকাপয়সা ছুড়ে দেয় জানলা দরজা দিয়ে। ফকির বাড়ির মেয়েরা ট্রেন চলে গেলেই 'কুড়িয়ে বাড়িয়ে' সেগুলো জড়ো করে। তাই দিয়ে চলে ফকিরের সংসার। এর বাইরে গানবাজনা করে আর তাগা-তাবিজ দিয়ে ক' পয়সা আর হয়?

'কিন্তু আমি ফকিরই থাকতে চাই'— এরপরও এমন ঘোষণা বোঝায় যে, জালাল অন্তরে বাইরে ঘোরতর ফকির। কেউ কেউ কি বলবেন, পলায়নবাদী? না, এদের সম্পর্কে সরকারি বদান্যতা আশা করা যায় না। পরিচিতি নেই, প্রচার নেই— সরকার জানবেই বা কী করে? সরকারি ডাক আসেনি বহুদিন, জালাল আশাও করেন না, উদ্যমও নেই। গোলাম শা-র মতো জালাল নানা জায়গায় প্রোগ্রাম করেন না তাই লোকে তাঁকে চেনে কম। তবে জালাল একদিক থেকে এগিয়ে আছেন— তিনি নিজে গান লিখে সেই গানে সুর বসিয়ে গাইতে পারেন। তাঁর গান ও গায়ন সংরক্ষিত হলে ভাল হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জালাল শাহ্-র কথা—৫

ফকিরি সাধনার রাস্তায় ভেতর বা বাইরে থেকে বা নিজের মন থেকেও কখনও কোনও বাধা পাইনি। বাধা দেবার মতো তেমন কেউ কেউ আছে— কিন্তু আমি তেমন কাউকে দেখিনি, বা আমার কাছে এসে দাঁড়াতে পারে না।

শুয়োরকে মৌলানা মৌলবিরা হারাম বলবে— আমরা হারাম বলব না। আমি খাই না; ঠিক আছে, কিন্তু হারাম বলাটা ঠিক নয়। শুয়োরকেও সেই তো সৃষ্টি করেছে, তাকে ঘৃণা করা ঠিক নয়।

আমরা গান-বাজনা করি। কেউ হয়তো ডেকে নিয়ে গেল, বলল—কালীমন্দিরে গান করতে হবে। তা হলে করতে হবে। এইবারে আল্লা-হরি দুটিকেই মিশিয়ে বলতে হবে। ফকির-মস্তান হচ্ছে— সর্ববিরাজী। সব জায়গায় যেতে পারে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারে। কিন্তু মৌলবিরা সেখানে যাবে না।

আমার মন্তব্য

জালাল শাহ্ তাঁর ফকিরি সাধনায় ভেতরে-বাইরে কোনও বাধা পাননি, কারণ তাঁরা বংশগতভাবে ফকির। নিজের মধ্যে বাধা পাননি কারণ জন্মেই তো আলম বাবা আর দায়েম শা-র মাজারের ছত্রচ্ছায়ায় রয়েছেন। তেমন বিদ্যালাভ ঘটেনি, জমিজমা নেই—কণ্ঠে সুর ছিল, পিতার কাছে একটু-আধটু শিখে চালিয়ে যাচ্ছেন। খুব বড় মাপের পারফরমার নন গোলাম শা-র মতো। তাঁর বিরুদ্ধাচরণ কে করতে যাবে? কেনই বা? তা ছাড়া দুবরাজপুর প্রধানত হিন্দু জনবসতির স্থান। একজন দু'জন ফকির সেখানে সমাজস্রোতের অংশ। দেখাই যাচ্ছে, কালীমন্দিরে গান করার আহ্বান তাঁর কাছে এসেছে বা আসে।

আসলে জালাল শা-র মনের মধ্যে অনাবিল ঔদার্য রয়েছে, যেটা আবহমান কালের ফকিরি ধারা। আল্লা আর হরিকে মেলাতে তাঁর অসুবিধা হয় না। আল্লাকে মহান স্রষ্টা বলে মানেন বলে, মানুষ আর শুয়োরকে হালাল হারাম ভেদ করেন না। সবচেয়ে সার কথা, যেটা তাঁর মনে হয়েছে, ফকিররা সর্ববিরাজী। তাঁদের চলমানতা এক মহৎ গুণ এবং সব কিছু গ্রহণ করার আগ্রহ। মোল্লা মৌলবিরা অনেকটা বদ্ধ জীব— শাস্ত্রবন্ধনে, মসজিদ এবং শরিয়তি আচার মার্গে।

জালাল শাহ্-র কথা—৬

ফকির আর বাউল বেশি দূরের নয়। গান-বাজনা ও কিছু মনোভাব নিয়ে বাউল ফকির কাছাকাছি আসে। কৃষ্ণতত্ত্ব ও মুর্শিদতত্ত্ব—মূল একটাই। তারপর এটাকে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। সাধু-সন্তদের মতো সাধনায় ফকিরদেরও বাহ্যজ্ঞানশূন্য দশা হয়।

গান গাওয়ার সময় সাদা ধুতি লুঙ্গির মতো পরি, সাদা পাঞ্জাবি পরি, গলায় একটা গামছা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে। সেটা রঙিন হতে পারে, আবার সাদাও হতে পারে। মাথায় হয়তো একটা পাড় বেঁধে নিলাম। গায়ে আলখাল্লাও পরে নিতে পারি।

গানের সঙ্গে বেহালা, ডুবকি, দোতারা, গাবগুবি, করতাল, চিমটে ব্যবহার করি। আরও কিছু যন্ত্র হলে ভাল হয়, যেমন—ঢোল, হারমোনিয়াম।

চুল রাখাটা আমাদের ধর্ম। হাতে যে লাঠি ('আসা') থাকে, সেটা হল হাতের সম্বল। যখন যেখানে গেলাম, বসলাম—হাতে একটা আসা থাকল। ফকিরদের ব্যবহৃত জিনিসের মধ্যে কিস্তি, লোটাকম্বল, ঝোলা, 'আসা' সবই থাকবে।

আমার মন্তব্য

জালাল শাহ ফকির হলেও কোনওভাবে তাত্ত্বিক নন। বেশির ভাগই শোনা কথা বলেন। আজহার খাঁ কিংবা আবু তাহেরের মতো তাত্ত্বিক ও চিন্তাশীল ফকিরদের সঙ্গ করেছি বলে এটা বুঝতে পারি। শাস্ত্র ও শরিয়তের বিরুদ্ধতা করতে গেলে পঠন পাঠন দরকার। তার জন্য ঘরগৃহস্থী দরকার। চাই শান্ত আত্মমগ্ন অবকাশ। চাই আরও দু'-একজন তাত্ত্বিক ও বিরুদ্ধপক্ষ। ব্যক্তিজীবনে আবু তাহের ও আজহার খাঁকে বহুবার আলেম বা মোল্লাদের সঙ্গে 'বাহাস' করে মোকাবিলা করতে হয়েছে। জালাল শাহ্ এঁদের তুলনায় অনেক অনুজ ও অর্বাচীন। তাই কৃষ্ণতত্ত্ব ও মুর্শিদতত্ত্ব মূলে এক এ ধরনের মন্তব্য জেনে বুঝে করা নয়, মুখের কথা। বেশ শুনতে লাগে। ফকির ও বাউল বেশিদূরের নয় হয়তো, কিন্তু কারণটা অন্তত জালাল শাহ-বর্গের ফকিরদের অধিগম্য হওয়ার কথা নয়।

জালাল সব অর্থেই পরম্পরাগত, টিপিকাল পথের ফকির। গানের সহযোগী বাদ্য-আয়োজন কিংবা গান গাওয়ার সময়কার পোশাক-পরিচ্ছদে কোনও মৌলিকতা নেই। ব্যবহার্য সামগ্রীও ধারাগত— সেই কিস্তি, ঝোলা, আসা। চুল রাখাটা ফকিরদের 'ধর্ম' নয়, যেমন ভেবেছেন জালাল, এটাও বহুদিনের অভ্যস্ত বিষয়।

জালাল শাহ্-র কথা—৭

বাউলদের মতো ফকিররা চারচন্দ্রে সাধনা করে না। খায় না। ফকিররা ওকে কন্ট্রোল করতে পারে। প্রস্রাব পায়খানা ফকিররা ছ'দিন-সাতদিন পর্যন্ত কন্ট্রোল করতে পারে। সাধনায় বসেছি। যতক্ষণ সাধনা শেষ না-হচ্ছে উঠছি না, ততক্ষণ ওকে কন্ট্রোল করা যাবে।...খাওয়া বন্ধ থাকে—হয়তো খালি জলই খেলাম, বা চা হল তো খেয়ে নিলাম। হাল্কা রাখতে হবে খাবার, তা হলে ওগুলো সব কন্ট্রোল থাকবে। ফকিরদের কাছে এই খাওয়া-দাওয়া কন্ট্রোল করাটা কোনও ব্যাপার নয়। আগে আমি গাঁজা-টাজা খুব খেতাম—পনেরো ভরি, ষোলো ভরি গাঁজা খেতাম—এখন খাই না, মনও চায় না।

ফকিরি সাধনায় যুগল-সাধনাও আছে, আবার নির্জনে সাধনাও আছে।...ফকিরদের দমের সাধনা যেমন আছে, বস্তুসাধনাও আছে।...আমরা জিকিরটাকেই বেশি গুরুত্ব দিই— জিকির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা মানেই শ্বাসকে কন্ট্রোল করা। দমের জিকির সব সময়েই হচ্ছে। দমে জিকিরের মানেই হচ্ছে— সে দমে আসে, দমে যায়। এই দমের তো কোনও ভরসা নাই।... নিশ্বাসকে বিশ্বাস নাই। নিশ্বাসকে আজও পর্যন্ত কেউ ধরে রাখতে পারল না।— বহুত জপ-তপ তপস্যা করেও।

আল্লাকে সম্পূর্ণ জানাও যাবে না। শেষ নাই। যুগে যুগে সাধকেরা আসবেন—তারা আরও জানাবেন—শেষ হবে না। শেষ যেদিন হবে—সেদিন তো রোজ কেয়ামত হবে।

আমার মন্তব্য

ফকিররা চারচন্দ্রের সাধনা করেন না, খবরটি ঠিক নয়। আমি এমন অনেক ফকির দেখেছি। মজার কথা যে, জালাল নিজেই পরে বলেছেন ফকিরদের 'বস্তুসাধনাও আছে'। বস্তু শব্দের তাৎপর্য আমরা জানি। সেটাই তো রসরতির সাধনা।

তবে খাদ্য সংযম বা প্রস্রাব দমন যে ফকিরি সাধনার বিশেষ লক্ষণ তা আমরা জানি। দমে জিকিরের পদ্ধতি এঁদের সাধারণ করণকৌশল। ফকিরের গাঁজা বিষয়ে তীব্র আসক্তি ও পরবর্তী অনীহা বিষয়টি বেশ চমকপ্রদ স্বীকারোক্তি।

জালাল শাহ্-র বাচনিক কৌশল খুব সুন্দর ও সুবিন্যস্ত। 'নিশ্বাসকে বিশ্বাস নাই' বাক্যবন্ধটি চমৎকার। 'আল্লাকে সম্পূর্ণ জানা যাবে না' ফকিরদের পরম উপলব্ধি। আবু তাহের ফকির আমাকে বলেছিলেন, 'তাঁকে জানা যায় না, এই জানাটাই সবচেয়ে বড় জানা।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফকিরের আত্মকথা

এই বিশাল ভারতবর্ষের এক কোণে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা থানার অন্তর্গত কাপাসডাঙ্গা গ্রামে এক ভিজে স্যাঁতসেঁতে গলিতে হাজরা পরিবারে দারিদ্র্যের ব্যথা নিয়ে ১৩৬৪ সালের কার্তিক মাসের ২৩ তারিখে ভোর ৩-১৫ মিনিটে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। বাবার নাম অক্ষয়নাথ হাজরা, মায়ের নাম লক্ষ্মীবালা হাজরা। জন্ম থেকেই অভাব আর অনটনের মধ্যে দুঃখকে বরণ করে নিয়ে, কখনও খেয়ে কখনও না খেয়ে কেটেছে ছেলেবেলার দিনগুলি। চার বছর বয়সে হাতে খড়ি নিয়েই শুরু হয় গ্রামে প্রাইমারি স্কুল জীবন। প্রতি বছর ক্লাস উত্তীর্ণ হয়ে এগিয়ে চললাম অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। এরই ফাঁকে পেলাম পাঁচ/ছ'জন ভাই-বোন। ছোট ভাই বোনদের সঙ্গে পেয়ে যেন অভাবের দড়ি আরও গলায় ফাঁসির মত টুঁটি টিপে ধরেছিল। তাই তো সংসারের প্রয়োজনে বিড়ি শ্রমিকের কাজ শুরু করি। তারপর এভাবে কেটে চলল আঠেরো বছরের জীবন।

উনিশে পা দিতেই বাবা মায়ের মনে আকাঙ্ক্ষা জাগলো বউমায়ের মুখ দেখবার। এ জন্যই মায়ের দূর সম্পর্কের দাদার মেয়ের সঙ্গে আমার প্রথম বিবাহ হল। খুবই অল্পবয়স্ক মেয়ে। আঠারো মাস সংসার-ধর্ম পালন করে ন'মাস গর্ভবতী অবস্থায় একলেম্‌শিয়া রোগে বহরমপুর সদর মাতৃসদন হাসপাতালে সে মারা যায়। এর পর শ্রাদ্ধক্রিয়া সেরে মনের উপর এক ব্যথাভরা চাপ পড়ল। সারাক্ষণ উদাস আর সাথিহারা জীবন নিয়ে পূর্বস্মৃতিভার বুকে নিয়ে এক ত্যাগের ভাব মনে উদয় হল। রাতদিন শুধু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতাম। হঠাৎ একদিন বিকালবেলায় দেখা আমাদের গ্রামেই বাড়ি উস্তাদ জাফরউদ্দিনের সঙ্গে যিনি নকসবন্দিয়া তরিকায় মুরিদ হয়ে কালবী জিকিরে যথেষ্ট মশগুল থাকতেন। লেখাপড়া তাঁর জীবনে তেমন ছায়া ফেলতে পারেনি। তবে আক্ষরিক জ্ঞান বা ঐশ্বরিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে বহু কিতাব কোরান হাদিস বা হিন্দু শাস্ত্র বিষয়ক বহু বই তিনি অবসর সময়ে পড়ে নিজে বহু জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। এই সব আধ্যাত্মিক চিন্তা ভাবনার সঙ্গে নিজে আধ্যাত্মিক গান ও গজল রচনা করতেন। কিন্তু তাঁর চিন্তাধারা বিশ্বময় প্রকাশ করার তেমন কোনও মাধ্যম হয়তো পাচ্ছিলেন না। তাই হঠাৎ আমাকে ডেকে বললেন 'যতীন সন্ধ্যার পর আমার বাড়ি আসবি, তোর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।'

যদিও ওঁর কথা আমার মনোমতো হচ্ছে না তবু 'আসবো' বলে বাড়ি ফিরে গেলাম। গ্রাম সম্পর্কে আমরা ওঁকে দাদু বলতাম। সন্ধ্যাবেলায় একটু ভেবে ওঁর সঙ্গে গেলাম দেখা করতে। গিয়ে দেখি উনি নামাজ পড়া শেষ করে তখন জায়নামাজে বসে তছবি তেলাওত করছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'তুই এসেছিস? আমি তোকে নিয়েই ভাবছি। আয় বোস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোর ভালর জন্যেই তোকে ডেকেছি। রাতদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াস, সংসারের কোনও কাজকর্মও করিস না তোর বাবা বলছিল। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালে মনে শান্তি আসবে কোথা থেকে? মন তো লাগামবিহীন ঘোড়া, আলগা পেলেই অন্যদিকে ছুটিয়ে নিয়ে চলে যাবে। শোন্ আমি তোর জন্যে একটা চিন্তাভাবনা করেছি, আর একটা কিছু করতেই হবে তোকে।'

আমি বললাম, 'বল আমায় কি করতে হবে।'

উনি বললেন, 'বহুদিনের চিন্তা ভাবনা আমি তোর মাধ্যমে প্রকাশ করতে চাই।'

আমি বললাম, 'আমায় কি করতে হবে বল।'

উনি বললেন, 'তোকে গান শিখতে হবে।'

আমি হাসতে লাগলাম, বললাম, 'আমার গলা দিয়ে জোরে কথা বের হয় না, আর আমি করব গান?'

উনি বললেন, 'আমি জানি তোর দাদু গান বাজনা করতেন, তোর ঠাকুমার গলার আওয়াজ কম ছিল না, তোর বাবার গলার তেজ মন্দ নয়, বংশ অনুযায়ী তোরও গান হবে।'

উনি তো বলছেন আর আমি বসে বসে হাসছি। কারণ আমার মনে হত মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে মুখ খুলে গান করা বড় লজ্জার ব্যাপার। এটা আমার পক্ষে কোনও মতেই সম্ভব নয়।

দাদু বললেন, 'তোর কোনও কথাই আমি শুনব না, তোকে প্রত্যেক সন্ধ্যায় আমার কাছে আসতেই হবে। তোকে প্রতিদিন নতুন নতুন গল্প শোনাব।' গল্প শোনার আগ্রহ আমার ছোটবেলা থেকেই। তাই গল্পশোনার আগ্রহে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ওঁর বাড়ি যেতে শুরু করলাম। দাদু গল্প বলা ছাড়াও আধ্যাত্মিক বিভিন্ন আলোচনা করতেন। ওই সব আলোচনা শুনে মনে আমারও আগ্রহ বাড়তে লাগল। হঠাৎ একদিন দেখি একটি লাউ-এর খোলে চামড়া দিয়ে ছেয়ে বাঁশের ছড় বেঁধে একতারা বেঁধে রেখে দিয়েছেন। আমি একতারা দেখে হাসতে হাসতে বললাম, 'এটা কি হবে?' উনি বললেন, 'তোকে শিখতে হবে।' উনি নিজে বাজিয়ে আমায় শেখাতে লাগলেন। কয়েকদিন পর দেখছি একজনের কাছ থেকে উনি একটা ডুগি চেয়ে রেখেছেন। বললেন, 'ডানহাতে একতারা আর বাম হাতে ডুগি অভ্যাস করতে হবে।' ধীরে ধীরে ওই ভাবেই অভ্যাস করতে এবং শিখতে লাগলাম। ঘরের মধ্যে দাদুর কাছে বসে আস্তে আস্তে দু'-একখানা গানও শিখতে লাগলাম। সব গান ওঁর রচনা নয়, নিজে যেগুলো লিখতেন সেগুলিও দিতেন। আমি ওঁর দেওয়া প্রতিটি গানই খাতায় লিখে নিতাম। ওঁর লেখা ও অন্য মহাজনদের লেখা গানে আমার খাতা ভারী হয়ে উঠল। উনি নিজে ভাল বাজাতে জানতেন না তাই পাড়া বা গ্রামে যাঁরা একটু ভাল বাজাতে জানতেন তাঁদের অনুরোধ করতেন আমায় শেখানোর জন্য। ডুগি একতারা বাজাতে গিয়ে বসে বসে হাসতাম। একহাতে একতারা হয়তো বাজত কিন্তু অন্যহাতে ডুগি বাজাতে চাইত না। আর দাদু বলতেন, 'তোর কোনও কথাই আমি শুনতে চাই না। তোকে শিখতেই হবে।' তাই সকাল সন্ধ্যায় যখন মন চাইত নির্জনে ওই যন্ত্র বাজানো অভ্যেস করতে লাগলাম। তারপর পাড়াতে এর ওর বাড়ি গিয়ে বসে বসে ২/৪টে গান গাইতাম। কেউ এক কাপ চা দিত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার কেউ দু'-একটি বিস্কুটও সঙ্গে দিত। সকলে গান শুনে উৎসাহ যোগাত এবং সহযোগিতাও করত। আবার কেউ কেউ হিংসেও করত। কেউ পেছনে কিছু বললে দাদুকে এসে বলতাম। উনি বলতেন, 'যারা হিংসে করবে তারা পিছনে পড়ে থাকবে। তুই অনেকদূর এগিয়ে যাবি, তোকে কেউ রুখতে পারবে না।'

দাদুর মুখে এই আশীর্বাদ শুনে মনে সবসময়ই আনন্দের স্রোতধারা বইত। এইভাবে গানের রেওয়াজ চালিয়ে যেতে লাগলাম। প্রতিদিন সন্ধ্যায় গান গাইতে বসতাম আর প্রতিটি গান গেয়ে তার অর্থ জেনে নিতাম। একদিন পাশের গ্রামে হিন্দু পল্লিতে গেলাম গান গাইতে। অন্যদেশ থেকে এসেছেন একজন বাউল শিল্পী। তাঁর সঙ্গে পাল্লাগান গাইতে কেউ বলছে, 'যতীন তোমার ভাল হচ্ছে, কিন্তু ওঁর গানের পাশে উত্তর হচ্ছে না।'

আমি খুবই চেষ্টা করে অল্প শেখা বিদ্যা নিয়ে লড়াই করলাম তবে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব আমার জানা নাই। অন্ধকার বোধ করলাম। মনে মনে ছটফট করতে করতে একটি গানের অর্থই বুঝলাম না, তার উত্তর দেব কী। প্রশ্ন-গান/'না-পাকে পাক হয় কেমনে। জন্ম বীজ যার না-পাক কয় মৌলবী গণে'—। বাড়ি এসে ওই কথাগুলি দাদুকে বললাম। উনি হাসতে হাসতে বললেন, 'প্রশ্ন খুব চমৎকার করেছে, তবে এর জবাব আমি বলি তুই শোন্— থালাতে ভাত হাতে তুলে মুখে দিয়ে খায়। কিন্তু খাওয়ার পর হাত মুখ থালা ধুতে হয় কারণ এগুলো এঁটো হয়ে গেছে, ভাত পবিত্র জিনিস—তাই ওতে কোনও না-পাক জিনিস নেই। তবে বাউল গান শিখতে হলে বাউল গোঁসাই ধরে শিক্ষামন্ত্র নিতে হয়। তোকে আমার এক বন্ধুর কাছে যেতে হবে যার বাড়ি নওপুকুরিয়া গ্রামে। আমি ওকে তোর জন্যে বলছি, বৈষ্ণব তত্ত্ব আমার জানা নেই। শিক্ষাগুরু বাদে যে কাজ চোদ্দো বছর লাগে আর গুরু ধরে ওই কাজ করলে চোদ্দো দিনের মধ্যে কর্মশিক্ষা হয়ে যায়।' দাদুর মুখে এই সমস্ত কথা শুনে মনে এক নতুন আগ্রহ বেড়ে গেল।

AMARBOI.COM

এক সন্ধ্যায় নওপুকুরিয়ার গোঁসাই মদনদাস বৈরাগ্যের বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। পাতলা ছিপছিপে লম্বা একজন মানুষ। মাথায় পাকা চুল বড় বড়, সামনে ঝুঁটি বাঁধা, মুখে দাড়িগোঁফে ভরতি। বগলে একটি সিদ্ধের ঝোলা, কয়েকজন ভক্ত নিয়ে গাঁজা খাচ্ছে। গিয়ে সামনে দাঁড়াতেই বললেন, 'নিশ্চয়ই তোর নাম যতীন হাজরা? আয় বোস।' মাটির একটি চারচালাঘর, চারদিকে বারান্দা নামানো। পাশে বসতেই বললেন, 'তোকে জাফর পাঠিয়েছে?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ'। আবার বললেন, 'বল, তুই কী জানতে চাস?' আমি বললাম, ' আমি একজন বাউলগানের শিল্পী হতে চাই। শিল্পী হতে গেলে যে সমস্ত তত্ত্ব জানা বা শেখার দরকার তা আপনাকে সব দিতে হবে।' উনি বললেন, 'বিয়ে করেছ?' 'হ্যাঁ, তবে সে বউ নেই, মারা গেছে।' 'তোর শিক্ষা তো হবে না'—উনি বললেন, আরও বললেন, 'বাউল তত্ত্ব শিখতে গেলে স্বামী স্ত্রী যুগলে মন্ত্র নিয়ে হাতে-কলমে কর্ম সাধতে হবে, কারণ আশ্রয়বিহীন সাধনা সম্ভব নয়, নিজ আশ্রয়ে রসের আলাপন, রসের কর্ম নীরসে হয় না, স্বামী-স্ত্রী যুগলে রসের কর্ম করে বাউল জগতকে জানতে হয়।'

তাই প্রত্যহ জানার কৌতূহলে সন্ধ্যায় যাওয়া শুরু করলাম। দেখতাম ওখানে যে সমস্ত ছেলে বা মানুষ যেত সকলেই প্রায় গাঁজা খেত। আর আমি গিয়ে ওদের পাশে বসে নানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্প করতাম। কিন্তু নিজে নেশা ভাং করতাম না বলে দূরে গিয়ে বসে থাকতাম। তাই নিজেকে শুধু পরপর বা একা লাগত। ভাবলাম এদের সঙ্গে কেমন করে কী ভাবে মেশা যায়। বাড়ি গিয়ে ওস্তাদ জাফরউদ্দিন মানে আমার প্রথম গানের গুরুদেবকে বললাম, 'দাদু ওখানে যাচ্ছি বটে ওরা কেউ কোনও পাত্তা দিচ্ছে না। এভাবে ঘুরলে আমার জানতে বহুদিন সময় লেগে যাবে।'

উনি বললেন, 'শিক্ষার প্রয়োজনে ঘর ঘাঁটিতে লাঠি হাতে ঘাট পাহারা দিতে হয়। জানার তাগিদে মুচির ঢাক বয়ে দিতে হয়। যেখানে গিয়েছিস ওই সমাজে মিশতে না পারলে কোনও কাজ উদ্ধার হবে না। প্রয়োজন হলে তোকেও ওদের সঙ্গে গাঁজা খেতে হবে।' দাদুর নির্দেশ পেয়ে পরদিন গেলাম গোঁসাই-এর আখড়াতে। গোঁসাই বাবার পাশে বসে দু'-একটা কথা শুনতে বা বলতে বলতে বললাম, 'বাবা আমাকেও না হয় কলকেটি দেন, খেয়ে দেখি কেমন লাগে।' সকলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'অভ্যাস যখন নেই তখন অসুবিধা হবে।' আমি বলেছিলাম, 'দু'-এক টান করে খেতে খেতে অভ্যাস হয়ে যাবে আপনিই।' যাই হোক গোঁসাই-এর হাত থেকে প্রথম কলকে নিয়ে দু'টান দিতেই মনে হয়েছিল যেন বুকের মধ্যে আগুন প্রবেশ করে ফুসফুসটা পুড়ে গেল। এর পরেও কয়েক টান দিয়ে, সন্ধ্যার পরে হেঁটে, পাশের গাঁয়েই তো বাড়ি—রাস্তায় হোঁচট খেয়ে দু'-তিনবার পড়ে গিয়েছিলাম। মাথাটা ঘুরছিল, গা পাক দিয়ে বমি শুরু হয়েছিল। বাড়ি গিয়ে ভয়ে বাবা মাকে কিছু বলতে পারিনি। বিছানায় শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত কেঁদেছিলাম। বারবারই মনে হচ্ছিল শিক্ষার জন্যে আমি কী করতে চলেছি। গাঁজা খারাপ জিনিস জেনেও আমাকে তাই খেতে হল। হোক। যেভাবেই হোক আর যত কষ্টই হোক আমি বাউল তত্ত্ব শিখব জানব। এইভাবে প্রত্যেকদিন যেতে লাগলাম। গিয়ে আমিও এক একদিন এক পুরিয়া গাঁজার দাম দিয়ে দিতাম। এইভাবে আমি ওদের সঙ্গে রোজ গাঁজা খেতে লাগলাম। যখন কেউ থাকত না তখন কোনও বাউল গান গেয়ে বাবাকে শুনিয়ে, সেই গানের অর্থ ব্যাকরণ করে বুঝে নিতাম। আস্তে আস্তে বাবার কাছে আমি বেশ প্রিয় হয়ে উঠলাম। আশ্রমে বসে মাঝে মাঝে ডুগি একতারা নিয়ে গিয়ে গোঁসাইকে গান শোনাতাম। বাবা কোনও ভক্তের বাড়ি গেলে আমায় সঙ্গে নিয়ে যেতেন। একদিন গঙ্গা পার হয়ে ওঁর মেয়ের বাড়ি যাব বলে দু'জনে বেরিয়েছি, গঙ্গার ঘাটে নৌকোয় চাপতে গিয়ে গোঁসাই বললেন,—'তোর গলায় কোনও মালা নেই?' আমি বললাম, 'মালা মানেই তো সাইনবোর্ড ঝোলানো। দোকানে মাল নেই, আর শুধু শুধু সাইনবোর্ড টাঙিয়ে লাভ কি?' উনি বললেন, 'আমার ঝোলাতে এই মালাটি আছে তুই গলায় পর।' আমি বলেছিলাম, 'একদিনকার জন্য গলায় দেব না, যদি চিরদিনকার মতো আমাকে আমার বলে স্বীকৃতি দেন এবং নিজের হাতে মালাটি গলায় পরিয়ে দেন তা হলে আমি ওই মালা গলায় পরব।' উনি হাসতে হাসতে বললেন, 'বেশ তা-ই হবে, আজ থেকে তুই আমার ছেলে। আয়, আমি নিজের হাতে তোর গলায় মালা পরিয়ে দিই' এই বলে নিজের হাতে সেই তুলসী কাঠের মালা আমার গলায় পরিয়ে দিলেন। গোঁসাই বাবার কাছে প্রত্যহই আসা যাওয়া করতাম। উনি বলতেন, 'বৈষ্ণব প্রকৃতি, রাধারানী হচ্ছেন প্রকৃত বৈষ্ণব। তোর ঘরে যে রাধা আছে ওর সেবা না করলে সুধা পাবি কোথা থেকে? ওকে ভক্তি দিবি একটু হাত বুলিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজ হাসিল করতে হবে।' গোঁসাই বাবার এই বাণী মনে মনে মেনে নিয়ে আমি ভাবলাম বাউল গান বা তত্ত্ব শিখতে হলে বিয়ে আমাকে অবশ্যই করতে হবে। বাড়িতে গিয়ে রাত্রে বাবা বললেন, 'বেশ তো অনেকদিন কেটে গেল। আমি একটি মেয়ের সন্ধান পেয়েছি, যদি তুমি রাজি হও তা হলে আমি বিয়ের ব্যবস্থা করব বা আজই মেয়ে দেখতে যাব।' শুনে যদিও মন চাইছে তবু পুরনো স্মৃতি আবার মনকে তাড়াতে লাগল, মনে হল বিয়ে তো মানুষের একবার। বারবার বিয়ে মানেই ব্যাবসা। আমি কি ব্যাবসা জুড়লাম নাকি? মনের মধ্যে বাবার ওই কথা শুনে রাগ হল। কাউকে কোনও কথা না বলে সকাল বেলায় ডুগি একতারা গাঁজা সিদ্ধের ঝোলা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় বেরিয়ে মনে হচ্ছে কোথায় যাই। সঙ্গে মাত্র বারো টাকা। বেলডাঙা স্টেশনে টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে দেবগ্রাম স্টেশনে নেমে একজন পরিচিত শিল্পী নইমুদ্দিনের বাড়ি হাটগাছা গ্রামে গিয়ে উঠলাম। আমাকে দেখে ওরা স্বামী-স্ত্রীতে বলল, 'হঠাৎ এভাবে আসার কারণ কি?' আমি বললাম 'মানসিকভাবে আমি সুস্থ নই, মনের অবস্থা ভাল না থাকায় আমি বাড়ি থেকে চলে এসেছি।' ওরা আমাকে বাড়ি ফিরে যাবার জন্য বারবার পীড়াপীড়ি করতে লাগল। ওদের কোনও কথা না বলে আমি রাত্রিটা কোনওরকমে থেকে সকালে খুব ভোরে উঠে কাটোয়া ঘাট পার হয়ে কাটোয়া স্টেশনে ছোটলাইন প্ল্যাটফর্মে গিয়ে বসে দেখছি আমার পকেটে ২ টাকা ১০ পয়সা সম্বল। বেলা গড়িয়ে গেছে, পেটে ভীষণ খিদে লেগেছে। চায়ের দোকানে একটি পাউরুটি-চা খেয়ে পকেট শেষ হয়ে গেল। সন্ধ্যায় আর খিদে সহ্য হয় না। ভাবছি জীবনে কখনও কোনওদিন কারও কাছে হাত পাতিনি, ভিখারির মতো কেমন করে খাবার চেয়ে খাব। কিন্তু পেটের মধ্যে এমন যন্ত্রণা করছে যে আর সহ্য হচ্ছে না। বসে বসে খিদের জ্বালায় কাঁদতে লাগলাম। সারাদিনের মধ্যে মাত্র একটি পাউরুটি আর এক কাপ চা পেটে পড়েছে। কাঁদতে কাঁদতে কাউকে কোনও কথা বলতেও লজ্জা করছে। হঠাৎ দেখি ছোট লাইনে ট্রেন এসে লাগল। সবাই গাড়িতে উঠছে, আমিও উঠলাম গিয়ে গাড়িতে। যে-বগির মধ্যে উঠেছি, সেই বগিতে দেখছি কতকগুলো ঘোষ ছানা দিতে এসেছিল কাটোয়া বাজারে। ওরা আমাকে দেখে বলল, 'দাদা কোথায় যাবেন?' আমি বললাম, 'কোথায় যাবো আমি নিজেই জানি না।' ওরা বলল, 'একটা গান শোনাবেন?' আমি বললাম, 'ভীষণ খিদে পেয়েছে। বলছেন যখন গাইছি।' আমি পর পর পাঁচখানা গান গেয়ে শোনালাম। ওরা এর ওর কাছ থেকে আমাকে সাত টাকা তুলে দিল। টাকাটা নিতেই এত আনন্দ লেগেছিল তা লিখে বর্ণনা করা যায় না। পেটে খিদে আর হাতে এল পয়সা। ওরা কীর্নাহার লাভপুর নেমে গেল। এর পর গাড়ির অন্য বগিতে গিয়ে কেউ না বলতেই নিজে দাঁড়িয়ে দু'খানা গান করলাম। দেখছি গান শুনতে শুনতে কেউ কেউ হাত বাড়িয়ে চার আনা আট আনা আমার হাতে দিতে লাগল। গাড়িতে বসে মিষ্টি দুটি খেয়ে জল খেলাম। তারপর দেখছি গাড়ি গিয়ে আমোদপুর স্টেশনে লেগে গেল, কেউ বলছে গাড়ি ওখানেই শেষ এর ওদিকে আর যাবে না। রাত্রিবেলাতে গাড়ি থেকে নেমে একটি হোটেলে গিয়ে দু'প্লেট ভাত খেয়ে টাকা দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে দু'চোখ গড়িয়ে জল পড়তে লাগল। বারবার মনে হচ্ছিল জীবনে কোনওদিন কারও কাছে কিছু চেয়ে খাইনি আর আজ আমাকে পেটের জ্বালায় গান গেয়ে ভিক্ষে করে খেতে হল? ঈশ্বর কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ভাগ্যে এই লিখেছিলেন? আর যদি ভাগ্যে লেখা নেই তা হলে আমাকে ভিক্ষা করতে হল কেন? যাক যতই হোক আমি বাড়ি ফিরে যাব না। ঘুরে দেখব এই দেশটা কেমন। তাই ওখানেই ওই স্টেশনে রাত্রিটা কাটিয়ে সকালে বড় লাইনে গিয়ে ট্রেনে চাপলাম। গাড়ি চলল বর্ধমান, ব্যান্ডেল হয়ে হাওড়া। গাড়ির প্রতিটি বগিতে উঠি আর কেউ বললে বা না-বললেও ২/১ খানা গান গাইতে লাগলাম। বেশ কিছু পয়সা পেতে লাগলাম।

খিদের সময় কোনও হোটেলে খেতাম, কোনও টিউবওয়েলে স্নান করতাম আর স্টেশনে পড়ে মেঝেতেই ঘুমিয়ে পড়তাম। বিভিন্ন স্টেশনে নেমে কোনও মন্দির বা কোনও পির মাজার অথবা পুরনো রাজবাড়ির নাম শুনলেই দেখে আসতাম। তারকেশ্বর মন্দির, হাওড়া পুলের নীচে হিন্দুস্থানিদের মন্দির, ফুল মার্কেটের পাশে গঙ্গার ধার—এ ছাড়াও নবদ্বীপধাম অথবা নামী মন্দির যেখানে শুনেছি সেগুলোও দর্শন করে আসতাম। এই ভাবে সাত মাস ট্রেনে ঘুরে ঘুরে একদিন ব্যান্ডেল স্টেশনে শুয়ে সকালে হাতের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠেছি। দেখছি সারা হাত মশায় খেয়ে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। দেখে মনটা দমে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে পানের দোকানে আয়নায় দেখছি মুখের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে মুখে হাম বেরিয়েছে। মুখের ও দেহের অবস্থা দেখে মন খারাপ হয়ে গেল। গাড়িতে ক্রমাগত গান করে করে বুকে গলায় ব্যথা, নিজের কণ্ঠস্বর অপরিচিত লাগে। এভাবে ঘুরে বেড়ালে আমাকে অকালে ধ্বংস হয়ে যেতে হবে, রাস্তায় বেওয়ারিশ কুকুর বেড়ালের মতো মরে থাকতে হবে। না এটা আমার করা ঠিক হচ্ছে না। আমাকে বাড়ি যেতেই হবে।

বাড়ির পথে রওনা হবার জন্যে তৈরি হলাম নিজে। মুখ ধুয়ে দোকানে চা খেয়ে—একমুখ চুল দাড়ি, পায়ে টায়ারের চটি, গায়ে ছেঁড়া পাঞ্জাবি, পরনে মার্কিন থান—জরাজীর্ণ শরীরে বাড়ি ঢুকলাম। সমস্ত গ্রাম ভেঙে পড়ল আমায় দেখতে। বাবা মা সবাই আমার চেহারার অবস্থা দেখে কাঁদতে লাগল—ছোট ভাই বোনেরাও কাঁদছে। এই সাত মাস কত যে কষ্ট, কত না হোটেলে খেয়ে বেড়ালাম। স্নান সেরে মায়ের দেওয়া ভাত খেতে বসে পিছনের কথাগুলি মনে পড়ছিল। কারণ গত সাত মাসের মধ্যে একদিন বোলপুর স্টেশনে বিশ্রাম ঘরে মেঝেতে খালি গায়ে শুয়ে আছি, ডুগি একতারা বুকের পাশে হাতে চাপ দিয়ে রেখেছি। মশার কামড়ে ঘুম আসছে না, রাত্রি তখন প্রায় পৌনে বারোটা। এমন সময়ে দেখছি একজন খাটো চেহারার লোক, মাথায় উসকো খুসকো চুল, পরনে বিশ্রী ছেঁড়া লুঙ্গি, গায়ে একটা ছেঁড়া কালো হাওয়াই শার্ট—আমার পাশে বসে আমার হাত ধরে টানছে আর বলছে,—'আরে এখানে শুয়ে আছিস, আমি তোকে খুঁজে পাচ্ছি না। ওঠ এতক্ষণ বোধ হয় সকলের খাওয়া হয়ে গেল। চল ওঠ দেরি করলে হবে না।' আমি অবাক হয়ে ওই লোকটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমায় কোথায় যেতে হবে, আর তুমিই বা কে? তোমাকে তো আমি চিনতে পারছি না!' ওই লোকটি বলল, 'আরে চিনাজানা পরে হবে তুই তাড়াতাড়ি ওঠ।' আমি উঠে বসে বলছি, 'আরে হাত ছাড়ো কি ব্যাপারটা বল।' ও বলল, 'এই খ্যাপা তুই বুঝতে পারছিস না, আরে ও পাড়ার বাজারে বাবুদের বাড়ি, মানে ওরা বিরাট বড়লোক, ওদের বাড়িতে আজ বিয়ে। বহু লোকজন খাওয়ান দাওয়ান হচ্ছে। একটু আগে গিয়ে বসতে পারলেই পেট পুরে দুটো খাওয়া যাবে।' আমি ওর কথাটা শুনে বললাম, 'বিনা নিমন্ত্রণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুরুর বাড়ি খাওয়াও নিষেধ বলে জানি। আমি বিনা নিমন্ত্রণে ভদ্রলোকের বাড়ি খেতে যাব কী করে? বলা নেই কওয়া নেই আর ওদের বাড়ি গিয়ে খেতে বসব? তুমি যাও আমি ঘণ্টা দেড়েক আগে হোটেল থেকে খেয়ে এসেছি, আমি যাব না।' আমার কথা শুনে— হাত ছেড়ে দিয়ে রেগে বলল, 'তুই বড়লোকের ব্যাটা তো, তোর মেলা টাকা, তাই তুই হোটেলে খেতে গেছিস। ওঃ ওঁকে নেমন্তন্ন করতে হবে। আরে আমাদের নেমন্তন্ন দুনিয়া জুড়ে, তুই থাক, তোকে খেতে হবে না, আমি একাই যাই।' ওই লোকটি চলে গেল।

রাতে খাওয়া সেরে বাবাকে বললাম, 'আমার বিয়ের দরকার হয়ে পড়েছে, তুমি মেয়ে দেখ। আমি বিয়ে করব; তবে শর্ত এই, যে-মেয়েকে দেখবে তাকে বা তার বাবা-মাকে বলবে, আমার ছেলে বাউল গান করে। যদি তারা মেনে নেয় বা আমার শিল্পী জীবনের পথে বাধা না দেয় তা হলে আমি তাকে গ্রহণ করব। যদি পরে চলার পথে বাধাসৃষ্টি করে তা হলে তাকে ত্যাগ করে চলে যাব।' বাবা আমার কথা শুনে পরদিন খুব সকালে মাকে সঙ্গে নিয়ে আমার জন্যে মেয়ে দেখতে বেরিয়ে গেলেন। আমি একটু রাত হলে ওস্তাদ দাদুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমার গলার স্বর শুনে উনি উঠে বসে দাদিকে দরোজা খুলতে বললেন। আমাকে দেখেই উনি বলে উঠলেন, 'কতদূর গিয়েছিলি?' আমি সেখানে যা করেছি সমস্ত কথা খুলে বিস্তারিত বললাম। উনি শুনে হেসে বললেন, 'তোকে যা শিক্ষা দিয়েছিলাম তা অত দূর পর্যন্তই প্রচার হল। ওরে মানুষ হতে গেলে বা মানুষের সন্ধান পেতে হলে, এই মানুষের মধ্যেই অনুসন্ধান করতে হয়। পালঙ্ক বা ঐশ্বর্য সুখের মধ্যে পরম পুরুষকে পাওয়া যায় না। জীবনটাকে কষ্টের মধ্যে ডুবিয়ে ধুয়ে নিলেই সোনালি রং ফুটে উঠবে। বিশ্বের মাঝে প্রতিষ্ঠা হতে হলে চাই অক্লান্ত পরিশ্রম। যতই ঘুরবি ততই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হবে। আর চলমান জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতাই একদিন তোর কাজে লাগবে।' এরপর দাদুকে বললাম, 'দাদু আমার নূরতত্ত্ব গান নেই, গান কোথায় পাবো?' উনি বললেন, 'নূরতত্ত্ব গান আমার অনেক লেখা ছিল, কিন্তু সে গান এখন আমার একটিও নেই। তবে তোর শিক্ষার জন্য, আমি কাল একজন জ্ঞানী উস্তাদকে আসতে খবর দিব। আমার পরিচিত এবং বড় শিক্ষিত মানুষ। শব্দফকিরি গানের জাহাজ বলা যায়। তুই তার কাছে যে-কোনও গান নিতে বা শিখতে চাইলেই পাবি। তিনি দয়া করে যদি দেন তা হলে, কেউ তোর হাতে আর হাত দিতে পারবে না।' তারপর দিন সন্ধ্যায় দাদু আমাকে ডেকে পাঠাল। আমি গিয়ে দেখি ওরা তিনজনে বসে, মানে আমার উস্তাদ দাদু, আরও পাড়ার একজন, তা ছাড়া অল্পবয়স্ক পাতলা স্বাভাবিক চেহারার অতি ভদ্র নম্র ভাবের একজন শান্ত মানুষ, পরনে লুঙ্গি, গায়ে পাঞ্জাবি, পায়ে একজোড়া দামি চটি। দেখে মনে হয়েছিল ও-পাড়ায় হয় তো বিয়ে হয়েছে, অষ্টমঙ্গলা চলছে, তাই এ-পাড়াতে হয়তো বেড়াতে এসেছে। আমি সামনে দাঁড়াতেই ওস্তাদ বললেন, 'আয় বোস্। এই লোকের জন্যেই তোকে বলেছিলাম, এঁর নাম ডাঃ একরামুল হক, বাড়ি রামেশ্বরপুর গ্রামে, পাশে বোস্, কি বলে শোন্।' উনি মানে ডাঃ একরামুল হক আমাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কি?' আমি বললাম 'যতীন হাজরা', 'লেখাপড়া কতদূর জান? মানে পড়াশোনা কতদূর করেছ?' আমি বললাম, '৮/৯ ক্লাস পড়েছি।' তারপর বললেন, 'তোমার সম্পর্কে সব কিছুই শুনলাম। এখন তোমার কণ্ঠে একখানা গান আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনব।' আমি বললাম, 'একটু পরেই ও-পাড়াতে গান গাইতে যাব, ওখানে গেলেই ভাল হয়।' উনি বললেন, 'চল আমি তোমার গান শুনে তারপর বাড়ি যাব।' এরপর ও পাড়ায় গান গাইতে গেলাম, ওখানে গ্রামের আরও দু'-চারজন ফকিরি গান করল। শুধু শিক্ষার জন্য চললাম গান করতে। গানের আসর চলছে, আমার সঙ্গে ও-পাড়ার ফকিরদের পাল্লাগানের ফাঁকে উনি উঠে বা আরও অনেকে অনুরোধ করায় উনি হাউড়ে গোঁসাই-এর চারখানা গান পরিবেশন করলেন। উনি ইতিপূর্বে এখানে শিল্পী হিসাবে সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। গানের সুর ও গায়নভঙ্গির নতুনত্বে সকলের তারিফ পেলেন। গানের শেষে উনি বললেন, 'তুমি আগামী বুধবার আমার বাড়ি যাবে।' আমি নির্দিষ্ট দিনে ওঁর বাড়ি গেলে ওঁর বিভিন্ন আলোচনা ভাব ভাষা বা প্রতিটি গানের ছন্দ অপূর্ব লাগল। এদিন থেকে প্রত্যেক বুধবার সকালে স্নান সেরে ওঁর বাড়ি যাওয়া আসা করতে লাগলাম। ওঁর খাতায় বিভিন্ন মহাজনের লেখা গান, অথবা নিজের রচনা গান খাতায় সারাদিন বসে বসে লিখতাম। প্রতিটি গানের কলির অর্থ ওঁকে প্রশ্ন করে জেনে নিতাম। ওঁর অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার আমায় বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করত। ওঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের গভীরতা আমায় এতদূর বিস্মিত করেছিল যে আমি অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য, ওঁর সান্নিধ্যে না এলে বা গুরু হিসেবে ওঁকে না পেলে আমার শিল্পীজীবনে কোনও পূর্ণতাই আসত না। বহু সুকঠিন বিষয় ওঁর অসামান্য বিশ্লেষণী শক্তিতে আমার মনের দরজা সহজেই উন্মোচিত হত। এক নতুন জগৎ আমার চোখের সামনে খুলে গেল। ওঁর সহজ করে বোঝানোর গুণে সব কিছু বুঝতে লাগলাম। একদিন একটি গ্রামে গান করতে গেলে 'নবুওত' 'বিলাওত' প্রসঙ্গে পাল্লা দিল। আমি কোনও রকমে জবাবদিহি করে, গান গেয়ে ওঁর বাড়ি গিয়ে উঠলাম। কারণ আসরে পাল্লা চলাকালীন বিচারকমণ্ডলী আমার বা পাল্লাদার শিল্পীর গান বিচার করে আমার হার রায় দিল, এতে মনে অসম্ভব ধাক্কা লাগল, ঠিক করলাম আর গান করব না। ডুগি একতারা ভেঙে ফেলে দেব ঠিক করলাম, বাড়ি না এসে ডাঃ একরামুল হকের বাড়ির পথে পা বাড়ালাম। ওঁর কাছে গিয়ে সব ঘটনা অকপটে জানিয়ে গান আর কখনও না-করার সিদ্ধান্তও তাঁকে জানালাম। আমার মতে— এত ভাল করে গান করা সত্ত্বেও ইচ্ছা করে অপমান করার জন্যে— এই রায় দিয়েছে। উনি সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর ধীরে ধীরে খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'ওরা ঠিকই করেছে। সম্মুখ সমরে এবার এর উপযুক্ত জবাব দেবার জন্য নিজেকে আরও দৃঢ়তার সঙ্গে প্রস্তুত কর। আজ থেকে তোমাকে আরও গভীরভাবে এই তত্ত্ব, এই গান শিখতে হবে। মনের মধ্যে যে রাগ জমেছে ভাল করে শিক্ষা নিয়ে ওই শিল্পীকে কোনও একটি আসরে ফেলে দাঁত ভাঙা জবাব দিতে হবে।'

মনের ঝোঁক জেদ আরও বেড়ে গেল। দিনরাত শুধু গানই আমার ধ্যান, গানই আমার সাধনা। ন'মাস পরে ওই শিল্পীকে আমাদের গ্রামের এক আসরে পেলাম। এর সঙ্গে সারারাত্রি পাল্লা গান করে প্রশ্নের পর প্রশ্ন রেখে বুঝিয়ে দিলাম অন্যায় বিচার করে বড় হওয়া যায় না।

এদিকে বাবা-মা আমার কথা অনুযায়ী একটি ১২/১৩ বছরের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ আনলেন। মেয়েটি দেখতে সুশ্রী, আমাদের পরিবারের সব কথাই খুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেছেন বাবা। বিয়ের দিন ধার্য হল। দু'দিন পরে দু'জন মানুষ আমাদের বাড়ি এলেন আমাকে দেখতে সন্ধ্যার সময় নানান কথা চলছে, দেনাপাওনা কিছুই নেই, শুধু একটি লালপাড় শাড়ি পরিয়ে বিয়ে হবে ঠিক হল। ৩০/৩৫ জন বরযাত্রী যাবে—এ কথাও হল। সবশেষে মেয়ের দাদা আমার একতারা হাতে নিয়ে পরপর দু'খানা বাউল গান গেয়ে শোনালেন এবং জানালেন উনি গান করেন। শুনে মনে খুব আনন্দ ও উৎসাহ জাগল। ভাবলাম মেয়ের দাদা যখন বাউল গান গাইল— নিশ্চয়ই কোনও বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না এরা। এর পর আটদিন পর চুলদাড়ি কেটে ধুতি পাঞ্জাবি পরে টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে করে আনলাম। নতুন বউ ঘরে এনে ফুলশয্যার রাতে বললাম, 'আজ থেকে তুমি আমার স্ত্রী— সামনে আমাদের যে দিনগুলি— শুধু খাওয়া শোওয়া নিয়ে আমরা জীবন কাটাব না, আমি বাউল রসের কর্ম তোমাকে নিয়ে করতে চাই। সে কর্ম যতই জঘন্য হোক তোমার মুখ থেকে "না" শুনতে চাই না। এতে তোমার অভিমত কী?' আমার স্ত্রী বলেছিল, 'আমি এতকাল বাবামায়ের ছিলাম, ওরা আমাকে চিরদিন রাখতে পারল না, তাই তোমার হাতে তুলে দিয়েছে। আমি তোমার। তুমি যে কর্ম বলবে বা করবে আমার মুখ থেকে "না" শব্দ কোনওদিন উচ্চারণ হবে না, সে যতই কঠিন হোক।' স্ত্রীর মুখে এই কথা শুনে মনে খুব আনন্দ হয়েছিল উৎসাহ পেয়েছিলাম। তাই গোঁসাই-এর শিক্ষা দেওয়া কর্ম নিজে স্বামী স্ত্রীতে হাতে-কলমে শুরু করলাম। ত্রুটি মনে হলেই গোঁসাইকে গিয়ে প্রশ্ন করতাম বা সঠিক যোগের হিসাব নির্ণয় করে নিতাম। এইভাবে কেটে যেতে লাগল— দ্বিতীয় মিলন জীবনের বৈষ্ণব কর্মজীবন। মনে মনে চিন্তা করলাম হাউড়ে গোঁসাই-এর একখানি গানে বলেছে সংসার করব কিন্তু সৃষ্টির পথ অবরুদ্ধ রাখব ('হাউড়ে বলে রাখব না আর বংশে দিতে বাতি')। এই চিন্তা ধারা নিয়ে জীবনের পাঁচটি বছর অতিক্রান্ত হল।

এবার এক নতুন সমস্যা দেখা দিল। দীর্ঘদিন গান গেয়ে বাইরে কাটানোর পর বাড়ি ফিরে এলে স্ত্রী কান্নাকাটি শুরু করল। আমি গ্রাম গ্রামান্তরে গান গেয়ে ফিরি। কিন্তু স্ত্রী ঘরে একা বড় শূন্যতার মধ্যে থাকে। একদিন বলেই ফেলল 'তুমি বিভিন্ন গ্রামে গান করে বেড়াবা আর আমি একা ঘরে চুপ করে শুয়ে পড়ে থাকব— এটা হয় না। যদি একটি ছেলেমেয়ে না হয়— তা হলে একা থাকব কী করে? সন্তানহীন বাড়ি বড় বেমানান।' বাবা-মাও একই কথা বারবার বলতে লাগলেন। সংসারের এই হাল দেখে এবং সকলের কথা শুনে গোঁসাই-এর যোগের হিসাব করে একটি শুভ যোগ দেখে বীজবপন করলাম এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শুভক্ষণে জন্ম নিল একটি মেয়ে। বাড়িতে সকলের ইচ্ছা একটি পুত্র সন্তান হোক, আমিও ছেলেই হবে বলেছিলাম মুখে, কিন্তু গোঁসাইয়ের ছক অনুযায়ী মেয়ের যোগে বীজ বপন করলাম—অথচ মুখে স্ত্রীকে একথা না জানিয়ে ছেলেই হবে জানালাম। এই দ্বিচারিতার কারণ হল—বংশবৃদ্ধি চাইনি আমি—অথচ সংসার ও স্ত্রী সন্তান চায়— তাই মুখে পুত্র হবে বললেও কার্যত একটি কন্যা-সন্তানেরই জন্ম দিলাম। ভেবে দেখলাম— মেয়েটি বড় হলে বিবাহ দিলে গোত্রান্তরিত হবে—আমার বংশবৃদ্ধি হবে না। তা ছাড়া পুত্র জন্মালে বংশবৃদ্ধি যেমন হবে তেমন সে যে আমার কর্ম করবে এমন কোনও কথা নেই।

এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন ডাঃ একরামুল হক মানে আমার ওস্তাদ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বাড়ি এলেন এবং জানালেন আগামী ১৪ই চৈত্র বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার আনখোলা গ্রামে আমাকে গান গাইতে যেতে হবে পির সাহেবের বাড়ি। আমি এর আগে বৈরাগ্যতলা, অগ্রদ্বীপ ধাম, পাথরচাপুড়ি, কল্যাণী ঘোষপাড়া সতীমায়ের মেলা— প্রভৃতি বিভিন্ন মেলায় গান করেছি— যে সব সাধু-বৈষ্ণব দর্শন করেছি তাঁদের প্রত্যেককে একটি প্রশ্ন করেছি। কিন্তু কেউই আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি। প্রশ্নটি হল— 'আয়না লাগে নিজের মুখ দেখতে গেলে—আয়না ছাড়া নিজের মুখ দেখার উপায় কি?' আরেকটি প্রশ্নও করি— 'সেটি হল বাড়িতে বসে রেডিওর সুইচ টিপলে নির্দিষ্ট নম্বরে আকাশবাণী কলকাতার কথা বা গান, খবর শোনা যায় বিনা তারে। আমি থাকব বাড়িতে আর গুরুদেব থাকবেন তাঁর নিজের বাড়িতে, বিনা তারে তাঁর সঙ্গে কথোপকথন হবে কি ভাবে? আপনারা কেউ কি পারবেন আমাকে এই তথ্য বা তত্ত্ব বুঝিয়ে দিতে বা কথোপকথন করতে?' কোনও গুরুবৈষ্ণব বলতে পারেননি যে তিনি পারবেন। তাই আমার দীক্ষা মন্ত্রও সে পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। তাই বর্ধমান জেলায় যখন গান করতে গেলাম ডাঃ একরামুলের সঙ্গে, তখন পিরবাবার বাড়িতে উরস্ উপলক্ষে, বিভিন্ন গান পরিবেশন করে শোনালাম। গান শেষে সকাল বেলায় পিরবাবার সামনে গিয়ে বসলাম বিদায় নেবার জন্যে। অপূর্ব জ্যোতির্ময় পুরুষ। দর্শনেই প্রত্যয় হয় তাঁর সাধক সত্তা। সুডৌল দোহারা লম্বাদর্শনধারী মানুষ। মনে পড়ে গেল আমার গোঁসাই বাবার কথা, গোঁসাই বলতেন, 'গুরু গুরু সর্বলোকে কয় আর গুরু দর্শন হওয়ামাত্রই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়।' যে গুরুর মুখচন্দ্রিমার মধ্যে কৃষ্ণের জ্যোতির্ময় আভা উজ্জ্বল প্রতিভা ভেসে ওঠে, সেই গুরু স্বয়ং গোবিন্দ। তাই পিরবাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে এদিক ওদিক চাইতে থাকলাম। পিরবাবা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি গো আমার এখানে কোন অসুবিধা হল না তো?' আমি বললাম 'না।' উনি বললেন, 'গান কোথায় শিখেছ?' আমি বললাম 'বাল্যগুরু জাফরউদ্দিনের কাছে, আমার বাড়ির কাছেই একই গ্রামের মানুষ। আর এখন গুরু হলেন ডাঃ একরামুল হক।' একরামুল হক পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন নত মস্তকে। তারপর পিরবাবা আমার দিকে হাত বাড়িয়ে কিছু টাকা দিতে এলেন। আমি বললাম, 'টাকা পয়সা আমি আপনার কাছ থেকে কিছু নেব না।' উনি স্মিত হেসে বললেন, 'কি নেবে?' আমি বললাম, 'আয়না লাগে নিজের চেহারা দেখতে হলে। আয়না ছাড়া নিজের চেহারা দেখা যায় কি ভাবে? তা ছাড়া আপনি থাকবেন আনখোলায় আর আমি থাকব কাপাসডাঙ্গায়, বিনা তারে আপনার সঙ্গে কথাবার্তা হবে কি ভাবে? এই কর্ম বা পদ্ধতি আপনাকে দিতে হবে।' আমার কথা শুনে উনি হেসে বললেন, 'হ্যাঁ দেবো আমি। ঐ জন্যেই বসে আছি। আর ঐ কর্তব্য ঠিকঠাক পালনের জন্যেই এনায়েতপুর গ্রাম, মেদিনীপুর জেলার খোদা নেওয়াজ সামসুল আউলিয়ার দরবার থেকে মাথায় পাগড়ি নিয়ে বসে আছি। এই তথ্য তত্ত্ব জানানোই আমার কাজ। তবে এসব জানতে হলে তোমাকে আমার কাছে বায়েত করতে হবে। আর আমার কাছে দীক্ষামন্ত্র নিলে তোমার জাত যাবে, তোমার সমাজ তোমাকে ত্যাগ করবে। বাবা-মা এঁরা কেউই তোমাকে মেনে নেবেন না। তাই আমার ইচ্ছা এই যে বাড়ি গিয়ে বাবা-মা-কে জিজ্ঞাসা করে অনুমতি নিয়ে আসলে তবেই তোমায় আমি দীক্ষা মন্ত্র দেব।'

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর নির্দেশমতো আমি বাবা-মায়ের কাছে সব কথা খুলে বললাম, একজন শিল্পীর পক্ষে জাতধর্ম মেনে সত্যিকারের শিল্পী হওয়া যায় না। শিল্পীকে তার সিদ্ধির স্তরে পৌঁছুতে হলে জাতের গণ্ডির মধ্যে নিজেকে বদ্ধ করে রাখলে সকলের জন্যে গান কীভাবে উঠে আসবে আমার শিল্পী চেতনায়? বাবা-মা বুঝলেন আমার বেদনা ও সমস্যা। তাঁরা আমাকে আমার বিবেক অনুযায়ী চলার নির্দেশ ও পরামর্শ দিলেন। বংশের বড় ছেলে বলে আমার করণীয় কর্তব্যের কথাও মনে রাখতে পরামর্শ দিলেন। দু'-চারদিন দারুণ ভাবনার মধ্যে কাটিয়ে অবশেষে সব সংকোচ, সংস্কার ও ক্ষুদ্রতার গণ্ডি থেকে নিজেকে মুক্ত করে অথচ বংশ মর্যাদার পক্ষে হানিকর এমন কোনও কাজ না করার শপথ নিয়ে পিরবাবার শরণাপন্ন হবার সংকল্পে অটল হলাম। আটমাস পর ওই পিরবাবা বেলডাঙা থানার রামেশ্বরপুর গ্রামে উর্স্ উপলক্ষে এলেন। পিরবাবার নাম হল— জমানায়ে আয়েফবিল্লা হজরত শাহ্ সুফি খাজা জয়নাল আবেদিন আল চিশতি (রহঃ)। উনি এলে ওঁর ভক্তদের কাছে খবর পেয়ে গানের সূত্র ধরেই ওঁর কাছে গেলাম। সন্ধ্যায় গান শেষ হল। রাত তিনটের সময় আমার দ্বিতীয় ওস্তাদ ডাঃ একরামুল হক আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন ওঁর কাছে। সামনে বসে সানুনয়ে বললাম, 'বাবা আপনার কাছে দীক্ষা নিতে চাই।' উনি আমার মুখের দিকে চেয়ে আবার বললেন, 'সমাজ সংসার মেনে নেবে তো?' আমি বললাম, 'সমাজ আমি মানি না— বাবা-মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। যত কঠিন ও দুঃসাধ্য হোক না কেন আমি আপনার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। সব কিছু শেখার জন্যে— জানার জন্যে আমি যে-কোনও কঠিন কাজ করতে প্রস্তুত।' উনি তখন আমাকে হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে শুদ্ধ কাপড় পরে ওঁর সামনে বসার নির্দেশ দিলেন। ওঁর নির্দেশমতো হাত মুখ ধুয়ে এসে ওঁর সামনে বসলাম। 'তোমার সমাজ যদি ত্যাগ করেও আমি তোমায় ত্যাগ করব না— তবে তোমায় কিছু পরীক্ষা দিতে হবে। একলব্যকে যেমন দ্রোণাচার্য পরীক্ষা করে নিয়েছিলেন আমিও তোমায় পরীক্ষা করে নেব।' আমি বললাম, 'যদি আপনি নিতে পারেন তবে আমিও দেবার জন্যে প্রস্তুত থাকব সদাই।' এর পর হাতে হাত রেখে দীক্ষামন্ত্র পড়ে দীক্ষা নিলাম।

এরপর থেকে যাওয়া আসা শুরু হল ওঁর দরবারে, সেখানে গিয়ে নানান প্রশ্ন রাখতাম আধ্যাত্মিক জগৎ নিয়ে এবং 'এলাম মারফৎ' তথ্য তত্ত্ব সম্পর্কে জানতাম। একদিন গিয়ে বললাম, 'বাবা আমার খাতার গান মুখস্থ হয় না।' উনি বললেন, 'ওগো তোমাকে আর খুব একটা খাতা খুঁজতে হবে না। কারণ আমার এই দেহ-খাতার দিকে লক্ষ রাখো। প্রয়োজনে আমি আসরে গান পৌঁছে দিব।' সেই থেকে তেমন আর খাতাপত্র পড়ি না, আসরে গান করতে উঠলেই গুরুদেবকে স্মরণ করি তখন প্রতিটি গানের প্রশ্নের উত্তর আপনিই মনের মধ্যে বা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মঞ্চে উঠে অথবা ওঠার আগে বর্তমান পরিস্থিতিকে নিয়ে কোনও গান গাওয়ার প্রয়োজন দর্শক তথা কর্তৃপক্ষ বললে ঠিক সেই মুহূর্তে গুরুদেবকে স্মরণ করলে আমি দেখেছি আপনিই সেই গান প্রসঙ্গে নানা ছন্দভাষা মনে উদয় হয়ে যায়।

একদিন এক বিয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে ঘর বর দেখতে গিয়েছিলাম। ওখানে যা খেয়েছিলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা ওরা যা খাইয়েছিল আমি যথেষ্ট বেছে বা দেখেশুনে খেলাম। বাড়ি এসে রাতে কিছু না খেয়ে শুয়ে পড়লাম। রাত্রি দেড়টা নাগাদ স্বপ্ন দেখলাম একটি কড়াইয়ে কে যেন আগুনকে জ্বাল দিয়ে জলের মতো তরল করল। তারপর দুজনে ধরে যেন আমার গায়ে ঢেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিকট যন্ত্রণায় আমি যেন ছটফট করতে লাগলাম। ভয়ংকর চিৎকার করে উঠতেই দেখছি আমার স্ত্রী আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলছে, 'কি হল? তুমি অমন করছ কেন?' আমি চেতন হয়ে মানে ঘুম ভেঙে দেখছি সারা শরীরে ধুলো লেগে, আর সারা শরীর লঙ্কাবাটা দিলে যেমন জ্বালা করে তেমনি জ্বলছে আর সারা শরীরে অসংখ্য ছুঁচ কে যেন ফুটিয়ে দিচ্ছে। জ্বলনে ছটফট করতে করতে কাঁদতে লাগলাম। আমার বাবা-মাও চিৎকার শুনে ঘুম থেকে উঠে আমার অবস্থা দেখে বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন কী হয়েছে? আমি বললাম, 'কি হয়েছে জানিনে কিন্তু সারা শরীর হু হু করে জ্বলছে আর কাঁটার মতো কি যেন বিঁধছে।' ওঁরা খুব অবাক হলেন এবং দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লেন। সারাটা রাত এই অসহ্য কষ্টের অনুভূতি নিয়ে কাটল। সকালে একজন কবিরাজের কাছে গেলাম। উনি হাত চালিয়ে বললেন 'জ্বালাবাণের ওষুধ খাইয়ে তোমার সারা শরীর জ্বালিয়ে দিয়েছে।' ওখান থেকে অন্য একজন ওস্তাদের কাছে গেলাম। ওই একই কথা বললেন, নানা ওষুধ খেলাম, অনেক ঝাড়ফুঁক করালাম, ডাক্তারি ওষুধও খেলাম, কিন্তু আমার শরীরের জ্বালা কেউ প্রশমিত করতে পারলেন না। তিনদিন তিনরাত্রি কষ্ট পাওয়ার পর কোথাও যখন জ্বালার উপশম হল না— তখন নিরুপায় হয়ে আমাদখোলা জয়নাল বাবার দরবার শরীফে আমার দীক্ষা গুরুদেবের বাড়ি বিকাল চারটায় সময় গিয়ে পৌঁছুলাম। বাবা বারান্দায় বসে আছেন। গিয়ে প্রণাম করতেই উনি বললেন, 'কি গো খুব কষ্ট হল আসতে। জ্বলন একটু হয়েছে, ভয় নেই গো, গুরু যার সাহায্য তাঁর আবার ভয় কি? আমি তোমার সঙ্গেই আছি। চলার পথে একটু বিস্মরণ হলেই একটু জ্বলন সইতেই হয়। যাও তোমার মায়ের কাছে কিছু খেয়ে এসো তারপর বসবে।' আমি মায়ের কাছে গিয়ে প্রণাম সেরে চা-মুড়ি খেয়ে এসে বাবার পায়ের নীচে বসলাম। কিন্তু আমার শরীরের জ্বালা এবং কাঁটাবেঁধার অনুভূতির কথা তখনও বাবাকে কিছু বলিনি বা বলার সুযোগ হয়নি। কয়েকজন শিষ্য চারপাশে বসে আছেন। আমি ভাবছি আমার শরীরের কষ্টের কথা বাবাকে কীভাবেই বা জানাব? সন্ধ্যা নেমে এল। বাবা বললেন, 'কেউ সেজরা শরীফ পাঠ করো।' একজন মুরিদ উঠে দাঁড়িয়ে সেজরা শরীফ পাঠ করলেন। কিছুক্ষণ পর বাবা বললেন, 'যতীন দু'-একটি গান গেয়ে শোনাও।' আমি বললাম, 'বাবা শরীরের অবস্থা ভাল নয়।' উনি বললেন, 'সেই জন্যেই গান করতে বলছি গো। গাও, তুমি গাইবে আর আমি শুনব। ওগো গুরুদেবকে আর গুণকীর্তন শোনাতে যন্ত্র লাগে না।' যন্ত্র ছাড়াই আমি পরপর পাঁচখানা গান গেয়ে শোনালাম। উনি নিশ্চুপ হয়ে আমার গান শুনে বললেন, 'যতীন একটু তেল নিয়ে এসো, আমার পায়ে দিয়ে দাও। শরীরটা ভীষণ জ্বালা পোড়া করছে।' আমি মনে মনে অবাক হয়ে ভাবছি বাবা তো কোনওদিন কাউকে পায়ে তেল ডলে দিতে বলেন এমন শুনিনি, অথচ আজ উনি ও-কথা বলছেন কেন? উঠে গিয়ে মায়ের কাছ থেকে তেলের বাটি নিয়ে এসে নিজে হাতে ওঁর দু'পায়ে তেল মালিশ করে দিতে দিতে কখন যেন বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছি, চমকে উঠে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা বললেন, 'শরীরটা বড় ক্লান্ত, যাও মায়ের খাওয়ার ডাক পড়েছে।' আমি আমার কথাটা বলার জন্য ইতস্তত করছি। উনি 'যাও তোমার মা ডাকছেন, খেয়ে এসো' বললেন। আমি কোনও কথা না বলে উঠে মায়ের দেওয়া ভাত খেয়ে এসে পায়ের কাছে বসে দেখছি কেউ নেই, বাবা একা। ভাবলাম এই সুযোগ। বললাম, 'বাবা আমার দেহের অবস্থা খুব খারাপ। এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়েছিলাম— তারা আমায় "জ্বালাবাণের" ওষুধ খাইয়ে দিয়েছে। আজ তিন দিন তিন রাত্রি দু'চোখে ঘুম নেই। সারা শরীর জ্বলে গেল।' উনি শুনে হেসে বললেন, 'তোমাকে তারা ওষুধ খাইয়েছে, আর তুমি এসে তোমার গুরুর বাড়ি মায়ের হাতে ভাত খেয়েছ। যাও সমান সমান হয়ে গেল। চুপচাপ শুয়ে পড় গিয়ে। সকালে উঠে একগ্লাস জল-পড়া করে দেব, তুমি খেয়ে নেবে, সব ভাল হয়ে যাবে। যাও তোমার গুরু সাহারা কোনও ভয় নেই।' আমি উঠে গিয়ে শুয়ে পড়লাম সেই ঘরের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম— ঘুম ভাঙল সকালবেলায় একজন পিরভায়ের ডাকে। উঠে দেখি বাবা কলের কাছে দাঁড়িয়ে, কাছে যেতেই বাবা এক গ্লাস জল ফুঁকে দিয়ে আমার হাতে দিলেন। আমি জলটা এক নিশ্বাসে চুমুক দিলাম। তারপর শরীরটা অদ্ভুত ঠান্ডা হয়ে এল, সেই তীব্র জ্বালা, কাঁটা-বেঁধা সবই উধাও। শরীর একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেল। বাবা বললেন, 'আর কোনও অসুবিধে নেই তুমি সোজা বাড়ি চলে যাও। বাড়ির সবাই দুশ্চিন্তা করছে।' আমি সুস্থ দেহমন নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

তখন সংসার জীবনে বিড়ির ব্যাবসা করতাম। শ্রমিক ছিল তেরো জন। নদিয়া জেলার পলশুড়া, বারুইপাড়া গ্রামে বিভিন্ন দোকানে হকারি করে মাল দিয়ে বেড়াতাম সপ্তাহে দু'দিন। আর যে-কোনও সময়ে কোনও গ্রাম থেকে গানের বায়না পেলে ব্যবসায়ে না গিয়ে গান করতে যেতাম। কারণ যেদিন থেকে গানের দিকে নজর দিলাম তখন থেকে গানই আমার কাছে এত প্রিয় হয়ে উঠল যে গান গাইতে কেউ নিষেধ করলে বা আমার গানের বিরোধিতা করলে মাথায় যন্ত্রণা শুরু হত। সে যতই প্রিয় হোক না কেন মুখের সামনে তাকে অপমান করতে দ্বিধা কসুর করতাম না। এখনও পর্যন্ত গানের জগৎ সম্পর্কে কেউ কটাক্ষ করলে এতই ক্ষুব্ধ হই যে ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না। কয়েকদিন আগে একজন মৌলবি এসে বলল, 'দাদা আপনার মুখে দাড়ি ঠিক আছে কিন্তু গোঁফ যা রেখেছেন সামনের ক'টা ছেঁটে ছোট করে রাখলে ভাল হয়।' মৌলবির প্রশ্নের জবাবে বিরক্ত হয়ে বললাম, 'আপনার ওই পর্যন্ত শিক্ষা হয়েছে, তবে ওই শিক্ষাতে ওই তত্ত্ব বুঝতে পারবেন না, প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রকে কলেজের শিক্ষা বললেও বুঝতে পারবে না। কারণ তার মাথায় তেমন বোঝার মতো মগজ তৈরি হয়নি।'

সাম্প্রতিক কালে সরকারের আনুকূল্যে সার্বিক সাক্ষরতার কাজ শুরু হয়েছে। বাড়ির সামনে পঞ্চায়েত মিটিং এর আয়োজন সকাল থেকে চলছে। একটা প্রাইমারি স্কুল চত্বরে এটা হচ্ছে। হঠাৎ সেক্রেটারি সাহেব এসে বললেন, 'যতীন, আজ আমাদের এখানে মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক দপ্তর থেকে বিভিন্ন সাক্ষরতা ভিত্তিক নাটক, বাউলগান পরিবেশন করা হবে। তুমিও তো বাউল গান করো— মঞ্চে ২/৪ খানা গান গাইলে হত না।' আমি বললাম, 'সাক্ষরতার গান কেমন হবে আমার তো তেমন কোনও গান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানা নেই।' উনি বললেন, 'মানুষকে লেখাপড়া শেখার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা, অর্থাৎ উৎসাহ জোগানো— এমন কিছু গান তোমায় গাইতে হবে।' বাড়ি গিয়ে বসে কলম ধরে পরপর চারখানা গান লিখলাম। তারপর সন্ধ্যায় মঞ্চে গিয়ে সকলের সামনে দাঁড়িয়ে ওই গান গাইতে লাগলাম। লক্ষ করে দেখেছি, মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। গান শেষে মঞ্চ থেকে নেমে আসতেই উনি বললেন, 'তুমি এত সুন্দর গান করতে পারো, তা আমাদের সঙ্গে আগে থেকে যোগাযোগ করনি কেন?' আমি বললাম, 'কারও কাছে তেলিয়ে বলাটা আমি পছন্দ করি না। দুটো গান শিখে বিভিন্ন অফিসে ধরনা দিয়ে বলে বেড়াব আমি একজন শিল্পী আমাকে প্রোগ্রাম দিন, ডাকুন গোছের কথা বলে বেড়ানো আমার পেশা নয়, আমি গরিব হতে পারি তবে ভিখিরি নই। গাছের বিচার ফলে। আমি যে কী শিল্পী কেমন শিল্পী সেটা বিচার হবে আমার গানে বা জ্ঞানে। গুরুদেব দয়া করে যে শিক্ষা দিয়েছেন, যা শিখিয়েছেন, ঝোলার মধ্যে পুরে নিয়ে ঘুরে বেড়াব, নিশ্চয় জ্ঞানীর বাজার কোথাও না কোথাও মিলবে সেখানে নিশ্চয়ই আমি মর্যাদা পাব।' তারপর মদনমোহনবাবু বললেন, 'আগামীকাল মির্জাপুর গ্রামে অনুষ্ঠান হবে, তুমি সন্ধ্যায় তোমার যন্ত্রসঙ্গীসহ গিয়ে অনুষ্ঠানে যোগ দেবে।' আমার শুনে মনে বড়ই আনন্দ হল। পরদিন মির্জাপুর যাবার জন্য তৈরি হচ্ছি আর আকাশে মেঘ ঘনিয়ে আসছে। সঙ্গীরা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলছে এই মেঘ মাথায় নিয়ে কীভাবে রওনা হবে? আমি তাদের সংশয় দেখে বললাম, 'জীবনে প্রথম সরকারি বাবুরা ডেকেছেন, যত কষ্ট বা বাধা আসুক না কেন আমরা যাবই। নিশ্চয়ই গুরুদেবের আশীর্বাদ আমার সঙ্গে থাকবে সর্বদা, তাঁর আশীর্বাদ আমার মাথায় ছাতার মতো আচ্ছাদিত হয়ে আমার রক্ষা করবে— দেখো বৃষ্টি হবে না।' সবাই আমরা নির্বিঘ্নে মির্জাপুর পৌঁছুলাম। মদনমোহনবাবু বরুণবাবু আমাদের দেখে সন্তুষ্ট হয়ে প্রথমেই আসরে আমাদের গান গাইবার সুযোগ দিলেন। গুরুদেবকে স্মরণ করে মঞ্চে উঠতেই মির্জাপুরের মানুষ বিশেষ করে মুসলিম পল্লিতে আমার নাম ডাক আছে ইসলামি গান করার জন্য— আমাকে দেখে বা যাওয়া দেখে আরও বেশি জনসমাগম হল সেদিন। গান পরপর সাত আটখানা গাইলাম। গানের সবাই খুব প্রশংসা করল। গানের শেষে ভাল মিষ্টি পাউরুটি খাওয়াল। রাতে বাড়ি ফিরে এলাম। বাড়ি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি শুরু হল। ওই প্রথম মদনমোহনবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হল। এর কিছুদিন পর আমার বাড়িতে চিঠি এল একটি। সেই চিঠিতে জানলাম ফারাক্কার অর্জুনপুর হাইস্কুলে বাউল ফকির রাজ্যসম্মেলন হবে। দু'জনকে ডেকেছে। চিঠিটা নিয়ে গিয়ে ওস্তাদ জাফরউদ্দিন ও গোঁসাই মদনদাস বৈরাগ্য ও ডাঃ একরামুল হককে দেখালাম। ওঁরা দেখে খুব খুশি হলেন এবং আশীর্বাদ করলেন। ওঁদের ও বাবা মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে চললাম আমরা অর্জুনপুর হাইস্কুলের সম্মেলনে। গিয়ে দেখলাম অজস্র নামী দামি শিল্পীর জমায়েত। এঁদের মধ্যে আমি কীই বা গাইব এই সব নানা চিন্তা করছি। বাউলের পোশাক তৈরি করানো হয়েছিল। প্রথম দিন সকালে পোশাক পরে নগর পরিভ্রমণ করে রেললাইনের পাশে একটি বাগানে মঞ্চে জমায়েত হলাম এবং প্রথম দিন একটি গান পরিবেশন করার জন্যে নাম লিখে দিলাম, বৈকাল তিনটে থেকে রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত বসে থেকে একটি গান করারও সুযোগ হল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন শেষে স্কুলে ফিরে এসে পোশাক খুলে খেয়ে শুয়ে পড়লাম। দ্বিতীয় দিন আবার বিকালে, তিনটার সময়ে পোশাক পরে মঞ্চের পাশে হাজির হলাম, দেখছি প্রতিটি শিল্পী একখানা করে গান পরিবেশন করার সুযোগ পাচ্ছে। আমি ওইদিন রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত বসে থেকে একটিও গান করার সুযোগ পেলাম না। রাতে স্কুলে এসে পোশাক খুলে খেতে যেতে আর মন চাইছে না। বারবারই মনে হচ্ছিল সেই কাপাসডাঙা থেকে এই অর্জুনপুর সম্মেলনে এসে একটি গান গাওয়ারও কি সুযোগ হবে না? বাড়ি ফিরে গিয়ে যখন গুরুদেব জিজ্ঞাসা করবেন, কোন গানটা গাইলাম, আমি কি জবাব দেব? এখানে কি শুধু খেতে আর পয়সা নিতে এসেছি? নিজেকে নানা প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত করতে থাকলাম। মনে হল— না এভাবে তো চলতে পারে না। এইভাবে তৃতীয় দিন এল এদিনও পোশাক পরে মঞ্চের পাশে আবার এসে দাঁড়ালাম, নিজের নাম লিখিয়ে ডাকের অপেক্ষায় রইলাম। এই দিনই শেষ দিন— তাই অধীর আগ্রহে ও উৎকণ্ঠায় সময় পার হতে লাগল। তারপর রাত্রি আটটার কাছাকাছি আমি অধৈর্য হয়ে বরুণবাবুর কাছে গিয়ে বললাম, 'একটি গানও গাইবার সুযোগ পেলাম না— এই ক'দিনে— গানই যদি না গাইব তা হলে কেন এখানে এসে তিনদিন হত্যে দিয়ে পড়ে আছি? কেন আসতে বললেন এখানে?' উনি বললেন, 'তুমি এখনও গাইতে পাওনি?' আমি বললাম, 'সুযোগ কোথায়? আপনারা তো নামী দামি বেতার ও দূরদর্শন শিল্পী নিয়েই মহাব্যস্ত।' উনি বললেন, 'যাও আমি তোমার নাম প্রচার করছি, যাও মঞ্চে যাও।' আমি বললাম, 'আমি একা কি করে যাব— আমার সঙ্গে আরও তিনজন শিল্পী এসেছেন— আমার সঙ্গে তাঁদের নামও প্রচার করুন। সঙ্গত করার জন্য এই তিনজন শিল্পী ছাড়া গান তো শ্রীহীন হবে। কেউ বাঁশি বাজাবে— কেউ হারমোনিয়াম কেউ তবলা বাজাবে— তবেই অখণ্ড গানের মেজাজ ফুটবে।' উনি চারজনের নামই প্রচার করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা মঞ্চে উঠে গেলাম। মঞ্চে উঠে সঙ্গের তিনজনকে আগে গান করে নিতে বললাম। ওদের তিনখানা গান শেষ হবার পর আমি বসে বসে ভাবছি— এই মঞ্চে বিভিন্ন নামী দামি শিল্পীরা তো সাক্ষরতা, সম্প্রদায়-সম্প্রীতির গান গেয়ে গেছেন— আমি কী গানই বা গাইব। মনে মনে গুরুদেবদের স্মরণ করে ভাবছি— এখন দর্শকবৃন্দ যা আছেন বিশেষ করে শতকরা সত্তর ভাগই মুসলমান— তা হলে ইসলামিয়া গান পরিবেশন করে দেখি না কেমন সাড়া জাগে। এই ভেবে মঞ্চে উঠে মাইক্রোফোন টেনে নিয়ে বলেছিলাম, 'উপস্থিত সুধী শ্রদ্ধেয় দর্শকবৃন্দ ও আমার শিল্পীবন্ধুগণ— প্রথমে আপনাদের সকলকে আমার প্রণাম, নমস্কার ও স্নেহময় আশীর্বাদ জানিয়ে দু'-একটি কথা বলি। আমি কোনও বেতার-দূরদর্শন বা বিদেশ ভ্রমণকারী শিল্পী নই। এই গ্রামের মাঠে ঘাটে পল্লিতে ঘুরে বেড়ান একজন নগণ্য শিল্পী। গানের ভাষার সুর, তাল অবশ্যই ভুল হতে পারে, তাই সকলের কাছে প্রার্থনা, অধম মনে করে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। —এই বলে এই গান শুরু করলাম, 'নবীকে চেনা হল না/ যারে বলি নবী নবী, তাহার তত্ত্ব পেলাম না।' গানখানি আমি তো মঞ্চে গাইছি এবং নাচছি— এর ফাঁকে লক্ষ করে দেখছি দর্শকবৃন্দের অনেকে মাথায় চাদর গামছা বেঁধে আমার তালে তালে ওরাও নাচছে। গেটের কাছে আট/ দশজন মানুষ দাঁড়িয়ে— ওরা সবাই সমস্বরে বলছে 'থামাথামি নেই চালিয়ে যান।' গান শেষ হতে না হতে ফারাক্কার এম. এল.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ হাসানুজ্জামান সাহেব মঞ্চের নীচে সামনে এসে বলছেন, 'যতীনদা আপনি চালিয়ে যান।' গেটের সামনে লোকের ভিড় দেখে প্রথমে ভয় হয়েছিল— ভাবছিলাম হয় তো গানে কোনও ভুলচুক হয়েছে আমার ঝামেলা করবে ওরা। পরে বুঝলাম আমার গানে খুশি হয়ে ওরা আমাকে উৎসাহ দিচ্ছে। আমিও উদ্দীপ্ত হয়ে আর একখানা গান ধরলাম। এ গান রজ্জব দেওয়ানের লেখা 'তারে ধরতে কয়জন পারে, তারে চিনতে কয়জন পারে/ পঞ্চরসে রাখাল বেশে ফুটল আবদুল্লার ঘরে/ ধরতে কয়জন পারে চিনতে কয়জন পারে।' দ্বিতীয় গানটা শেষ করে মঞ্চ থেকে নেমে যেতে চাইলাম। গেটের কাছে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা বাধা দিল। আরও অনেক শিল্পী গাইতে বাকি ছিল তাই সবাই বাধা দেওয়া সত্ত্বেও নেমে এলাম। দর্শক-বৃন্দকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বরুণবাবু বললেন, 'অনেক শিল্পী এখনও গাইবার জন্যে অপেক্ষা করছেন তাঁদের গান হয়ে গেলে যতীন হাজরা আবার মঞ্চে উঠে গান করবেন।' আমি মঞ্চ থেকে নেমে আসতেই বরুণবাবু আমায় বললেন, 'তুমি এক্ষুনি স্কুলে গিয়ে শুয়ে পড়। যাবার সময় ওদের বলে যাও একটু পরেই ফিরে আসবে।' যাই হোক প্রায় চোরের মতো চুপি চুপি লুকিয়ে স্কুলে পালিয়ে গেলাম। পরদিন সকালে অনুষ্ঠান সেরে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরে আসার সময় অনেক লোক আমার ঠিকানা লিখে নিয়েছিল। মঞ্চ থেকে গান গেয়ে নেমে এসে একটু ভোরের দিকে আমি যে ঘরে থাকতাম ওই ঘরের এক পাশে আর একজন শিল্পীবন্ধু ছিলেন। ওঁর পরিচয় আমার তেমন কিছু জানা হয়নি। তবে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আপনার বাড়ি কোথায়?' উনি বললেন, 'আমার বাড়ি উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে নেমে সুভাষগঞ্জ গ্রাম।' ঠিক ভোরবেলায় উনি আমায় এসে বললেন, 'দাদা আপনার সঙ্গে কথা আছে, আমার এখানে আসুন।' আমি উঠে ওঁর বিছানার পাশে বসলাম। দেখতে ভারী সুদর্শন মানুষ। মাথায় বড় বড় চুল উপর থেকে যেন কোঁচকানো, কাজলকালো দুটি আয়ত দীর্ঘ চোখ গায়ের রং কৃষ্ণের মতো কালো। একবাক্যে শ্রীকৃষ্ণ বললে ভুল হবে না। অতি শান্ত নম্র ধীর ভাব মনের মধ্যে কোনও অহংকার আছে বলে মনে হল না, তবে গর্ব আছে। পাশে এসে বললাম, 'বলুন কি বলবেন?' উনি আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন— তারপর ঠিকানা। আমি আমার নাম ঠিকানা বলতেই উনি একটি খাতা বের করে লিখে নিলেন। তারপর একটি কার্ড বের করে পথ নির্দেশ লিখে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'আপনি পয়লা বৈশাখ আমার বাড়ি আসুন পথ খরচা ও সাম্মানিক দক্ষিণা অবশ্যই দেওয়া হবে।' কার্ডে লেখা ছিল ওঁর নাম : তরণীসেন মহান্ত।

আমি আমন্ত্রণপত্রটি হাতে নিয়ে বাড়ি এসে প্রথমে আমার প্রথম গুরু জাফরউদ্দিন সাহেবকে দেখালাম। উনি দেখে হাসতে হাসতে বললেন, 'তোকে বলেছিলাম না, তুই অনেকদূর যাবি। আমার আশীর্বাদ বিফলে যাবে না, জিন্দেগীভর তেমন কিছু করতে না পারলেও আল্লার জিকির আমি কোনও দিন কাজ করিনি। তিনার এই আত্মবিশ্বাস আমার মনের জোর বাড়িয়ে তুলত।' কার্ডখানি নিয়ে চললাম আমার দ্বিতীয় গুরুদেব ডাঃ একরামুল হকের কাছে। উনি আমাকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'নিশ্চয়ই তুমি জয়ী হবে এবং সুসম্মান বহন করে আনবে।' সকলের আশীর্বাদ নিয়ে সেই অচেনা জেলায় চললাম। রাস্তা অনুযায়ী সকালে বেরিয়ে খুঁজে খুঁজে গিয়ে পৌঁছুলাম উত্তর দিনাজপুর জেলার সুভাষগঞ্জ গ্রামে। সবই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেন অচেনা অপরিচিত। একা একা নির্বোধের মতো খানিকটা অসহায়ের মতো অফিসে দেখা করে নাম লিখে দিলাম। তারপরে একজন আমায় সঙ্গে নিয়ে একটা বড় চাঁচমহল ঘরে থাকা শোবার জায়গা দেখিয়ে দিল। আমি বিছানা পেতে বিশ্রাম করতে লাগলাম, আর উৎকণ্ঠিতভাবে আসরের ডাকের অপেক্ষায় সময় গুনতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর তরণীদার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। উনি বললেন, 'আজ আপনার আসর দিচ্ছি না, আজ বিশ্রাম করুন। আগামীকাল, বৈকাল ৪-৬টার সময় মনসুর ফকিরের সঙ্গে আপনাকে মঞ্চে পাঠাব।' মনসুর ফকিরের নামও জানা নেই, ভাবনা শুরু হল। উনি আমাকে কেমনভাবে সঙ্গে নেবেন, কি ধরনের শিল্পী, কি গান গাইবেন, আমি ওঁর পাশে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে গান গাইতে পারব কিনা— এই সব সাত-পাঁচ ভেবে অস্থির হলাম। তারপর বিকেল ৪টের আগেই মঞ্চে উঠে বসলাম, সঙ্গে মনসুর ফকির নিজেই মঞ্চে উঠে দাঁড়িয়ে গান শুরু করলেন। আমি নীচে বসে থাকলাম। উনি পরপর সাতখানা গান করে বসলেন। শেষ গান গাইলেন, 'পারে কে যাবি নবীর নৌকাতে আয়/ রূপকাষ্ঠের নৌকাখানি নাই ডোবার ভয়।' লালন ফকিরের গানখানি গেয়ে বসলেন। আমার মনে হল আমাকে উনি পরীক্ষা করার জন্য এই গানখানি গাইলেন। আমি ঘড়িতে দেখছি ১ ঘণ্টা ১০ মিনিট সময় কেটে গিয়েছে। তারপর তরণীদার ইঙ্গিতে মঞ্চে গান গাইতে উঠলাম। মনসুরের গানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম গান আরম্ভ করলাম : 'যারে বলি নবী নবী তাহার তত্ত্ব পেলাম না/ নূর নবীকে চিনলে পরে চিনা যায় পরুয়ারে/ সারুয়ারে বলেছে বেনা নূর নবীজির আইন ধরে চলেছিল চার ইয়ারে/ শেষেতে কুরনি শহরে আলির সঙ্গে হয় জানা/' এরপর মনসুর আর নিজে না উঠে ওঁর এক সঙ্গীকে গান করতে মঞ্চে পাঠালেন। একটি গান আমার গানের পরিপ্রেক্ষিতে গাইলেন, তবে আমার গানের জবাব হল না বলে আমার মনে হল। আমি পরে দ্বিতীয় গান নবীস্তুতিই গাইলাম। সে গানের যে জবাব হওয়া দরকার সেটাও হল না। এই চার পাঁচখানা গান গাইবার পর সময়ও শেষ। ওরা সকলেই উঠে মঞ্চ থেকে নেমে চলে গেল। আমি আমার ডুগি একতারা নিয়ে গুছিয়ে উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে কে যেন পেছন থেকে আমারে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। পিছন ফিরেই দেখে তরণীসেন মহান্ত আমায় জড়িয়ে ধরে বিশাল গর্ব ও আনন্দভরা মুখে মাইক্রোফনের সামনে আমাকে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'ইনিই সেই যতীন হাজরা, যাঁকে আমি অর্জুনপুর হাইস্কুলে রাজ্য বাউল ফকির সম্মেলনে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গে একজন সুদক্ষ সুকণ্ঠ প্রকৃত জাত-ফকির বলে শনাক্ত করে আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিলাম। এখনকার কমিটি হয়তো এঁর সংগীত প্রতিভা সম্যক উপলব্ধি করতে না পেরে এঁকে প্রথমত ফকির শিল্পী বলে মনে করছিলেন না। ইনিই সেই যতীন হাজরা— যাঁকে মঞ্চে না ওঠালে তাঁর জাত চেনা যায় না। যতীনদা অপূর্ব হয়েছে আপনার আসর। কমিটি তথা দর্শকবৃন্দ সকলেই ধন্য।' আমি মনে মনে আমার গুরুদেবদের প্রণাম জানালাম। আজ এখানে পৌঁছে দিয়েছেন তো তাঁরাই। তাঁদের আশীর্বাদ ও প্রেরণাই আমার পরম পাথেয়। ওই অনুষ্ঠান শেষে চারদিন পর বাড়ি ফিরলাম এবং ওখানকার সমস্ত খবর গুরুদেবদের জানাতেই ওঁরা যে কী খুশি হলেন— তা বর্ণনা করা আমার ভাষাতীত। কিছু দিন পর মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক বাড়িতে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। উনি— মদনমোহন দাস মহাশয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানিয়েছেন কলকাতায় রবীন্দ্রসদনে সর্বভারতীয় লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠান হবে। বিভিন্ন রাজ্যের শিল্পী সমন্বয়ে এই অনুষ্ঠান হবে। শিল্পীদের সল্টলেক স্টেডিয়ামে থাকার ব্যবস্থা। পরদিন বেলডাঙা স্টেশন থেকে তিনজন শিল্পী সঙ্গীকে নিয়ে ট্রেনে চেপে বসলাম। যথাসময়ে শিয়ালদা স্টেশনে নেমে অনেক রাতে অটো রিকশায় সল্টলেক স্টেডিয়ামে পৌঁছুলাম। সম্পূর্ণ অচেনা জায়গায় একমাত্র মদনবাবুর চিঠিই ভরসা। চিঠিটা এক ভদ্রলোককে দেখাতেই উনি আমাদের ভিতরে অফিসে নিয়ে গেলেন এবং পরিচয় করিয়ে দিলেন। এমন পরিবেশে নিজেকে দেখে কেমন যেন অভিভূত হয়ে গেলাম। নিজেরই অজান্তে চোখে জল ভরে এল, গুরুদেবের গভীর আশীর্বাদ ও শিক্ষা ছাড়া এই জায়গায় কি আমি পৌঁছুতে পারতাম! তারপর দুপুরে খাওয়া সেরে বিকেল তিনটের মধ্যে পোশাক পরে প্রস্তুত হয়ে বিভিন্ন শিল্পীর সঙ্গে লাক্সারি বাসে চেপে রিমঝিম বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে আমরা রবীন্দ্রসদনে পৌঁছে গেলাম। দেখলাম বিশাল মঞ্চ, প্রথমেই আমাদের সম্প্রদায় সম্প্রীতির উপর ভিত্তি করে গান পরিবেশন করতে নির্দেশ দিলেন। মঞ্চে উঠে প্রথমেই এই গানটি গাইলাম : 'শোন গো বিশ্ববাসীগণ মানুষ হইয়া করো সবে মানুষের পুজন/ এই ভারতবর্ষ মোদের কাছে শান্তিনিকেতন।' গানখানি করে মঞ্চ থেমে নেমে আসতেই দেখতে পেলাম, লম্বা দোহারা শরীর বাউল পোশাকে সজ্জিত একজন বাউল শিল্পী, দেখে যেন চেনা মনে হচ্ছে। আমাকে দেখে উনি বললেন, 'কোথায় বাড়ি তোর?' আমি বললাম, 'মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা থানা, আমার নাম যতীন হাজরা।' উনি আমাকে বললেন, 'আমাকে চিনিস না? আমার নাম প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী। আমাকে টি. ভি-তে দেখতে পাস না? আমি বাড়ি ছিলাম না— কাল আমেরিকা থেকে বাড়ি ফিরেছি। এরা বলল তাই না এসে পরলাম না।' মনে ভাবলাম এত সাধের জৌলুস-এর একখানা গান না শুনে যাব না এখান থেকে। আমার পরে একঘণ্টা ধরে কবিগান হল, তারপর যথাক্রমে নেপালি গান, গুজরাটি গান, সাঁওতালি গান হল। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের শিল্পীদের রেকর্ডকৃত গানের সঙ্গে নাচ দেখলাম। শেষে ওই শিল্পী মানে প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী মঞ্চে উঠলেন। বেশ আগ্রহ নিয়ে মঞ্চের পাশে দাঁড়ালাম। উনি দু'পাশে তিনজন করে ছ'জন যন্ত্রী বসালেন তারপর মাঝখানে বসে একখানি গান শুরু করলেন। লালনের অতি বিখ্যাত গান 'সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে/ লালন বলে জাতের কি রূপ দেখলাম না এই নজরে।' একটি অতি পরিচিত সাধারণ সুরে গানটি গাইতে দেখে মনে মনে ভাবলাম ইনিই আমেরিকা-রাশিয়া-জাপান ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং ছ'জন যন্ত্রী সংগত করছেন, আর আমাকে ডেকেছেন দু'জন শিল্পী ও একজন যন্ত্রী নিয়ে। এতে নিজে বাজিয়ে কি গাইব? আর তার মর্যাদা কে দেবে? যাই হোক অনুষ্ঠান শেষে আবার বাসে করে সল্টলেক স্টেডিয়ামে নিয়ে এলেন। তারপর ওঁরা বললেন, 'লালগোলা যাবার ট্রেন ১০-৫৫ মিনিটে। আপনি কি ওই গাড়িতে যেতে চান?' আমি জানালাম আর কোনও অনুষ্ঠান না থাকলে বাড়িই যাব। তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে প্রস্তুত হয়ে বের হওয়ার মুখে আমার হাতে ওঁরা ২৭০.০০ টাকা দিলেন। আমি কেমন অভিভূত হয়ে গেলাম। গ্রামের সামান্য মানুষ— এতগুলো মানুষের সামনে গান করেই নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম।

এরপর বেশ কিছুদিন পর ওই একই বছরে আমার দীক্ষা গুরুদেব খাজা জয়নাল বাবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উরস্ উৎসব। ১৪ই চৈত্র উৎসবে গেলাম। ওঁর শিষ্য সংখ্যা প্রায় সত্তর হাজার। উনি উৎসব মঞ্চে বসে বিভিন্ন শিষ্যদের ডাক দিচ্ছেন আর প্রেমিক শিষ্যদের হাতে একখানি করে লোহার চিমটি দান করছেন। কাটোয়ার একটি মেয়ের হাতে একটি ত্রিশূল দান করলেন। হিন্দুদের জন্য ত্রিশূল দেবার পর মঞ্চ থেকে উনি আমাকে ডাকলেন। প্রথম ডাকে সাড়া না দিলেও দ্বিতীয় তৃতীয় ডাকে সাড়া দিতেই হল। আমার আশংকাই সত্যি হল। আমি উঠে দাঁড়াতেই একটি লোহার ত্রিশূল হাতে নিয়ে বললেন, 'ধর।' দু'হাতে ধরে আছেন। আমি রাগতভাবে বললাম, 'ওই লোহার ত্রিশূল বইতে আমি আসিনি, ওই ত্রিশূল আমার প্রয়োজন নেই।' উনি বললেন, 'তুমি কি নিতে এসেছ?' আমি বললাম, 'আমি ত্রিশূলওয়ালার সন্ধানে এসেছি।' উনি বললেন, 'তুমি কি ত্রিশূলওয়ালার সন্ধান আজও পাওনি? ত্রিশূলওয়ালাকে কি দেখনি তুমি?' যখন উনি ওই কথাগুলি বলছেন তখন ওঁর দ্বিদল পদ্মে, মাকাকে মাহানুদায় এক অপূর্ব জ্যোতি ফুটে উঠেছে। রূপের কিরণ এতই তাজাল্লি ফুটে উঠেছিল তা লিখে বর্ণনা করা যায় না। আমি তখন স্বচক্ষে রূপের কিরণ প্রত্যক্ষ করে অভিভূত হয়ে কি বলব ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। উনি আবারও বললেন, 'তুমি স্বয়ং মহাদেবকে কি খুঁজে পাচ্ছ না?' আমি দেখে বলতে বাধ্য হলাম, 'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি।' 'তা হলে তোমার সেই ত্রিশূলওয়ালা তাঁর হাতের ত্রিশূল তোমায় দান করছেন, তুমি ধর।' আমি দু'হাত বাড়িয়ে দিলাম, উনি আমার হাতে একখানি লোহার ত্রিশূল তুলে দিলেন। সারা শরীর আমার থরথর করে কাঁপতে লাগল, বুকের ভিতর যেন বহুদিনের জমাট কান্না দরজা ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আমার ভিতরটা যেন নিঃশব্দ চিৎকারে চৌচির হয়ে যেতে চাইছে। অথচ দু'চোখে এক ফোঁটাও জল নেই। যেন প্রবল তাপে শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছে। সে এক অবর্ণনীয় অনুভূতি বুকে নিয়ে ত্রিশূল ওঁর পায়ের কাছে রেখে আভূমি প্রণাম করে আবার ত্রিশূল হাতে টলতে টলতে ভূতগ্রস্ত এক মানুষের মতো স্খলিত চরণে মঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলাম। হঠাৎ দেখি আমার গানের দ্বিতীয় গুরু ডাঃ একরামুল হক আমার পাশে এসে জড়িয়ে ধরে বলছেন, 'তোমার কি হয়েছে? অমন করছ কেন? আমি তোমার পাশে আছি তো। গুরুদেব তোমার পরিশ্রমের পুরস্কার দিয়েছেন এ তো পরম গৌরব ও গর্বের। তোমার অর্জনের প্রমাণপত্র দিয়েছেন। তুমি গুরুদেবের কাছে দীক্ষা নিয়ে তাঁর কর্ম তুমি করেছ। তাই তিনি সন্তুষ্ট হয়ে তোমাকে একটি জায়গায় পৌঁছে দিলেন।' আমি বললাম, 'আমি এ নিয়ে বাড়ি যাব না, আমি তো দেখেছি ত্রিশূল চিমটি নিয়ে সকলে রাস্তায় রাস্তায় উদাসী হয়ে ভিখারির মতো ঘুরে বেড়ায়।' আমার জানা চিমটি দু'রকম একটি লোহার অপরটি চামড়ার। চামড়ার বলতে গোল স্ত্রীদ্বারের আকৃতি ও কিছুটা ত্রিশূলের মতো। তা হলে ত্রিশূল নিয়ে বেড়াতে হলে আর সংসার ধর্ম করতে পারব না। সবাই আমাকে ভণ্ড বলবে, কারণ হাতে ত্রিশূল মাথায় চুল মুখে দাড়ি। এদিকে সন্ধে হলে বউ-এর কাছে যাওয়া বা স্ত্রীসংসর্গ করা সম্ভব নয়। এতে মানসিক চাপ তৈরি হয়। এই ধরনের বিপরীত আচরণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব বলে মনে হল। ডাক্তারবাবু বললেন, 'তুমি নিয়ে গিয়ে রাখো তো, পরে বাবার সঙ্গে আলোচনা করে তোমায় বলছি— তোমায় কি করতে হবে।' এরপর সকালবেলায় খাজা বাবা ডাক দিলেন, সামনে পায়ের কাছে বসতেই উনি একটি লাল সুতির কাপড় আমার মাথায়

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাগড়িস্বরূপ বেঁধে দিয়ে বললেন, 'তোমার গুরুদেব যা দিয়েছেন তুমি তার ভক্তি রাখবে এবং এখন সংসারধর্ম পালন করবে। যখন প্রয়োজন মনে করব তখন তোমায় সংসার থেকে তুলে নিয়ে নির্দিষ্ট কর্মের মধ্যে পাঠাব।' আমি দরবার থেকে ত্রিশূল হাতে না নিয়ে চলে আসব মনস্থির করলাম। দেখছি আমার গানের দ্বিতীয় গুরুদেব ডাঃ একরামূল হক ত্রিশূলটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, বললেন, 'ধর, নিয়ে চল।' তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে উনি নিজে হাতে বহন করে বেলডাঙ্গা পর্যন্ত নিয়ে এসে আমার দিয়ে বললেন, 'তুমি সোজা বাড়ি গিয়ে একটা পরিষ্কার জায়গায় রেখে দাও এবং প্রত্যহ এতে তেল জল দেবে ও একে ভক্তি করবে।'

মাথায় পাগড়ি ও ত্রিশূল আজও পবিত্র জায়গায় রেখে দিয়ে ভক্তি করে চলেছি। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় আমার দীক্ষা গুরুদেব উরস্ উৎসব করতে যেতেন আমরাও সঙ্গে যেতাম। সেই প্যান্ডেলে আমাকে সেজরা শরীফ পাঠ, ইসলামিক গজল, নাত ও ফকিরি, মারফতি, আধ্যাত্মিক গান করার নির্দেশ করলে আমি পরিবেশন করতাম। ইনি আমাকে একটি কাজ করতে নির্দেশ দিলেন। কাজটি হল : রাত্রে একা নিরালায় নিভৃতে বসে সেজরা শরীফ পাঠ এবং স্মরণের মাধ্যমে দর্শন জিকির প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে গুরু বর্জক সামনে ভাসিয়ে আপনাকে মিশে ফানা হয়ে যাওয়া এবং দেখতে হবে বা দেখা যাবে (আমিই গুরু গুরুই আমি)। এই বিশ্বব্যাপী আমাকে ছড়িয়ে দেওয়া বা আমিই ছড়িয়ে যাওয়া।

আমি বিভিন্ন মেলায় গিয়েছি যেমন বৈরাগ্যতলার মেলা, পাথরচাপুড়ির মেলা, কল্যাণী ঘোষপাড়ার সতীমায়ের মেলা, অগ্রদ্বীপধামের মেলা এবং বিভিন্ন পির মাজার বা পির সাহেবের দরবার। তবে আমার সমস্ত দেহ সত্তার আড়ালে বসে একটি অমোঘ শক্তি কাজ করে। সেটি হল পরম করুণাময়, আল্লাহ্ জামানায়ে আরেফ বিল্লা হজরত শাহ সুফি খাজা জয়নাল আবেদিন আল চিশতি (রহঃ)। বিভিন্ন গ্রামে বাউল মেলায় ইসলামিয়া গান পরিবেশন করার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে থাকি। ওখানকার মানুষ আমার নামে প্রচারপত্র ছাপলে আমার পদবি বা নানা বিশেষণ দেন— যতীন হাজরা ফকির ইসলামিয়া তত্ত্ববিশারদ অথবা ইসলাম তত্ত্বের জাহাজ...ইত্যাদি। আমার নামের পাশে কোন বিশেষণ সাজাচ্ছে এটা আমার কাছে গর্ব বা অহংকারের কথা নয়। কিন্তু ওইসব বিশেষণের উপযুক্ত কাজ করে প্রমাণ করতে পারব কিনা— অথবা এই মর্যাদা বহন যাতে করতে পারি সেই চিন্তাতেই আকুল হয়ে উঠি। বিভিন্ন বাউল মেলাতে গান করতে গেলে মুসলিম শ্রোতারা নানা ইসলামিয়া প্রশ্ন করেন এবং সব প্রশ্নগুলির সন্তোষজনক উত্তর আমি দিতে চেষ্টা করি। বাল্যকাল থেকে যে শিক্ষাগুলি আয়ত্ত করেছি সেগুলি সুন্দরভাবে প্রয়োগ করতে পেরে ভাল লাগে। বাংলাদেশের একজন হাফেজ সাহেবের মাধ্যমে কোরান শরীফ বাংলা উচ্চারণ, বাংলা ব্যাখ্যা, তর্জমা করা আনিয়ে নিলাম। এটির তর্জমাকারী মৌলানা মাজাহারউদ্দিন সাহেব। আমি হিন্দু মুসলমান জানি না— আমি জানি আমি একজন শিল্পী। জানা বা শিক্ষার তাগিদে গানের মর্মভেদ করতে আমাকে প্রয়োজনীয় শাস্ত্র বা তত্ত্ব জানতেই হবে। মোটকথা এই মানুষের মধ্যে ঘুরে বেড়ালে ছোট-বড় কালো-ধলো হাড়ি-মুচি, মেথর-ব্রাহ্মণ, উঁচু-নিচু বিভেদ দেখা যায়। কিন্তু একটি বিমানে চেপে শূন্য আকাশের বুকে ভেসে বেড়ানোর সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপর থেকে নীচের মানুষগুলোকে ছোট ছোট দেখায়— যত উপরে ওঠা যায় নীচের দৃশ্যাবলি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয় এবং বহু উপরে উঠলে একটা সময়ে নীচের দূরের সবকিছুই অস্পষ্ট, ঝাপসা কুয়াশাচ্ছন্ন ও একাকার মনে হয়। মানুষের ক্ষেত্রেও তাই। গুরু নির্দেশিত পথপরিক্রমায় যিনি সিদ্ধ, তাঁর দৃষ্টি বিমানবিহারীর মতোই সমদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে যায়। তখন জাতি ধর্ম বর্ণ কুসংস্কারের ধোঁয়া ছায়া মানুষের দৃষ্টিকে আর আবিল ও অস্পষ্ট রাখে না। 'মান' ও 'হুঁস' সম্পন্ন ব্যক্তিই তো মানুষ। মান-মর্যাদা-বিবেক চালিত হয়ে পশুশক্তি থেকে জ্ঞান ও প্রেমের জগতে উঠতে পারলে মনুষ্যত্ব জাগে পরিপূর্ণরূপে। প্রেমের জগৎটি অবশ্য আর একটু এগোনো। বাহির জগতের কর্মচিন্তা সামাজিকতা এগুলি বেঁচে থাকার মাপকাঠি মাত্র। কিন্তু অন্তরে ভালবাসা যার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে তার দর্শন বা মিলন না হওয়া পর্যন্ত কুরে কুরে খায়। তাই তো প্রেম করো তুমি তোমার প্রভুর সঙ্গে যিনি প্রেম আস্বাদন করার জন্য জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এই নিখিল বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে দিয়েই স্রষ্টা নিজেকে আস্বাদন করতে চেয়েছেন। যে প্রেমের চূড়ান্ত পর্যায় মিলন — চোখের জল ফেল এইভাবে— সে জল অন্য কেউ যেন না দেখে। তোমার চোখের জল অন্য কেউ দেখলে মাঝখানে দেওয়াল সৃষ্টি হবে। নিরালা নিভৃতে গোপনে চুরি করে প্রভুকে স্মরণ করে ভক্তির মাধ্যমে সেজদায় অবনত হয়ে চোখের জল ছেড়ে দাও। ভেসে যাক তোমার জায়নামাজ, ভিজে যাক তোমার আসন, অন্তরের কান্নার সুর যেন অন্য কারও কানে না পৌঁছয়। জেনে রেখো তোমার প্রভু দরজা খুলে অধীর আগ্রহে কান পেতে বসে আছে। সারাদিন শুধু কর্মের মাধ্যমে দিন কাটিয়ে দিয়ো না। অন্তরের গোপন চিলেকোঠায় সেই ছবিকে বসিয়ে রাখো, যে ছবি গুরুদীক্ষার সময় তোমায় দেখিয়ে ছিল, ওই ছবিই চিরসত্য, চির অম্লান, চলমান জীবনের পথ এবং পরপারের কাণ্ডারি। পিরের সঙ্গে প্রেম করে যে জ্ঞান গরিমা দয়া করে দান করেছেন সময় সংকীর্ণতার মধ্যে তার কিঞ্চিৎমাত্র ইশারা দিলাম।

শিল্পী জীবনে কত সুখ দুঃখের স্বাদ যে নিতে হয় তা শিল্পী না হলে বোঝা যায় না, বিশেষ করে আমাদের এই নিম্নবিত্ত ঘরে। মনে পড়ছে তিন বছর আগে রেজিনগর থানার অন্তর্গত গোপালপুর গ্রামে গান করতে যাব বলে কথা দিয়ে পঞ্চাশ টাকা অগ্রিম বায়না নিয়েছিলাম। নির্দিষ্ট দিনে কালীপুজো মণ্ডপে গান। বিকেলে গান। বিকেলে গান করতে যাব, আর ঠিক দুপুরবেলায় আমার একটিই বাচ্চা— হঠাৎ কৃমির বিকারে বিষ খাওয়া রোগীর মতো ঝিকতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ভ্যান রিকশা করে বেলডাঙ্গা হাসপাতালে নিয়ে গেলাম, তখনও ঝাঁকানি চলছে। ডাক্তারবাবু কতকগুলো ইঞ্জেকশন লিখে দিয়ে বললেন, 'সত্বর কিনে আনুন— তবে বাঁচবে কিনা জানি না।' ঈশ্বরের নাম গুরুর কথা বারবার স্মরণ করছি শিশুর শিয়রে বসে। বার বার উচ্চারণ করি— 'গুরুদেব তুমিই এই সন্তান দিয়েছ, রাখা বা নেওয়া তোমার ইচ্ছা।' স্বামী-স্ত্রী হাসপাতালের নীচে বসে কাঁদছি। বিকাল ৫টাতেও অজ্ঞান অবস্থায় বিছানায় শুয়ে। এমন সময় আমার তিন সংগতকারী এসে হাজির গোপালপুর অনুষ্ঠান করতে যাবার জন্যে। আমি সমস্ত ঘটনা ওদের জানিয়ে বললাম, 'গিয়ে ওদের বুঝিয়ে বল আমার এই বিপদের কথা। বাচ্চা একটু সুস্থ বোধ করলেই আমি চলে যাব।' ওরা গোপালপুর গিয়ে সব জানালে তারা কোনও কথা বিশ্বাস না করে মিথ্যা বলে দোষারোপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে বলেছে, 'গান গাইতে পারবে না তাই ভয়ে এল না।' অপমানিত যন্ত্রীরা অন্ধকার রাতে তিন মাইল হেঁটে রেজিনগর স্টেশনে ট্রেন ধরে আমার কাছে রাত আড়াইটের সময় এসে বলল, 'কাকা তোমার সন্তান বেঁচে আছে কিনা আমরা জানতে চাইছি না, তোমাকে এখুনি আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। সমস্ত যন্ত্র আটক করেছে, তুমি চল।' ওদের কথা শুনতে শুনতে আমার জগৎসংসার টলে উঠল— সন্তান মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে হাসপাতালের বিছানায়। বুকের মধ্যে অপমান ক্ষোভ বেদনা তীব্র শোক সব তালগোল পাকিয়ে গেল। আমি আজও সেই তীব্র যন্ত্রণার কথা ভুলতে পারি না। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করা শিশু— আর তার অসহায় পিতামাতার আর্তকান্না হাসপাতাল চত্বরের রাতের বাতাসকে যেন স্তব্ধ করে দিয়েছিল। বিশ্বচরাচরে আমাদের কেউ নেই সেই মুহূর্তে। শোকে পাগল স্ত্রীকে হাসপাতালে একা রেখে অসহায়ভাবে ওদের সঙ্গে রওনা হলাম। আমার শিশুকে ঈশ্বরের হাতে রেখে পা বাড়ালাম। স্ত্রীকে বললাম, 'যদি আমি আমার গুরুর সঙ্গে প্রেম করে থাকি— তবে তার বিনিময়ে বলতে পারি— এই অল্প বয়সে আমায় শোক সইতে হবে না। আমি হলফ করে বলতে পারি— এমন কোনও পাপ বা অন্যায় আমি করিনি যাতে আমার শিশুকে হারাতে হবে।' স্ত্রীকে বললাম, 'তুমি এখানে বসে বসে গুরুদেবকে স্মরণ করো, আমি চললাম গোপালপুর গান করতে।' অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়া স্ত্রীকে একা রেখে চোখের জল মুছে গোপালপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। জীবন যে কী সেদিনের মতো কি আর বুঝেছি? সারা পথ কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে শ্রান্ত পায়ে বহুদূরের রেজিনগরে নেমে আরও হেঁটে গোপালপুর পৌঁছুলাম। ওখানকার লোকগুলো আমায় দেখে নিজেদের মধ্যে বলা কওয়া করতে লাগল, 'বিপদ-আপদ কিছুই নয়— ভাঁওতা— আসবে না বলে ডুব মেরেছিল।' কোনও কথায় কান না দিয়ে সোজা গিয়ে জানালাম মঞ্চের শিল্পীকে নামিয়ে দিন— আমি এখুনি গান করব— বলে পোশাক পরে মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু কী গান গাইব? কোনও গানই মনে পড়ছে না। বারবার মনের দরজায় আছাড় খাচ্ছে শুধু আমার একমাত্র মৃত্যুপথযাত্রী সন্তানের মুখ! গাইব কি? হঠাৎ কে যেন নাড়িয়ে দিল— সব ঝেড়ে ফেলে নিজেকে বলি 'তুমি শিল্পী ওঠো, জাগো, গাও। জনতা অপেক্ষা করছে অধীর আগ্রহে।' নিজেকে সংবৃত করে গুরুবন্দনা শুরু করলাম। পরবর্তী শিল্পী যাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে আমার তিনি গত সন্ধ্যায় এখানে এসে আমায় না দেখে মন্তব্য করেছেন 'আমার সঙ্গে গাইতে পারবে না বলে নিজে আর আসেনি এদের পাঠিয়ে দিয়েছে।' এক শিল্পীর অন্য শিল্পী সম্পর্কে যথোচিত না জেনে মন্তব্য করা যে কত মর্মান্তিক— সেদিন তা উপলব্ধি করলাম। মর্মাহত ভারাক্রান্ত চিত্তে একখানা গান মঞ্চে গেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আজকের এই গানে কী পালা হবে? এবং আমার ভূমিকা কি থাকবে?' দর্শকদের মধ্যে একজন বলল, রাধা ও বৃন্দে পালা। তুমি বৃন্দে আর উনি রাধা। আমি বৃন্দের ভূমিকায় গান গাইতে শুরু করলাম। পাঁচ ঘণ্টা গান করার পর মিলনের গান করে আসর শেষ করে পোশাক খুলেই তখনই বললাম, 'আমার কাজ আশা করি শেষ করতে পেরেছি, এবার টাকা পয়সা যা প্রাপ্য তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দিন আমি চলে যাব।' ওরা খাবার জন্যে বলায় আমি জানালাম, 'মুমূর্ষু সন্তান আমার হাসপাতালে পড়ে আছে। স্ত্রী একা কি করছে জানি না।' নিজে বা যন্ত্রীরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউই না খেয়ে বেলডাঙা হাসপাতালে পৌঁছেই খবর নিতে, উপর থেকেই আমার স্ত্রী বলল 'ভাল আছে। ভোর থেকে ঘুম ভেঙেই সে বাবাকে দেখার জন্যে কাঁদছে।' আমি মনে মনে আমার গুরুদেবকে বললাম, 'ধন্য খাজা সত্যই তুমি প্রণম্য, তোমার চরণে শতকোটি প্রণাম।' আত্মজীবনী লিখতে বলেছেন। এই ক্ষুদ্র শিল্পীজীবনে এত ঘটনা দুর্ঘটনার ঘনঘটা, এত লৌকিক অলৌকিক ঘটনার ঘনঘটা, এত সুখ-দুঃখে দোলাদুলি যে এমন একশত খানা খাতা আর টানা দু'বছরেও বোধহয় সে লেখা শেষ হবার নয়। এই আঠারো উনিশ বছরের শিল্পী জীবনে দেখা-শোনা-জানার অভিজ্ঞতায় জীবনের থলি উপচে পড়েছে, কাকে রেখে কাকে ছাড়ি! আত্মকথা বলতে লিখতে ইচ্ছেই করে না। জীবনের ভাবনাগুলো ভাবগুলো কলমের ডগায় সে ভাবে আসে কই? আর ঘটনার ঘনঘটা সুখদুঃখের মধ্যেই কি সেই অচিন পাখিটাকে ধরা যায়? কি জানি। একজন ফকির উদাস থাকে তার প্রভুর পানে চেয়ে, কারণ হাদিস শরীফে বলেছেন— আল্লা ফারুকওয়ালা ফারুক সিন্নি অর্থাৎ আল্লা বলছেন : আমি ফকিরের ভেদ ফকির আমার ভেদ। এস্কে দিওয়ানা হয়ে প্রেমিক যখন তার প্রভুর দর্শনের পর ফানা ফিল্লাতে দাখেল হয়ে যায় আর দুই থাকে না। সম্পূর্ণ একাকার হয়ে যায়। মনে হয়, এই পার্থিব জীবনের কি ইতিহাস লিখব? যদি অনন্তকালের ইতিহাস লিখতে পারতাম তবেই লেখাটা সার্থক হত। সাধন কর্ম কলমের ডগায় লেখার চৌহদ্দিতে আসে না। রাতের অন্ধকারে ঘরে শুয়ে মানুষ যখন নিদ্রায় অভিভূত হয়ে থাকে আমি তখন আঁধার রাতে একাকী গুরুদেবের দেওয়া কাজ করে যাই। শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে দম নিতে নিতে যে ছবি ভেসে আসে সে একান্তই নিজস্ব ও গোপন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরুলিয়ার 'সাধু' গান

পুরুলিয়ায় বাউল গান অনুসন্ধান করতে গেলে আমার আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয়। সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে গান বিষয়ে যাঁরা অভিজ্ঞ বা উৎসাহী তাঁরা আমাকে নিরুৎসাহ করেন এই বলে যে, 'এ-অঞ্চলে বাউল নাই, সবই ঝুমুর।' পুরুলিয়া শহরে প্রখ্যাত ঝুমুর গায়ক কুচিল মুখোপাধ্যায় আধুনিক কালের মানুষ। একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইংরাজি পড়ান। তাঁকে বাউল গান বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে সরাসরি জানিয়ে দেন, পুরুলিয়ার বাউল গানের কোনও ধারার কথা তাঁর জানা নেই। বড়জোর দু'-চারজন বাউল গায়ক থাকলেও থাকতে পারেন কিন্তু তাঁদের গানে কোনও মৌলিকতা বা স্থানিক বিশেষত্ব নেই।

এর পরবর্তী খোঁজখবরে শলাবৎ মাহাতোর কথা জানা গেল। তিনি পুরুলিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত লোকায়ত ঝুমুরশিল্পী, প্রবীণ ও প্রতিভাসম্পন্ন গায়ক। ঝুমুর গায়নের জন্য তিনি রাজ্য সরকারের 'লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র'-র পক্ষ থেকে লালন পুরস্কার পেয়েছেন। জানা গেল প্রধানত ঝুমুর গায়ক হলেও এখন বাউল গানও করেন। রাজ্য সংগীত একাডেমি প্রকাশিত ঝুমুর গানের সংকলনে বিস্ময়করভাবে কিছু মুদ্রিত বাউল গান পাওয়া গেছে। পুরুলিয়ার প্রবীণ মানুষ, রাজনৈতিক নেতা ও সাংস্কৃতিক কর্মী নকুল মাহাতো আমাকে জানান, পুরুলিয়ায় অনেক বাউল আছেন। তাদের পাওয়া যাবে ভেতরদিকের গ্রামে।

হয়তো কেন, নিশ্চয়ই বাউলরা আছেন, কিন্তু তাঁদের নাম-যশ বা পরিচিতি নেই। তাত্ত্বিক গুরুত্ব, গুরুপাট, আখড়া বা আশ্রম, শিষ্যমণ্ডলী তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। থাকলে এতদিনে বাংলার বাউল গানের আসরে তাঁদের প্রতিনিধিত্বের চেহারা দেখা যেত।

এরপর খোঁজখবরের টানে পুরুলিয়া বেশ ক'বার যেতে যেতে পুরুলিয়া শহরের সাহিত্য ও সংস্কৃতিমনস্ক লেখক অজিত মিত্রের কাছে আমাকে নিয়ে গেলেন অধ্যাপক বন্ধু শ্যামাপ্রসাদ বসু। অজিত মিত্র আমাকে প্রথম পুরুলিয়ার 'সাধু' গানের খবর দেন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত যে, পুরুলিয়ায় বাউল গানের শূন্যস্থান সাধুগানেই পূর্ণ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তাঁকে আমি অনুরোধ করি, সাধুগান সম্পর্কে তাঁর মতামত ও একটি প্রতিবেদন আমাকে লিখে পাঠাতে। ১৯৯৭ সালের ৩০ জুলাই তিনি 'পুরুলিয়ার সাধুগান' শিরোনামে যে লেখাটি আমাকে ডাকযোগে পাঠান, এখানে তার থেকে মূল কথাগুলি তাঁর ভাষাতেই উদ্ধৃত হচ্ছে। এই লেখা পড়লে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বাউল গানের প্রভাব বহুমাত্রিক আর বহুদূর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিস্তৃত। অঞ্চল ভেদে এর ভাব, বাণী ও আঙ্গিকের ভিন্নতর চেহারা পাওয়া যেতে পারে। তার জন্য আর একটু নিবিড় অনুসন্ধান এবং ভূমিপুত্রদের সহযোগিতার দরকার। অজিত মিত্রের রচনার সারাৎসার এইরকম।

পশ্চিম সীমান্ত রাঢ়ের অন্তর্গত পুরুলিয়া জেলায় বাউল সংগীতের প্রচলন খুবই কম। যা ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তাও প্রতিবেশী জেলা থেকে আমদানি করা। কিন্তু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই, ঐতিহ্যময়ী লোকসংস্কৃতির পীঠস্থান পুরুলিয়া জেলায় প্রচলিত 'সাধু গান' এবং 'নির্গুণ ঝুমুর' সংগীতের সঙ্গে বাউল গানের নিকট আত্মীয়তা সহজেই ধরা পড়ে। বাউল সংগীতের ক্ষেত্র বহু বিস্তৃত। সহজ সাধনের কথা তার উপজীব্য বিষয়। প্রধান উদ্দেশ্য সহজিয়া মত প্রচার। পুরুলিয়া জেলায় প্রচলিত সাধুগানের উদ্দেশ্যও অনুরূপ। নিঃসংকোচে বলতে পারি এই দুই ভিন্ন সম্প্রদায় একই ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। উভয়ের মধ্যে গঠন প্রণালী ও বর্ণনায় সামঞ্জস্য দেখা গেলেও বাউল গানের সুর এবং নৃত্যে সাধুগান এবং নির্গুণ ঝুমুরের সঙ্গে একটা সুস্পষ্ট ভেদরেখা লক্ষ করা যায়। উভয় গানের গঠন-শৈলী বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বাউল গানে প্রথমেই ধুয়া থাকে। আবার বহুক্ষেত্রে বাউল সংগীতের দ্বিতীয় চরণে ধুয়া এবং গানের শেষাংশে তার পুনরুক্তি ঘটে। কখনও দুই চরণ বা তদতিরিক্ত চরণের পরে এমন একটি চরণ রচিত হয় যার শেষাক্ষরের সঙ্গে ধুয়ার শেষাক্ষরের মিল থাকে এবং সেই চরণটি গাওয়ার পরই ধুয়া গাওয়ার রীতি সুবিদিত। সাধুগান এবং নির্গুণ ঝুমুরের অধিকাংশই একই প্রণালীতে রচিত হওয়ার ফলে বাউল গানের সঙ্গে একটা অলিখিত সাযুজ্য লক্ষ করার বিষয়। রচনা কৌশলেও উভয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। উভয়ের মধ্যে হেঁয়ালি বা সান্ধ্যভাষার প্রয়োগ লক্ষণীয়।

সাধুগান এবং নির্গুণ ঝুমুরের মধ্যে একদিকে যেমন অতিশয়োক্তি, বিপরীতোক্তি এবং রূপকের ছড়াছড়ি, অন্যদিকে তেমনি দেহ ও মনকে সাধারণ পার্থিব রূপে কল্পনা করে কোনও এক অজানা সাধন জগতের ইঙ্গিত বহন করে। বাউল গানেও তার ব্যতিক্রম নেই। ভাব ও তত্ত্বের দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বাউল সংগীত, সাধুগান ও নির্গুণ ঝুমুর একই খাতে প্রবাহিত।

বাউল সংগীতের বর্ণনীয় বিষয় বহু বিস্তৃত। সামাজিক, দৈহিক, আধ্যাত্মিক, লৌকিক, পারলৌকিক নানা বিষয় নিয়ে যেমন রচিত, অনুরূপভাবে সাধুগান এবং নির্গুণ ঝুমুরের গতিপ্রকৃতিও বহুমুখী। উভয় সম্প্রদায়ের রচয়িতা কল্পনার জগতে বিচরণ না করে চক্ষুকর্ণের দ্বারা উপভোগ্য পার্থিব বিষয়ের উপর গান রচনা করেন। কোথাও কল্পনার বিলাসিতা নেই। স্থূলভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বাউল সংগীতের বর্ণনীয় বিষয় প্রধানত তিন প্রকার : দেহতত্ত্ব, সহজসাধন এবং বৈরাগ্য। এই তিনটি মুখ্য বিষয় সাধুগান এবং নির্গুণ ঝুমুরের মধ্যেও বর্তমান।

এই সম-ভাবনার নৈকট্যের উৎসমুখ কিন্তু একটিই। বাউল সংগীত, সাধুগানের প্রচলন যেকালে হয়েছিল তখন অধুনা বৃহত্তর বাংলার অস্তিত্ব ছিল না। পুণ্ড্র, রাঢ়, দক্ষিণ রাঢ়, সুহ্ম, বরেন্দ্র প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদে বাংলাদেশ বিভক্ত ছিল। সুবে বাংলার উদ্ভব পরবর্তীকালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকবরের সময়। এই বিভিন্ন জনপদগুলির মধ্যে পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও একই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের অন্তর্গত ছিল। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে বৌদ্ধাচার্য লুইপাদ এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রথম সহজধর্ম প্রচার করেন। লুইপাদ রাঢ়দেশের মানুষ। সুতরাং সিদ্ধাচার্য লুই এবং লুইপন্থীদের একদা বিচরণক্ষেত্র ছিল রাঢ় এবং পশ্চিম রাঢ়ের অন্তর্গত পুরুলিয়া জেলার বিস্তৃত অঞ্চল। সুতরাং বলতে পারি বাউল এবং সাধু উভয় সম্প্রদায়ই লুইপন্থী প্রচারিত সহজসাধন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এই সহজসাধনাই উভয় সম্প্রদায়ের উৎসমুখ।

কালক্রমে সহজিয়া সম্প্রদায় পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তার মধ্যে বাউল সম্প্রদায় অন্যতম। এই পাঁচ ভাগের উপভাগ হল পুরুলিয়ার সাধু সম্প্রদায়। একই উৎসমুখ থেকে নির্গত হলেও নানা বিবর্তনে পরিবেশ ও কালের প্রভাবে উভয়ের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ভেদরেখা পরিলক্ষিত হয়। সুরে ছন্দে পার্থক্য প্রকট হয়ে ওঠে।

রমেশচন্দ্র বসু ১৩৩৩ সালের মাঘ মাসে প্রকাশিত 'প্রবাসী'-র চতুর্থ সংখ্যায় 'বঙ্গভাষায় বৌদ্ধস্মৃতি' প্রবন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করেন তার থেকে আমরা নিঃসন্দেহ যে সাধুবাচক বাউল সম্প্রদায়ের একটি অংশ পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত বাঘমুণ্ডি থানায় আস্তানা গাড়ে এবং বাউল সংগীতের প্রচলন করে।

পুরুলিয়ার সাধুগানে সহজিয়া মতবাদের লক্ষণ সুস্পষ্ট। সাধুগানগুলিকে মুখ্যত কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা— ১) আত্মদেহে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন ২) গুরুভক্তি ৩) দেহতত্ত্ব ৪) বৈরাগ্য ৫) চৈতন্যলাভ ৬) বিবিধ সাধন : শৃঙ্গার সাধন, নায়িকা সাধন, কায়া সাধন।

সাধুপন্থীরা তাঁদের মতবাদ সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের বোধগম্য করার জন্য স্বভাবতই লোকসংগীতের সুর আশ্রয় করেন। ফলে সমাজে সাধারণত নিম্নশ্রেণির মানুষ বলে যারা অভিহিত এবং আর্যসংস্কৃতি যাঁদের মধ্যে আজও প্রভাব বিস্তার করেনি তারা সাধুগানের মাধ্যমে সহজিয়া সাধন পদ্ধতিতে আকৃষ্ট হয়। সাধুগানের দুটি নমুনা দেওয়া গেল।

১. শুন সজনী রে সে আগুন জ্বলে দিবারজনী

নীচেতে চুল্‌হা আছে তাতে হাঁড়ি বস্যা আছে
সে আগুন জ্বলে দিবারজনী ॥ ধ্রু ॥
বত্রিশটি চুল্‌হা আছে চুল্‌হার আঁচ কাছে কাছে
বিনা আগুনের গুণে রাঁধে রাঁধুনী ॥ ধ্রু ॥
চারজন জ্বাল দিছে দুইজন চাল ফেলে
একজনাই ভাত ঢালে ঢালনী ॥ ধ্রু ॥
জীবের এ চুল্‌হার মাঝে রবি শশি দুই আছে
বরজুদাসের দুটি ছাঁদনী ॥ ধ্রু ॥

২. শুনো সাধু— ইত সাধু শুনে চমৎকার হে।
সুতাতে চলিল হাথি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিঁপড়া মারিল লাথি
সেই হাথি বেড়ি মাতোয়ার হে ॥ ধ্রু ॥
সিংহ চলি যায়
মাছিতে ধরে খায়
তাও মাছির মা হল আহার হে ॥ ধ্রু ॥
নাই মাতা নাই পিতা
বিনা মাতায় জুড়ে নাতা
বরজুদাস কী জানে তাহার হে ॥ ধ্রু ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেলাওয়ারি বাউল পরিচিতি

কলকাতা

পূর্ণদাস বাউল	৫৯এ, মহারাজা ঠাকুর রোড। কলকাতা ৭০০০৩১
প্রেমতোষ দাস	২৮ রামকৃষ্ণ সরণি। পর্ণশ্রী পল্লী। বেহালা কলকাতা ৭০০০৬০
ভক্তদাস বাউল	কালিকাপুর। কলকাতা ৭০০০৭৮
মঞ্জু দাসী	৫৯এ মহারাজা ঠাকুর রোড। কলকাতা ৭০০০৩১
মনোরঞ্জন দাস	১১৩ চেতলা লক গেট। কলকাতা ৭০০০৫৩
মাধবচন্দ্র চক্রবর্তী	৬২/৫ বাঞ্ছারাম রায় রোড। বেহালা। কলকাতা ৭০০০৩৪
রাজকুমার হালদার	১৮/১ কালিকাপুর। কলকাতা ৭০০০৭৮
শান্তিদাস বাউল	মুকুন্দপুর কলোনি। সন্তোষপুর। কলকাতা ৭০০০৭৫
সনজিৎ মণ্ডল	১৪ মহেন্দ্র রায় লেন। কলকাতা ৭০০০৪৬
সম্মিতি পোদ্দার	আদর্শপল্লী। বিরাটি। ২২/২ শহীদ গণেশ দত্ত রোড। কলকাতা ৭০০০৫১
সাহেব মণ্ডল	বিজিপাড়া। গড়িয়া। কলকাতা ৭০০০৬৮

AMARBOI.COM

কোচবিহার

অজিত বর্মন	পেস্টারঝাড়।
উপেন্দ্রনাথ প্রধান	মাস্তন্তি। তুফানগুঞ্জ। মাকারখানা।
গিরিবালা ব্রহ্মচারী	১৩৯ বোকনাবান্ধা। আলেকঝাড়ি।
গোপাল ব্রহ্মচারী	১৩৯ বোকনাবান্ধা। আলেকঝাড়ি। ময়নাগুড়ি।
গৌতম বর্মন	উচলপুকুরি।
তরণী বর্মন (প্রতিবন্ধী)	কোদালক্ষেতি। দোমুখা নয়ারহাট।
তিলক কর	উচলপুকুরি।
নিভা রায়	খাসবাস দ্বারিকামারি জালালদহ।
নিমাই দাস	বাণেশ্বর।
নীলকমল রায় প্রধান	১৬৮ ধুলিয়া বলদিয়াহাটি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরেশচন্দ্র মণ্ডল	চাঁপাগুড়ি। পেস্টারঝাড়।
মণীন্দ্রচন্দ্র দাস	কামাতফুলবাড়ি। তুফানগঞ্জ।
মাধবীলতা রায়	খারিদা। গোপালপুর। বড়গোপালপুর।
মুকুন্দমোহন রায়	ভোগরামগুড়ি।
যশোদা রায়	১৪৪ কামাত চাংরাবান্ধা।
রতিচাঁদ বর্মন (প্রতিবন্ধী)	১৬৫ উচলপুকুরি।
রাখালচন্দ্র রায়	উচলপুকুরি।
রামচন্দ্র দাস	সাঁজেরপাড়া। কাঁঠালবাড়ি। সাজের আড়। ঘোড়ামারা।
রামচরণ দাস বাউল	সাঁজেরপাড়া। কাঁঠালবাড়ি। ঘোড়ামারা।
রূপচাঁদ সরকার	পেস্টারঝাড়। পিন : ৭৩৬১৫৬
লক্ষ্মীকান্ত বর্মন	ভোগরামগুড়ি।
শ্যামলী রায়মাঝি	ভোগরামগুড়ি।
সন্ধ্যারানী ব্রহ্মচারী	১৩৯ বোকনাবান্ধা।
সুধীরচন্দ্র গোস্বামী	কামাতফুলবাড়ি। তুফানগঞ্জ।
সুভদ্রা ব্রহ্মচারী	বোকনাবান্ধা। আলেকঝাড়ি।
সুভাষচন্দ্র বর্মন	ধানধুনিয়া। ভোগরামগুড়ি।
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী	উচলপুকুরি।
হরকুমার বর্মন	কেশরিবাড়ি।
হরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	চাঁদগুড়ি। পেস্টারঝাড়।
হেমেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	চাঁপাগুড়ি। পেস্টারঝাড়।

AMARBOI.COM

চব্বিশ পরগনা। উত্তর

অচ্যুতানন্দ বিশ্বাস	দীনবন্ধুনগর। বনগাঁ।
অনন্তগোপাল দাস	১৫৪, যতীননগর লেন। নিউব্যারাকপুর।
অলকনাথ কাহার	লেবুতলা। গোপালপুর।
অমিত মজুমদার	শ্যামনগর।
আশিস ভট্টাচার্য	সূর্যনগর। খড়দা।
উপেনদাস বাউল	নিউ আদর্শনগর। আগরপাড়া।
কাজল মণ্ডল	ঝাঁঝা। খাসবালান্দা।
কার্তিকদাস বাউল	কমলপুর। শ্যামনগর। জগদ্দল।
কার্তিকচন্দ্র সরকার	মণ্ডলপাড়া। মতুয়া।
গণেশ মণ্ডল	ঝাঁঝা। খাসবালান্দা।
গোপাল মণ্ডল	নারায়ণপুর। সোনারপুকুর।
চিত্ত বিশ্বাস	সাদপুর। মসলন্দপুর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জগন্নাথ অধিকারী বাউল	গরুর ফাঁড়ি। হালিশহর।
জয়দেব ভট্টাচার্য	দীনবন্ধুনগর। বনগাঁ।
তারাপদ সাহা	দীনবন্ধুনগর। বনগাঁ।
তুলসী খ্যাপা	ইন্দিরানগর কলোনি। পূর্ণানন্দপল্লী। ঘর নং ১০২, নৈহাটি।
নারায়ণ দফাদার	পূর্ব ডাঙা। বেলপুর।
নীলমণি মণ্ডল	পারপাটনা। দেগঙ্গা।
পরিতোষ মণ্ডল	ঝাঁঝাঁ। খাসবালান্দা।
বঙ্কিম দাস	পারপাটনা। দেগঙ্গা।
বাচ্চু মণ্ডল	নারায়ণপুর। সোনারপুকুর।
বাণী চক্রবর্তী	শ্যামনগর। শান্তিনিবাসপল্লী। আতপুর।
বুদ্ধিশ্বর বাউল	নগরউখরা।
ভবসিন্ধু কর্মকার	বিশপুর।
রজনীকান্ত সরকার	কুচিয়ামোড়া। চাঁচবেড়িয়া।
রাণাপ্রতাপ মুখার্জি	উত্তর আগরপাড়া।
লোকনাথ মণ্ডল	মণ্ডলপাড়া। মতুয়াধাম।
শম্ভুদাস বাউল	পালপাড়া। আকাইপুর।
শিখা দাস	২৬ নং মিন্টু আদর্শনগর। আগরপাড়া।
সরোজ দাসী	ইন্দিরানগর কলোনি। পূর্ণানন্দপল্লী। ঘর নং ১০২, নৈহাটি।
স্মরজিৎ খ্যাপা	সাহেব কলোনি। নৈহাটি।
সুনীলদাস বাউল	সরকারি আবাসন। ব্লক সি-৫৪। শ্যামনগর।
সুবোধচন্দ্র মণ্ডল	গোকুলপুর।
হরিদাস বাউল	২৩-রেলগেট। শ্যামনগর।
হাজারিলাল স্বর্ণকার	বেড়াচাঁপা।
ক্ষুদিরাম মণ্ডল	নারায়ণপুর। সোনারপুকুর।

চব্বিশ পরগনা। দক্ষিণ

অমল চক্রবর্তী	মালঞ্চ কলোনি। মালঞ্চ মহিনগর। বারুইপুর।
অশেষ দে	কামরাবাঁধ। সোনারপুর।
অক্ষয় বৈদ্য	মৈনপীঠ। কুলটি।
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	মহেশপুর। রামকৃষ্ণপুর। বারুইপুর।
কৃষ্ণচন্দ্র সিদ্ধ	তালুক রাণাঘাট। পূর্ব রাণাঘাট।
কৃষ্ণপদ সর্দার	জালাবেড়িয়া। নিমপীঠ আশ্রম। কুলটি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেশবচন্দ্র (সিদ্ধান্ত) মৃধে	পূর্ব রাণাঘাট। মথুরাপুর।
কেশবচন্দ্র সিদ্ধ	তালুক রাণাঘাট। পূর্ব রাণাঘাট।
কালীপদ শিকারি ও সম্প্রদায়	রাজনগর। কুলপি। কাকদ্বীপ।
গোপালদাস বাউল ও সম্প্রদায়	পূর্ব কাশিয়ারা। সোনারপুর।
জগদীশ সরকার	আলিপুর সদর। মালঞ্চ কলোনি। মালঞ্চ।
জ্যোতির্ময়ী ব্রহ্মচারী	চাঁদপুর। ডায়মন্ডহারবার।
নৃপেনচন্দ্র হালদার	কামালপুর। দক্ষিণ বিজয়নগর।
নীতীশচন্দ্র রায়	আলিপুর সদর। ছিটকালিকাপুর। কসবা।
নিরাপদ মণ্ডল	হসপিটাল কোয়ার্টার্স। ছোট মোল্লাখালি। গোসাবা।
নিশিকান্ত বর্মন	রাজনগর শ্রীনাথ। রাজনগর। কাকদ্বীপ।
মহম্মদ আলি আকবর	বেনেডাঙা নোয়াপাড়া। মল্লিকপুর। বারুইপুর।
মাধাই ঘরামি	মথুরাপুর।
মুরারিমোহন কয়াল	দক্ষিণ কুটোখালি। মধুখালি। ক্যানিং।
শান্তিদাস বাউল	আলিপুর সদর। বিরজি কদমতলা। গড়িয়া।
শ্যামাপদ বৈদ্য	গহেরপুর। জয়নগর। ডায়মন্ডহারবার।
স্বপনকুমার মণ্ডল	মোইপিঠ বিনোদপুর। অম্বিকানগর।
হরিপদ সর্দার	মায়াহাউরি। জয়নগর।

AMARBOI.COM

জলপাইগুড়ি

অমরচাঁদ গোস্বামী	চুড়াচুড়া ভাণ্ডার। ময়নাগুড়ি। হুসুলডাঙা।
অমল অধিকারী	ভক্তিনগর।
অশ্বিনীকুমার গোস্বামী	দশরথপল্লী। শিলিগুড়ি সেবক রোড। শিলিগুড়ি।
কালাচাঁদ দরবেশ	(২ নং) রাধানগর-বি। ধূপগুড়ি। পিন : ৭৩৫২১০।
কামিনী বিশ্বাস	ধূপগুড়ি-১ নং বর্মনপাড়া। ধূপগুড়ি। পিন : ৭৩৫২১০।
কাশীনাথ মণ্ডল	ভক্তিনগর। শিলিগুড়ি।
খগেন্দ্রচন্দ্র বর্মন	ধূপগুড়ি।
গোপাল সাধু (সরকার)	উত্তর বৈরাতিগুড়ি। ধূপগুড়ি।
গোবিন্দ শর্মা	দশরথ পল্লী। শিলিগুড়ি-সেবক রোড।
দীনবন্ধু রায়	রাধানগর (বি) ধূপগুড়ি।
দুলাল হালদার	৪১ শাস্ত্রীনগর। সেবক রোড। পিন : ৭৩৪৪০১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধীরেনদাস বাউল	১ নং ধূপগুড়ি।
নরেন্দ্রনাথ দাস	ধূপগুড়ি-রায়পাড়া। ধূপগুড়ি।
নারায়ণ বিশ্বাস	ভক্তিনগর।
নারায়ণ সরকার	বৈরাতিগুড়ি। ধূপগুড়ি।
নিতাই রায়	ভক্তিনগর।
নিত্যানন্দ মল্লিক (বাউল)	বৈরাতিগুড়ি। ধূপগুড়ি।
পরেশচন্দ্র মণ্ডল	বারঘরিয়া। বারঘরিয়া প্রধানপাড়া।
পরেশদাস বাউল	২ নং ব্রিজ নিউপাড়া। ধূপগুড়ি।
প্রভাতকুমার হালদার	দেওমালি। খগেনহাট। ধূপগুড়ি। পিন : ৭৩৫২০৪।
ফটিক হালদার	৪ নং ওয়ার্ড-শাস্ত্রীনগর। সেবক রোড। শিলিগুড়ি।
বিবেকানন্দ দাস গোস্বামী	মাইকেল মধুসূদন কলোনি। সাহুডাঙা।
মঞ্জু দাসী	জলদিপাড়া। লেঙ্গুঝাড়।
মণীন্দ্র বর্মন	বর্মনপাড়া। ধূপগুড়ি।
মায়ারানী দাস	ভক্তিনগর। শিলিগুড়ি।
যতীন মোহন্ত	রায়পাড়া-ধূপগুড়ি। ধূপগুড়ি।
রাইদাসী মোহন্ত	রায়পাড়া। ধূপগুড়ি।
লক্ষ্মণদাস বাউল	ধূপগুড়ি-রায়পাড়া। ধূপগুড়ি।
সত্যরঞ্জন দাস বাউল	ভক্তিনগর।
সমর অধিকারী	ভক্তিনগর। শহিদ কলোনি। শিলিগুড়ি।
সরলা দেবী বাউল	ঝিলকলোনি। স্টেশনপাড়া রোড। আলিপুরদুয়ার। (মাড়োয়ারিপট্টি)।
সিদ্ধ গোপালদাস বাউল	দ্বারিকামারি। কালিরহাট। টেকাতলি।
সুধীরকৃষ্ণ দাস	উত্তর ঘাগড়াবাড়ি রেলগেট। ময়নাগুড়ি। পিন : ৭৩৫২২৪।
সুবলচন্দ্র শীল	চরচরা ভাণ্ডার। ময়নাগুড়ি। ভাঙামালি।
সুভাষচন্দ্র দাস	ভক্তিনগর। শিলিগুড়ি।
সুশীল রায় ক্ষ্যাপা	১ নং ধূপগুড়ি। ধূপগুড়ি।
হরিদাস বাউল	কচুয়াবোয়ালমারি। কচুয়া।
হরিদাস সরকার	কচুয়াবোয়ালমারি। কচুয়া।

AMARBOI.COM

দার্জিলিং

কালাচাঁদ গোঁসাই	নিউ তেলিপাড়া। শিলিগুড়ি। দার্জিলিং।
গোকুলচন্দ্র সরকার	ভারতনগর। শিলিগুড়ি। দার্জিলিং।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোপালদাস মোহান্ত	খাপরাইল মোড়। মাটিগাড়া। শিলিগুড়ি। দার্জিলিং।
গোপাল সরকার	ভারতনগর। রবীন্দ্র সরণি। শিলিগুড়ি। দার্জিলিং।
গোপাল হালদার	২ নং পূর্ব বাঘাযতীন কলোনি। প্রধাননগর। দার্জিলিং।
চৈতন্য হালদার	বাঘাযতীন কলোনি। (দক্ষিণ)। প্রধান নগর (মহানন্দা)। দার্জিলিং।
ছায়ারানী দেবনাথ	শান্তিপুর। মাটিগাড়া। কদমতলা। দার্জিলিং।
নিত্যানন্দ সরকার	ভারতনগর। শিলিগুড়ি। দার্জিলিং।
পাগলচাঁদ দাস	পরিমল কলোনি। মাটিগাড়া। দার্জিলিং।
মল্লিকা দাসী	বাগড়াকোট। শিলিগুড়ি। দার্জিলিং।
রামকৃষ্ণ পাল	ভক্তিনগর। শিলিগুড়ি। দার্জিলিং।

দিনাজপুর। উত্তর

অমর মণ্ডল	কাঞ্চনপল্লী। রায়গঞ্জ।
অর্চনা দত্ত	দেবীনগর।
অজিত ঘোষ	কমলাই। ইটাহার।
অনিলকুমার পাল	সুভাষগঞ্জ। রায়গঞ্জ।
আনন্দকুমার দাস	কুরমানপুর। ইটাহার।
কল্পনা বিশ্বাস	দক্ষিণ কসবা। রায়গঞ্জ।
কার্তিকচন্দ্র বর্মন	গোয়ালগাঁও। বীরঘই। রায়গঞ্জ।
কালাচাঁদ মুর্মু	নাজিরপুর। মহারাজা। রায়গঞ্জ।
কৃষ্ণকান্ত বর্মন	শেরপুর। খোকসা।
গরল দাস	পাইকপাড়া। ইটাহার।
গিরীন বর্মন	লহণ্ডা। রামপুর-রায়গঞ্জ।
গোপেন্দ্রনাথ দাস	পূর্ব-কলেজপাড়া। রায়গঞ্জ।
জগদীশচন্দ্র রায়	কাশিমপুর। হেমতাবাদ।
তরণীকান্ত শীল	সুভাষগঞ্জ। রায়গঞ্জ।
তরণীমোহন বিশ্বাস	ছত্রপুর। রায়গঞ্জ। কাশিবাটি।
তরণীসেন মহান্ত (হালদার)	সুভাষগঞ্জ। পিন : ৭৩৩১৩৪।
তরীমোহন বর্মন	রুনিয়া। রায়গঞ্জ।
তুফান দেবশর্মা	পশ্চিম মহাদেবপুর। রূপাহার।
দীনবন্ধু গোস্বামী	মানিকোরপাল্সা। করণদীঘি। পাতনোর। ডালখোলা।
দুলাল সরকার	কলেজপাড়া। ইন্দিরা কলোনি। রায়গঞ্জ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধনেশ্বর বর্মন	জয়নগর। বীরখই।
নগেন মহন্ত	পালপাড়া। সুকান্ত কলোনি। রায়গঞ্জ।
নরহরি মহন্ত	ধনকোলহাট। কালিয়াগঞ্জ।
নারায়ণচন্দ্র শীল	সুভাষগঞ্জ। সুকান্ত কলোনি। রায়গঞ্জ।
নিত্যানন্দ দাস	কাঞ্চনপল্লী। রায়গঞ্জ।
নেপাল বর্মন	ডুমুরিয়া। রুনিয়া।
পরিতোষ দাস	ব্রহ্মপুর। খোকসা। রায়গঞ্জ।
পারুল দেবশর্মা	সুদর্শনপুর। রায়গঞ্জ।
প্রফুল্ল হালদার	দক্ষিণ কসবা। দেবীনগর। রায়গঞ্জ।
প্রভাতী দাস	কাঞ্চনপল্লী। রায়গঞ্জ।
প্রভাস রায়	খলসি। রায়গঞ্জ।
ব্রজগোপাল বৈষ্ণব	অর্থগ্রাম। মহারাজাহাট। রায়গঞ্জ।
ভক্তি পাল	বগুন ইটাহার। বেকিডাঙা।
রণজিৎ বর্মন	ডুমুরিয়া। রুনিয়া। রায়গঞ্জ।
লক্ষ্মীকান্ত বর্মন	বারুইবাড়ি। হেমতাবাদ।
ললিতা দাসী (শর্মা)	ফারসারা। ডালকোলা। করণদীঘি।
শরৎচন্দ্র রায়	সারাইট। রূপাহার। রায়গঞ্জ।
শ্যামাপদ বর্মন	রায়নগর। কালিয়াগঞ্জ। রঘুনাথপুর।
শ্যামসুন্দর পাল	সুভাষগঞ্জ। রায়গঞ্জ।
শেফালি দে	অর্থগ্রাম। মহারাজাহাট।
সতীশচন্দ্র বর্মন	বামনগ্রাম।
সতীশচন্দ্র মজুমদার	দাড়িভিট। মজুমদারপাড়া। দুলালি ভিটা।
সদানন্দ মহন্ত (শচীন বাবাজী)	কসবা। রায়গঞ্জ। দেবীনগর।
সন্তোষ শীল	মকদমপুর। রুনিয়া। রায়গঞ্জ।
স্বপনচন্দ্র বিশ্বাস	লক্ষ্মণীয়া। রায়গঞ্জ।
স্বপ্না বিশ্বাস	দক্ষিণ-কসবা। দেবীনগর। রায়গঞ্জ।
সরস্বতী মহন্ত	দেশবন্ধুপাড়া। কাঞ্চনপল্লী। রায়গঞ্জ।
সহদেব সরকার	সুদর্শনপুর। রায়গঞ্জ।
স্বামীনাথ রায়	জয়নগর। বীরখই। রায়গঞ্জ।
সুকুমার দাস	পাইকপাড়া। ইটাহার।
সুজন বর্মন	খোকটুলি। রুনিয়া। রায়গঞ্জ।
সুধীরচন্দ্র রায়	বীরখই। রায়গঞ্জ।
সুধীর সরকার	দীপনগর। দেবীনগর। রায়গঞ্জ।
সুনীল সরকার	ইন্দিরা কলোনি। কলেজপাড়া। রায়গঞ্জ।
সুবোধ দাস	পাইকপাড়া। ইটাহার।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুভাষচন্দ্র পাল	বাগবাড়ি। ইটাহার।
সুরবালা বর্মন	বারুইবাড়ি। হেমতাবাদ।
সুশীল দাস মহন্ত	কলাইগাও। বর্সিয়ান। রায়গঞ্জ।
হরিপদ দাস	বামনগ্রাম। রায়গঞ্জ।

দিনাজপুর। দক্ষিণ

অমৃত বর্মন	বোয়াল। বড়কাশিপুর।
কমলাকান্তি মহন্ত	গোবিন্দপুর। কুমারগঞ্জ।
কালিপদ সরকার	লস্করহাট। তপন।
ক্ষিতীশচন্দ্র দেবনাথ	চক্রামপ্রসাদ। খিদিরপুর। বালুরঘাট।
গণেশ বর্মন	রামচন্দ্রপুর। তপন।
গোপাল সিংহ	ঝাপুর্সি। পতিরাম। বালুরঘাট।
গোপেশচন্দ্র বর্মন	সোবড়া কলোনি। আমরাইল।
গৌরীরানী দাস	ঘাটকালিতলা। নারায়ণপুর। বালুরঘাট।
চন্দনকুমার বর্মন (সরকার)	ঘাটকালিতলা। বালুরঘাট।
চন্দনকুমার মহন্ত	চকভগীরথ। করদহ।
চরণ মহন্ত	সালাস। তপন।
জয়দেবচন্দ্র কবিরাজ	চকভৃগু। বালুরঘাট।
তরণীকান্ত মহন্ত	বাজার পাড়া। ত্রিমোহিনী। হিলি।
দীপুভূষণ দাস	শিববাড়ি। কেশপুর। রাজিবপুর। গঙ্গারামপুর।
ধীরেন মহন্ত	সাহাপাড়া। গঙ্গারামপুর।
ধীরেন্দ্র মহান্ত	বাজারপাড়া। ত্রিমোহিনী। হিলি।
নরেন্দ্রনাথ দেবনাথ	মহিষ-নটা বাজারপাড়া। ত্রিমোহিনী। হিলি।
নারায়ণ মহন্ত	তপন।
নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ (ঘেরু)	ডাকরা। চকভৃগু। বালুরঘাট।
প্রদীপ মহন্ত	মির্জাপুর। বংশীহারি। বুনিয়াদপাড়া।
প্রফুল্লচন্দ্র মহন্ত	দোলগাঁও। হরিরামপুর। বাগিচাপুর।
বলরাম রায়	ঘাটুল। তপন। গুড়াইল।
বিনয়কৃষ্ণ মহন্ত	মাকৈলা। কুশমণ্ডি। উত্তর করঞ্চি।
বিপদভঞ্জন দাসমহন্ত	তপন।
বীরেন্দ্রনাথ রায়	উত্তর বজরাপুকুর। নয়া বাজার। তপন।
ব্রজেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস	বংশীহারি।
ভারতী বর্মন	খোরনা। নাজিরপুর। বালুরঘাট।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুবনেশ্বরী খেপী (ফুরফুরি)	খোরনা। (মাহিসন)। নাজিরপুর। বালুরঘাট।
মাধাই মহন্ত	শুকদেবপুর। রাঘবনগর।
মামণি রায়	উত্তর বজরাপুকুর। নয়াবাজার। গঙ্গারামপুর।
মালতী মহন্ত	চকভৃগু। বালুরঘাট।
রঘুনাথ মণ্ডল	মহারাজপুর। জালালপুর।
রাজকুমার বর্মন	খোরনা। নাজিরপুর। বালুরঘাট।
রাধারানী মহন্ত	চকভৃগু। বালুরঘাট।
লক্ষ্মণদাস বাউল	দক্ষিণপাড়া। বাসুদেবপুর। হিলি।
সমীর রায়	উত্তর চকভবানী। বেলতলা পার্ক। বালুরঘাট।
সুকুমার ঘোষ	বাঘাযতীন কলোনি। বালুরঘাট।
সুবল বিশ্বাস	লস্করহাট। তপন।
সুমঙ্গল সরকার	এ. কে. গোপালন কলোনি। বালুরঘাট।
সুরেশ শীল	ভাইওর। ভিকাহার।
সূর্যকান্ত দাস	গণাহার। তপন।

নদিয়া

AMARBOI.COM

অজিত রায়	নতিপোতা।
অর্জুন মণ্ডল	গোয়াস।
অধীর দাস	পুরনো বাজার। তাহেরপুর।
অনিল খ্যাপা	ভীমপুর।
অপূর্ব বিশ্বাস	নাকাশিপাড়া।
অবনী ঘোষ	কৃষ্ণপুর। শিবনিবাস।
অরুণ দে	বিক্রমপুর। সোনাডাঙা। নাকাশিপাড়া।
অরুণদাস বাউল	কাঁটাগঞ্জ। কল্যাণী।
অশোকদাস বাউল	শ্রীনাথপুর। আনুলিয়া।
অশোকদাস বাউল	গাজনা।
আদ্যনাথ বিশ্বাস	আসাননগর।
আনন্দ মণ্ডল	ঘোষপাড়া। কল্যাণী।
আনন্দময়ী অধিকারী	বাজিতপুর। কীর্তনীয়াতলা।
কল্যাণী দাসী	কৈখালি। বগুলা।
কার্তিক খ্যাপা	চরমাজদিয়া। চরব্রহ্মনগর।
কালিদাসী অধিকারী	বৈষ্ণবপাড়া। ঘূর্ণী।
কৃষ্ণদাস বাউল	আড়ংঘাটা।
কৃষ্ণদাস বাউল	গাঙনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষ্ণদাসী বৈষ্ণবী	ঘোষপাড়া। কল্যাণী।
গঙ্গাধর মণ্ডল	নাইকুড়া। আসাননগর।
গায়ত্রী দাসী	গলাকাটা। ভাতজাংলা। কুলগাছি।
গোকুলগোষ্ঠ দাস বাউল	বগুলা।
গোপাল দাস	চকবিহারী। নতিপোতা।
গোপালদাস বাউল	নবদ্বীপ।
গোবর্ধন হাজরা	আউপাড়া।
গোবিন্দ প্রামাণিক	সিংহহাটি ধুবুলিয়া।
গৌরাঙ্গদাস বাউল	বেতাই।
গৌরাঙ্গদাস বাউল	মুবারকপুর। হরিপুর।
চন্দনা দাসী	দক্ষিণ বহিরগাছি।
চম্পা ঘোষ	তারকদাসপুর। মহৎপুর।
জয়দেব গোস্বামী	হীরনগর।
তুলিকা মণ্ডল	নাইকুড়া। আসাননগর।
দয়াল খ্যাপা	দেবগ্রাম।
দিবানন্দ খ্যাপা	ভাগ্যবন্তপুর। কালীগঞ্জ।
দ্বিজপদ প্রামাণিক	জোকিপুর। বাগচি জমশেরপুর।
দীনেশ হালদার	ধুবুলিয়া নিউমার্কেট।
দুলালচন্দ্র দাস	বেলেয়াটি। মামজোয়ান।
দুলালদাস বাউল	দেবীপুর। ধানতলা।
ধীরেনদাস বাউল	পুকুরিয়া। বাদকুল্লা।
নবকুমারদাস বাউল	ঘোষপাড়া। নতুনপল্লী। কল্যাণী।
নরোত্তমদাস বাউল	২ নং মিত্র কলোনি। কল্যাণী।
নারায়ণচন্দ্র সাহা	গোপালপুর।
নাড়ুগোপাল অধিকারী	স্টেশনপাড়া। বাদকুল্লা।
নিখিল গায়েন	চাঁদপুর। রামপুর।
নিগমানন্দ দাস	মাটিয়ারী আশ্রম। মাটিয়ারী।
নিত্যগোপাল বৈরাগ্য	আসাননগর।
নিত্যানন্দ বালা	ঘোষপাড়া। নতুনপল্লী। কল্যাণী।
পরেশ সরকার	আসাননগর।
প্রদীপ দাস বাউল	রাধাকান্তপুর। কেশপুর।
প্রফুল্ল বিশ্বাস	আঘাপোতা। ভীমপুর।
প্রভাস মণ্ডল	জোকিপুর। বাগচি জামশেরপুর।
প্রহ্লাদ দাস	বামুনপুকুর।
প্রশান্ত অধিকারী	ধুবুলিয়া।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেমানন্দ দাস বৈরাগী	পূর্ব ভাতজাংলা। কুলগাছি।
বিধানচন্দ্র বিশ্বাস	খামার শিমুলিয়া।
বিষ্ণুপদ দাস	দুর্গাপুর। হরিতলা।
বীরেন দাস	চিলাখালি। দাসপাড়া।
বীরেন সরকার	উত্তর ঘোষপাড়া। চাকদহ।
ভক্ত দাস	মাধবপুর। কৃষ্ণপুর।
ভরত দাস	দক্ষিণ বহিরগাছি।
ভোলানন্দ গোস্বামী	রাধাকান্তপুর। কেশপুর।
ভোলানাথ দাস	কানাইনগর। ভালুকা।
মদন ঘোষ	রাজীবপুর।
মদন মণ্ডল	কেচুয়াডাঙা। ফুলগ্রাম।
মদনকুমার ভৌমিক	ফুলখালি (বৈষ্ণবপাড়া)। কেচুয়াডাঙা।
মদনমোহন রাজবংশী	সত্যনগর কলোনি। শান্তিপুর।
মন্মথ বিশ্বাস	যাযাবর। হাঁসখালি।
মন্টু মণ্ডল	চাঁদের হাট।
মণীন্দ্র মণ্ডল	কল্যাণী সীমান্ত। কল্যাণী।
মণীন্দ্র সরকার	মুরারিপুর। কল্যাণী।
মনোহর দাস	বেলঘরি। পায়রাডাঙা।
মহাদেব বিশ্বাস	প্রভাতনগর। জয়পুর।
মহারাজ বিশ্বাস	হরিহরনগর। চিত্রশালী।
মাধবী গোস্বামী	সুকান্তপল্লী। ঘূর্ণী। কৃষ্ণনগর।
মিনতি মহান্ত	মুরুটিয়া। বালিয়াডাঙা।
মীরা মোহান্তি	মাটিয়ারী।
মুকুন্দ দাস	সগুনা। লেবুতলা।
মুকুল দাস	পূর্বভাতজাংলা। কুলগাছি।
মৃত্যুন খ্যাপা	গাঁটরা। গৌরীপুর।
রতন বাছার	কাঁঠালতলা। ঘোষপাড়া। কল্যাণী।
রবীন্দ্রনাথ অধিকারী	মুগরাইল। চন্দনদহ।
রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল	কুমড়ি হোসলাবেড়িয়া।
রসিক ভক্তদাস	রামনগর। রাণাঘাট।
রাধারানী গোস্বামী	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মিশন। নবদ্বীপ।
রামপদ শর্মা	উষাগ্রাম ট্রাস্ট। বীরনগর।
লক্ষ্মীরানী বিশ্বাস	কল্যাণী সীমান্ত। কল্যাণী।
শশাঙ্ক সরকার	যমুনাপাড়া। বেলতলা। আলাইপুর।
শশাঙ্ক সরকার	কল্যাণগাছি দক্ষিণ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রাবন্তী দাস	সগুনা। লেবুতলা।
শীলা তরফদার	সগুনা। লেবুতলা।
শৈলেন সরকার	ঘোড়াদহ।
ষষ্ঠী খ্যাপা	দিঘরা। চাকদহ।
ষষ্ঠীচরণ অধিকারী	থানা রোড। শান্তিপুর।
ষষ্ঠী দাস	আসাননগর।
সত্যরঞ্জন মণ্ডল	বয়েরডেঙী। নবরূপদা। বগুলা।
সনাতন দাস	চাঁদরা।
সন্ন্যাসীচরণ হালদার	বঙ্কিমপুর।
সন্দীপ পাল	সাহেব নগর।
সন্ধ্যারানী অধিকারী	লক্ষ্মীপাড়া। মাজদিয়া।
সমীর হাজরা	ধর্মদা।
সাধন প্রামাণিক	তেঘরি।
সামিয়েল মণ্ডল	বাঙালঝি। চাপড়া।
সুধীর বিশ্বাস	গাছা।
সুফল দাস	পূর্ব ভাতজাংলা। কুলগাছি।
সুবল দাস	যুগলকিশোর মন্দির। আড়ংঘাটা।
সুবর্ণ দাস	কানাইনগর। ভালুকা।
সুব্রত বিশ্বাস	গাড়াপাতা।
সুভদ্রা শর্মা	বাঙালঝি। চাপড়া।
সুভাষ বিশ্বাস	চন্দনপুকুর চিত্রশালি।
সুমিত্রা দাসী	ঘোষপাড়া। মুড়াগাছা।
সোমা বিশ্বাস	হাঁসাডাঙা ধুবুলিয়া।
স্বপনকুমার মণ্ডল	শিবপুর।
হরিদাস বৈরাগ্য	রায়নগর। নামেরকুলি।
হরি বৈদ্য	দক্ষিণ চাঁদমারী। কল্যাণী।
হরিদাস হালদার	পাগলাচণ্ডী। রাধাকান্তনগর।

পুরুলিয়া

আকাশ সহিস	ভাংড়া। পুরুলিয়া ২ নং ব্লক।
কেশব দাস	ঢোলকাটা। হুড়া।
ঘনশ্যাম সহিস	সিজু। দাপাৎ। হুড়া।
দেবিদাস বাউল	প্রেমানন্দ আশ্রম। ভাংড়া মোড়।
প্রদীপ দাস	অর্জুনজোড়া। হুড়া।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাশুলী দাসী	ঢোলকাটা। খধরিপিড়া। হুড়া।
বিপিন মহন্ত	ধবেড়া। বামুনডিহা। বড়াবাজার।
বুদ্ধেশ্বর বাদ্যকার	ভাংড়া। পুরুলিয়া। ২ নং ব্লক।
রজনী মহন্ত	রাওতাড়া। ভাগাবাঁধ। হুড়া।
শলাবৎ মাহাত	লটপদা। হেবরনা।
সৃষ্টিধর মহন্ত	সাতসরতি। বাসু সাধু আশ্রম।
সুভাষ গোস্বামী	অর্জুনজোড়া। হুড়া।
সুবল মাহাত	তালটাঁড়। রাওতোড়া ভাগবাঁধ।
সুবিতা দাসী	ধারগ্রাম। সরবেড়িয়া।

বর্ধমান

অনন্তগোপাল দাস	গোপালমাঠ। দুর্গাপুর-৩
অনুপকুমার দত্ত	পাণ্ডবেশ্বর।
আলিবর্দি মল্লিক	নওপাড়া। উখুড়া। সারংপুর। পূর্বস্থলী। কালনা।
ওমদাস বাউল	কাটোয়া।
কবিতা দাস	বাবনাবেড়া। আমলাজোড়া।
করুণা বৈরাগ্য	মুক্তিপুর। সহজপুর। হাটতলা।
কুমার শ্যামলেন্দু	বাবনাপাড়া। আমলাজোড়া।
গীতা চক্রবর্তী	পাণ্ডবেশ্বর।
চৈতালি চক্রবর্তী	আসানসোল। চাঁদামোড়। শিবডাঙা কোলিয়ারী। মিগা।
জীবনদাস বাউল (১)	বাবনাবেড়া। আমলাজোড়া।
জীবনদাস বাউল (২)	চাকদোলা মোড়। কৃষ্ণনগর।
দিলীপ দাস	পাণ্ডবেশ্বর।
দিলীপদাস বাউল	দক্ষিণবাটি। বিদ্যানগর।
নবনীদাস বাউল	দুর্গাপুর। বেনাচিতি মার্কেট।
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়	কুচুট।
ভজন বৈরাগ্য	মুক্তিপুর। সহজপুর। হাটতলা।
ভক্তিভূষণ দাস	রাধানগর।
মন্দিরা দাস বাউল	মুক্তিপুর। সহজপুর। হাটতলা।
মিতালি চক্রবর্তী	আসানসোল। চাঁদামোড়। শিবডাঙা কোলিয়ারী। মিগা।
রতনদাস বাউল	উত্তরচুপী।
রীতা দাস	পাণ্ডবেশ্বর।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শক্তি ঘোষ	মুক্তিপুর। শ্যামসুন্দর।
শ্রাবন্তী রায়	নবগ্রাম কলোনি। খণ্ডঘোষ।
সনাতন দাস	নমালিপুর। খণ্ডঘোষ।
সাধনদাস বৈরাগ্য	হাটগোবিন্দপুর।
সন্দীপ রজক	মুক্তিপুর। সহজপুর। হাটতলা।
স্বপন অধিকারী	মুক্তিপুর। শ্যামসুন্দর।
হারাধনদাস বাউল	রাধানগর।

বাঁকুড়া

উত্তম বটব্যাল	মনোহরতলা। সোনামুখি।
কৃষ্ণদাস বাউল	দুবরাজপুর।
গৌরদাস বৈরাগী	রাধানগর।
চিন্ময় মণ্ডল	রাধাপুর। মোহনপুর। সোনামুখি।
তপন বন্দ্যোপাধ্যায়	ব্যানার্জিপাড়া। সোনামুখি।
তন্ময় মজুমদার	লোকেশোল।
দিলীপ চট্টোপাধ্যায়	অর্ধগ্রাম। আধগাঁ।
দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়	ব্যানার্জিপাড়া। সোনামুখি।
নিত্যানন্দদাস বৈরাগী	একাড়া। পলাশবনি।
পতিতপাবন দাস	কাঁকড়ডাঙা। দুলেপুকুর। কৃষ্ণনগর।
পতিতপাবন দাস	অর্জুনপুর। লায়েকবাঁধ।
বাপী দাস	চাষাবাদ। মনোহরতলা। সোনামুখি।
বাঁকাচাঁদ দে	নিমতলা। সোনামুখি।
বারিদবরণ দাস খ্যাপা	সোনামুখি।
বিকাশ মজুমদার	লোকেশোল।
ভরতদাস বৈরাগী	সোনামুখি।
ভক্তরাম মোহান্ত	তেঁতুলআড়া। ভক্তরামের আশ্রম। ঘড়া।
মদন নাগ	শ্যামবাজার। সোনামুখি।
মনোজ দাস	বারাসাত কলোনি। হদলনারায়ণপুর।
রিঙ্কু দে	নিমতলা। সোনামুখি।
রীনা দে	নিমতলা। সোনামুখি।
লম্বন দাস	বারাসাত কলোনি। হদলনারায়ণপুর।
লালমোহন দাস	বিষ্ণুপুর।
সত্যানন্দ দাস বাউল	মাকুর গ্রাম।
সতীশ দাস	ইশেবপুর। পণ্ডিতপাড়া।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সনাতনদাস বাউল	খয়েরবুনি।
সনাতনদাস ঠাকুর	রাধামোহনপুর। সোনামুখি।
সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়	ব্যানার্জিপাড়া। সোনামুখি।
সঞ্জয় দে	নিমতলা। সোনামুখি।
সুখদেবদাস বাউল	বিষ্ণুপুর।
সুনীল দাস	বারাসাত কলোনি। হদলনারায়ণপুর।
সুবল মণ্ডল	পাত্রসায়ের। সোনামুখি।
সুবীর দাস	কাঁকড়ডাঙা। দুলেপুকুর। কৃষ্ণনগর।
সুভাষ চক্রবর্তী	বেলিয়াতোড়।
হরিপদ গোস্বামী	নবাসন। ছান্দার।
হেমন্তকুমার দাস	কেন্দডাংরা।

বীরভূম

অজিতদাস বাউল	দ্বারন্দা।
আশিস দাস	অমরপুর। দেড়পুর।
কার্তিকদাস বাউল	ধনডাঙা। লাভপুর।
কানাইদাস বাউল (অন্ধ)	তারাপীঠ।
কেনারাম দাস	শ্রীফলা। রামপুরহাট।
কেশবভারতী বাউল	বারগ্রাম। ষাটপলশা।
খ্যাপাচাঁদ ভারতী	জয়দেব। শক্তিসেবা আশ্রম।
গঙ্গাধর দাস	দুবরাজপুর আশ্রম। দুবরাজপুর।
গৌতম দাস	মেটেলা।
তপন দাস	অমরপুর। দেড়পুর।
তারকনাথ দাস	জয়দেব। কেঁদুলি।
তিনকড়ি দাস বাউল	পাইগড়া।
দয়াময় দাস	বক্রেশ্বর।
দিবাকর দাস বাউল	নিশাপতি কলোনি। পারুলডাঙা। বোলপুর।
দীনদয়াল	শ্যামবাটি। সুভাষ পল্লী। শান্তিনিকেতন।
দেবদাস বাউল	শুঁড়িপাড়া। বোলপুর।
নক্ষত্রদাস বাউল	পাগলা বাবার আশ্রম।
নারদ গোস্বামী	হাটপিকড়া।
নারদদাস গোস্বামী	হাটইকড়া। গদাধরপুর।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিতাই দাস বাউল	কালিপুর। কড়িধ্যা।
নিত্যানন্দদাস বাউল	শ্রীফলা। রামপুরহাট।
পবনদাস বাউল	দেশবন্ধুনগর কলোনি। কোকোভ্যান।
প্রভাত খ্যাপা	জয়দেব গ্রাম। জনুকজ্জার।
বরুণ দাস	হেতমপুর। দুবরাজপুর।
বাঁকাশ্যামদাস বাউল	জয়দেব। ইলামবাজার।
বাসুদেবদাস বাউল	শ্যামবাটি। সুভাষপল্লী। শান্তিনিকেতন।
বিপদতারণ দাস	গড়গড়িয়া।
বিশ্বনাথ দাস বাউল	সিউড়ি। বোলপুর।
বেণীমাধব দাস	দুবরাজপুর।
বৈদ্যনাথ দাস	শুঁড়িপাড়া মনসাতলা আশ্রম। বোলপুর।
মাধব দাস	দুবরাজপুর।
রবিদাস বাউল	শ্রীফলা। রামপুরহাট।
রাধারানী দাস বাউল	দ্বারন্দা।
রাধেশ্যাম দাস	সুইপাড়া। সোনারকুণ্ড।
রেণুকাদাস বৈরাগ্য	রবীন্দ্রপল্লী। সিউড়ি।
লক্ষ্মণ দাস	মেহিদ্দগের আশ্রম।
লক্ষ্মণদাস বৈরাগ্য	রবীন্দ্রপল্লী। সিউড়ি।
লক্ষ্মণচন্দ্র দাস বাউল	কেন্দুয়া। সোনাতোড়।
শম্ভু দাস	ইলামবাজার।
শান্তি দাস	মল্লারপুর।
শ্রীবাসচাঁদ গোস্বামী	তেঁতুলিয়া।
সুধন কাহার	মনোহরি। মেটলা।
সুধীর দাস	সাঁইথিয়া।
সুধীরদাস বাউল	পারুলডাঙা। বোলপুর।
স্মৃতিমা দাস	বারগ্রাম। ষাটপলশা।

মালদহ

অনন্ত মালাকার	শঙ্করপুর। গাজোল।
অমূল্য হালদার	মুদাফৎ হবিনগর। কাটিকান্দর। গাজোল।
কৃষ্ণদাস রায়	২১ মাইল কলোনি। মালডাঙা। শ্যামবাড়ি।
ক্ষীরোদলাল সরকার	শ্রীরামপুর। গাজোল।
গোকুল হালদার	দৌলতপুর। বামনগোলা। নালাগোলা।
জয়দেব চক্রবর্তী	মাকুলি। পাকুয়া। বামনগোলা।

AMARBOI.COM

ঝন্টু সরকার	আরজিজ জালসা। জালসা। গাজোল।
দীনেশচন্দ্র সরকার	বাশিপাড়। কুপাদহ।
নরোত্তম দাস	গুড়ালা। জগদলা। বামনগোলা।
বিজেন দাস	বামনগোলা।
বিবেকানন্দ রায়	নয়াপাড়া। গাজোল।
ভরতদাস বাউল	কলাইবাড়ি। শিরষি।
মদনমোহন মজুমদার	কৃষ্ণনগর। কাটিকান্দর। গাজোল।
মণীন্দ্রনাথ সরকার	বামনগোলা।
মানবেন্দ্র হালদার	পাবনাপাড়া। সাহাপুর। ওল্ড মালদহ।
রঘুনাথ দাস	মালঞ্চ। আশ্রমপুর।
রাজারাম মণ্ডল	কদমতলা। কালিয়াচক।
রামচরণ সরকার	শোলাডাঙা। ডুবাপাড়া।
শঙ্কর চক্রবর্তী	পঞ্চতীর্থ গোবরাকুড়ি মহাশ্মশান। পাকুয়াহাট।
সতীশচন্দ্র সরকার	শ্রীরামপুর। গাজোল। বামনগোলা।
সাধনকুমার সরকার	বুলবুলচণ্ডী। ডুবাপাড়া।

মুর্শিদাবাদ

AMARBOI.COM

অতুল বিশ্বাস	মনোহরপুর। কান্দি।
অনন্তদাস বাউল	বাজারশা।
অনিল চৌধুরী	গড়াইমারী।
অজয় দাস	বালিয়া।
আশালতা সরকার	পাঁচগাছি। রুকুনপুর।
উত্তরা সরকার	চরমহুলা। যদুপুর।
উদয় হালদার	কেদারচাঁদপুর।
কালিপদ দাস	পেটারি। সেনাই।
খোকন হাজরা	গয়সাবাদ। তালগ্রাম।
গুরুপদ সরকার	কুন্নরুন্ন।
গোপাল বিশ্বাস	বিধুপাড়া।
গোবিন্দ চট্টরাজ	রূপপুর। জেমোরাজবাটি।
গোবিন্দ দাস	জিনপাড়া। গোবরহাটি।
গৌরহরি দাস	গড্ডাসিঙারি।
ঘনশ্যাম সর্দার	সালার।
জয়দেব মণ্ডল	চাঁদখালি। কান্দিবালিয়া।
জয়ন্তী দাসবৈরাগী	কুশবেড়িয়া। জুড়ানপুর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরুণকুমার প্রামাণিক	নবগ্রাম মজলিসপুর। তারাপুর।
তুলসী দাসী	রূপপুর। জেমোরাজবাটি।
তুলিকা হাজরা	বেগুন বাড়ি।
দয়াল মণ্ডল	নও পুকুরিয়া।
দিলীপ দাস	কেদারচাঁদপুর।
দিলীপ মণ্ডল	গোলাহাট। নবদুর্গা।
দুলাল দাস	মাহাদিয়া।
দুলাল দাস	গড্ডাসিঙারি।
ধনঞ্জয় দাস	ফুলশিখর। বিপ্রশিখর।
ধুলু দাস	খড়গ্রাম।
ধুলু রাজবংশী	মনসবপুর। পুরন্দরপুর।
নন্দদুলাল দাস	বল্লভপুর। মহাদেববাটি।
নির্মল ঘোষ	মালিয়ান্দি।
নিত্যানন্দ মণ্ডল	হরিবাগান।
নিমাই দাস	মাহাদিয়া।
নিমাই দাস	কোঁদলা।
নিমাই দাস	আইজুনি। সালু।
নিমাই মুখোপাধ্যায়	বিধুপাড়া। সোমপাড়া।
নীহারিকা দাস	পাঁচথুপী।
নেপালচন্দ্র মণ্ডল	বাছড়া।
পঞ্চানন মণ্ডল	জিৎপুর। রাজারামপুর।
পাঁচুগোপাল দাস	কুন্নরুন্।
পুতুল দাস	উত্তরপাড়া। রাধারহাট।
পুতুল দাসী	উত্তরপাড়া। নিত্যানন্দ আশ্রম।
পূর্ণচন্দ্র দাস	হৈদরপুর। জাহাবাড়া।
প্রেমানন্দ দাস	চরমহুলা। যদুপুর।
বাবন দাস	দয়ানগর। কাশিমবাজাররাজ।
বাসন্তী দাস	সিঙ্গার।
বিশ্বনাথ দাস	সিঙ্গার।
বিশ্বনাথ দাস	বিনকার। সারগাছি।
বৃন্দাবন বাগ	জিনপাড়া। গোবরহাটি।
ব্রহ্মপদ সাহা	সালার।
ভজহরি দাস	কোঁদলা।
ভবানীবালা দাসী	জিনপাড়া। গোবরহাটি।
ভক্তিদাসী বাউল	বাজারসা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনোরঞ্জন চৌধুরী	গড়াইমার।
মনোরঞ্জন হালদার	টেঁয়া স্টেশন কলোনি। টেঁয়া।
ময়নাবালা	মাদাপুর কলোনি। হাতিনগর।
মাণিক দাস	কুন্নরুন।
যতীন হাজরা	কাপাসডাঙা।
যশোদা দাস	নিশিন্দা। ফারাক্কা।
যাদবচন্দ্র দাস	দয়ানগর। কাশিমবাজার।
যোগমায়া দাস	কোঁদলা।
রবিদাস বাড়ল	কাশিমবাজার।
রবীন্দ্রনাথ দাস	রোসগঞ্জ। কাশিমবাজার।
রামেশ্বর হাজরা	বেগুন বাড়ি।
লক্ষ্মী মণ্ডল	খড়গ্রাম।
লক্ষ্মী চট্টরাজ	রূপপুর। জেমোরাজবাটি।
শশাঙ্কদাস বাউল	হরিরবাগান। পুরন্দরপুর।
শান্তিময়ী দাসী	বল্লভপুর। মহাদেববাটি।
শুকদেব দাস	পাঁচথুপী।
শ্যামল চক্রবর্তী	মাহাদিয়া।
শ্যামল বিশ্বাস	বাদড়া।
শ্যামসুন্দর দাস	উত্তরপাড়া। রাধারহাট।
সম্বল মণ্ডল	তারানগর। মসিমপুর।
সরস্বতী দাস	রোসগঞ্জ। কাশিমবাজার।
সুবোধ মণ্ডল	কাশিপুর।
সুবোধ সাহা	পাঁচগ্রাম।
সুভাষ মাঝি	সালার।
সুমিত্রা দাস বাউল	বাজারসাউ।
সোমেন বিশ্বাস	বাঁশচেতর। বেলডাঙা।

মেদিনীপুর

অশোক বেরা	চড়াবাড়। ভগবানপুর।
কার্তিকচন্দ্র গিরি	বেলদা।
কৃষ্ণকানাই দাস	চড়াবাড়। ভগবানপুর।
কৃষ্ণা দাস	চড়াবাড়। ভগবানপুর।
গৌরহরি পণ্ডিত	দোবান্দী।
তপনকুমার সামন্ত	চিয়াড়া। রাজনগর।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দয়ালকৃষ্ণদাস বাউল	তিলন্তপাড়া। জলচক।
নবকুমার দাস	কামালপুর।
নবদ্বীপ গাঁতাইত	ময়না। হোগলাবাড়ি।
নবদ্বীপ দাস	হোগলাবাড়ি। ময়না।
নিত্যানন্দ বাউল	মহম্মদপুর।
পঙ্কজদাস বাউল	দক্ষিণ বড়হৎ। কেশাপাট।
প্রাণকৃষ্ণ দাস বাউল	মলিঘাটি।
বংশী দলুই	আগুতিয়া। ভগবানপুর।
বিমল গোস্বামী	ভৈরবীচক। শুকলালপুর।
ব্রজগোপাল দাস	শৈশা। কেশপুর।
মনোরঞ্জন আদক	কোলাঘাট।
রবীন সরকার	পুরুষোত্তমপুর।
রাজকৃষ্ণ বেরা	চড়াবাড়। ভগবানপুর।
লক্ষ্মীনারায়ণ বাউল	চণ্ডীপুর।
সতীলাল দুয়া	বেলাঘাটি। গোপালপুর।
সুবল পাত্র	কোদালিয়া। ভোগপুর।
সুবোধ জানা	আগুতিয়া। ভগবানপুর।
হরেন্দ্রনাথ ভুঁইয়া	চড়াবাড়। ভগবানপুর।

হুগলি

অসীম দাস	শ্যামনগর। মণ্ডলপাড়া। অবন্তীপুর। ১৬/৫ পীরতলা রোড।
চিন্ময় দাস বাউল	ত্রিবেণী।
ডলি দাস	শ্যামনগর। মণ্ডলপাড়া। অবন্তীপুর। ১৬/৫ পীরতলা রোড।
নিত্যগোপাল গোস্বামী	যশড়া। সোমরা।
পুষ্প অধিকারী	মোশাদ।
মাধবদাস বাউল	যশড়া। সোমরা।
রূপা দাস	জগদ্ধাত্রী পল্লী। ভদ্রেশ্বর।
সান্ত্বনা মণ্ডল	শক্তিপুর। গুপ্তিপাড়া।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফকিরদের পঞ্জি

মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া ও নদিয়ার সাধক ফকির ও গায়ক ফকিরের পঞ্জি

অছিমুদ্দিন ফকির	পরানপুর। কুবলা। নদিয়া।
অজিত মোল্লা	শিকড়া। পদ্মমালা। নদিয়া।
আওলাদ সেখ	সোনিয়া। শিহালায়। মুর্শিদাবাদ।
আকসেদ সেখ	কুলগাছি। নদিয়া।
আদুশাহ্ ফকির	মহেশপুর। সোনামুখি।
আবদুল আলিম	শাসপুর। কামুতপুর। বীরভূম।
আবদুল হালিম	মুনসিরের মোড়। বড়সাল। বীরভূম।
আবসাব আলি	বাজিতপুর। সাহাপুর। মুর্শিদাবাদ।
আবু বক্কর	ধনঞ্জয়পুর। বেথুয়াডহরি। নদিয়া।
আবদুল কাশেম	পাকমিয়া। পিপুলবেড়িয়া। নদিয়া।
আমিরুদ্দিন মণ্ডল	গোয়াস। নদিয়া।
আমিরচাঁদ ফকির	বেঘড়ি। নদিয়া।
আম্বাদ আলি সেখ	রাণাবন্ধ। নদিয়া।
আলমিন ফকির	দেউলিয়া। তালুকহুদা। নদিয়া।
আলিবক্স ফকির	হরিশপুর। বারুইপাড়া। মুর্শিদাবাদ।
আসমত ফকির	মজলিসপুর। পিপুলবেড়িয়া। নদিয়া।
আহমদ সেখ	আলুগ্রাম। মুর্শিদাবাদ।
ইবাদত ফকির	বার্নিয়া। নদিয়া।
ইমান মণ্ডল	পাথরঘাটা। তেহট্ট। নদিয়া।
ইস্রাফিল ফকির	কুশাবেড়িয়া। জুড়ানপুর। মুর্শিদাবাদ।
ইসারুদ্দিন সেখ	মেলেপোতা। পাথরঘাটা। নদিয়া।
এনায়েতুল্লা ফকির	পরানপুর। করিমপুর। নদিয়া।
এনায়েতুল্লা বিশ্বাস	পরানপুর। টোপলা। নদিয়া।
কসিমুদ্দিন শাহ	জমিদারি। বহরমপুর। মুর্শিদাবাদ।
কামাল সেখ	মুরারিপুর। মধুরকুল। মুর্শিদাবাদ।
কালু ফকির	আয়াস। বীরভূম।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খলিল শাহ	রাজনগর। বীরভূম।
খেজমত শাহ ফকির	তারানগর। মুর্শিদাবাদ।
খেজিমত মণ্ডল	সাহেবপাড়া। দোগাছি। নদিয়া।
খৈবর রহমান ফকির	গোরভাঙা। নদিয়া।
গনি শাহ	সরভাঙা। তেহট্ট। নদিয়া।
গোলাম শাহ	ঘুড়িষা। ইলামবাজার। বীরভূম।
জামির শাহ	ঘুড়িষা। ইলামবাজার। বীরভূম।
জলিল খাঁ	চোঁয়া পাঠানপাড়া। মুর্শিদাবাদ।
জহিরুদ্দিন ফকির	চোঁয়া পাঠানপাড়া। মুর্শিদাবাদ।
জামাত আলি	সাহাজাতপুর। মুর্শিদাবাদ।
জালাল শাহ	ফকিরডাঙা। হেতমপুর। বীরভূম।
জব্বার আলি খান	নারায়ণপুর। নদিয়া।
জুলমত ফকির	সাহাজাতপুর। মুর্শিদাবাদ।
জিল্লার ফকির	নিশ্চিন্তপুর। মুর্শিদাবাদ।
তাজ মল্লিক ফকির	বহরান। বারুইপাড়া। মুর্শিদাবাদ।
তালেব শাহ	ফকিরডাঙা। হেতমপুর। বীরভূম।
দিল্লার ফকির	দক্ষিণখার। মহুলা। মুর্শিদাবাদ।
নজরুল ফকির	সাহাজাতপুর। মুর্শিদাবাদ।
নাজিমুদ্দিন মণ্ডল	ফাজিলনগর। নদিয়া।
নারায়ণ শাহ ফকির	রাণাবন্ধ। নদিয়া।
নিমাই ফকির	হুদাগ্রাম। তালুকহুদা। নদিয়া।
নিয়ামত হোসেন	মাদারতলা। হরিহরপাড়া। মুর্শিদাবাদ।
নুরমহম্মদ শাহ	ঘুড়িষা। ইলামবাজার। বীরভূম।
পিঞ্জিরা শাহ	সরডাঙা। কানাইনগর। নদিয়া।
পিজের ফকির	পীতাম্বরপুর। পদ্মমালা। নদিয়া।
বসির বাবা	ইমামনগর। হরিহরপাড়া। মুর্শিদাবাদ।
বাহার সেখ ফকির	মেলেপোতা। পাথরঘাটা। নদিয়া।
বিক্রম ইয়াসিন সেখ	সৈয়দ ভরতপুর। মুর্শিদাবাদ।
বেহেতার শাহ	হাতিয়া। বীরভূম।
মকিম শাহ	ময়ূরেশ্বর। বীরভূম।
মর্জম ফকির	চোঁয়া পাঠানপাড়া। মুর্শিদাবাদ।
মথুর মণ্ডল	পাথরঘাটা। তেহট্ট। নদিয়া।
মদন সাধু	রাজীবপুর। পদ্মমালা। নদিয়া।
মনসুরআলি ফকির	গোরভাঙা। নদিয়া।
মহম্মদ নাজের আলি সেখ	রুদ্রনগরপাড়া। পলাশিপাড়া। নদিয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহম্মদ রজব আলি	বার্নিয়া। তেহট্ট। নদিয়া।
মহম্মদ রাসেদ আলি	গোপীনাথপুর। মুর্শিদাবাদ।
মহম্মদ মনসদ আলি	দিহিপাড়া। কুখুলিয়া। বীরভূম।
মহম্মদ সেলিম	হাঁসাডাঙা। ধুবুলিয়া। নদিয়া।
মহম্মদ ফকির	সাহাজাতপুর। মুর্শিদাবাদ।
মহবুল খাঁ	গোরভাঙা। নদিয়া।
মুক্তার শাহ	হেতিয়া। বীরভূম।
মুজিবর রহমান	শাসপুর। কামতপুর। বীরভূম।
মুলাম ফকির	ডোমপুকুর। পীতাম্বরপুর। নদিয়া।
মোজাম্মেল ফকির	ভাঙালঝি। চাপড়া। নদিয়া।
যোসেফ মহলদার ফকির	রাণাবন্ধ। নদিয়া।
রহমত ফকির	বার্নিয়া। তেহট্ট। নদিয়া।
রহিদ সেখ	চাচুয়া। মুর্শিদাবাদ।
রহিদ সেখ	চাঁদোয়া। গড্ডাসিঙ্গারি। মুর্শিদাবাদ।
রহিম খাঁ ফকির	গুপিনাথপুর। বেলডাঙা। মুর্শিদাবাদ।
লাল মহম্মদ সেখ	খোসালপুর। বারুইপাড়া। মুর্শিদাবাদ।
লালু শাহ	শাসপুর। কামতপুর। বীরভূম।
লোকমান ফকির	পাঁচদিয়ার। মুর্শিদাবাদ।
শাবুল ফকির	সাহাজাদপুর। মুর্শিদাবাদ।
সমর মণ্ডল ফকির	রাণাবন্ধ। নদিয়া।
সমীর শাহ	শাসপুর। কামতপুর। বীরভূম।
সরুরত ফকির	খোসালপুর। বারুইপাড়া। মুর্শিদাবাদ।
সাবু ফকির	কুশবেড়িয়া। জুড়ানপুর। মুর্শিদাবাদ।
সাদের ফকির	বাগচি জমশেরপুর। কুচাইডাঙা। নদিয়া।
সামসের আলি খাঁ	বহড়ান। বারুইপাড়া। মুর্শিদাবাদ।
সালাম শাহ	শাসপুর। কামতপুর। বীরভূম।
সাহাবুদ্দিন সাধু	শোনপুর। সুটিয়া। নদিয়া।
সিরাজ শাহ	কানাইপুর। কড়িধ্যা। বীরভূম।
সিরাজুল হক	রুদ্রনগরপাড়া। পলাশিপাড়া। নদিয়া।
সুখচাঁদ ফকির	কুলগাছি। তেহট্ট। নদিয়া।
সেখ আবু তাহার	মান্দারি। পুরন্দ। লাভপুর। বীরভূম।
হাসান ফকির	মহম্মদপুর। মুর্শিদাবাদ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাউল গানের নানাবর্গ

কয়েক শতাব্দী ধরে বাউল গান লেখা হচ্ছে, তার সবগুলি ছাপার অক্ষরে বেরোয়নি। বেরোনো সম্ভবও নয়, কারণ সারাদেশ ঘুরে এত বড় সম্পদ সংগ্রহ করবে কে? তা ছাড়া খোঁজ করলে দেখা যাবে অনেক বাউল গানের কোনও লিখিত রূপ নেই, রয়ে গেছে নানা বাউলের স্মৃতি ও শ্রুতি পরম্পরায়। সেই কারণে কোনও বাউল গীতি সংকলনই পূর্ণাঙ্গ নয়। বরং কোনও একজন গীতিকারের গান সংগ্রহ করা সহজতর এবং অনেকটা নির্ভরযোগ্য। এইভাবে সংকলিত হয়েছে লালনগীতি, পাঞ্জু শাহের গান, জালালগীতি, দীন শরতের পদ, দুদ্দু শাহ-র পদাবলি, হাসন রজার গান, আর্জান শাহ-র পদ, নসরুদ্দিন ও ফুলবাসউদ্দিনের গান অথচ সংকলিত হয়নি কুবির গোঁসাইয়ের বা যাদুবিন্দুর রচনা, রাধেশ্যাম দাসের অনন্য গীতাবলি।

বাউল গান রচনার ধারা এখনও সজীব। পশ্চিমবঙ্গে নানা পল্লিতে নামা-অনামা ব্যক্তি বাউল গান লিখে চলেছেন, তাঁদের শিষ্যরা সেসব গান গাইছেনও নানা আসরে। সনাতনদাসের মতো শিল্পী নিজের লেখা গান নিজেই গাইছেন। আবার এমনও দেখা যাচ্ছে যে, কিছু কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি, মূলত বাউল গানের ভাবে রসে স্নাত হয়ে, গান লিখছেন, জুগিয়ে দিচ্ছেন চেনা বাউলের হাতে, গাইবার জন্য। সেগুলিও ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে।

গত কয়েক বছরে পশ্চিমবাংলার নানা প্রান্তে ঘুরতে ঘুরতে শত শত গান সংগ্রহ করেছি। তার থেকে বেছে, বিচার করে, ২০টি গান এখানে সংকলিত হল। এ গানগুলির অধিকাংশ আনকোরা— কিছু ঐতিহ্যবাহী। গানগুলি নির্বাচনে বিষয়গত বৈচিত্র্য ও প্রকাশগত অভিনবত্বের উপর ঝোঁক পড়েছে। কত আশ্চর্য বিষয় নিয়ে যে এঁরা ভাবছেন, এখানে তার একটা 'থিমেটিক ভেরিয়েশন' যাকে ইংরিজিতে বলে, তা পাওয়া যাবে। প্রবীণতম জীবিত বাউল থেকে নবীনতম বাউলের রচনাসম্ভার এখানে বিন্যস্ত হল। বাউল জীবন, বাউল তত্ত্ব, শব্দ গান, উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক রচনা, বাস্তব জীবন সমস্যা, সমাজ পরিবর্তনের সংলাপ, প্রতীচ্যদর্শনের অভিঘাত, বাউল গানের বিকৃতি— এমনতর নানা বিচিত্র ভাবনার তরঙ্গ এসে লেগেছে এসব গানের অন্তস্তলে। পাঠকদের সামনে আধুনিক বাউলের বিচিত্র আত্ম-প্রতিকৃতি হাজির করাই এই সংকলনের লক্ষ্য।

এর বাইরে আরও যে শত শত বাউল গান সংগৃহীত হয়েছে তা ধরা আছে টেপ-এ এবং লিখিত আকারে। ভবিষ্যতে কখনও সেগুলি সংকলিত হতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐতিহ্যবাহী বাউল গান

অনন্ত দাস

ওগো সুখের ধান ভানা
ধনী এমন ব্যবসা ছেড়ো না—
কর কৃষ্ণ প্রেমের ভানা-কুটা কষ্ট তোমার থাকবে না।
তোমার দেহ-ঢেঁকশালে অনুরাগের ঢেঁকি বসালে
ভজন-সাধন পাড়ুই দুটো দুদিকে দিলে
আবার নিষ্ঠা-আঁসকল লাগালে
ঢেঁকি চলবে ও যে টলবে না—
ওগো সুখের ধান ভানা।
রাগ ও বৈধী দুজন ভানুনী তাদের নাম কৃষ্ণমোহিনী
তাদের একজন সদ্‌গোপের মেয়ে একজন তেলেনি
তারা ধান ভানে ভাল জানে ভাল
তাদের গায়ে সোনার গহনা।
ঘরে বৃদ্ধা শ্রদ্ধা সেকেলে গিন্নি
শুদ্ধমতি শুতি কুলো-চালুনি
এবার কাম-কামনা ঝেড়ে ঝুড়ে
তুষ-কুঁড়ো ফেলে নাও না।
রাগ-বিবেকের মুষল আঘাতে
বাসনা-তুষ যাবে ছেড়ে পাড় দিতে দিতে—
চাল উঠবে ঘেঁটে বিকার কেটে
ঠিক যেন মিছরিদানা।
শ্রীগুরু-মহাজনের ধান তাতে হবে রে সাবধান
ষোলআনা বজায় রেখে করবে সমাধান
তুমি লাভালাভে কাল কাটাবে
আসল যেন ভেঙ্গ না।
গোঁসাই বলে অনন্ত তুই ধান ভান্‌তে জানিস না
ও তোর ঘটবে যন্ত্রণা—
পাপ-ঢেঁকি তোর মাথা নাড়ে গর্তে পড়ে না।
দেখিস যেন বেহুঁশারে হাতে ঢেঁকি ফেলিস না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরনো বাউল তত্ত্বগান

রাধেশ্যাম দাস

দেখলাম এক রমণী প্রেম পাগলিনী আছে জগতে
সে হয়ে উন্মত্ত লয়ে প্রেমতত্ত্ব ফিরছে পথে পথে।
স্বামীর সহ হয়নি শুভমিলন
কেমন করে কী প্রকারে জানবে প্রেম কেমন—
হয় সেই যুবতী গর্ভবতী বিনা পতি সঙ্গমেতে।
ধন্য রমণী কেমনে জানি প্রসব করে তিন সন্তান
দুইটি গৃহবাসী একটি উদাসী করতে পিতার সন্ধান—
সেই রমণী হয়ে জননী মজে পুত্রের প্রেমেতে।
ত্রিজগতের কর্তা যিনি আদি বিধাতা
তিনজনকে তিন কর্ম দিয়ে করলেন তিন কর্তা—
কেউ সৃষ্টিকর্তা কেউ পালনপিতা
কেউ প্রলয়কর্তা শেষেতে।
অজ নামে সন্তান যিনি তিনি সৃষ্টি করে
ক্ষীরোদ সাঁই নামে সন্তান পালন করে সবারে—
অপর সন্তান করেন সমাধান মহাকাল নামেতে।
দাস রাধাশ্যাম বাতুলের মতো কহে সৃষ্টিতত্ত্ব
জীবের অসম্ভব কিন্তু শাস্ত্রসঙ্গত—
আমার যত কিছু প্রকাশিত গুরুর চরণ কৃপাতে।

AMARBOI.COM

* * *

জগৎ প্রসবিনী যে জননী সেই মহামায়া
হয়েছে প্রেম-পাগলিনী স্বামীর সঙ্গ না পাইয়া।
পরমপুরুষ আদি যিনি তাঁর যে তিন শক্তি
তিন শক্তির মধ্যে প্রধান যে সেই মায়াশক্তি—
তিনি আদ্যাশক্তি ভগবতী
নামটি অভয়া।
ইচ্ছাময় সেই পরমপুরুষ স্বয়ং ভগবান
তাঁর ইচ্ছাতে প্রসবে মা তাঁর তিনটি সন্তান—
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের বিধান
তিনকে দিলেন বিচারিয়া।
ঐ মহাশক্তি রমণীর প্রতি হয় দৈববাণী
তিনের মধ্যে চিনে লহ কে হয় তব স্বামী—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রীজগৎপতি পিতা ও আমি
তুমি দেখ মা ভাবিয়া।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিনকে ডেকে বলেন মা সতী
তিনজনের মধ্যে একজন হও মম পতি—
শিব বলেন মা শক্তি একশো আটবার যদি
ত্যাগ কর মা কায়া।
গোঁসাই গুরুচাঁদ মহাশক্তিমান সর্বতত্ত্ব অবগত
কৃপা করি জানিয়েছেন তায় মায়েরই তত্ত্ব—
রাধাশ্যাম কয় চাই না অর্থ
মা চাই তব পদছায়া।

অজ্ঞাত রচয়িতার মরমি পদ

ওরে মন জানব তুমি কেমন গড়নদার
কেমন স্বর্ণকার—
ওরে গড়ে দে তুই উপাসনার সোনার অলংকার।
নিষ্ঠা-নিক্তিতে ধরে
সোনা জমা নে ওজন করে
দেনাপাওনা ষোলোআনা সূক্ষ্মের উপরে—
ছেড়ে খুঁটিনাটি ময়লা মাটি গলিয়ে খাঁটি কর এবার।
আগে জ্বালো বিবেক-হুতাশন
ষড়রিপু-কয়লা তাতে কর রে ক্ষেপণ—
তাতে সাধুসঙ্গ-সুবাতাস দে
আঁচ হবে তোর চমৎকার।
আমি নিষেধ করে দিতেছি দোহাই
যেন অসৎসঙ্গ-তামাদস্তা খাদ দিও না ভাই—
গলিয়ে আঁচে ভাবের ছাঁচে ঢেলে তারে করবি তার।
সোনা কি অমনি গলে শুধু অনলে
তাতে দে অনুরাগ-সোহাগার ভাগ যতনে ফেলে—
গড়ে দে আমার চমৎকার কৃষ্ণভক্তি-রত্নহার।
ব্রজের ভাব সুনির্মল
তাতে কেটে দে ডায়মল—
গোপী-ভাবের ঝালা দিলে করবে রে ঝলমল।
দিয়ে শুদ্ধরতি গাঁথলে মোতি
হবে অতি সুবাহার।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দ গান

খ্যাপাচাঁদ বাউল

পর বিনে জগতে কে আপন।
পরের জন্য যার প্রাণ কাঁদে
সেই তো জানে পরের মন।
যেমন লোহা-কাঠ সংগ্রহ করি
সমুদ্রেতে ভাসায় তরী
তার কে হয় কার আপন।
তরী একবার ভাসে একবার ডোবে
তবু না ছাড়ে প্রেমের বাঁধন।
যেমন মেয়েরা যায় পরের বাড়ি
পরকে লয় আপন করি
হয় মহামিলন—
তারা একবার হাসে একবার কাঁদে
না ছাড়ে প্রেমের বাঁধন।
খ্যাপা বলে পর আপনার করা
হতে হবে জীয়ন্তে মরা
হয়েছিল চণ্ডীদাস একজন—
তারা একমরণে দুজন ম'ল
এমনি তাদের প্রেমের মিলন।

AMARBOI.COM

বাউল তত্ত্বগান

রাধেশ্যাম দাস

তারে দেখতে যদি পাই
চিত্তের অন্ধকার সন্ধ মেটাই।
শুনেছি যা শুনব না তা
বর্তমানে দেখানো চাই।
না দেখে আপন নয়নে
ভজিব বল কেমনে
বর্তমান দেখায় যে জনে
তাহার চরণে বিকাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাহিরে সে অন্ধকারে
চন্দ্র সূর্য হরণ করে
যে মনের আঁধার ঘুচাইতে পারে—
সেই দীক্ষাগুরু গোঁসাই।
ভুলব না আর সোনা বলে
শোনা কথা সবাই বলে
শোনা কথায় তরী খুলে
হাঁটু জলে পাইনে থাই।
বহু মন সাধনার ফলে
গুরুচাঁদের কৃপা বলে
রাধেশ্যাম কয় দেখতে পেলে
সোনাতে বাসনা নাই।

বাস্তবগন্ধী বাউল গান

অজ্ঞাত

হরি তোমায় ডাকবার আমার
সময় হল কই?
আমি ঐ ভাবনায় সদা রই।
ভোরের বেলা মনে করি করব তোমার স্তব
ক্ষুধার লাগি খোকা উঠে লাগায় কলরব—
আবার ঐ গোলমালে গিন্নি জেগে
তার চাঁদবদনে ফোটায় খই।
মনে করি গঙ্গাজলে করব তোমার স্তুতি
কলসি কাঁখে সারি সারি উদয় যুবতী—
আমি তাদের দেখে তোমায় ভুলে
অমনি আত্মহারা হই।
যখন আমি বসি ভোজনে
একক ক্রমে পঞ্চগ্রাস দিই গো বদনে
তখন পাওনাদারের সাড়া পেয়ে
শুক্তানিতে মাখাই দই।
যখন আমি মালা নিয়ে জপেতে বসি
তখন লম্বা হাতে বাজার ফর্দ উদয় প্রেয়সী
ঘরে চাল বাড়ন্ত লক্ষ্মীকান্ত
অমনি মালা ঝোলা সই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তরবঙ্গের তরজা বাউল গীতি

তরণী সেন মহান্ত

শিষ্যের প্রশ্ন

গুরু তুমি তত্ত্ববেত্তা শুধাই তোমারে
লীলা একি নিত্য দেখি বল গো আমারে।
আগে হল লীলাখেলা পাছে জন্ম তার
দেখে শুনে মাথা ঘোরে কাণ্ড চমৎকার।
আগুন (অঘ্রান) মাসে রাসলীলা হয় ফাগুন মাসে দোল
শ্রাবণ মাসে ঝুলন যাত্রা দেশে কলরোল।
তারপরে ভাদরে জন্মে কৃষ্ণ করে লীলা
তরণী কয় লীলাময়ের এ কীসের অছিলা।

গুরুর উত্তর

মত্ত হয়ে তত্ত্ব কর এ দেহের ভিতরে
লীলা ছেড়ে তত্ত্বে পাবে দেহ অভ্যন্তরে।
জীব মত্ত রয় রাসলীলাতে শেষে খণ্ডরতি
কর্ষণে আনন্দ সপ্ত রাসে হয় আহুতি।
দোল অর্থ আবীরের খেলা শেষে ফাগুন মাস
রক্তে মাখা গর্ভের শিশু চার মাসে প্রকাশ।
শ্রাবণ মাসে ন'মাস শিশুর ঝুলনেতে ঝোলা।
মাতৃগর্ভ ঝুলে পড়ে শিশু মারে দোলা।
ভাদরে তাই দশমাস হলে হয় জন্মাষ্টমী
তরণী কয় কী বলব আর এই বুঝেছি আমি।

শিক্ষিত নাগরিকের বাউল রচনা

বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত

শুধুই রূপসজ্জায় কি মানুষ করা যায়?
মানুষ আছে এই দেহ-ঘটে
নাইক পটে—
নাইরে মন্দির মসজিদ গির্জায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই মানুষের করণ নয় সাধারণ
সেই যে অগ্নি-পারার মিলন করণ
এ ভবে তা' জানেরে কয়জন
যে জন জানে তাহার ধর গে চরণ
নইলে তারে পাবি নারে সুনিশ্চয়।
তুই মাথায় বাঁধলি লাল পাগুড়ি
স্কন্ধে ঝুলাস লাল উত্তরী
বাঁধলি কোমরপটি উর্ধ্বঝুঁটি
হাতে গোপীচন্দ্র শোভা পায়।
মন রে সময় থাকতে ছাড় এই খেলা
সাধুসঙ্গ করিস্ না হেলা
এবার বহিরঙ্গ দূরে ফেলা
অন্তরঙ্গা ভাবের কর আশ্রয়।
গোঁসাই বলে ওরে বঙ্কা
তোর থাকবে না রে কোনো শঙ্কা
তুই পারে যাবি মেরে ডঙ্কা
একবার ধর না গিয়ে সাধুর পায়।

প্রবীণ বাউলদের রচনা
সনাতনদাস বাউল

খ্যাপারে ঢাকা শহর যাবি কী করে
ও তুই ঢাকা খুলে দেখলে পরে যাবে রে মাথা ঘুরে।
এবার ঢাকার কথা শোন তরে বল্লি
ঢাকার ভিতর আছে ঢাকা তিপ্পান্ন গলি—
আছে ঢাকার ভিতর গন্ধকালী বলি খাবার তরে।
ঢাকায় চারদিকে আছে দেখ ঝুরকুণ্ডারি বন
অপ্রকটে আছে সেথা মদনমোহন—
সেথা ডাকিনীটা দিবানিশি আছে বসে হাঁ করে।
খ্যাপা বলে সনাতন রে
সেথা বেহুশারে গেলে পরে
বাপ-বেটায় মরে—
আবার ঠাকুর গেল মরে
বাগাতে সে না পেরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষিতজনের জনপ্রিয় বাউল রচনা
আশানন্দন চট্টরাজ

আমি মরছি খুঁজে সেই দোকানের
সহজ ঠিকানা—
যেথা আল্লা-হরি-রাম-কালী-গড্
এক থালাতে খায় খানা।
যেথা ভক্তি-যোগের আগুন জ্বেলে
গোরা রামকৃষ্ণ কড়াই ঠেলে
আর মহম্মদ জিন যিশু ছাঁকে
প্রেম-রসে মিহিদানা।
আমি মরছি খুঁজে সেই ঠিকানা।
যেথা জ্ঞান-ছানাতে কর্ম-চিনি
বুদ্ধ নানক মাখে
আমি দয়ার সাথে ক্ষমার সাথে
ধর্মবড়া থাকে।
যা পয়সা দিলে যায় না পাওয়া
আর বিন্ কড়িতে যায় গো খাওয়া—
যেথা আসল মালিক চেনার হদিস
জপ ধ্যানেতে যায় জানা—
আমি করছি খুঁজে সেই দোকানের
সহজ ঠিকানা।

প্রবীণ বাউলের আধুনিক রচনা
হরিপদ গোঁসাই

যাস নারে তুই হুরার পুকুর পার।
সেই পুকুরের জলের পারে
মাছরাঙায় মানুষ মারে
দেখলে জীবের জ্ঞান থাকে না আর।
পুকুর সারে তিনকানি
বন্যাতে লাল পানি
ডুলি দিলে বহে একটি দ্বার—
সেই পুকুরে পাগলা ভোলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিনান করে তিনবেলা
ব্রহ্মা বিষ্ণু না পাইল আর।
পুকুরের পারে অমাবস্যায়
চন্দ্র ওঠে কোন্ ভরসায়
পূর্ণিমার দিন থাকে অন্ধকার—
সেই চন্দ্র দর্শন করিলে
কোটি জন্মের ফল ফলে
ভবের পরে আসবে না সে আর।
ভেবে হরিপদ বলে
চন্দ্রগ্রহণের কালে
মুক্তিস্নানে যেয়ো পুকুর পার—
দুই জনে এক আত্মা হয়ে
স্নান করলে সেই পুকুরে
জন্ম মৃত্যু না হইবে আর।

দরবেশের আত্মদর্শনের গান
কালাচাঁদ দরবেশ

বাংলার বাউল সুরসাগরে যেজন ডুবেছে
তিনিই সাগর সেঁচে মাণিক তুলে
বাউল রত্ন হইয়েছে।
এমন রত্নই কোহিনুর মণি
তত্ত্ব সম্রাট পরশমণি
সুর ব্রহ্মা স্বরূপিনী তার কণ্ঠে সদা হয়েছে।
ধন্য বাউল লোকশিক্ষক
সমাজের হয় প্রতিরক্ষক
মুখপাত্র খাঁটি পরীক্ষক
সাধক বাউল হয়েছে।
দরবেশ রাধাচন্দ্র নিলেন কবে
কালাচাঁদকে ভালবেসে
তত্ত্ববস্তু দিলেন শেষে প্যারিসে প্রমাণ রয়েছে।
বাউল দরবেশীর স্বর্গভূমি
বাংলাই বাউলের রাজধানী
বিশ্ববাসী হইল ধনী
তারা বাউলের পরশ পেয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
AMARBOI.COM

আধুনিক বাউল গান
শঙ্কর চক্রবর্তী

বাউল গান নষ্ট করল বৈতাল বাউলে—
ডিস্কো আর পল্লীগীতি করছে বাউলের ক্ষতি
পূর্ব মহাজনের পদ ভুলে।
পুঁচকে কিছু ছেলেছোকরা
পিতামাতার কুলাঙ্গার—
বাউলের ভাবভঙ্গি নিয়ে
খমকেতে দেয় টংকার।
জানে না বাউলের ভাষা ভিটাবাড়ির জংলা চাষা
তাই তো বাউলের দশা মাথা মুড়ে ঘোল ঢালে।
পোষাক চাঙ্গা করে রাঙ্গা হাতে নিয়ে একতারা
প্যান্ট ছেড়ে কাপড় পরে বাউল মঞ্চে হয় খাড়া—
খমকে বাজায়ে খ্যামটা
বিধবার সঙ্গে প্রেমটা
অন্ধকারে মাতালে।
মুকুন্দদাস লালনের গান
সিরাজ সাঁই পাঞ্জুর আখ্যান
বল্লভের সেই মধুর তান
গিয়েছে বাউল আজ ভুলে।
খগেন সাধু কয় ফুকারি সমাজে বাউল খুব দরকারি
রঘু আয় তাড়াতাড়ি শঙ্করকে সঙ্গে করে—
আমরা তিন মিলে গানের বাউলে
কলঙ্ক ফেলি তুলে।

বাউলের প্রতীচ্য দর্শন
হরিপদ গোঁসাই

এসে দেখি আমি এই প্যারিস শহরে
দেখছি রঙ্গবিরঙ্গে অনেক মানুষ
সকলকে নেয় আপন করে।
দেখি তাদের এমনই ব্যবহার
নাহি তাদের কেহ আপন পর—

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিংসা নিন্দা নাই অন্তরে
চুম্বন খায় সবাই সবাইকে ধরে।
পুরুষ নারীর নাই কোনো বাধা
এদের অন্তরগুলি বড়ই সাদা
এরা প্রেমে মত্ত সকল সময়
কী ঘরে কী বাহিরে।

তাদের লীলা খেলা বলব কী
যেমন বস্ত্রহারা ব্রজবালা হয় উলঙ্গী
উত্তম প্রেমে মত্ত তারা
রয়েছে নেশার ঘোরে।
হরিপদ কয় সত্যকথা
তোমরা মা জননী স্বর্গের দেবতা
তোমরা ইন্দ্রপুরী ত্যাজ্য করে
এসেছ এই প্যারিস শহরে।

AMARBOI.COM

অন্ধ প্রতিবন্ধী বাউলের রচনা
রথীন হালদার

আমি বিহঙ্গের গান শুনেছি বিজনে
নীলাকাশ চোখে দেখিনি—
আমি কুসুম গন্ধ পেয়েছি কাননে
গোলাপের শোভা দেখিনি।
আমার দু'চোখে আঁধার কখনও
আলোর ঠিকানা পাবে না—
অন্তর যদি কাঁদে প্রিয়া বলে
জানি তুমি কাছে রবে না
হৃদয়ের মাঝে পরম যতনে
মোর ছবি কেহ আঁকেনি।

শুনেছি শুধুই রামধনু নয়
সাতটি রঙেতে রাঙানো
তোমার দু'চোখে সাগরের নীল
কুন্তলে মেঘ ছড়ানো—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গানের ভুবনে আহত বলাকা
মেলেনিকো পাখা সুদূরে।
বিরহ ব্যথার অশ্রু মালিকা
পারিনিকো দিতে প্রিয়ারে
বেদনার সুরে মোর স্বরলিপি
হায় আজও কেউ লেখেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দায়েম শাহ্-র গান

১

ফিরবি কবে রে মন মরি এ রণ
ঘর বড় ঘড়িরে ভাই দেখিলাম ঘোর দরশন।
সেই খানেতে বিরাজ করে সাঁই নিরঞ্জন
মরি এ রণ—
ছাঁচ চালের পানি রে ভাই ঘরের মড়কচাতে মরে
ভেবে দেখ ও পাগল মন আপন আপন ধড়ে
ফিরবি কবে রে মন—
হাল জোয়াল মাঠে গেল বলদ রইল গাভির পেটে
কিরষেনের ও খোঁজ নাই তো, লাইলি গেল মাঠে
ফিরবি কবে রে মন—
দায়েম শা ফকিরে বলে আমার লেগে গেল ধাঁধা
করকটাতে শিকার করে বাজ রইলো বাঁধা
ফিরবি কবে রে মন—

AMARBOI.COM

২

মনের মায়ার তগি ফেলেছে, প্রাণের মায়ায় তগি ফেলেছে
ভবে বিষয় কাঁটার টোপ গেঁথেছে।
এই সে ভব সিন্ধু মাঝে চোদ্দ পোয়া দ'পড়েছে
চোদ্দ পোয়া পুষ্করিণীতে ঘাট করে সে বসে আছে
মনের মায়ায়—
এক দু তিন চার হাত ডোরেতে চারদিকে চার বঁড়শি আছে
কোথাকার এ খেলোয়াড় এসে ফিচাক মেরে দাঁড়া ফেলেছে
মনের মায়ায়—
জীবনে যার আখেরে গর্মি সেই কাঁটাতে ঠোকরেছে
আমোদে না গিলতে পেরে গলায় কাঁটা লাগান বসে আছে
মনের মায়ায়—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দায়েম শা ফকির বলে ভাই কাঁটা ভাঙার পথ রয়েছে
নবীর কলমা পড়ে মারো ঝাপটা ভাঙবে কাঁটা ভয় কি আছে
মনের মায়ায়—

৩

রুহু নফস্ কালেব ভেদ জেনে তুই কররে সাধনা
রুহু নফস্ কালেব না চিনিলে বন্দেগী তোর হবে না।

রুহু নফস্ কালেব কারে বলে ওরে বুঝে লে তুই গুরুর ঘরে
আবার গুরুকরণ না করিলে এই ভেদ তুই পাবি না
রুহু নফস্ কালেব—

ওরে পঞ্চ রুহু পঞ্চ আত্মা কর তাহার সাধনা
আবার তার সাধনা করিলে ভবেতে পার পাবি না
রুহু নফস্ কালেব—

ইলমে ফুকা যারে বলে ওরে চিনে লে তুই গুরু ধরে
আবার ইলমে তাহিম তোর না থাকিলে চলবে না
রুহু নফস্ কালেব—

ওরে বুঝে নে তুই নাতেক খুলে যেদিন যাবি গুরুর ঘরে
আবার ইলমে লাদুনী না চিনিলে বন্দেগী তোর হবে না
রুহু নফস্ কালেব—

দায়েম শা ফকিরে বলে ভেদ থাকে কি পদ্মবনে
ওরে গুরুকরণ না করিলে সেই ভেদ তুই পাবি না।

৪

ওরে খ্যাপা সহজে কি ধন মেলে কামেল মত্ত না হলে
কামরূপেতে কামেল হাওয়া চাই জিন্দা মরতে হয়
নবীর তরিক ধরতে গেলে।
আয়ুব নবীর ছিল চার বিবি তিন বিবি তালাক নিলে
একা রহিমা বিবি নবীর করণ মরণ শিকার না যায় ছেড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরে খ্যাপা—
আয়ুব নবীর আঠারো বছর তাজা দেহ পোকায় খেলে
তবু নবী পড়তেন নামাজ রহিমা বিবির চুল ধরে
ওরে খ্যাপা—
আয়ুব নবীর আঠারো বেটা এমনি আল্লা দিল গজব
মরে গেল সবক'টা
দায়েম শা ফকিরে বলে তবু নবী হাত তুলে
আল্লার কাছে মুলাকাত করে।

৫

প'ড়ে হতাশ প'ড়ে হতাশ হোস না মন রাই
ইনিল্লাহু মা সাবেরুন্ন কোরানেতে লেখা রয়।
আলিফ হে মিম দালেতে এক আহম্মদ লেখা আছে
নু হরফকে নথি করে দেখ খোদা কারে কয়
প'ড়ে হতাশ—
কুলাবিল মমিন আরশ মহল কোরানেতে লেখা রয়
আদমের কালেবে আল্লার আরশ অন্য জায়গায় কি খুঁজলে হয়
প'ড়ে হতাশ—
দায়েম শা ফকিরে বলে বৃথা জীবন আমার যায়
আমি চিনব মানুষ হয় অচেনা মানুষ চেনা ভীষণ দায়।

৬

ও তুমি দেল হুজুর না চিনলে পরে তোমার নামাজ হবে কি করে
দেল হুজুরে পড়ো নামাজ আপনার মোকাম চিনে।
ওরে ভুলে যাবি ইস্কের জ্বালা উঠবে নুর তাজেল্লা
খ্যাপা সামনে দেখবি আল্লাতাল্লা ঠিক রাখো দুই নয়নে
ও তুমি—
খ্যাপা আপনার আপনি আসবি যাবি নামাজের ভেদ তবেই পাবি
ও তোর ছয় লতিফা হইবে জিকির খ্যাপা মারাকাবায় বসিলে
ও তুমি—
আগে নয় দরজা বন্ধ করো মুখে লা'ইলাহা জিকির ছাড়ো
খ্যাপা দম থাকিতে আগে মরো পড়ো নামাজ সমানে
ও তুমি—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে আকারে সিজদা দিলে খ্যাপা সেই সিজদা কি হয় দলিলে
আকার ধরে দাও রে সিজদা বসে থাকো এক ধ্যানে
ও তুমি—
দায়েম শা ফকিরে বলে মারো সিজদা হরফ চিনে
মারো সিজদা হরফ চিনে নবীর মিম্বর আছে যেখানে।

৭

মন ঘোড়াকে বাগ ফিরাইতে নারলাম না ভাই দিনে রাতে
মন সেয়ানা বুটের দানা খায় না ঘোড়া কোনমতে।

বিসমিল্লাতে দিয়ে লাগাম, একশো ত্রিশ কর ভাই পালান
হাদিসের কসনি কসে লারলাম ভাই সওয়ার হতে।
মন ঘোড়াকে—
পাঁচ কলমা গোঁজ গাড়ি নামাজ রোজা কর ভাই দড়ি
খয়রাতের দিলাম পিছাড়ী, ছিঁড়লো দড়া আচম্বিতে
মন ঘোড়াকে—
দায়েম শা কয় সহিস হয়ে ঘোড়সওয়ার দিন গেল বয়ে
পুল পেরোবে কিবা লয়ে সে দিন দিবে কোঁড়া ঝাঁটা হাতে।

AMARBOI.COM

৮

রমণীর ছয় পিরীতে মজায় না মন তাই বলি শোন
পিরীত করতে হয় কেমন।
পিরীতে মজ্ঞ মজ কুলমান ত্যাজিয়া
শততম মন মানের গোড়ায় ছাই দিয়া
ও তুমি কুল হারালে দেখতে পাবে
দেখবে তুমি ধ্যানের ছবি।
পেছনে বেজাই ভেনী বাজে ঘন ঘন, তাই বলি শোন
রমণীর ছয় পিরীতে—
প্রিয়ার পবিত্র বাণী লিখেছেন সাঁই কোরানে
সে জন প্রেমিক হবে দেখা হবে নির্জনে
সুজন দেখে ভজ তুমি গুরুজীর চরণ তাই বলি শোন
রমণীর ছয় পিরীতে—
দায়েম শা কয় কাতর হালে যে জনা প্রেমিক হবে
যে জনা প্রেমিক হবে দেখিবে চন্দ্রানন তাই বলি শোন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯

আমি যার কাছে যাই কেউ নাহি কয়
কী করে নামাজ আদায় হয়।
একশো তিরিশ ফরজ মশলা বিচে
লিখেছেন সাঁই কোরানে শুনে
আমার ভাবনা হয়।
আবার কোন্ ফরজে আল্লা আছে
আল্লার দিদার হয় গো কীসে
শুনতে আমার ইচ্ছা হয়।
ওরে সাতজনাতে জামাত হল
একজনা তার ইমাম হল—
বাকি দুই রেকাত নামাজ পড়িল
তিন রেকাতে ইমাম মারা যায়
কী করে নামাজ আদায় হয়।
মুক্তারিগণ ভাবছে বসে
বাকি নামাজ পড়বে না মাটি দেবে
মাটি দেবে না গঙ্গায় দেবে—
ওরে দায়েম শা ফকিরে কয়
কী করে নামাজ আদায় হয়।

AMARBOI.COM

১০

জন্মিলে মরণ লেখা যায় সাধের দুনিয়ায়।
দীন দুনিয়ার ধ্যানের ছবি
পয়দা হলেন দীনের নবী
যার তুলনা এ জগতে নাই।
মরণ তোমার বাঁধছে বাসা সোনার মদিনায়।
হুকুমে এসেছে ভবে
তলব হলে যেতে হবে—
চিরদিন না রবে হেথায়।
ভাইবন্ধু সব ছাড়িয়া
নির্জনে যাও বাসর লইয়া
সঙ্গের সাথী আর তো কেহ নাই।
দায়েম শা ফকিরে বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দয়াল নবীর চরণ তলে—
যার তুলনা এ জগতে নাই
মা জননী কাঁদছে বসে সোনার দুনিয়ায়।

মহম্মদ শাহ্-র গান

১

আওল আলেফেতে আল্লা গনি আপে করতার
মিম রূপে দুজাহান বিচে হয়েছেন প্রচার।
মিমে পাগল হয়ে বিধি
বেহেস্ত দোজখ জমিন আদি
বখসে আপে রত্ন আদি
আলমগড়ে হিজদে হাজার ॥
মিম রূপ না হতো যদি
না করত সাত হরিয়াদি
ছেড়ে দেহ আপন খুদি
মিমে হানা পরোয়ার ॥
যত দেখ মিমের কারণ
মিম চিনে তার কর সাধন
নইলে যাবে বৃথা ভজন
মিম বিনা নাই পারাপার ॥
আলেফ হে দাল ছিল যখন
কিছু পয়দা হয় নাই তখন
মিমের চাদর উড়িয়ে আপন
খেলছে সদাই জাহান পর ॥
আহাদ আহম্মদ চিনো আপন
আদম জিনে হবে ধরম
গুরু পদে হের আপন
মহম্মদ দেখ একাকার ॥

AMARBOI.COM

২

কি কল পেতেছ কলন্দার সকল ঘুরছে লা'এ ত্রিসংসার।
লাম আলেফে জবর দিলে
লামেতে আলেফ লুকাইলে
এলাহা কাহাকে বলে
এল্লরে ভেদ কি তার ॥
আলেফে তিন হরফ আছে
লাম আলেফ লা হয়েছে
এলাহায় কেবা আছে
এলাল্লার ভেদ কি তার ॥
কেবল কলমা পড়ছ মুখে
কেন নাই দেখ চক্ষে
কেবা তোমায় করবে রক্ষে
হাসরের দিন মাঝার ॥
এলাল্লাহ সাবেদ করে
পড় সবে বরজোখ ধরে
নিস্তার পাবে মলে পরে
মহম্মদ বলে রোজ হাসর ॥

৩

আপনে সুরাতসে আদম বানাইয়াছেন খোদায়
সেইজন্য মালা একে সেজদা করতে হয়।
জনাবে করি মিনতি
খানাকুল্লাহ আদম
আলাসুরাতি ॥
ফরমাইলেন জগৎপতি
ইবলিস খাড়া তথায় রয়।
আদম সিজদার হুকুম দিলে
আল্লা কি সেরেক করালে
সেরেক গোনা থাকে বলে
এ দিন দুনিয়ায় ॥
ফুকে দম মকরুল্লা
আলাস তারা বলে আল্লা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
AMARBOI.COM

আদম কয় কালুবালা
মিশাক সময় ॥
কহুতুরেতে মুশা নবী
ইবলিসের হাল পুছে সবি
খবর শুনে মনে ভাবি
গোরে সিজদা দিতে কয় ॥
মালা একে পুরা করে
ইবলিস সেথা ইনকার করে
লানতের তক গলায় পরে
মরদুদ হয়ে যায় ॥
গোরে সিজদার হুকুম দিল
ইহার কি ভেদ বল
আল্লার হুকুম ফরজ হল
কি হল তায় ॥
আদমে কি ভেদ আছে
আল ইনসান ফরমাইয়াছে
মহম্মদ শাহ গুরুর কাছে
বুঝে ইশারায় ॥

৪

ও মন আপনায় চিনলে পাবে মালেক রব্বানা
আমি আমি বলছো সবে কোথায় আমার ঠিকানা।
ফরমাইল ও আলী অজহু
মান আরাফা নফ সাহু
ফাকাদ আরাফা রব্বাহু
চিনে আমি বল না ॥
কেবা আমি কেবা তুমি
দুয়ে সেরেক করো না
আপনাকে চিনলে তারে
কোন চিন্তা রবে না ॥
অচিনে করিয়া চিন কর ভজন সাধনা
আন্দাজিতে ডাকলে পরে
বন্দেগী তার হবে না ॥

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকল দুনিয়ার মজার সাতে
নিশ্বাস বিশ্বাস করো না
মত্তান্নেসের সেগা ছেড়ে
মজাক্করে হও দানা ॥
যে জন চিনেছে আপে
সেই জন বলায় দেও না
আয়নাল হক ফুকারে মনসুর
পেয়ে খোদে আপনা ॥
ফকির শাহ দয়া করে
দিলেন কিছু নিশানা
মহম্মদ শা মিলে থাক বলে
ধরা পড়ো না ॥

৫

জাহের নামাজ পড়ো বাতুনি আদায় করো
বুঝে সুজে না পড়িলে মুছবে নাকো অন্ধকারে।
জাহেরেতে নামাজ ভাই
পাঁচওয়াক্ত পড়া যে চাই
মুরশিদ ধরে জেনে নিয়ে
নামাজ পড়ো আপনারে ॥
কোন হরফে কিয়াম কর
কাহার সাথে ফেরাত পড়ো
কোন হরফে হয় রুকু দিতে
সেজদাতে কোন হরফ ধরো ॥
আত্তাহিয়াতো পড়ো কখন
কোন হরফ হয় হে তখন
সালাম ফিরো কেবা কোন জন
দরুদ পড়ায় কোন রূপ ধরে ॥
সেজদা কেবা করে রে মন
সেজদা সেই বা লয় কোনজন
জেনে চিনে পড় আপন
নইলে সেরেক হবে আরো ॥
না করিলে হুজুর দেলে
দুর হতে সেজদা দিলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাটি সেজদা মিশে গেলে
শয়তানের হয় তাবেদারো ॥
মহম্মদ শা মুরশিদ ধর
জাহের বাতুন নামাজ পড়
লা এর ঘরে সেজদা কর
জাকাত হইয়া রাহে তারো ॥

৬

আল্লা সেওয়া সেজদা হারাম কহেছেন রব কোরানেতে।
কোনখানে কোন নামে সেজদা করি মন কিরূপেতে।
আজাজিল ফেরেস্তা ছিল
সকল স্থানে সেজদা দিল
একজেরা তিল ফাঁক না ছিল
সত্তর হাজার ফি জায়গাতে ॥
দেখরে মন বিচার করে
মনে হাজের হাজের জানলে তোরে
সেজদা হবে কি প্রকারে
না দেখিয়া নজরেতে।
আজাজিলের জন্ম শুদ্ধা
না চিনে করিল সেজদা
জায়গা চিনে কর সেজদা
সকল ফতে হবে তাতে।
আদম সফি মকবুল হলো
চিনে আপন সেজদা দিলো
আজাজিল বান্দা গেল
বাহির হল দরগা হতে ॥
ফকির শাহের ধরে পায়
জাকাত হয়ে মহম্মদ কয়
দয়া করে চেনাও আমায়
সেজদা দিবো সে রূপেতে ॥

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭

নামাজ পড়বি যদি নিরবধি খুদি ছাড় মন
খুদির সাথে সাথে পড়লে নামাজ সফল অকারণ।
আল্লায় হাজের নাজের
সেজদা কর পরোয়ারে
আন্দাজীতে করলে পরে
কবুল না করবে নিরঞ্জন ॥
আপনায় চিনে আদম সেজদা
মকবুল করলেন আপেখোদা
না চিনে করলে সেজদা
হবি আজাজিল মতন ॥
এই জন্য নবী বলে
নামাজ পড় হুজুর দেলে
দেল হুজুরী না পড়িলে
নামাজি কেমন ॥
ফকির শাহের চরণ ধরে
মহম্মদ শাহ আপনায় হেরে
হুজুর দেলে নামাজ পড়
সদা সর্বক্ষণ ॥

AMARBOI.COM

৮

মানুষ মানুষ বল সবে মানুষ ধর মানুষ পাবে
মনের মানুষ আছে খামুস হৃদয় মাঝে গোপনভাবে।
মানুষ ধরে দেখ নিজে
পাবে মানুষ হৃদয় মাঝে
থেকো না মন মিছে কাজে
মানুষ আছে ধরতে হবে ॥
মানুষ আছে রংমহলে
মানুষ মেলে কলমার কলে
নইলে জনম হায় বিফলে
আখেরাতে পস্তাইবে ॥
আলেফ দাল মিম হল যখন
হুকুম দিলেন সাঁই নিরঞ্জন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেজদা করলেন ফেরেস্তাগণ
সেই মানুষ আসিল যবে ॥
ফকির শাহের চরণতলে
মহম্মদ কয় কাতর হালে
মানুষের হুঁসের বলে
সাবেদ পেয়ে দেখলাম ভবে ॥

৯

দিন থাকতে দমের কর ঠিকানা ও মন দম ফুরালে হবে না
আদমের দম বহে চব্বিশ হাজার দম
অরুজ নজুল জানলে পরে হবে তার সাধনা।
দমের ভিতর সাতটি দম
চিনে দম কর সাধন
না চিনিলে দম বৃথা জীবন
সেথা হেথা রবে কানা ॥
সমস কমর আছে দুই দম
ইংলা পেংহা বলে দুই দম
খাতরাহা দম সেই বা কেমন
শুকমন দম খোঁজে না।
আদমের দম এহি দমে
আহম্মদের দম এই আদমে
আল্লার দম চিনলে মহম্মদ
অযুদ ধ্বংস হবে না ॥

১০

মুখে কেবল আল্লাহ বলা হয়
আল্লাহ কোথা আমি কেবা হল না তার পরিচয়—
আপন কাছে না দেখিয়া দেখে বেড়াও জগৎময়।
বেলগায়েবে ডাকলে পরে
শেরেকেতে ধরা যায়
পাক নাম আল্লাহ হামদোলিল্লাহ
কোনখানেতে কিরূপ হয় ॥
হক্কেল একিন হলে পরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলমেল একিনে লিল্লয় হয়
কোন মোকামে কিরূপেতে
আল্লার নামটি দেখাও ময় ॥
এলমেল একিন জানলে পরে
আইনল একিন সাবেদ হয়।
হেজে করে নামটি দেখাও
ওহে গুরু দয়াময় ॥
হয়াল একিন করে দেহ
মহম্মদ শাহের অভিপ্রায় ॥

১১

চড়ো মন নুহুর কিস্তিতে
সে নৌকা ভাসছে সদায় ভবেতে।
সে নৌকায় চাপে যে জনা
ঘোর তুফানে ছয় রিপুতে ঠেকতে হবে না।
আবার কিস্তি ছাড়া হবে যারা
মরতে ডুবে পানিতে ॥
মনরে অবোধ বলি তোরে
চেপে বস কিস্তি পরে
না চড়িলে গৌরব করে
কাঁদতে হবে শেষেতে ॥
বাঁচব আমি পাথার পরে
যে বুঝে সে পড়বে ফেরে
নবী আপে আঁটতে নেরে
বাদাম তোলে নৌকাতে ॥
সেই দিনের বড়ই তুফান
জোয়ার এসে নদী ফেঁপে হবে কানেকান
আবার কিস্তি চড়ে রও মহম্মদ
বাদামের নীচেতে ॥

AMARBOI.COM

১২

ওয়া দাহু মুখে বললে হবে না
লা শরিক লাহু ওয়াদহু চোখে সকল দেখ না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একা আল্লা জোড়া নাহি তার
কিসে প্রমাণ পাই গো তাহার
সাহাদত কলমা সাক্ষী দাও যার
মুখের কথায় চলবে না ॥
না দেখিয়া সাক্ষী দিলে
মুখে ওয়াদাহু বলিলে
বিচার আপনা না করিলে
রবে সদাই দিন কানা ॥
মুখে এক বল যেমন
চোখে এক দেখ তেমন
মহম্মদ ধাঁধা ঘুচিয়ে আপন
ওয়াদাহুকে দেখ না ॥

১৩

নিরাকার পরওয়ার আকার ধরেছে রে
ওমন দেখলি নারে নজর করে দেলের আঙ্গারে।
হামদো সানা সিফাতে হয়
আল্লা রসুল সকলে কয়
তৈয়ব কলমায় কয় দয়াময়
রবে নিরাকার রে ॥
হাম মিম সেজদা বীজে
সা নূরেহিম আয়াতে আছে
সৃষ্টি সকল জগৎ বীজে
আমার নিশান দেখায় রে ॥
আদম আল্লা সুরাতেহি
না ফাকতোহি হেমির রুহি
আকার ধরে এলাহি
দম আপনার ফুকে রে ॥
মহম্মদ আপন খুদি ছাড়ো
দেশ বিদেশে নাহি ঘোর
বুলে বারো বসে তেরো
পুজো তার চরণ ধরে ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪

নমাজ রোজা কলমা পড়বো না
তাতে তোমার কিসের ভাবনা
আমি কেবল মাত্র চাইব দিদার
হুর গুলেমাল চাহি না ॥
নামাজের মধ্যে রে আকার
দেখা ভীষণ গুনগার
ঐ জন্য আমারই ভাই
হয়ে ওঠা ভার।
তুমি পার যদি খুবই কর
আমায় কিছু বল না ॥
কলমা পড়লে হয় না মুখে
কলমা দেখতে হয় চোখে
ঐ জন্যে আমি রে ভাই রয়েছি ঠেকে
আবার না দেখে পড়লে কলমা
কুফরি তো ঘুচবে না ॥
রোজা রাখার যে ঠেলা
দিন গিয়ে সন্ধ্যাবেলা
খাবার হয় পালা।
আবার তাহার মাঝে একটু ত্রুটি হলে
রোজা হবে না ॥
মহম্মদ জানের এই মনের বাসনা
তা কেন বলব না
হক গুরুজি মোর আলমের পানা
আমি নিজের বেহেস্ত করব তৈরী
কারো বেহেস্তে যাবো না।

১৫

দেখবি যদি অধর চাঁদে একদম ভুলো না
হুশ দরদম নজর কর কদম সাফাদের ওতনে হবে মিলনা।
ঘৃণা লজ্জা ভয় ছাড়ো বিচার করে
নাম রং জাত মা বাপ হামকে ছেড়ে
জপ জোয়ান ধিয়ান করে
আপনায় পাবি আয়না ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেওয়াই মিনতি অধীনতা
জানেতে তখন সে আছে কোথা
খুঁজো কেন হেথা সেথা
হয়ে তুমি দিন কানা ॥
দেল আগার সাফকুনি
হামচু আয়না বেরকুনি
চিন্তাতে রয় চিন্তামণি
পীরের কাছে বোঝ না ॥
কিনা কেবর আদাওত ছেড়ে
থাকো রে মন জ্যান্ত মরে
সাহত লালচ দূর করে
হও রে মন দেওয়ানা ॥
হেরেশ বগজ গুস্যা ছাড়ো
ঝুট বখিলে নেকি কর
মহম্মদ শাহর সঙ্গ ধর
কোন চিন্তা রবে না।
কম খানা কম শোনা
কম বল না কম চল না
তুমি দয়াল দয়া করে
পুরাও মনের বাসনা ॥

AMARBOI.COM

১৬

বলব বলব মনে করি সে কথা বলব কি করে
তিনটি নামের একটি মানুষ একটি ঘরে বাস করে।
তাহার ঠিকানা বলি
জেলা হুগলী শহর দিল্লী
আবার জীবনপুরে ইস্টিশনে
দমকলে দম চলে ফিরে ॥
হক জামালের জমিদারী
দম দমাতে হয় কাছারী
চারটি থানার খবরদারী
চার দারোয়ান চারধারে ॥
জবরূত নাসুত লাহুত মালকুত
শুনে ফকির হয়েছে বহুত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফকির বলে হয় না ফকির
হয় মনের মানুষ ধরে ॥

১৭

প্রেমের খেলা ইস্কের মামলা সবে জানে না
ইস্কেবাজী করে দেখ মালেক রব্বানা।
আপন নূরে আপনি আশক
হলেন দেখ আল্লাজী পাক
করে কত জাঁকজমক
হয়ে দেওয়ানা ॥
আপন নূরে নবী পয়দা করে
দুনিয়ায় পাঠায় খোদা
দুই জনাতে জুদা হয়ে
থাকতে পারে না ॥
মহম্মদকে আনিবারে
জিব্রিল পাঠায় মক্কর করে
মক্করউল্লার মক্করকে কয়
প্রেমের ছলনা ॥
আয়নকহক হুক্ক ফুকারে
মনসুর আপে চড়ে দ্বারে
প্রেমের খেলা কেমন করে
দ্বারের বাহানা ॥
খলিলুল্লার আতশেতে
মুশা নবী কহতুরেতে
ইনুষ নবী মাছের পেটে
করে মিলনা ॥
জোলেখা ইউসুফের তরে
শিরীর প্রেমে ফরেহাদ মরে
লাইলার প্রেমে কয়েশ আপে
হলেন দেওয়ানা ॥
গুরুজিকে মহম্মদ কয়
প্রেম পিয়ালা পিয়াও আমায়
মস্ত কর আপন দয়ায়
বানাও দিওয়ানা ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইমরান ফকিরের গান

ভেদের কথা ভেদির নিকট জানতে হবে রে
খোদার নূরে নবী হল ফেরেস্তা হয় কার নূরে।
ও দাদা মনের বিচার কর
কোন্ পর্দাতে আছে খোদা কোন্ দুয়ারী ঘর—
আরশে কুরশী আরশেয়ানা আছে বল কার পরে।
ও দাদা কোরান দেখে পড়
কোন্ হরফে রূহের খেলা কোন্ হরফে ধড়—
আবার মিম্বারের তিন ধাপ কেন হয় বল দেখি কার তরে।
ও দাদা খবর তিনের শোন্
আহাদ আহম্মদ কোথায় ছিল কিরূপে তার তন্
আবার আহাদ থেকে আহমদ হলে ভালো করে দেখ তারে।
ও দাদা আবার বলে যাই
লা পুরাতে আল্লা ছিল কলমা বলে তাই—
নবী সঙ্গে বলরে কথা সেই কথা হয় কোন্ সুরে।
ও দাদা ভেদের মর্ম বোঝ
মিমের পর্দা কোথায় ছিল ভালো করে খোঁজ—
আবার কোন্ কলেতে তৈরি হল গড়ল কোন্ কারিগরে।
ও দাদা বলছি কথা খাঁটি
কোন্ দরিয়ার পানি দিয়ে গড়ল কাদামাটি—
আবার ঐ মাটিতে পুতুল গড়ে আদম দিল নাম তারে।
ও দাদা ইমরান বলে তাই
ভেদের কথা জানতে পীরের দরবারেতে যাই—
আবার নোক্তার ভিতর কোরান গোপন রয়েছিল কী করে।

মিয়াজান ফকিরের গান

সরলে গরল মিশে না সরলভাবে আছে যে জনা।
সর্পের মাথায় ব্যাঙা নাচে
তবু সর্পে আহার করে না।
বুঝি সর্পের ওঝা আছে
তাই জন্যে মাথা তুলে না।
পদ্মপাতায় পানি ফুটি টলমল
পদ্ম ভিজে না—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার সাক্ষী আছে দধিভাণ্ড
উপরে ভাসে ননী ছানা।
ফকির মিয়াজানে কয় সরল পথে থাকলে মানুষ
ধইরবা রে মনা।
সরলে গরল মিশে না সরল পথে রয় যে জনা
সহজ পথে রয় সে জনা।

আবদুল্লা ফকিরের গান

সাপ ধরিবার মন্ত্র আগে শিক্ষা লও রে ভাই
নামের মালা গলে দিয়ে কুঞ্জবনে যাই।
মাটির নীচে ধন আছে
সাপিনী তায় পাহারা দিছে
ছয়টা ইঁদুর ঘরের নীচে
পিড়ার মাটি নাই ॥
ব্যাঙে নাচে সাপের কাছে
সাপ পলাইল ধনের নীচে
মনিব হইয়া ব্যাঙে নাচে
ধরবার পা নাই ॥
নামের হলদি গায়ে দিলে
সরে যায় সাপ গন্ধ পাইলে
আবদুল্লা কয় পইড়া রইবা চরণতলে
মাথাটি লুকাই ॥

চার ফকিরের গান

শুনুন বাবু চার ফকিরে ফকিরি গান গাই
আমরা ফকির বটে মোদের ফিকির জানা নাই।
হিন্দু মুসলমানের এ দেশ সকলে ভাই ভাই—
শুনুন বাবু চার ফকিরে ফকিরি গান গাই।
হিন্দু যদি মাটি হয় তো মুসলমান হয় জল
মাটিতে জল পড়লে তবে হয় জানি ফসল।
হিন্দু যদি ফল হয় তো মুসলমান হয় ফুল
হিন্দু যদি নদী হয় তো মুসলমান তার কূল।
ভেবে দেখুন দুইয়ের মাঝে কোনো তফাৎ নাই

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনুন বাবু চার ফকিরে ফকিরি গান গাই।
হিন্দু যদি মেঘ হয় তো মুসলমান হয় হাওয়া
জল বিলিয়ে মেঘেরা সব করে আসাযাওয়া।
হিন্দু যদি চোখ দুটো হয় দৃষ্টি মুসলমান
হিন্দু যদি সুর হয় তো ইসলাম তার গান।
দুইয়ের দেহে রক্ত আছে রক্তের রং লাল
তাহলে আর কীসের তফাৎ হায় পোড়া কপাল।
হিন্দু যাকে জল বলে মুসলমানে বলে পানি
নামেতে দুই কাজে কিন্তু একই বলে জানি।
হিন্দু মুসলমানে দেখুন সকলে ভাই ভাই
শুনুন বাবু চার ফকিরে ফকিরি গান গাই।
গীতা কোরান দুইয়ে জোড়ান একই কথা বলে
দুই ধর্মের দুইটি কেতাব একই পথে চলে।
অমিল কিছু নাই ওরে ভাই আল্লা ভগবানে
ধর্ম যাদের ব্যবসা তারাই এসব তফাৎ মানে।
রাম ও রহিম সৃষ্টির একের নাইকো হানাহানি।
শুনুন বাবু চার ফকিরের সাম্যবাদের বাণী।

দরবেশি গান

সাধন কর ভজন কর তওবা করে আইছনি
হাদিস পইড়া খোদার দিদার পাইছনি—
তৌহিদ কোরান কলেমা তোমার দিলকোরানে মিলাইছনি।

দমের ঘরে অহি আছে দিলের খাতায় লিখছনি
পরের ছুরত দেখছ চাইয়া নিজের ছুরত দেখছনি।
খালে বিলের পানি দিয়া মাটির দেহ লও ধুয়াইয়া
এসকো নদীর পানি দিয়া মনের ময়লা ধুইছনি।

তুমি পরের ব্যারাম সারাইতে যাও নিজের ব্যারাম চিনছনি
স্বভাব রোগে মরছে সাধু তাঁর ঔষধ খাইছনি।
না চিনিয়ে রুহ হায়াজি ছাগল গোরু দাও কুরবানি
পেটকে খাওয়াও ক্ষীর নবনী রুহর খাদ্য খাইছনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসমাইলের জন্মস্থানে উঠাও খোদার কাবা ঘর
তোমার জন্ম কোন্ খানেতে রাখছনি রে তার খবর।
তোমার সাফায়েত করেন যিনি তার সনে নাই চেনাচিনি
মোহম্মদের ছবিখানি বুর্জগে উঠাইছনি।

নিজের জমির পতিত রাইখা পরের জায়গায় বাঁধছ ঘর
দুদিন পরে তোমার জায়গায় তুমি হইয়া যাইবে পর।
আপন মানুষ থাকতে কাছে পইরা গেলি অনেক পাছে
রাধাবল্লভের আইসা গেছে বিদায় দিনের নিশানী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফকিরি-নামা

আবু তাহের ফকির রচিত

প্রথমেতে কহি আমি শরিয়তি কাজ।
কলেমা নামাজ রোজা জাকাত আর হজ্ব ॥
ইহা না জানিলে কেহ মুসলমান নয়।
মুসলমান মানে হচ্ছে বিশ্বাসী যে হয় ॥
খোদা ও রসুলের প্রতি বিশ্বাস যার রয়।
মোমিন মুসলমান সে তা মিথ্যা কথা নয় ॥
প্রথমে কলেমা ভাই সবার জানা চাই।
কলেমা না জানিলে সেই কাফের গণ্য হয় ॥
কলেমা কিন্তু মহাম্মদের তবু হয় ফরজ।
চারি কলেমায় চারি একিন করো গো নেহাজ ॥
কলেমা পড়িতে আছে কোরানে আদেশ।
পড়িয়া চিনিতে হবে কলেমা বিশেষ ॥
নাইলে কাফের হবে যত কল্‌মা পড়।
না পড়িলেও কাফের হবে ওহে বেরাদার ॥
তা পরে নামাজ কর জাকাতের সাথে।
আদায় করিতে হবে একিন সহিতে ॥
কোরানেতে কোন স্থানে নামাজ পড়িতে।
বলে নাই আল্লা-তায়ালা কোন জায়গাতে ॥
বিরাশি জায়গায় আল্লা করেছে ফরমান।
জাকাত সহ নামাজ কায়েম কর মুসলমান ॥
কি করিয়া নামাজ কায়েম হইবে সবার।
নামাজ কায়েম না হলে যাবে দোজখ মাঝার ॥
মৌলভী মৌলানাগণের নিকটেতে পুছ।
তাহাদের খেদমতে থাকি জেনে লও কিছু ॥
নহেত কামেল পীর ধরিয়া একিনেতে।
কোন নামাজ হইবে কায়েম জানো তার সাথে ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোরানেতে আছে সহ দেখে শুনে লবে।
তত্ত্ব তৌহিদ হলে নামাজ কায়েম হইবে ॥
তারপরে ছিয়াম ভাই রোজা বলে যাকে।
একমাস প্রতিপালন কর এই রোজাকে ॥
ছিয়াম মানে উপবাস ঠিক ইহা নয়।
উপবাসের সঙ্গে সংযম বলা যায় ॥
আহারে বিহারে ভাই চলায় বলায়।
হর কাজে সংযম হইতে সে যে কয় ॥
সংযম না হইলে রোজা কায়েম না হবে।
বাদুড়ের ন্যায় উপবাস করিয়া মরিবে ॥
একমাস খোদার হুজুরে হাজির থাকিবে।
পরেতে খুশীর ঈদ পালন কর সবে ॥
ঐ সঙ্গে কিছু দান কাঙাল মিস্‌কিনে করিবে।
ফেত্‌রা বলিয়া যাহা লিখিছে কেতাবে ॥
আরও বাতেন কিছু ছিয়ামতে আছে।
জেনে লিয়ে কর ভাই দুনিয়ার বিচে ॥
তাপরে জাকাত দাও করিয়া হিসাব।
মজুদ মালের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ॥
ইহাতে বখিলের জন্য যাহা হুকুম আছে।
আরও এক জাকাত আছে নামাজের বিচে ॥
সব হতে প্রিয় বস্তু জাকাত কিছু দাও।
ছুহা আল এমরান মাঝে কোরান পানে চাও ॥
ইহা হতে বুঝা যায় জাকাত দুই প্রকার।
জানিয়া আদায় কর ওহে বেরাদার ॥
তার পরে হজ্জ ভাই করিতে হইবে।
মালদার যে জন ভাই সেই হজ্জে যাবে ॥
সকলের জন্য ইহা নহে ত ফরমান।
যার আছে টাকাকড়ি সেই হজ্জে যান ॥
হজ্জ শব্দের অর্থ ভাই দেখা-সাক্ষাৎ হয়।
কাবা গিয়া দেখে এসো যার মনে লয় ॥
সংক্ষেপেতে পঞ্চবেনা করিলাম শেষ।
তাপরে তরিকের কথা শোন সবিশেষ ॥
তরিকেতে পীর ধর দেখিয়া শুনিয়া।
তাহার খেদমতে থাকি লইবে জানিয়া ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু নিবে কিছু দিবে আদান প্রদান।
কোরানেতে মোবায়াত বলিয়াছে নাম ॥
হকিকত কাহাকে বলে জানিয়া লইবে।
সেইমত সত্যপথে চলিতে থাকিবে ॥
মারেফত যার নাম শোন ভাই সবে।
বুঝিয়া সুজিয়া কাজ দুনিয়ায় করিবে ॥
তরিকত না জানিলে শরিয়ত হবে না।
আগে জান দেহতত্ত্ব রবকে যাবে জানা ॥
আরবিতে যাকে দেখ তশরিহ্ কয়।
ইংরাজিতে সেইত দেখ এনাটমি হয় ॥
তছাউরাক যার নাম মারেফত বলে তারে।
বাংলায় শরীরতত্ত্ব বোঝ বেরাদারে ॥
দেহতত্ত্ব না জানিলে সকল বৃথা হবে।
কামেল মুর্শিদ ধরি দেহতত্ত্ব করি লবে ॥
পাঁচ নফস পাঁচ রূহ ছয় লতিফা কয়।
দেহ মধ্যে সকল আছে কর পরিচয় ॥
পঞ্চ ওজুদ তালাশ করি দেখিয়া লইবে।
কোন ওজুদে কোন মোয়ামেলা জানা চাই তবে ॥
আপন ছুরাতে আল্লা গড়েছেন আদম।
আপনি বসত করেন লাগাইয়া দম ॥
অফি আন ফোসেকুম আফলো তোফসেরুন।
বলেছেন আল্লা-তায়ালা তার খোঁজ করুন ॥
কোন ওজুদে বাস করেন পীর ধরি জানো।
পরের খেদমতে থাকে তার কথা মানো ॥
একজন যে আলেম দেখিতে পাওয়া যায়।
কোরান হাদীস লইয়া জলসা করিয়া বেড়ায় ॥
নামাজ পড় রোজা কর বলেন এই কথা।
পরের দোষ দেখে বেড়ায় করিয়া ধৃষ্টতা ॥
আরবি লেখাপড়া শিখে অহঙ্কার মনে।
আজাজিল বড় আলেম আছে কি তা মনে ॥
ঘোরাফেরা স্বার্থসাধন রুজির লালসায়।
না জানিয়া গীবত গায় কেবল রুজির দায় ॥
দুই চারিটি কেচ্ছা গেয়ে উদাহরণ দেয় ভালো।
তত্ত্ব তছুরাফ ধার ধারে না তার বেলায় মুখ কালো ॥
দেল মুখ এক না করি লোককে শুনায় ওয়াজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখে এক কাজে এক কেবল ফাঁকা আওয়াজ ॥
কোরানের আয়াত বেচি করে দরকষাকষি।
নিব দুইশত টাকা হবে না কম বেশী ॥
রুম, শাম, মিশর, কায়রো, মক্কা ও মদিনা।
তায়েফ, সিরিয়া, ইরাক, দামেস্ক, আছে কোথা মানা।
পেলেস্টাইন, কুফা কারবালা দেখে এসো চোখে।
কাগজ কেতাব রেখে দাও কাজ কি শুনে মুখে ॥
এবনে সউদ বাদশা তাঁর শাসন শরিয়ত।
দাড়ি চাঁচলে ৭॥ টাকা ফাইন দণ্ড তৎক্ষণাৎ ॥
স্বাধীন রাজ্যে হারাম হলে করত মুণ্ডপাত।
মুসলিম রাজ্যে বাদশার বিচার শুনে হবে মাত ॥
বাংলার পণের দায়ে হয় না বিয়ে গরিবের মেয়ে।
কত অবৈধ কাজ হয় সমাজে কেউ দেখে না চেয়ে ॥
আবার কতজনে অন্যস্থানে মেয়ে বিক্রি করে।
ঘরে বসে বাংলায় শরা আর তাম্ভি করে ফেরে ॥
কত শত মৌলভী মৌলানা ফিরছে গঞ্জে গ্রামে।
বহুরকম ফতোয়া দেয় এসলামের নামে ॥
যেদিন এসলাম এসেছিল ভারতের বুকে।
সেদিন প্রশংসিত হয়েছিল লোক মুখে মুখে ॥
সেই আদর্শে ভারতের লক্ষ লক্ষ হিন্দু।
এসলাম গ্রহণ করে হয় এসলামের বন্ধু ॥
তখন তো ছিল না এত মৌলভী মৌলানা।
শরা শরা বলি এত তম্বি কেউত করত না ॥
তবু এসলাম জারি হয়েছিল এই হিন্দু দেশে।
জয়ডঙ্কা বেজেছিল তার দিকে দিকে উল্লাসে ॥
ছিল না এত আলেম ফাজেল মক্তব মাদ্রাসা।
হিংসা দ্বেষ ছিল নাকো ছিল ভালোবাসা ॥
সাম্যবাদের নীতি ছিল ছিল না সাম্প্রদায়িকতা।
যে দান নবী দিয়েছিলেন দেখাইয়া উদারতা ॥
আজি কোথা সে এসলাম চরিত্র মহান মানবিকতা।
ইহার জন্য কাহারা দায়ী ভাবিয়া দেখেছি কি তা ॥
কমবেশী সকলেই দায়ী আর মৌলভীগণ সবে।
ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা বিষ ছড়াইয়া এই মানব ভবে ॥
ভুলিয়াছি মোরা শান্তির বাণী হইয়াছি চরিত্রহীন।
মহম্মদের নামে কলঙ্ক রটায় ভেজিয়া মহম্মদী দীন ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু নবী আমাদের এন্তেকাল করে নি থাকিবেন চিরদিন।
কোরান তাই সাক্ষ্য দিতেছে 'হয়োতুল' মরছালিন ॥
বলিবার মোর বহু কিছু আছে অল্পে করিনু শেষ।
ভাবিয়া দেখুন জ্ঞানীগণ সবে করি প্রার্থনা বিশেষ ॥
আর কিছু নিবেদন আছে আমার ফকির সম্প্রদায় মাঝে।
আউল বাউল, সাই দরবেশ নাড়াবিন্দা মালাহাদ ইসমাইলী কাছে ॥
সুফী সহজিয়া চৈতন্য ধারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণে।
সকলের কাছে নিবেদন আমি করিতেছি মনে প্রাণে ॥
চিমটি আসা খড়ম ও ছবি মালা গেরুয়া বেশধারী।
অনেকে এই বেশ করিয়া ধারণ নগরে বেড়ায় ঘুরি ॥
জিজ্ঞাসিলে বলে সবে আমরা ফকির হয়েছি।
অমুক জনা আমার গুরু আমি তাঁর মত গ্রহণ করেছি ॥
দুই চারিটা শেখা বুলি বলে করি আত্ম অহংকার।
আত্মতত্ত্ব নাইকো জানা কেবল গাল গল্প সার ॥
কেহ কেহ পদ শিখিয়া টাকা লইয়া পাল্লা করিয়া বেড়ায়।
ভিতরে নেই প্রেমের পরশ শরার মৌলভীগণের প্রায় ॥
বৃক্ষের শাখায় ফল ধরিলে আপনি সে যায় নুয়ে।
থাকে না আর গর্দান খাড়া দেখে না লোক চেয়ে ॥
এক পয়সা আণ্ডা দিয়া আসে মুরগী বাহিরে।
কক্ কক্ করি উড়ন ছাড়ে জানায় লোকজনেরে ॥
হজরত মোজাদ্দেদ আলফেছানি বলেছেন এই মতে।
নিজেকে নিকৃষ্ট জান ফিরিঙ্গি ও কুকুর হতে ॥
ফকিরের মূল তত্ত্ব স্বভাব সুন্দর আর চরিত্র গঠন।
তা না হলে কি করে হবে ভজন সাধন ॥
একদন ফকির দেখি মাঠে ঘাটে পথে।
ফকিরি ছড়াইয়া বেড়ায় সকল লোকের সাথে ॥
নারী লইয়া ছিনিমিনি করছে কত জন।
মায়ের জাতকে মাগী ভাবি করে অযতন ॥
কোণে বনে নির্জনেতে যে কাজ সম্ভবে না।
কি করিয়া রাস্তা ঘাটে করে সেই সব আলোচনা ॥
নফসের দায় হইয়া করে নারী নির্যাতন।
শক্তি দ্বারা ব্যভিচার সে পোড়া কাঠ যেমন ॥
কোন মূল্য নাই শক্তি বিনা শক্তিবানের।
যে জন করে অবমাননা শক্তিরূপা মহামায়া জনের ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহার মতন আর পাতক নাই এ ভব মাঝারে।
কাম লোভে ডুবে থেকে মিছে কেন মরে ॥
যে পর্যন্ত রবে তুমি মাশুক নাহি পাবে।
তুমি না থাকিবে যখন তখন মাশুক কে দেখিবে ॥
'আনাছির রূহু' হয় জান আল্লার ভেদ মানুষ।
হবে সেজন আরেক বিল্লা যার আছে সদা হুঁস ॥
আলা এনছান ছিররিহি মানুষের ভেদ আল্লা।
যে না জানিবে এই সকল ভেদ সে চির অন্ধকালা ॥
জীবস্বভাব আচার ব্যবহার লইয়া সদা আছে।
ধর্মের নামে ধাপ্পাবাজি সকল তাহার মিছে ॥
কেবল নফছানি আত্মসুখ অন্বেষণ স্বার্থ সিদ্ধির।
তাড়নায় মত্ততার হালে করে বিচরণ দোহাই দেয় ফকির ॥
জানে না কোরান কি বস্তু জানে না ইমান কি।
কলেমা কি বস্তু নামাজ না জানি কেবল হইয়াছি মুসল্লি ॥
অন্ধ সে জন হয় চিরদিন এ-কাল সে-কালে।
কেমনে হইবে ফকির মোকাম-মঞ্জিল তত্ত্ব না করিলে ॥
খোদার বান্দার তবে এ-কাল সে-কাল সব হারাম।
'মোল্লা কাসেমী' ছালমি হতে এক হাদিস জানগো তামাম ॥
তাহাই ব্যক্তি পাপ যাহা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা হয়।
আর গুপ্ত পাপ দেখ যাহা চিন্তা করে সুখ লালসায় ॥
এই দুই কারণেতেই খোদা বিস্মৃতি সবার ঘটে।
কি করিবে তার ফকিরি আর নামাজে দেখ তবুসির হোসেনী ঘেটে ॥
অতএব নিবেদন করি হুজুরে সবার।
করিবে ফকিরি ভাই হয়ে হুঁশিয়ার ॥
মুর্শিদ নিকটে জান করিয়া খেদমত।
দয়া করি দেখাবেন তিনি সত্যপথ ॥
আমি আর কি বলিব হয়ে গোনাগার।
কোন বাতে সন্ধ থাকে বল সামনে আমার ॥
পিছেতে বলিলে তাকে গীবত বলে ভাই।
গীবতের গোনা আল্লা মাপ করিবেন নাই ॥
এই পর্যন্ত করিনু শেষ মাপ চাই সবার কাছে।
'ছালাম-আয়কুম' জানাই মজলিছে যারা আছে ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাউল-ফকিরি গানের স্বরলিপি
ও
স্বরলিপি প্রসঙ্গে

যতই আলোচনা চলুক বাউল বা ফকিরি গান নিয়ে, যেখা যাচ্ছে, পূর্বজদের প্রধান ঝোঁক তার ভাবের বিশ্লেষণে বা প্রকাশভঙ্গির অভিনবত্ব বিষয়ে। সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ-জাতীয় গানের বিচার একদিক থেকে ভাবলে, ভুল। কেননা বাউল ও ফকিরি গান রচনার উদ্দেশ্য তো কোনওভাবে সাহিত্যরচনা নয়— তাঁরা এমনকী শিষ্ট বিদ্বজ্জনদের জন্য এসব গান লেখেননি। তাই হালে ঝোঁক পড়েছে সামাজিক নৃবিদ্যা বা সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বাউল ফকিরদের জীবন ও রচনাকে দেখা বা দেখানো। তাদের প্রতিবাদী চেতনা ও সমন্বয়ী ভাবনাকে বড় করে তুলে ধরা, যার মধ্যে অন্তঃস্থ হয়ে আছে আমাদের নিম্নবর্গের অন্যতর ইতিহাস। সমাজের ভদ্রলোক-শ্রেণি যে-উদ্যমে ব্যর্থ হয়েছেন, যেমন সাম্প্রদায়িক বিভাজনরেখাকে মুছে, তুলে ধরা মানবিক প্রত্যয়ের সফলতা, তা নিপুণভাবে ফুটে উঠেছে লোকায়তদের ভাবনার বলিষ্ঠতায়। এক ধরনের গবেষক বাউল ফকিরদের সামাজিক অবস্থান ও অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে কাজ করে চলেছেন। বিদেশি সন্ধিৎসুদের কাছে বাউলদের মরমি রহস্যের জগৎ, অপ্রকাশ্য চন্দ্রতত্ত্ব আর আচরণবাদের কূট কায়াবিশ্ব অনেকটাই সম্মোহিত করেছে। একথা আজ দ্বিধাহীনভাবে বলা চলে যে, রবীন্দ্রনাথ-ক্ষিতিমোহন-মনসুরউদ্দিন-উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতিরা বাউল দর্শনকে যেভাবে উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন, আধুনিক গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ তার চেয়ে অনেক প্রাগ্রসর উন্মোচনে ব্যাপৃত ও বাস্তবকাঙ্ক্ষী। বাংলাদেশেও আহমদ শরীফ, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গির কিংবা আহমদ মিনাজের চিন্তাচেতনা বাউল জীবন বিষয়ে অনেকটাই সমাজমুখী ও দিগদর্শী।

কিন্তু সাংগীতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলার বাউল ও ফকিরদের সাধনাকে এখনও সঠিকভাবে দেখানো হয়নি। যাকে বলে গানের ভিতর দিয়ে দেখা বাউলভুবন তা এখনও আমাদের কাছে অনালোকিত। সবে বছর দশেক এ কাজ শুরু হয়েছে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে গান সংগ্রহ, সেই গান স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ ও স্বরলিপি করে রাখা, বাউল ফকিরি গানে সুর ও স্বরপ্রয়োগের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বিশ্লেষণ, একই গান কীভাবে একেক অঞ্চলে সুরে ও গায়নে ভিন্ন ধরন পেয়ে যায় তা লক্ষ করা— এ জাতীয় কর্মোদ্যোগের সূচনা ঘটেছে মাত্র। বাউল গানের সুরকাঠামোয় ঝুমুর, ভাওয়াইয়া, ভাঙা কীর্তন ও ভাটিয়ালির প্রভাব শনাক্ত করা হচ্ছে কিন্তু পাকাপাকি সাংগীতিক বিশ্লেষণের সমন্বিত ও অনুপুঙ্খ আয়োজন গড়ে ওঠেনি, প্রধানত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যম, অর্থাভাব ও ক্ষেত্রকর্মীদের সমন্বয়ের অভাবে। এ ব্যাপারে একক প্রয়াসীরূপে উল্লেখযোগ্য প্রবীণ খালেদ চৌধুরী এবং তরুণতর কঙ্কন ভট্টাচার্যের নাম। যথাক্রমে কলকাতার 'ফোক মিউজিক অ্যান্ড ফোকলোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট' ও 'পশ্চিমবঙ্গ সংগীত একাডেমি'-তে এই দুইজনের গানের সংগ্রহ সংরক্ষিত।

পশ্চিমবঙ্গের বাউল-ফকিরদের সমীক্ষা প্রয়াসে আমার লক্ষ্য তাই অনেকটাই ছিল গানের দিকে। টেপে নিবদ্ধ বেশ কিছু গান (নানা জেলার) যা আমি ও আমার সহকারীরা সংগ্রহ করেছি তা সংরক্ষিত আছে 'লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র'-র সংগ্রহালয়ে। ভবিষ্যতে সেগুলি ব্যবহার করলে গত দেড় দশকের বাংলার বাউল ফকিরদের গানে সুর ও গায়নের প্রকৃতি তথা বৈচিত্র্য ধরা পড়বে। তবে সেগুলি সবক্ষেত্রে গায়নের দিক থেকে বা স্বরক্ষেপের গভীরতায় নির্ভরযোগ্য নয়, কারণ অধিকাংশ গায়ক গায়িকা গানের দীক্ষায় তত উন্নত নন— পারফরমেন্স লেভেল খুব উঁচু নয়— সংগীত গ্রহণেও যান্ত্রিক ত্রুটি আছে। সমসাময়িক চটুল সুরের নকলনবিশি এবং বিকৃতির নমুনাও সহজলভ্য। তবু ভাল গানও অনেক পাওয়া গেছে এবং তার সংখ্যাই বেশি।

কিন্তু আমাদের লক্ষ্য কিছুটা বিশেষায়ণের অভিমুখী, তাই বাউল গানের এবং ফকিরিগানের ব্যাপক প্রচলিত কয়েকটি ছাঁচ বা ছককে আলাদাভাবে শনাক্ত করে এখানে স্বরলিপিবদ্ধ করে উপস্থাপিত হল। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত এবং বহু গায়কের অনুসৃত বাউল-ফকিরি গানের অন্তত দশরকম রীতি বা স্ট্যান্ডার্ড স্ট্রাকচার অনুধাবন করলে আমাদের লোকায়ত শিল্পীদের আত্মপ্রকাশের স্বাভাবিক উৎসনির্ভরতা স্পষ্ট হবে।

'বাঁকা নদীর পিছল ঘাটে' ও 'সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে' পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান দুটি জনপ্রিয় সুরবিন্যাসের কৌশল ধারণ করে রেখেছে। গান দুটির স্বরলিপি করেছেন লোক সংগীতের তত্ত্বজ্ঞ ও ভাণ্ডারি খালেদ চৌধুরী।

'যদি ডাকার মতো পারিতাম ডাকতে' একটি প্রসিদ্ধ বাউলাঙ্গের গান, যার ধরনকে 'ফিকিরচাঁদী ঢং' বলা হয়। এটির স্বরলিপি সংগীতাচার্য রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা এবং দিনেন্দ্র চৌধুরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। 'মন চল যাই ভ্রমণে', 'চল্ গুরু চল দুজন যাই পারে' ও 'আমার ঐ নিতাইচাঁদের দরবারে' গান তিনটির স্বরলিপি লোকসংগীতশিল্পী ও শিক্ষক দিনেন্দ্র চৌধুরী প্রণীত।

স্বরলিপি অধ্যায়ে ফকিরি গানের চারটি নমুনা থাকছে। 'লা ইলা ইল্লালার নকশা', 'ঐ মনের মানুষ আছে খামোস', 'বন্ধুর বাড়ি তে রে মন' ও 'ঘরের মানুষ আছে ঘরে' এই চার ধাঁচের ফকিরিগান ও তার সুর সরাসরি সংগ্রহ করেছেন বিশিষ্ট গবেষক কঙ্কন ভট্টাচার্য, বীরভূমের ফকিরদের গায়ন থেকে। স্বরলিপিও তাঁর করা।

স্বরলিপি প্রসঙ্গে বিশেষ সহায়তা করেছেন রণজিৎ সিংহ ও আমার স্নেহভাজন ছাত্র দীপংকর দাস। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। খালেদ চৌধুরী, দিনেন্দ্র চৌধুরী ও কঙ্কন ভট্টাচার্য আমার বিশেষ অনুরোধে স্বরলিপি প্রণয়ন করে লোকসংগীতের প্রতি তাঁদের বহুদিনের দায়বদ্ধতা প্রমাণ করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বরলিপি

বাঁকা নদীর পিছল ঘাটে
ও পার হবি কী করে
ও পার যাবি কী করে।

ও সেথায় কামকুম্ভীর রয়েছে সদায়
বাপরে বাপ সদায় হাঁ করে।

আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে যে করে গমন
ও তার হয় না রে মরণ
যে যায় তাড়াতাড়ি হুড়াহুড়ি
ও তার প্রাণ হারাবার তরে।

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতের ঘাট
ও তার কীবা পরিপাট
দেখলে সেই ঘাটের ছবি অবাক হবি,
যাবি দুই বাপ বেটাতে মরে।

মদন-মাদন-শোষণ-স্তম্ভন ও মোন এই পঞ্চসার
ও সারের মহিমা অপরা,
যদি সেই যুদ্ধে যাবি তীর ছুটাবি
তবে চাবি লাগা ঘরে।
সেথা গন্ধকালী বসে আছে
(ওই দ্যাখ, দ্যাখ) বলি খাবার তরে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঁকা নদীর পিছল ঘাটে

II ধা ধা সা । সা সা -রা I গা পা পা । -া পা -ধা I

বাঁ কা ০ ন দী র পি ০ ছ ল্ ঘা ০

I ধা -া -া । -া -পধ -শা I -ধপা -া পধা { ধা পা -া I

টে ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ও ও পা র্

I গা রা -া । গা রা সা I সা -া সা } -া -া -া II

হ বি ০ কি ক ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া । -া পা পা I ধা র্সা র্সা । র্সা র্সা না I

০ ০ ০ ০ সে থায় কা ম্ কুম্ ভীর্ র ০

I ধা না া । না ধা পা I া া া । া া া I

য়ে ছে ০ স দা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্

I া া পা । পা পা -পা I গা গা পা । পা পা ধা I

০ ০ বাপ্ রে বা -প্ স দা য়্ হাঁ ক ০

I ধা া া । -া গা ধা I পা া (পধা) । ওপার ... II

রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ও

II গা -গা গা । গা -গা গা I রা গা -া । রা গা -া I

আ স্ তে আ স্ তে ধী রে ০ ধী রে ০

I গা -া মা । গমগা রা -া I রা -া গা । সা রা -া I

০ ০ ০ ০০০ ০ ০ যে ০ ক রে গ ০

I গা -া -া । া া া I া া গা । পধা পা -পা I

ম ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন ও তা র্

I গা গা মা । গা রা সা I সা -া -া । -া -া -া I

হ য়্ না রে ম ০ র ০ ০ ০ ০ ০

I সা -া পধা । ধা পা পা I ধা র্সা -া । র্রা র্গা -া I

ণ ০ (ও) যে যা য়্ তা ড়া ০ তা ড়ি ০

I র্সর্রা র্সা া । া া া I া া া । া প পধা I

০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ যে যায়্

I ধা র্সা -া । র্সা না -া I ধা না -া । র্সনা ধা ০ I

তা ড়া ০ তা ড়ি ০ I হু ড়া ০ হু ড়ি ০

I পা -া -া । পা পা -গা I গা -গা পা । পা পা -ধা I

০ ০ ০ ও তা র্ প্রা ণ্ হা রা বা র্

I ধা -া ধা । -া -পধা -শা I -ধপা -প (পধা) । ওপার ... II

ত ০ রে ০ ০০ ০ ০০ ০ (ও)

বাকি কলিগুলি দ্বিতীয় কলির অনুরূপ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব লোকে কয়, লালন কী জাত এই সংসারে।
লালন কয়, জাতির কী রূপ, দেখলাম না এই নজরে ॥
কেউ মালা কেউ তসবীহ্ গলে
তাই তো রে জাত ভিন্ন বলে
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়
জাতের চিহ্ন রয় পড়ে ॥
ছুন্নৎ দিলে হয় মুসলমান
নারীর তবে কী হয় বিধান
বামন চিনি পৈতেয় প্রমাণ
বামনী চিনি কী প্রকারে ॥
জগৎ বেড়ে জাতির কথা
লোকে গল্প করে যথাতথা
লালন বলে, জাতির ফাৎনা
ডুবিয়েছি সাধ-বাজারে ॥

সব লোকে কয় লালন কী জাত

AMARBOI.COM

[ঋা-সা]

II {-া -া সা মা । মা -া -া জ্ঞা I মা পা -া মা । জ্ঞা ঋা মজ্ঞা -া I
০ ০ স ব্ লো কে ক য় লা ০ ল ন্ কী ০ জা ০
I জ্ঞা -া সা ঋা । ন্া -া -া -া I সা -া -া -া । -া -া -া -া} I
ত্ ০ এ ই স ং সা ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
I {-া -া ণা র্সা । র্সা -া -া ণা I ণা র্সা -া ণা । পদা -া পা -া} I
০ ০ লা ০ ল ন্ ক য় জা ০ তি র্ কী ০ রূ প্
I পা -া দা -া । পা -া -া মা I মা জ্ঞা -া মা । মপা মপা মা জ্ঞা II []
দে খ লা ম্ না ০ এ ই ন ০ জ ০ রে০ ০০ ০ ০
II {-া -া সা -া । সা -া -া ঋা I জ্ঞা -া মা -া । জ্ঞা -া -া -া I
০ ০ কে উ মা লা কে উ ত স্ বী হ্ গ লে ০ ০
I -া -া জ্ঞা -া । ঋা জ্ঞা -া মা I মা -া জ্ঞম মপা । সা -া -া -া} II
০ ০ তা ই তো রে জা ত্ ভি ন্ ন০ ০০ ব লে ০ ০
I -া -া র্সা -া । র্সা র্সা র্সা ণা I র্সা ণা দা -া । দা -া পা -া I
০ ০ যা ও য়া কিম্ বা ০ আ ০ সা র্ বে ০ লা য়
I -া -া পা মা । -া দা -পা মা I মা জ্ঞা জ্ঞা মা । মপা মপা মা জ্ঞা II []
০ ০ জা তে র্ চি ন্ হ র য় প ০ ড়ে ০০ ০ ০

বাকি পঙ্‌ক্তিগুলি তৃতীয় পঙ্‌ক্তির অনুরূপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি ডাকার মতো পারিতাম ডাকতে
তবে কি মা অমন করে লুকিয়ে থাকতে পারতে।
আমি নাম জানি নে ডাক জানি নে জানি নে মা কোন কথা বলতে;
আমি ডেকে দেখা পাই না তাইতে
আমার জনম গেল কাঁদতে।

দুখ পেলে মা তোমায় ডাকি
আবার সুখ পেলে চুপ করে থাকি ডাকতে
তুমি মনে ব'সে মন দেখ মা
আমায় দেখা দাও না তাইতে।
ডাকার মত ডাকা শিখাও
না হয় দয়া ক'রে দেখা দাও আমাকে
আমি তোমার খাইমা তোমার পরি
কেবল ভুলে যাই নাম করতে।

তাল / দাদরা
সংগীতাচার্য রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত স্বরলিপি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রা সা ১ ০ ১ ০
সা সা II সা রা -া । রা গা -া I গমা -পধা পা । মা গা মগা I
য দি ডা কা র ম ত ০ ০০ ০০ পা রি তা ০ম্
১ ০ ১ ০
I রা গা র্রা । সা পা পা I পা ধা -া । ধা -ধনা -ধপা I
ডা ক্ তে ০ ও গো ত বে ০ কি মা০ ০০
১ ০ ১ ০
I পা পধা -র্নর্সা । না ধা না I ধা পা -া । -া পা পা I
অ ম০ ০ন্ ক রে ০ ০ ০ ০ ০ তু মি
১ ০ ১ ০
I ধা না না । ধা -পা পা I মা -পা মা । -গা -া -া II
লু কি য়ে থা ক্ তে পা র্ তে ০ ০ ০
১ ০ ১ ০
সা সা II সা ধ্সা সা । সা সা রা I গা পা পা । পা মা পা I
আ মি না ০ম জা নি নে ০ ডা ক্ জা নি নে ০
১ ০ ১ ০
I মা গা -া । -া রা গা I রা গা -া । মা পা ধা I
০ ০ ০ ০ আ মি জা নি ০ নে মা ০
১ ০ ১ ০
I পা মা -া । গা রা -া I গা -া রা । সা পা পা I
কো ন ০ ক থা ০ ব ল্ তে ০ আ মি
১ ০ ১ ০
I পা ধা -া । ধা -ধনা পা I পা -ধনা র্সা । না ধা না I
ডে কে ০ দে খা০ ০ পা ০ই না তা ০ ই
১ ০ ১ ০
I ধা পা -া । -া পা পা I ধা ধনা না । ধা পা -া I
তে ০ ০ ০ আ মার্ জ ন০ ম গে ল ০
১ ০
I মা পা পগা । গা -া -া II
কাঁ দ্ তে০ ০ ০ ০
১ ০ ১ ০
II সা ধ্সা সা । সা সা রা I গা পা -া । পা মা পা I
দু ০খ পে লে মা ০ তো মা য় ডা কি ০

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১ ০ ১ ০
I মা গা -া । -া রা গা I রা রা গা । মা পা ধা
০ ০ ০ ০ আ বার্ সুখ্ পে লে চু প্ ০

১ ০ ১ ০
I পা মা -া I গা রা -া I গা -া রা । সা পা পা I
ক রে ০ থা কি ০ ডা ক্ তে ০ তু মি

১ ০ ১ ০
I পা ধা -া । ধা ধনা পা I পা ধনা র্সা । না ধা না I
ম নে ০ ব সে ০০ ম ন০ দে খ মা ০

১ ০ ১ ০
I ধা -পা -া । -া পা পা I ধা ধা না । ধা -া পা I
০ ০ ০ ০ আ মায় দে খা ০ দা ও না

১ ০
I মা পা পগা । -া -া -া II
তা ই তে ০ ০ ০

১ ০ ১ ০
II সা ধ্সা সা । সা সা রা I গা পা -া । পা মা পা I
ডা কা০ র ম ত ০ ডা কা ০ শি খা ০

১ ০ ১ ০
I মা গা -া । -া গা গা I রা গা -া । মা পা ধা I
০ ০ ০ ও না হয় দ য়া ০ ক রে ০

১ ০ ১ ০
I পা মা -া । গা -া রা I গা রসা -া । -া পা পা I
দে খা ০ দা ও আ মা কে ০ ০ আ মি

১ ০ ১ ০
I পা ধা -া । ধা -া ধনা I পা ধনা র্সা । না ধা না I
তো মা র খা ই মা০ তো মা০ র প রি ০

১ ০ ১ ০
I ধা পা -া । -া পা পা I ধা লা -া । ধা -া পা I
০ ০ ০ ০ কে বল্ ভু লে ০ যা ই নাম

১ ০
I মা গা পগা । -া -া -া II
ক র তে০ ০ ০ ০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন চলো যাই ভ্রমণে
কৃষ্ণ অনুরাগের বাগানে
সেথা যাবি প্রাণ জুড়াবি
আনন্দে সমীরণে।
সে বাগানে তিন জনা মালী
একজন উড়ে একজন সাহেব একজন বাঙালী
তারা সেচ করে নাড়ে চারে
গাছ-বাড়ে অতি যতনে।
সে বাগানে নিত্য ফোটে পাঁচ রকমের ফুল
সৌরভে প্রাণ আকুল করে গৌরবে আকুল
ওরে আত্মারামের আত্মা ব্যাকুল
করেছে তার আঘ্রাণে।

তাল: দাদরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন চলো যাই ভ্রমণে

স্থায়ী

II {স - র । র র গ I ম প - । ম গ - I
ম ন্ চ লো যা ই ভ্র ম ০ ণে ০ ০
I র - র । গ ম - I র গ র । স - ন্ I
কৃ ষ ণ অ নু ০ রা গে র্ বা ০ গা
I স - - । - - - }I র্স র্স - । ন ধ - I
নে ০ ০ ০ ০ ০ সে থা ০ যা বি ০
I প - ধ । ন র্স - I ধ ধ ন । ধ প - I
প্রা ণ জু ড়া বি ০ আ ন ন্ দ স ০
I মপ - ম । গ - - I র - র । গ ম - I
মী০ ০ র গে ০ ০ কৃ ষ্ ণ অ নু ০
I র গ র । স - ন্ I স - - । - - - I
রা গে র্ বা ০ গা নে ০ ০ ০ ০ ০

AMARBOI.COM

প্রথম অন্তরা

II {- - স । র র র I র - প । ম - গ I
০ ০ সে বা গা নে তি ন্ জ না ০ মা
I র - - । - - - I র - ম । ম ম - I
লী ০ ০ ০ ০ ০ এ ক্ জন্ উ ড়ে ০
I গ - গ । র স - I র - গ । র - স I
এ ক্ জন্ সা হে ব্ এ ক্ জন্ বা ং লা
I স - - । - - - }I
লী ০ ০ ০ ০ ০
I । - প প I র্স র্স - । ন ধ - I
০ তা রা সে ০ চ্ ক রে ০
I প - ধ । ন র্স - I ধ - ণ । ধ প প I
লা ০ ড়ে চা রে ০ গা ছ্ বা ড়ে অ তি
I ম প ম । গ - - I র - র । গ ম - I
য ০ ত নে ০ ০ কৃ ষ্ ণ অ নু ০
I র গ র । স - ন্ I স - - । - - - I
রা গে র বা ০ গা I নে ০ ০ ০ ০ ০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় অন্তরা

II {- - স । র র র I র - গ । র র - I
০ ০ সে বা গা নে নি ত্ ত ফো টে ০

I প - প । ম গ - I মগ র - । - - - I
পাঁ চ্ র ক মে র্ ফু ০ ০ ০ ০ ল্

I ম - ম । ম ম - I গ গ - । র স - I
সৌ ০ র ভে প্রা ণ্ আ কু ল্ ক রে ০

I র - গ । র স - I স - - । - - - }I
গৌ ০ র বে আ ০ কু ০ ০ ০ ০ ল্

I । I । - প প I
০ ও রে

I র্স - র্স । ন ধ - I প - ধ । ন র্স - I
আ ত্ মা রা মে র্ আ ত্ মা ব্যা কু ল্

I ধ ধ ণ । ধ ণ - I ম প ম । গ - - I
ক রে ০ ছে তা র্ আ ০ ঘ্রা ণে ০ ০

I র - র । গ ম - I র গ র । স - ন্ I
কৃ ষ্ ণ অ নু ০ রা গে র্ বা ০ গা

I স - - । - - - II
নে ০ ০ ০ ০ ০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চল্ গুরু চল্ দুজন যাই পারে
আমার একলা যেতে ভয় করে।

পার ঘাটাতে মাল্লা ছয় জনা
সঙ্গী বিনে তারা আমায়
পার করে দেয়না
মাঝি বলে পার করে-দি
মাল্লারা নিষেধ করে।

আমার দেহ ছিলো শ্মশানের সমান
গুরু তুমি মন্ত্র দিয়ে
করলে ফুল বাগান

আবার সেই বাগানে ফুল ফুটেছে
গোঁসাই অধর চাঁদ বিরাজ করে।

তাল: দাদরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থায়ী

II {র - র । ম গ ম I র গ - । র - স I

চ ল্ গু গু চ ল্ দু জ ন্ যা ই পা

I স - - । - - - }I

রে ০ ০ ০ ০ ০

I । - স স I স - র । র র গ I

০ আ মার্ এ ক্ লা যে তে ০

I ম - প । ম গ - II

ভ য় ক রে ০ ০

চল্ গুরু... দুজন যাই পারে অবধি।

প্রথম অন্তরা

II {র - জ্ঞ । র স - I র - ম । প ণ ধ I

পা র ঘা টা তে ০ মা ল্ লা হু য় জ্ঞ

I প - - । - - - I প - ধ । ণ ধ - I

না ০ ০ ০ ০ ০ স ং গী বি নে ০

I প ম - । গ র - I র - জ্ঞ । র স - I

তা রা ০ আ মা য় পা র ক রে দে য়

I স - - । - - - }I প প র্স । র্স র্স র্র I

না ০ ০ ০ ০ ০ মা ঝি ০ ব লে ০

I র্স - ণ । ধ প - I প - ধ । ণ ধ - I

পার ক রে দি ০ মা ল্ লা রা নি ০ ০

I প - ম । গ প - I প - ধ । ণ ধ - I

যে ধ ক রে হা য় মা ল্ লা রা নি ০

I প - ম গ - - I

যে ধ ক রে ০ ০

চল্ গুরু... দুজন যাই পারে অবধি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় অন্তরা

II । I । - স স I

০ আ মার্

I{ র জ্ঞ - । র স - I র ম - । প ণ ধ I

দে হ ০ ছি লো ০ শ্ম শা ০ নে র্ স

I প - - । - - - I প ধ - । ণ ধ - I

মা ০ ০ ০ ০ ন্ গু রু ০ তু মি ০

I প - ম । গ র - I র - জ্ঞ । র স জ্ঞ I

ম ন্ ত্র দি য়ে ০ ক র্ লে ফু ল্ বা

I স - - । - - - }I

গা ০ ০ ০ ০ ন্

I । - প প I প - র্স । র্স র্স র্র I

০ আ মার্ সে ই বা গা নে ০

I র্স - ণ । ধ প - I - - - । - স স I

ফু ল্ ফু টে ছে ০ ০ ০ ০ ০ গোঁ সাই

I প ধ - । ণ - ধ I প - ম । গ প প I

অ ধ র চাঁ দ বি রা জ ক রে গোঁ সাই

I প ধ - । ণ - ধ I প - ম । গ - - II

অ ধ র চাঁ দ বি রা জ ক রে ০ ০

চল গুরু... দুজন যাই পারে অবধি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ঐ নিতাই চাঁদের দরবারে
একমন হ'লে সে-ই যেতে পারে
দুমন হ'লে পড়বি ফেরে
পারবি না যেতে পারে।
চারদশে হয় চল্লিশ সেরে মন
রতি মাসা কমি হ'লে লয়না মহাজন
আবার সদর হুকুম আছে ব্রজে
রাধারানী পার করে।
কাঠুরেতে মাণিক চেনে না
ময়রার বলদ চিনি বয় তার স্বাদ জানে না
আবার সোনার বেনে সোনা চেনে
পরখ করে লয় তারে।
সদর আমিন শ্রীরূপ গোঁসাই সনাতন
আনন্দ বাজারে তারা প্রেমের মহাজন
ও -প্রেম দাঁড়ি ধরে ওজন করে
ঘ'ষে মেজে লয় তারে।

তাল: দাদরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থায়ী

II - - স । স স ম I ম ম - । ম ম - I

০ ০ আ মার ঐ ০ নি তা ই চাঁ দে র

I ম ০ জ্ঞ । ম - জ্ঞস I স - স । ঋ জ্ঞ - I

দ র বা রে ০ ০০ এ ক্ মন হ লে ০

I ম জ্ঞ ঋ । স ঋ ণ্ I স - - । - - - I

সে ই যে তে ০ পা রে ০ ০ ০ ০ ০

I - - প । প প প I প - দ । ম প - I

০ ০ দু মন হ লে প ড় বে ফে রে ০

I প - ণ । ধ প - I ম - জ্ঞ । ম জ্ঞ ঋ I

পা র বি না যে ০ তে ০ পা রে ০ ০

I স - স । ঋ জ্ঞ - I ম জ্ঞ ঋ । স ঋ ণ্ I

এ ক্ মন হ লে ০ সে ই যে তে ০ পা

I স - - । - - - II

রে ০ ০ ০ ০ ০

প্রথম অন্তরা

II {স - ম । ম ম - I ম ম - । প ম - I

চা র দ শে হ য় চল্ লি শ সে রে ০

I জ্ঞ ম - । - - - I - - ম । জ্ঞ ঋ স I

ম ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্

I - - স । স স ঋ I জ্ঞ জ্ঞ - । ম প ম I

০ ০ র তি মা সা ক মি ০ হ লে ০

I জ্ঞ - জ্ঞ । ঋ স ণ্ I (স - - । - - -)} I

দ য় না ম হা ০ জ ০ ০ ০ ০ ন্

I । I স - - । - ণ ণ I

জ ০ ন্ ০ আ বার

I ণ র্স - । র্স র্স - I ণ ণ - । দ প - I

স দ র হু কু ম আ ছে ০ ব্র জে ০

I ণ ণ - । দ প - I জ্ঞ - ম । প ম জ্ঞ I

রা ধা ০ রা নী ০ পা র ক রে ০ ০

I স - স । ঋ জ্ঞ - I ম জ্ঞ ঋ । স ঋ ণ্ I

এ ক্ মন হ লে ০ সে ই যে তে ০ পা

I স - - । - - - II

রে ০ ০ ০ ০ ০

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় অন্তরা

II {স ম ম । ম ম - I ম ম - । প ম - I
কা ঠু ০ রে তে ০ মা ণি ক চে নে ০

I জ্ঞ ম - । - - - I - - ম । জ্ঞ ঋ স I
না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I - - স । স স -ঋ I জ্ঞ জ্ঞ - । ম প ম I
০ ০ ময় রার ব ন্দ্ চি নি ০ বয় তা য়

I জ্ঞ - জ্ঞ । ঋ স ণ্ I (স - - । - - -)} I
স্বা ০ দ্ জা নে ০ না ০ ০ ০ ০ ০

I । I স - - । - ণ ণ I
না ০ ০ ০ আ বার

I ণ র্স - । র্স র্স - I ণ ণ - । দ প - I
সো না র বে নে ০ সো না ০ চে নে ০

I ণ ণ - । দ প - I জ্ঞ - ম । প ম জ্ঞ I
প র খ ক রে ০ ন য় তা রে ০ ০

I স - স । স জ্ঞ - I ম জ্ঞ ঋ । স ঋ ণ্ I
এ ক্ মন হ লে ০ সে ই যে তে ০ পা

I স - - । - - - II
রে ০ ০ ০ ০ ০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় অন্তরা

II   ।   I - - - । { - স স I
     ০ ০ ০   ০ স দর

I স ম - । ম ম - I ম ম - । প ম - I
আ মি ন   শ্রী রূ প   গো সা ই   স না ০

I জ্ঞ ম - । - - - I - - ম । জ্ঞ ঋ স I
ত ০ ০   ০ ০ ০   ০ ০ ০   ০ ০ ন

I - - স । স স ঋ I জ্ঞ জ্ঞ - । ম প ম I
০ ০ আ   নন্ দ বা   জা রে ০   তা রা ০

I জ্ঞ জ্ঞ - । ঋ স ণ্ I (স - -)} । - - - I
প্রে মে র   ম হা ০   জ ০ ন্   ০ ০ ০

I   ।   I স - - । - ণ ণ I
     জ ০ ন্   ০ ও প্রেম

I ণ র্স - । র্স র্স - I ণ ণ - । দ প - I
দাঁ ড়ি ০   ধ রে ০   ও জ ন্   ক রে ০

I ণ ণ - । দ প - I জ্ঞ - ম । প ম জ্ঞ I
ঘ ষে ০   মে জে ০   ল য় তা   রে ০ ০

I স - স । ঋ জ্ঞ - I ম জ্ঞ ঋ । স ঋ ণ্ I
এ ক্ মন   হ লে ০   সে ই যে   তে ০ পা

I স - - । - - - II
রে ০ ০   ০ ০ ০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফকিরি (দাদরা)

লাইলাহা ইল্লালার নকশা আছে যার দিলে
খুদা পাক্ রসুরুল্লাহ সঙ্গেতে ফিরে ॥
ছয়তলাতে তালা দিলে অধরাকে ধরা যায়
হু-হু শব্দে বীণা বাজে তোমার দিল দরিয়ায়
হু-হু শব্দর কর ঠিকানা পাইবি রে সোনার মদিনা
পাইলে পাইতে পার আত্মায় আত্মায় মিশিলে ॥
একুশ হাজার ছয়শোটিকার নাসিকাতে আসে যার
এই কথাটি মুর্শীদ ধরে তোমরা সবে জান ভাই
আড়ি পেতে আল্লা আছে মিমে মহম্মদ আছে
এই কথা বলতে মানা লিখা আছে পাক্ পুরাণে ॥
রত্না কূলের আব্দুল ফকির বলে দিল এই সভায়
বেহেস্তে যাবার পথ পরিষ্কার করনা ভাই
বেহেস্তে যাবার কালে লয়ে যাবে কোলে করে
নইলে দোজখ যেতে হবে তাতে কিছু বাধা নাই ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

II	গা	পা	মা	।	গা	রা	-সা	I	সা	সা	-া	।	সা	-রা	-া	I
	লা	ই	লা		হা	ই	ল্		লা	লা	র্		ন	ক্	শা	
I	গা	পা	-া	।	পা	-া	মা	I	পা	মা	-গা	।	-া	-া	-া	I
	আ	ছে	০		যা	র্	দি		লে	০	০		০	০	০	
I	-া	-া	পা	।	পা	পা	-া	I	পা	ধা	-া	।	র্সা	না	-া	I
	০	০	খু		দা	পা	ক্		র	সু	০		রু	ল্লা	হ্	
I	ধা	-া	পা	।	পা	মা	-পা	I	গা	-পা	-মা	।	-গা	-রা	-সা	II
	স	ঙ্	গে		তে	ফি	০		রে	০	০		০	০	০	
II	গা	গা	পা	।	পা	পা	-া	I	পা	ধা	-া	।	পা	ধা	-া	I
	ছ	য়	ত		লা	তে	০		তা	লা	০		দি	লে	০	
	এ	কু	শ্		হা	জা	র্		ছ	য্	শো		টি	কা	র্	
	র	ত্	না		ফু	লে	র্		আব্	দু	ল্		ফ	কি	র্	
I	র্সা	-া	র্সা	।	র্সা	র্সা	-া	I	র্সা	র্সা	-া	।	র্সা	-া	-া	I
	অ	০	ধ		রা	কে	০		ধ	রা	০		যা	য্	০	
	না	০	সি		কা	তে	০		আ	সে	০		যা	র্	০	
	ব	০	লে		দি	ল	০		এ	ই	স		ভা	য়	০	
I	র্সা	র্রা	-া	।	র্রা	-া	র্রা	I	র্সা	র্রা	-া	।	র্রা	-া	র্গা	I
	হু	হু	০		শ	ব্	দে		বী	ণা	০		বা	০	জে	
	এ	ই	ক		থা	০	টি		মুর্	শী	দ্		ধ	০	রে	
	বে	হে	স্		তে	০	যা		বা	০	র্		প	০	থ	
I	র্রা	র্সা	-া	।	র্সা	না	-া	I	ধা	র্সা	-া	।	না	ধা	-পা	
	তো	মা	০		র	দি	ল্		দ	রি	০		য়া	য়	০	
	তো	ম্	রা		স	বে	০		জা	ন	০		ভা	ই	০	
	প	রি	ষ্		কা	র	ক		র	না	০		ভা	ই	০	
I	পা	পা	-া	।	ধা	না	-না	I	ধা	ধা	-া	।	র্সা	-না	-া	I
	তো	মা	০		র	দি	ল্		দ	রি	০		য়া	০	০	
	তো	ম্	রা		স	বে	০		জা	ন	০		তা	০	০	
	প	রি	ষ্		কা	র	ক		র	না	০		ভা	ই	০	
I	ধা	-না	-ধা	।	পা	-া	-া	I	-া	-া	-া	।	-া	-া	-া	I
	০	০	০		য়	০	০		০	০	০		০	০	০	
	০	০	০		ই	০	০		০	০	০		০	০	০	
	০	০	০		ই	০	০		০	০	০		০	০	০	
I	পা	ধা	-া	।	র্সা	না	-া	I	ধা	ধা	ধা	।	ধা	ধা	-া	I

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

	হু	হু	০		শব্	দ	য়		ক	র়	ঠি		কা	না	০	
	আ	ড়ি	০		পে	০	তে.		আ	ল্	লা		আ	ছে	০	
	বে	হে	স্		তে	০	০		যা	বা	র্		কা	লে	০	
I	পা	র্সা	র্সা	।	র্সা	না	-া	I	ধা	-া	র্সা	।	না	ধা	পা	I
	পা	ই	বি		রে	সো	০		না	র্	ম		দি	না	০	
	মি	০	মে		ম	হ	ম্		ম	০	দ্		আ	ছে	০	
	ল	য়ে	০		যা	বে	০		কো	লে	০		ক	রে	০	
I	-া	-া	পা	।	পা	পা	-া	I	পা	-া	ধা	।	র্সা	না	-া	I
	০	০	পা		ই	লে	০		পা	ই	তে		পা	য়	০	
	০	০	এই		ক	থা	০		ব	ল্	তে		মা	না	০	
	০	০	ন		ই	লে	০		দো	জ	খ্		সে	তে	০	
I	ধা	পা	-া	।	মা	গা	-া	I	রা	গা	-মা	।	গা	রা	-সা	II
	আত্	তা	য়		আত্	তা	য়্		মি	শি	০		০	লে	০	
	লি	খা	০		আ	ছে	০		পা	ক্	পু		রা	ণে	০	
	হ	বে	০		তা	তে	০		কি	ছু	বা		ধা	নাই	০	

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফকিরি (কাহারবা)

ঐ মনের মানুষ আছে
খামোশ হৃদয় মাঝে
গোপন ভাবে।
মানুষ মানুষ বলে সবে
মানুষ ধর মানুষ পাবে ॥

মানুষ ধরে দেখ নিজে
পাবে মানুষ হৃদয় মাঝে
(ঐ) থেকে না আর মিছে কাজে
মানুষ আছে ধরতে হবে ॥

মানুষ আছে রঙমহলে
মানুষ মিলে কলমার কলে
নইলে জনম যায় বিফলে
আখেরাতে পস্তাইবে ॥

আলির ডালসিধ হইল যখন
হুকম দিল সাঁই নিরঞ্জন
তখন সেজ্‌দা করে ফেরেস্তাগণ
সেই মানুষ আসিল যবে ॥

মহম্মদ কয় কাতর হালে
ফকির সাহার চরণ তলে
মানুষেরই হুঁশের বলে
সাবেদ পেয়ে দেখলাম ভবে ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐ মনের মানুষ আছে

I র্সা -া র্সা -া । র্সা -া র্রা -া I র্সা -া ণা -া । ধা -া পা -ধা I

ম ০ নে র্ মা ০ নু ষ্ আ ০ ছে ০ খা ০ মো শ্

I পা -া মা -া । গা -া রা -া I সা -া সা -রা । রা -া গা -রা I

হৃ ০ দ য় মা ০ ঝে ০ গো ০ প ন্ ভা ০ বে ০

I -া -া সা সা । -া রা গা -া I রা -া গা -পা । -গা -া গা -রা I

০ ০ মা নু ষ্ মা নু ষ ব ০ লে ০ ০ ০ স ০

I সা -া -া -া । -া -া -া -া I -া -া -া -া । -া -া -া -া I

বে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা -ধা ধা ণা । ধা -া পা -মা I পা -া মা -া । গা -া রা -া II

মা ০ নু ষ্ ধ ০ র ০ মা ০ নু ষ্ পা ০ বে ০

II গা -া গা -া । পা -া ধা -া I ধা র্সা -া -া । র্সা -া র্সা -া I

মা ০ নু ষ্ ধ ০ রে ০ দে খ ০ ০ নি ০ জে ০

মা ০ নু ষ্ আ ০ ছে ০ র ঙ্ ম ০ হ ০ লে ০

আ ০ লি র্ ডা ল্ সি ধ্ হ ই ল ০ য ০ খন্ ০

ম ০ হ ম্ ম দ্ ক য় কা ০ ত র্ হা ০ লে ০

I র্সা -া র্সা -া । না -া ধা -পা I ধা না র্সা -না । র্সা -না ধা -পা I

পা ০ বে ০ মা ০ নু ষ্ হৃ দ য় ০ মা ০ ঝে ০

মা ০ নু ষ্ মি ০ লে ০ ক ল্ মা র্ ক ০ লে ০

হু ০ কু ম্ দি ০ লে ০ সাঁ ই নি ০ রন্ জন্ (তখন্)

ফ ০ কি র্ সা ০ হা র্ চ ০ র ণ্ ত ০ লে ০

I গা -া পা -া । পা -া পা -া I ধা -র্সা র্সা -া । না -া ধা -া I

থে ০ কো ০ না ০ আ র্ মি ০ ছে ০ কা ০ জে ০

নই ০ লে ০ জ ০ ন ম্ যা য়্ বি ০ ফ ০ লে ০

সেজ্ ০ দা ০ ক ০ রে ০ ফে ০ রে স্ তা ০ গ ণ্

মা ০ নু ০ ষে ০ রি ০ হুঁ ০ শে র্ ব ০ লে ০

I ধা -া পা -া । মা -া গা -া I রা -া গা -মা । গা -া রা সা I

মা ০ নু ষ্ আ ০ ছে ০ ধ র্ তে ০ হ ০ বে ০

আ ০ খে ০ রা ০ তে ০ প স্ তা ০ ই ০ বে ০

সেই ০ মা ০ নু ষ্ আ ০ সি ০ ল ০ য ০ বে ০

সা ০ বে দ্ পে ০ য়ে ০ দে খ্ লা ম্ ভ ০ বে ০

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফকিরি (কাহারবা)

বন্ধুর বাড়ী হ'তে রে মন
আইছি অনেকদিন গো আমি।
যাব কবে মরি ভেবে দেহ হ'ল হীন ॥
বন্ধু যখন আসবে নিতে
তার সঙ্গে ভাই যাব চলে
থাকবে না আর এই মহলে
সবাই বাসে ঘিন্ ॥

রোজা নামাজ পঞ্চ বেলা
গলে লাগাও তিরিশমালা
বন্ধু দেখে হবে ভোলা
খেলবে কত রসের খেলা বয়সের নবীন ॥

দায়েম শাহের রচনা
মিঠাই মণ্ডা ঘিয়ে বোনা
তেলে ছাঁকা তাও নেব না,
বুঝে মিঠাই কিন্ ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

II রা জ্ঞা সা রা । ণ্া সা সা সা I রা -া -া -া । মা মা মা জ্ঞা I
বন্ ধুর বা ড়ি ০ হ তে রে ম ন্ ০ ০ আই ছি অ নেক্

I রা -া জ্ঞা জ্ঞরা । সা সা -া -া I র্সা র্সা র্সা র্সা । ণা ধা পা পা I
দি ন্ গো আ০ ০ মি ০ ০ যা বো ক বে ০ ম রি ভে

I পণা ধণা পমা -া । মা মা মা মা I রা -া -া -া । -া -া -া -া I
বে ০০ ০০ ০ দে হ হ লো হী ০ ০ ০ ন্ ০ ০ ০

I ম পা র্সা -া । র্সা -া -া -া I না নর্সার্সা না । র্সা -া -া -া I
বন্ ধু ০ য খ ন্ ০ ০ আ ০স্ বে নি তে ০ ০ ০
রো জা ০ না মা জ্ ০ ০ প ন্ চ বে লা ০ ০ ০
দা য়ে ম্ শা হে র্ ০ ০ র ০০ চ না ০ ০ ০ ০

I না -া র্সা -া । র্রা -া র্রা -া I র্সা -া ণা -া । ধা পা পা -া I
তা র্ স ঙ্ গে ০ ভা ই যা ০ ব ০ চ ০ লে ০
গ ০ লে ০ লা ০ গা ও তি ০ রি শ্ মা ০ লা ০
মি ০ ঠা ই ম ন্ ডা ০ ঘি ০ য়ে ০ বো ০ না ০

I র্সা -া র্সা -া । র্সা -া র্সা -া I ণা -া ণা -া । ধা -া পা -া I
থা ক্ বো ০ না ০ আ র্ এ ই ম ০ হ ০ লে ০
ব ন্ ধু ০ দে ০ খে ০ হ ০ বে ০ ভো ০ লা ০
খে ল বে ০ ক ০ ত ০ র ০ সে র্ খে ০ লা ০
তে ০ লে ০ ছাঁ ০ কা ০ তা ও নে ০ ব ০ না ০

I মা মা মা গা । রা -া -া -া II
স বাই বা সে ঘি ন্ ০ ০
ব য় সে র্ ন বী ন্ ০
বু ঝে মি ঠাই কি ন্ ০ ০

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফকিরি (কাহারবা)

ঘরের মানুষ আছে ঘরে
তারেও চিনলাম না—
চিনে ভালোবাসলে পরে
বিচারের ভয় রবে না,
তোমার মরণের ভয় রবে না ॥

দুশ'ছয়টি টুকরো কাঠের
বিনা পেরেকে সেই ঘর আঁটে
তিনশ' ষাটটি তার লাগিয়ে
চালায় মালিক কারখানা ॥

আট কুঠুরি ঘরের নয় দরজা
তিনজন উজির তিনজন রাজা
তিনতলা ঘর বড়ই মজার
পাঁচজনার ঐ বারামখানা ॥

সাততলা ঘর সিংহাসনে
বসে আছে মালিক নিজের ধ্যানে
লালন বলে অন্যমনে
কর গুরুর সাধনা ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

II -া -া মা মা । পা -ধা -ণা ধা I পধা -পা মপা -মা । গমা -গা রগা -রা I
০ ০ ঘ রের্ মা ০ ০ নুষ্ আ০ ০ ছে০ ০ ঘ০ ০ রে০ ০
I সা -া রা -জ্ঞা । জ্ঞা রা -সা সা I সা -া -া -া । -া -া -া -া I
০ ০ তা ০ রেও চি ন্ লাম্ না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
I -া -া র্সা র্সা । -া র্সা র্সা র্রা I র্সা র্সা ণা -া । ধা -া পা -া I
০ ০ চি নে ০ ভা লো ০ বা স লে ০ প ০ রে ০
I মা -া মা -া । গা -া রা সা I -া -া সা রা । রা -জ্ঞাজ্ঞা জ্ঞা I
বি ০ চা ০ রে র্ ভ য় ০ ০ র বে না ০ তোমার্
I রা -া রা -া । সা -া সা -া I -া -া সা রা । সা -জ্ঞারা -সা I
ম ০ র ০ ণে র্ ভ য়্ ০ ০ র বে না ০ ০ ০
II -া -া মা পা । -া না না -া I -া -া না -না । র্সা র্না র্সা -া I
০ ০ দু শো ০ ছয়্ টি ০ ০ ০ টু ক্ রো কা ঠে ০
০ ০ আট্ কু ঠুরি ঘ রের্ ০ ০ ০ ন য় দ র জা ০
০ ০ সাত্ ত লা ঘ র্ ০ ০ ০ সিং হা স নে ০ ০
I -া র্সা না র্সা । র্রা র্রা র্রা -া I র্সা র্সা ণা -ণা । ধা -া পা -া I
০ র্ বি না পে রে কে ০ সে ই ঘ র্ আঁ ০ টে ০
০ ০ তিন্ জন্ উ জি র্ ০ তি ন্ জ ন্ রা ০ জা ০
০ ০ ব সে আ ছে মা নিক্ নি ০ জে র্ ধ্যা ০ নে ০
I -া -া র্সা -া । র্সা র্সা -া র্রা I র্সা -র্সা ণা -া । ধা -া পা -া I
০ ০ তি ন্ শো ষা ট্ টি তা র্ লা ০ গি ০ য়ে ০
০ ০ তি ন্ ত লা ঘ র্ ব ০ ড়ই ০ ম ০ জার্ ০
০ ০ লা ল্ ন্ ০ ব লে অ ন্ ন ০ ম ০ নে ০
I মা -া মা -া । মা -গা রা -সা I -া সা -া রা । রা -জ্ঞাজ্ঞা জ্ঞা I
চা ০ লা য়্ মা ০ লি ক্ ০ কা র্ খা না ০ আ হা
পাঁ চ্ জ ০ না র্ ঐ ০ ০ বা রাম্ খা না ০ আ হা
ক ০ র ০ শু ০ রু র্ ০ সা ০ ধ না ০ আ হা
I রা -া রা -া । সা -া সা -া I -া সা -া রা । সা জ্ঞা -রা -সা II
চা ০ লা য় মা ০ লি ক্ ০ কা র্ খা না ০ ০ ০
পাঁ চ্ জ ০ না র্ ঐ ০ ০ বা রাম্ খা না ০ ০ ০
ক ০ র ০ শু ০ রু র্ ০ সা ০ ধ না ০ ০ ০

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাউল-ফকিরি গানের সুর প্রসঙ্গে আলাপচারি

দিনেন্দ্র চৌধুরী গান পাগল মানুষ। নানা বর্গের সংগীত গায়নে তিনি দক্ষ এবং বড় মাপের পারফরমার। আধুনিক বাংলা গান সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ প্রবল। নিজে গান লেখেন, সুর করেন। গান নিয়ে মাঝে মাঝে ভাবনা উদ্রেককারী নিবন্ধ লেখেন। ভাল ট্রেনার এবং তাঁর পরিচালনায় অনেক রেকর্ড বেরিয়েছে। তাঁর বেশ ক'টি বই আছে, গবেষণা আছে, একথা দীর্ঘদিন জানি বলেই একদিন তাঁর সঙ্গে বসেছিলাম বাংলা বাউল গানের সুর ও সুরের গঠন সম্পর্কে আলোচনা করতে। জানতাম যে তাঁর বক্তব্য হবে মৌলিক ও প্রণিধানযোগ্য, তাই সঙ্গে ছিল টেপরেকর্ডার। আমার প্রশ্ন আর দিনেন্দ্র চৌধুরীর জবাব নিয়ে সেই আলাপচারি এখানে লিখিত আকারে ছেপে দেওয়া গেল গানবাজনায় উৎসাহীজনের জন্য। টেপরেকর্ডবদ্ধ এই আলাপচারির লিখিত রূপে তিনি পরে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও সংযোজন করেছেন। নীচে সেটি অবিকল মুদ্রিত হল।

প্রথমে দিনেন্দ্র চৌধুরী একটা গানের মুখ শোনালেন :

মানুষ তারে চিনলা নে
নবরঙ্গ দেহের মাঝে বিরাজ করে কে...

প্রশ্ন : এটা কোন্ অঞ্চলের গান?

উত্তর : এটা পূর্ববঙ্গের সিলেট অঞ্চলের বৈষ্ণব বাউল। সুর কিন্তু ভাটিয়ালি। সিলেট মানে বিরাট অঞ্চল। এদিককার রাঢ়ীয় আর নবদ্বীপী দু-রকম বৈষ্ণব ভাবাশ্রয়ী গান আছে— ওদিকে নবদ্বীপভাবাশ্রয়ী বাউল গেছে। ভাটিয়ালি সুরেই বাউল গাওয়া হয়।

প্রশ্ন : এদের সঙ্গে হাসন রজার গানের পার্থক্য কী?

উত্তর : হাসন রজা তো বৈরাগ্যমূলক গান গাইতেন। সুর নিজস্ব, কিন্তু ভাটিয়ালি সুর-শৈলীর বাইরে নয়—

যেমন—

মাটির পিঞ্জিরার মাঝে / শুয়া বন্দী রইলা রে
কান্দে হাসন রাজার / মন ময়নায় রে।

ওঁর নাম ছিল হাসন রজা চৌধুরী। ওখানে স্থানীয়ভাবে সবাই হাসান রাজা বলে। সম্ভ্রান্তবংশীয় মুসলমান জমিদার। রজার সঙ্গে রাজার যোগসূত্র নেই কিন্তু।

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয় বাংলার বাউল গানের কোনও নির্দিষ্ট সুর আছে?

উত্তার : না। তত্ত্বমূলক গানের কোনও নির্দিষ্ট সুর নেই। পুজোপার্বণের কিছু গান আছে যেগুলো পালটায় না। বছরের নির্দিষ্ট দিনে গাওয়া হয়— নিয়মিত চর্চা হয় না বলে মডিফিকেশন হয় না, চেঞ্জ হয় না। কিন্তু বাউল গানের সুরে ও ধাঁচে অনেক পরিবর্তন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেছে। যেমন আজকাল লালন ফকিরের গান সুর দিয়ে আমরা গাইছি— মিসলিঙ্কড হয়ে গেছে তো। এতে কোনও অপরাধ আছে বলে মনে করি না। যদি যোগ্য লোক তাঁদের অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন— কুষ্টিয়া, রাজশাহী অঞ্চল বা মধ্যবঙ্গের ওই অঞ্চলের সুর সম্পর্কে যদি তাঁর দখল থাকে, তিনি যদি লালনের গানে সুর করেন— মেনে নেওয়া যাবে। এবং সেটা যদি কমিউনিকেট করে, সকলের মনের সঙ্গে তার বক্তব্যটা অর্থবহ হয়ে ওঠে— তা হলে করা যেতে পারে। আমরা যেমন কবীরের গান, মীরাবাঈয়ের গান সুর দিয়ে গাই— নইলে তো হারিয়ে যাবে।

প্রশ্ন : পূর্ববঙ্গে 'বাউলা' গান বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : পূর্ববঙ্গে অন্য সব তত্ত্বের সঙ্গে দেহতত্ত্বও থাকে। বাউলা মানে ছন্নছাড়া লোকেরাই এ গান গায় না। ত্রিনাথের আসরে সংসারী লোকেরাই গাইছে। বাউলা মানে বৈচিত্র্য। বৈচিত্র্যমূলক গানের আসরকেই বাউলা বলা হয়ে থাকে। বাউল থেকে বাউলা নয়। বাউল বলে স্বতন্ত্র কোনও গান আছে কিনা জানা নেই।

প্রশ্ন : বেশ তো, একটা নমুনা দিন :

উত্তর : শুনুন, ত্রিনাথের গান—

ও গাঞ্জার চিরল চিরল পাত
গাঞ্জা খাইয়া মগ্ন হইয়া নাচে ভোলানাথ—
নাচে ভোলানাথ গো নাচে ভোলানাথ।
আনন্দ গগনে নাচে মগনে
ত্রিন্নাথ ত্রিন্নাথ বইলা মারো একটান
ও সিদ্ধি মারো একটান।
তিন কলকি সাজাইয়ে
শবিনা লাগাইয়া
টিক্কায় আগুন দিয়া মারো একটান।

প্রশ্ন : বাঃ। এ গানের সঙ্গে গম্ভীরা গানের তো বেশ মিল রয়েছে।

উত্তর : হ্যাঁ। শিব সম্পর্কে গান। কিন্তু ত্রিনাথ মানে ত্রিভুবনেশ্বর। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের রূপকল্প নয়।

প্রশ্ন : বাউলা সুরে দেহতত্ত্বের গান আছে?

উত্তর : দেহতত্ত্বের গান সব সুরেই আছে। বাউলা সুরে কোনও গানে নয়, বাউল সুরে আছে। দেহতত্ত্ব, মনঃশিক্ষা ও বাউলের সুরে বিশেষ প্রভেদ নেই। আঞ্চলিক সুরেই গাওয়া হয়ে থাকে সব গান।

প্রশ্ন : সে রকম একটা নমুনা যদি দেন—

উত্তর :

ঘুমে রইলে কপালপোড়া
কামনদীতে ডুবল রে ভারা—
ও তুই দিন থাকিতে খুঁজলে পাবি
অন্ধকারে যাবি মারা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গানটির পর্যায় হল 'আখেরি চেতন', সুরে তা ভাটিয়ালি।

প্রশ্ন : গানের যে বেসিক নোট— চার সুর ছয় সুর বলে, তার সম্পর্কে আপনার কী মত?

উত্তর : খুব প্রাচীন গানে স্বর কম লাগত। এখনকার গানে অনেক স্বর লেগে যাচ্ছে। লোকসংগীতের মধ্যেও বেসিক নোটই লাগে। একদম সোজাসুজি তো গায় না। সুতরাং কিছু কাজকর্ম এসেই যায়। সুরের বিষয়ে গ্রাম্য গায়কদের সচেতন প্রয়াস থাকে না। প্রচলিত ছকে ও নিজস্বতায় কিছুটা বিবর্তিত হয় মাত্র। যেহেতু ব্যাকরণ নেই।

প্রশ্ন : এ রকম সুরের গান একটা শোনান।

উত্তর : দেখুন, চারটি স্বর লেগেছে। এ হল সূর্যব্রত অনুষ্ঠানের 'নৌকাবিলাস' পর্যায়ের গান—

পার কইরা দেওরে মাঝি মথুরাতে যাই
মথুরাতে গিয়ে যদি কানাইর দেখা পাই।
মধ্য গাঙ্গে নিয়া কৃষ্ণ নাওয়ে দিল লাছা
চমকিল রাধার পরান ভাঙল নাওয়ের পাছা।

প্রশ্ন : একটু সরগম করে গান—

উত্তর : র, ম, প, ধ,— এই চারটি স্বরে তিন চরণে নিবদ্ধ গান এটা—

ধ — ধ	ধ ম —	প — প	ম র —
পা র্ ক	রি য়া ০	দে ও রে	মা ঝি ০
র র ম	ম· প —	ম — —	— — —
ম থু ০	রা তে ০	যা ০ ০	০ ০ ই
র ম —	র ম —	প ধ —	প ম —
ম থু ০	রা তে ০	গি য়া ০	য দি ০
ধ ধ —	ধ ধ —	প ধ —	প ম —
কা নাই র্	দে খা ০	পা ০ ০	০ ০ ই

AMARBOI.COM

প্রশ্ন : এ গানের সুরের বেসিস কী?

উত্তর : এটা রাঢ়ীয় অঙ্গের। ঝুমুর, টুসু, ভাদুর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বাউলের মিল নেই, মূলত ভৈরবী ঠাটে নিবদ্ধ।

প্রশ্ন : পূর্ণদাস বাউল তো এই সুরেই গান করেন তাই না?

উত্তর : হ্যাঁ, এরই একটু রকমফের আর কী। পূর্ণদাস বাউলের কণ্ঠে রাঢ়বঙ্গের বাউল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনোহারিত্বে অতুলনীয়। তাঁর প্রয়াসেই বাউল গান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রসারিত।

প্রশ্ন : ফকিরি গান তো অনেক শুনেছেন, তার সঙ্গে বাউল গানের পার্থক্য পেয়েছেন?

উত্তর : ফকিরি তো আলাদা সাধনা। আলাদা সাধনা বলে আনুষ্ঠানিক স্তরে কিছু পার্থক্য আছেই। ওটা মুসলমানদের। ফকিরি গান অবশ্য দু'রকমের আছে। মূলত সুফিবাদসম্পন্ন ফকিরি, কারণ ইসলামের মরমিতত্ত্ব তো প্রকাশ করেছেন সুফিরাই। আর সব মারিফতিই হল মুর্শিদা, কিন্তু সব মুর্শিদাই মারিফতি নয়। কারণ মুর্শিদকে স্মরণে রেখে যে গান হচ্ছে তাই মুর্শিদা। আবার মারিফত হল একজনের মাধ্যমে বা নির্দেশে যেতে হয়। যেহেতু সাধনাটিতে গোপনতা আছে। তাই তত্ত্বাদি আয়ত্ত করতে মুর্শিদই হল অবলম্বন।

প্রশ্ন : আচ্ছা, এ সব গানে সুরের পার্থক্য কেমন?

উত্তর : তত্ত্বমূলক গানে কোনও সুরের পার্থক্য নেই— যে-কোনও সুরেই গাওয়া যায়। পূর্ববাংলায় দশ রকম সুরে গাওয়া হয়। যেহেতু একটা শৈলী আছে তার বাইরে ওরা যেতে পারে না। যেমন এপার বাংলা ওপার বাংলা দু'দেশেই চলে— 'আমি কোথায় পাব তারে'... সেই সুরে... শুনুন—

চিননি মন তারে তুমি চিননি মন তারে
যেজন তোমার দিল্‌পিঞ্জরে দিবানিশি বিরাজ করে।
যখন আল্লা পরওয়ারে সৃষ্টি করলেন আদমরে
আব আতস বাতাস দিয়ে খাক্-এ মিলন করে।
হুকুম করলেন তবে রুহু যাও কল্পপুরে
তখন আন্ধারিয়া ঘর দেখিয়া কাঁদছে রুহু কাতর স্বরে।

AMARBOI.COM

প্রশ্ন : আশ্চর্য তো! এ সুর কোথায় পেয়েছেন?

উত্তর : আমাদের সিলেটে।

প্রশ্ন : এখনও প্রচলিত?

উত্তর : এখনও প্রচলিত। আসলে এমন কিছু সুর আছে যা দুই বাংলাতেই চলে। যেমন প্রভাতী পর্যায়ের গান পূর্ব বাংলায় ভাটিয়ালি শৈলী থেকে অন্য দিকে চলে গেছে। ধরা যাক, 'বৃন্দাবনবিলাসিনী রাই আমাদের'— এটা এ বাংলার। হয়তো নবদ্বীপ বা কৃষ্ণনগর থেকে বা বটতলা প্রকাশনীর কারণে ওই বাংলায় যেতে পেরেছে। কিছু লোক শুনে গিয়ে বৈষ্ণব ভাবকে প্রচার করেছে। লোকের মুখে বা গায়কের মুখে প্রচারের মোটিভের ফলেও গিয়ে থাকতে পারে। গানের তো হাত-পা নেই। তবু বিচরণশীল— oral transmission-ই রাস্তা। যেমন ধরুন শুকসারি দ্বন্দ্বের গান—

শুকসারি বলে উঠ লো কিশোরী
যামিনী অবসান।
কোকিলায় ঘন ঘন কুহুরবে মধুকরে
মধু করে পান।
রতি রস রঙ্গে রসরাজ সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশি পোহাইল প্রেম তরঙ্গে
এই তো সমাধান—
ঘরে গুরুকুল জাগিল সকল
মাধব কর পয়ান।

ব্যাপারটা ভাবতে গেলে মনে হয়, পূর্ববাংলায় প্রভাতী গান একটু বাঁক নিয়েছে। এই concept রবীন্দ্রনাথে এসেছে 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না / বেলা হল মরি লাজে'— বৈষ্ণবপদের প্রতিফলনে উন্নত সংস্কৃতির স্বাক্ষর বলা যায়।

প্রশ্ন : বেশ। এবারে জানতে চাই মুর্শিদা গানটা কেমন?

উত্তর : মুর্শিদকে উদ্দেশ্য করে গান। অনেক রকম গান আছে এ জাতীয়। চট্টগ্রামে মাইজভণ্ডারী বলে একটা জায়গা আছে। সুফি সাধকরা চট্টগ্রামের পথেই তো এসেছেন। এঁরা খুবই উন্নত মানের সাধক। তাই পারসিক সুরের সঙ্গে স্থানীয় সুরের মিশ্রণ ঘটা বিচিত্র নয়। যেমন,

মাইজভাণ্ডারের ভাবের রসিক
বেশ সুখে আছে—
সোনার ময়ূর মুর্শিদ বাবা
তাল ফেলে নাচে ॥
ভাব ধরাইল কোন্ ভাবিনী
না জানি কেমন কামিনী
নাম ধরিলে মাণিক জ্বলে
হৃদি মন্দিরের নীচে ॥

WWW.AMARBOI.COM

প্রশ্ন : 'আমায় ডুবাইলি রে ভাসাইলি রে' গানটার সঙ্গে ক্ষীণ মিল আছে নাকি, সুরে?

উত্তর : না না। দ্রুত ছন্দ বলে তালের মিল আছে— চতুর্মাত্রিক : কাহার্‌বা। তাল : মধ্য লয়। যেমন—

আটকুঠুরি নয় দরজা কোন্‌খানে নাই তালা
ঘর খানি হয় তিনতালা—
ঘরের নয় দরজায় নয় জন দ্বারী সদাই তারা ঘুরিফিরি।
ছয় ডাকাতে জানলে পরে
তখন করবে চুরি।
ঘরের মণিকোঠায় দিয়া চাবি
ও তুই মনের সুখে নিদ্রা যাবি—
সেই ডাকাতের ভয় রবে না
সুখে থাকবি মন কালা।

প্রশ্ন : এই গানটা কি ঢাকা থেকে পাওয়া?

উত্তর : হ্যাঁ— আবদুল লতিফের রচনা। তিনি বিখ্যাত লোককবিরূপে পরিচিত।

প্রশ্ন : বিভিন্ন অঞ্চলে বাউল গানে বিভিন্ন সুর হয়েছে— এর কারণ কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তর : ভৌগোলিক পার্থক্যের জন্যে। পরম্পরা একটা তৈরি হয়ে যায়— তারপর একটু-আধটু মডিফিকেশন হয়, তবে মূল সুর একই থাকে।

প্রশ্ন : ফিকিরচাঁদের গানের ধাঁচা কেমন?

উত্তর : হ্যাঁ, খুব বেসিক সুর— বাউল গানে ইনফ্লুয়েন্স তৈরি করেছেন উনি। যেমন ধরুন ফিকিরচাঁদি গান :

বসায়ে রসের মেলা সখের খেলা
দিন দুইচার খেললে ভালো
মেলাতে দেখে চোখে ম্যালা লোকে
কেবা কী উপদেশ পেলো ॥

গানটি ঝাঁতি তালে নিবদ্ধ। পূর্ববাংলায় বলে 'ছব্‌কি'। আট মাত্রা অথচ একটা করে মাত্রা ছেড়ে অফবিটে গাওয়ার জন্যে ত্রিমাত্রিক বলে ভুল হতে পারে। ঝাঁতি কীর্তনে ব্যবহৃত তাল। এঁরা এটিকে ছয় মাত্রাযুক্ত ত্রিমাত্রিক বলেন। বোল : ।-ধিতা কি। ধিৎ তা কি।*

* দিনেন্দ্র চৌধুরী ২০০৮ সালে প্রয়াত হয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পশ্চিমবঙ্গের বাউল, ফকির ও গায়কদের আর্থ-সামাজিক পরিচয়-সারণি
নির্বাচিত ও বর্ণানুক্রমিক

নাম ও বয়স	সন্তান	ঠিকানা	জীবিকা ও মাসিক আয়	বাস্তু বিবরণ	গায়নের অভিজ্ঞতা	ধর্মমত	গণসংগঠনের নাম	শিষ্য সংখ্যা	মন্তব্য
অমর মণ্ডল ৫৬	১ ছেলে	কাঞ্চনপল্লী। পোঃ রায়গঞ্জ। উত্তর দিনাজপুর	গানবাজনা, ৭০০ টাকা	বাড়ি আছে, জমি নেই	অন্তত ২৫ বছর	কন্থাধারী সম্প্রদায়	লেখক শিল্পী সংঘের সদস্য	নেই	বাউলগানের দক্ষ শিল্পী। মার্জিত রুচি ও ভক্তিমান। উত্তরবঙ্গের বাউল আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব।
অরুণ দাস ২৭	অবিবাহিত	গ্রাম ও পোঃ ঘাটপলশা বীরভূম	পটুয়া পিতার সঙ্গে হাতের কাজ	পিতার গৃহে বসবাস	১০-১২ বছর	অদীক্ষিত ও সাধনা বর্জিত	×	×	বীরভূমের বিখ্যাত বাঁকু পটুয়ার ছেলে। কিন্তু বাউলগানে দক্ষ। বাউল গাইতে গেছেন দিল্লি ও ভূপালে। গানের টিউশনি করেন আবার পটও আঁকেন। সাক্ষর।
কার্তিকদাস বাউল ৪৫	১ ছেলে ১ মেয়ে	ধনডাঙা। পোঃ কনিয়ারা। বীরভূম	গানবাজনা, ৬০০ টাকা	বাড়ি আছে এবং ৩ বিঘা জমি	৩০ বছর	যুগলমতের উপাসক	×	×	সম্ভবত বীরভূমের সেরা বাউল গায়ক। বেতারের 'এ' গ্রেড শিল্পী। দেশবিদেশে প্রচুর ঘুরেছেন গান গাইতে। বেতার ও দূরদর্শনের নিয়মিত শিল্পী। সাক্ষর।
কালাচাঁদ দরবেশ ৬৩	১ ছেলে ১ মেয়ে	২, রাধানগর। পোঃ ধূপগুড়ি। জলপাইগুড়ি	গানবাজনা, ৬০০ টাকা	বাড়ি আছে জমি নেই	১৭ বছর	দরবেশি	বাউল সংগঠনের জেলা সম্পাদক	×	ভাল গায়ক ও সংগঠক। মধ্য শিক্ষিত। অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল। বাউল গাইতে বিদেশ গেছেন। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র থেকে সম্প্রতি গানের ক্যাসেট বেরিয়েছে।
গণেশ টুডু ৪৩	×	ভগবতী পাড়া। পোঃ ইলামবাজার। বীরভূম	কামারের কাজ ও গানবাজনা	একটি কুঁড়েঘর দিনগুজরান হয়	১০ বছর	অদীক্ষিত	×	×	জন্মসূত্রে সাঁওতাল। নিরক্ষর। প্রচলিত বাংলা বাউলগান সাঁওতালি ভাষায় অনুবাদ করে গান করেন। জনপ্রিয় শিল্পী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাম ও বয়স	সন্তান	ঠিকানা	জীবিকা ও মাসিক আয়	বাস্তু বিবরণ	গায়নের অভিজ্ঞতা	ধর্মমত	গণসংগঠনের নাম	শিষ্য সংখ্যা	মন্তব্য
গৌরহরি দাস ৪৪	সাধক বলে নিঃসন্তান	গাড়ুলিয়া। পোঃ জিউই। বীরভূম	বাউল সাধনা ও মাধুকরী	গুরুভাইয়ের দেওয়া পর্ণকুটিরে বাস	২০ বছর	মথুরানন্দের স্রোত	×	অন্তত ১০০ জন সাধনশিষ্য	তেজি কণ্ঠের গায়ক কিন্তু প্রকাশ্যে গান করেন না। ভাবের মানুষ। শেফালি, অঙ্গরা এবং সাধনা নামের তিনজন নিম্নবর্গের সঙ্গিনীর সঙ্গে কায়া সাধনা করেছেন। অথচ সংযত, বিনয়ী ও নিষ্কাম। সাক্ষর।
জগন্নাথ ধারা ৪৩	২ ছেলে ৫ মেয়ে	যশপুর। পোঃ ঘোড়াতরী। বীরভূম	দেবাংশীর কাজ এবং গানবাজনা। আয় অনিশ্চিত।	বাড়ি আছে	৩০ বছর	তান্ত্রিক সাধক	×	অল্প কয়েকজন	বাড়িতে কালীমূর্তি আছে।অঞ্চলের নামকরা দেবাংশী। অল্প কিছুকাল আগে থেকে বেতার ও দূরদর্শনে গাইছেন বাউল গান। অতিপ্রজ মানুষ। সন্তানদের নিয়ে অর্থকষ্টে বিড়ম্বিত।
তরণীসেন মহান্ত ৪৫	১ ছেলে	সুভাষগঞ্জ। পোঃ রায়গঞ্জ। উত্তর দিনাজপুর	গানবাজনা ৪০০ টাকা	বাড়ি আছে প্রশস্ত। জমি নেই।	৩০ বছর	অখিলচাঁদ-পন্থী	বাউল সংগঠনের নেতা	×	উত্তরবঙ্গের বাউল সংগঠনের দরদি কর্মী ও নেতা। সুভাষগঞ্জে লোকমঞ্চ গঠনের উদ্যোগী। প্রতি বছর ১ বৈশাখ বিশাল বাউল মেলার প্রাণপুরুষ। দক্ষ ও তাত্ত্বিক গায়ক। গীতিসংকলন আছে স্বরচিত।
দীনবন্ধু গোস্বামী ৮০	১ ছেলে	মানিকোর পালসা। পোঃ করণদিঘি। উত্তর দিনাজপুর	গানবাজনা ৭০০ টাকা	বাড়ি আছে	৫০ বছর	কালাচাঁদী সম্প্রদায়	×	অন্তত ৫০ জন, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও নেপালে ছড়ানো	উত্তরবঙ্গের জ্যেষ্ঠ ও দক্ষ বাউল শিল্পী। সাক্ষর। এখন অর্থাভাবে ও বয়োভারে বিপন্ন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাম ও বয়স	সন্তান	ঠিকানা	জীবিকা ও মাসিক আয়	বাস্তু বিবরণ	গায়নের অভিজ্ঞতা	ধর্মমত	গণসংগঠনের নাম	শিষ্য সংখ্যা	মন্তব্য
প্রফুল্ল হালদার ৬৭	৩ ছেলে ১ মেয়ে	দক্ষিণ কসবা। দেবীনগর। পোঃ রায়গঞ্জ। উত্তর দিনাজপুর	মাছ ধরা এবং গানবাজনা। ৬০০ টাকা	বাড়িঘর নেই	৩০ বছর	শ্রীরূপের মতাদর্শী	বাউল সংগঠনের সদস্য	×	ভাল শিল্পী কিন্তু সপরিবারে অর্থাভাবে সংকটাপন্ন। নিরক্ষর।
ফরিদা খেপী ৩৮	১ ছেলে	মুনশিরের মোড়। পোঃ বরশাল। বীরভূম	গানবাজনা, আয় অনিশ্চিত	ছোট একটি মেটে বাড়ি	১৭ বছর	চিস্তিয়া মত	×	দু'-চারজন	ফরিদা জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণকন্যা। কুমারী জীবনের নাম মানকুমারী চক্রবর্তী। পরে, প্রধানত গানের টানে ফকির আবদুল হালিমকে বিয়ে করে মুসলমান হয়েছেন। ঘটনা হিসাবে উদাহরণীয় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ।
বিপিন মহন্ত ৬৭	৩ ছেলে	ধবেড়া। পোঃ বামুনডাঙা। পুরুলিয়া	চাষবাস ৫০০ টাকা	মেটে বাড়ি	২০ বছর	বাউলপন্থ	×	আন্দাজ ৪৫ জন	সাধক বাউল গায়ক। ভাবুক ও বিশ্বাসী মানুষ। বয়স্ক কিন্তু গানের ব্যাপারে প্রাণচঞ্চল ও উৎসাহী। দুঃস্থ শিল্পী হিসাবে ১৯৯০ ও ১৯৯৬ সালে সরকারি অনুদান পেয়েছেন।
বেহেতার শাহ ৫৫	২ ছেলে ১ মেয়ে	গ্রাম ও পোঃ হাতিয়া বীরভূম	মুসাফিরি এবং গানবাজনা ৩০০ টাকা	মেটে বাড়ি	২৫ বছর	তরিকপন্থী	×	৪-৫ জন	সাধারণ ফকিরের নমুনা পাওয়া যায় এঁর মধ্যে। গরিবগুর্বো— উচ্চাশাহীন— প্রত্যাশাহীন। নামাজ ও রোজায় বিশ্বাসী কিন্তু আছেন ফকিরিপন্থায়। সাক্ষর।
মুক্তার শাহ ৭২	৪ ছেলে ৪ মেয়ে	গ্রাম ও পোঃ হাতিয়া বীরভূম	গানবাজনা ও চাষবাস। রোজার রমজান মাসে টহলদারি।	১০ কাঠা জমি ও মেটে বাড়ি	৫৫ বছর	শরিয়ত তরিকত দু'মতেই বিশ্বাসী	×	×	বাংলার গ্রামে ইসলাম ও ফকিরিপন্থার দ্বৈতভূমিকা এঁকে দেখলে বোঝা যায়। রোজার সময় টহলদারি জীবিকা হিসাবে বিচিত্র। অতিপ্রজ্ঞ দীনভিখারি। সাক্ষর।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাম ও বয়স	সন্তান	ঠিকানা	জীবিকা ও মাসিক আয়	বাস্তু বিবরণ	গায়নের অভিজ্ঞতা	ধর্মমত	গণসংগঠনের নাম	শিষ্য সংখ্যা	মন্তব্য
লক্ষণচন্দ্র দাস ৬৪	২ ছেলে ৩ মেয়ে	কেন্দুয়া। পোঃ সিউড়ি। বীরভূম	গানবাজনা। আয় বলেননি।	নিজের প্রশস্ত পাকা বাড়ি ও ২ কাঠা জমি	৪০ বছর	চিন্তামণির মত	×	১০-১২ জন	প্রখ্যাত নবনীদাসের সন্তান ও পূর্ণদাস বাউলের ভাই। দেশবিদেশে বাউলগান গেয়ে খ্যাতিমান। প্রতিষ্ঠিত শিল্পী ও আত্মতৃপ্ত। গর্বিতও কিছুটা। নিবিষ্ট সংসারী। ফর্মে নিজের নাম সই নিজের পরিচয় দিয়েছেন 'বাউলরাজা', 'ভাবরত্ন'।
ষষ্ঠীচরণ বাউল ৫৫	১ ছেলে ১ মেয়ে	গোবিন্দপুর। পোঃ দিঘড়া। নদিয়া	গানবাজনা ও মাধুকরী। ৪০০ টাকা	বাড়ি আছে। জমি নেই	২০ বছর	বৈষ্ণব মত	বাউল সংগঠনের সদস্য	সামান্য ক'জন গানের শিষ্য	জাতে তপশিলী ষষ্ঠী খ্যাপা নামে সর্বত্র প্রসিদ্ধ। মেলা মহোৎসবে বিপুল জনপ্রিয়। নৃত্যকুশল ও ভাবোন্মাদ। প্রচুর অনুষ্ঠানে ডাক পান। সাক্ষর।
সামিয়েল মণ্ডল ৫৫	৪ ছেলে ১ মেয়ে	খ্রিস্টানপাড়া। পোঃ চাপড়া। নদিয়া	চাষবাস ও গানবাজনা। ২ বিঘা চাষের জমি	৮ কাঠা জমির উপর বাড়ি	৩৫ বছর	দরবেশি ও বৈষ্ণবধারা	×	১০-১২ জন গানের শিষ্য	জন্মগতভাবে খ্রিস্টান (প্রোটেস্ট্যান্ট) কিন্তু বাউলমতে দীক্ষিত। নামী গায়ক ও আত্মাভিমানী। ক্যাসেট আছে। গান লেখেন সুন্দর। গায়করূপে বিশেষত নদিয়ার গ্রামাঞ্চলে খুব বিখ্যাত। ভাল তত্ত্বগান জানেন।
শ্যামল চক্রবর্তী ৪৫	১ ছেলে ৫ মেয়ে	মাহাদিয়া। পোঃ কান্দি। মুর্শিদাবাদ	গানবাজনা এবং হারমোনিয়াম নির্মাণ ও মেরামতি। ১০০০ টাকা।	বাড়ি আছে	২৫ বছর	বৈষ্ণবধারা	নিজের সংগঠন 'উদাসবাউল সম্প্রদায়'	৩০ জন গানের শিষ্য	বেতারে বাউলগান গেয়ে প্রতিষ্ঠিত ও খ্যাতিমান। ব্রাহ্মণ। বাড়িতে শ্রীচৈতন্যের মন্দির স্থাপন করেছেন। বাউল গানে উচ্চবর্ণের প্রতিনিধি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাম ও বয়স	সন্তান	ঠিকানা	জীবিকা ও মাসিক আয়	বাস্তু বিবরণ	গায়নের অভিজ্ঞতা	ধর্মমত	গণসংগঠনের নাম	শিষ্য সংখ্যা	মন্তব্য
শ্যামসুন্দর পাল ১৩	×	সুভাষগঞ্জ। পোঃ রায়গঞ্জ। উত্তর দিনাজপুর।	নেই।	পিতৃগৃহে বাস	২ বছর	অদীক্ষিত	×	×	আজকাল বাউলগানে এগিয়ে আসছে অনেক কিশোর শিল্পী— তেমনই একজন। ভবিষ্যতে হয়তো পেশাদার হবে। এখন সম্ভাবনাপূর্ণ। সাক্ষর।
সনাতনদাস বাউল ৭৮	২ ছেলে ১ মেয়ে	খয়েরবুনি। পোঃ সোনামুখি। বাঁকুড়া	গান ও মাধুকরী ১০০০ টাকা	১ বিঘে জমিতে আশ্রম ও বাসগৃহ	৬৪ বছর	বৈষ্ণবধারা	×	৪-৫ জন	প্রবীণ ও বহুমান্য বাউল গায়ক। প্রধানত তাত্ত্বিক ও ভাষ্যকার। গানের সঙ্গে বাউলনাচের শেষ অভিজাত রূপকার। বাউলতত্ত্ব নিয়ে ২টি বই এবং অনেক পদ রচয়িতা। বিদেশে গান গাইতে গেছেন কয়েকবার। বিনয়ী ও নম্রস্বভাব। লালন পুরস্কার ও রাজ্য আকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত।
সরস্বতী মহন্ত ৩৭	×	কাঞ্চনপল্লি। পোঃ রায়গঞ্জ। উত্তর দিনাজপুর	গানবাজনা ৩০০ টাকা	নির্বাস	১৫ বছর	গৌড়ীয় মত	বাউল সংগঠনের সদস্য	×	বাউলগান ও কীর্তনগানে যশস্বী। কিন্তু গান গাইবার অপরাধে স্বামী পরিত্যক্তা। অতি দরিদ্র। সাক্ষর।
সাধনদাস বৈরাগী/৪৮	×	গ্রাম ও পোঃ হাটগোবিন্দপুর। বর্ধমান	মাধুকরী ও অনুষ্ঠান। আয় বলেননি।	আখড়া বাড়ি। ৮ কাঠা জমি ও বাগান।	৪০ বছর	সহজিয়া	×	অন্তত ১৫০ জন	প্রথম বিবাহের স্ত্রী ও সন্তানদের স্বগ্রামে রেখে এখন সাধনজীবনে আছেন জাপানি স্ত্রী মাকি কাজুমিকে নিয়ে। ভাল গায়ক ও তত্ত্বজ্ঞ। প্রচুর অনুষ্ঠান করেন। সচ্ছল সংসারী। তৃপ্ত ও জনপ্রিয়। সাক্ষর।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাম ও বয়স	সন্তান	ঠিকানা	জীবিকা ও মাসিক আয়	বাস্তু বিবরণ	গায়নের অভিজ্ঞতা	ধর্মমত	গণসংগঠনের নাম	শিষ্য সংখ্যা	মন্তব্য
সুফিয়া বিবি ৩৭	১ ছেলে ২ মেয়ে	হেকেমপুর। পোঃ মুক্তিনগর। মুর্শিদাবাদ	গানবাজনা ১৫০০ টাকা	বাড়ি আছে	২০ বছর	মারিফত পন্থী	বাউল-ফকির সংঘের সদস্য	২০ জন গানের শিষ্য	দুই বাংলায় ঘুরে ঘুরে গান করেন। অর্থনৈতিক দায় নেন সংসারের। স্বাধীনচেতা। মুর্শিদাবাদ ও প্রান্তীয় নদিয়ার নামকরা শিল্পী। নিরক্ষর।
সুমিত্রা দাস ৩৮	×	ঘোষপাড়া। মুড়াগাছা। নদিয়া	গানবাজনা ৩০০ টাকা	পিতৃগৃহে থাকেন	২২ বছর	বৈষ্ণবধারা	×	২-৪ জন গানের শিষ্য	ভাল গায়িকা। সুকণ্ঠী ও জনপ্রিয়। নিরক্ষর। অসহায়।
হরিপদ গোঁসাই ৮৯	×	নবাসন আশ্রম। গ্রাম নবাসন। পোঃ ছান্দার। বাঁকুড়া	মাধুকরী ও শিষ্যদের দান এবং উন্মাদদের চিকিৎসা। ৩০০০ টাকা	১৯ শতক জমিতে আশ্রম। জমি ১।। বিঘা	৪০ বছর	পাবনা স্রোত	×	যোগ এবং বাউলমতে অন্তত ৫০০০ শিষ্য (?) দেশে ও বিদেশে	বিদেশে গিয়ে যোগ শিক্ষা দেন। বিদেশিরাও আসেন। গান লেখেন ও ভাল তাত্ত্বিক গায়ক। স্ত্রী নির্মলাও নামী শিল্পী। দু'জনের সি ডি বেরিয়েছে প্যারিস থেকে। বাউলতত্ত্ব-রহস্য আঁকেন ছবিতে। বর্ণময় চরিত্র। নেতৃস্থানীয় ও বাউলদের পিতৃপ্রতিম। সচ্ছল ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্দেশিকা

অক্ষয়কুমার দত্ত ৬৬, ৭১, ৭৬, ৭৮, ৯৮, ১০১
'অচিনপাখি' ১৭১
অজিত দাস ১১৯, ১২১
অজিত মিত্র ২৫৩
অদ্বৈতাচার্য ১১৮
অনন্ত দাস ২৬, ১৮৯
অনুপম দত্ত ১২৬-১২৮
অমিত গুপ্ত ৭৩
অরুণ নাগ ৮৯, ৯০, ১৪৭-১৪৯

'আউল বাউল' ৬৪, ৭৬
আজহার ফকির ৩১, ৮৮
'আত্মকথা' ৫৬
আদিত্য মুখোপাধ্যায় ২৪, ৬৪, ৮২-৮৩, ৮৭, ১০০
আনাখোলা জয়নাল বাবা ২৪১
আবদুল ওয়ালী ৯৮, ১৯১, ২০০
আবুল আহসান চৌধুরী ১৪২
আব্দুল করিম ৬৯, ৭০
'আমার ফকির সঙ্গ' ৫৪
আমিন শা ফকির ৮৮
আরকুম শাহ ৬৯
আলোকারী ২২৪, ২২৫
আহমদ মিনহাজ ৬৮, ৬৯
আহমদ শরীফ ৬৭, ৭২, ২০১, ২০২

ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী ১০১
ইমতিয়াজ আমেদ ১৯৮
ইয়ুসুফ ফকির ৩২
ইসলাম ১৮০

ঈশান যুগী ৮০

উইলসন ১০১
'উচিত কথা' ৭৬
উদ্ধবদাস ১৬১-১৬৩
উদ্ধারণ দত্ত ১১৯
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ২২, ৮০, ৮১, ১০৬, ১১০
উস্তাদ জাফরউদ্দিন ২৩০

(ডা.) একরামুল হক ২৩৬, ২৩৮, ২৪৩, ২৪৫, ২৪৮, ২৪৯
এনায়েতউল্লা ফকির ৫৪, ১১২, ১৯৫, ১৯৬

কঙ্কণ ভট্টাচার্য ১৭১, ২০৭
কণিকা ব্যানার্জি ৩০
কদমখালির লালনমেলা ৩৯, ৪৪, ৫০
কবীর ১৫০
কবু শা(হ) ২৮, ৫৪, ২০৭
কাঙাল হরিনাথ ২৭, ৬০, ১৯৩
কাঙালিনী সুফিয়া ১৩৯
কাজী নুরুল ইসলাম *দ্রঃ* রাধাময় গোস্বামী
কাজী মৌলবী কেরামতউল্লা ৭৬
কার্তিকদাস বাউল ৮৩, ৯১, ১৩১-১৩৩
কালাচাঁদ দরবেশ ১৩৯
কালিদাসী ১৬৪
কালীমোহন ঘোষ ১০১
কুচিল মুখোপাধ্যায় ২৫৩
কুমুদকিঙ্কর *দ্রঃ* রাধাময় গোস্বামী
কুমুদরঞ্জন মল্লিক ৯৩
কৃষ্ণতত্ত্ব ২২৭, ২২৮

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষ্ণদাস ১১৮
কেঁদুলি ২৪
কেশবচন্দ্র ৭১
ক্ষিতিমোহন সেন ২৯, ৫৬, ৭৫, ৮০, ৮২, ১০৪-১০৬, ১১০, ১৪১
ক্ষুদিরাম দাস ৮৫

খাজা জয়নাল বাবা ২৪৭
খিলাফত ১৪২-১৪৩, ১৪৫
খেপু ঘোষ ৯৪
খ্যাপা মা ৬৪

গগন হরকরা ১০০
গঙ্গারাম ৮০
গঙ্গাধর দাস ৯৮
গোপাল ভট্ট ১১৮, ১১৯
গোবিন্দদাস ৯৫, ১১৯
'গোরা' ১০১
গৌরীদাস পণ্ডিত ১১৯
গোলাম শাহ্ ২৮, ২১৬-২২৩
গোষ্ঠগোপাল ১৬১
গৌতম ভদ্র ১৯১, ১৯২

চণ্ডীদাস ১১৭
চন্দ্রকুমার দে ৪৮
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৫
চৈতন্যদেব ১১৯

জগা কৈবর্ত ৮০
জবাবে ইবলিস ২০৩
জয়দেব কেঁদুলির মেলা ২৯, ৫৬
জলধর সেন ১৯২, ১৯৩
'জাতবৈষ্ণব কথা' ১১৯, ১২১
জাফরউদ্দিন ২৪৫
জামানায়ে আরেফবিল্লা হজরত... চিশতি ২৪০, ২৪৯
জালাল শাহ্ ৭৯, ১৪২, ১৭৪, ১৮৫, ২২৩-২২৯

জাহ্নবা দেবী ১১৯
জীব গোস্বামী ১১৮
জীবন গোঁসাই ১১৩
'জীবনস্মৃতি' ১০১
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১০০, ১০৪
জ্ঞানদানন্দিনী ১৪৪

ঝুমুর ২৫৩

তরণীসেন মহান্ত ৯৫, ২৪৬
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৩
তালেব শাহ্ ১৮৫
তোতারাম ১২০
ত্রিভঙ্গ খ্যাপা ২৯

দাতা বাবার মেলা ২৮
দায়েম শাহ্ ২৮, ৫৪, ১৭৩, ১৭৪, ২১২, ২২৬, ২২৭
দাশরথি রায় ৬৬
দাশু বাউল ৮০
দীন শরৎ ৭৯
দুদ্দু শাহ্ ২৩, ৭৯, ১১৪-১১৭, ১৮৫, ১৯৯, ২০০
দ্যুশন জাভাতিয়েল ৪৮
দুর্বিন শাহ্ ৬৯, ৭৯

দেওয়ান খান বাহাদুর ফজলে ২০২
দেবীদাস বাউল ১২৩-১২৫
দেবেন্দ্রনাথ ৭১

'ধর্ম ও সংস্কৃতির আলোকে বাউল' ৮২-৮৩
ধীরেন মোহন্ত ৯৫
'ধুয়া' ১৯৫

নইমুদ্দিন ২৩৪
নগেন্দ্রনাথ বসু ৯৮, ১০১
ননীবালা ১১০

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবনীদাস বাউল ২১, ৩০, ৬০, ৮৫, ৮৬, ৯৮, ১১১-১১৩
নবাসনের সমাবেশ ৫০
নরোত্তম দত্ত ১১৯
নসরুদ্দিন ফকির ২১৩
নারায়ণ দাস ৯৮
নারায়ণচাঁদ গোঁসাই ৬৪
নিত্যানন্দ ১১৮
নিরঞ্জন গোঁসাই ১২৬
নির্গুণ ঝুমুর সংগীত ২৫৪
নির্মলা মা ১৬৫, ১৬৬
নূর শাহ বাবা ১৮৮-১৯০
নৃপেন্দ্রনাথ *দ্রঃ* খেতু ঘোষ

পদ্মলোচন ৭৯
পবনদাস ৮৩, ৯০, ১৬১
পরমেশ্বর দাস ১১৯
পরীক্ষিৎ বালা ১৬১
পাঁচু ফকির ৮০
পাগল চাঁদ ৮০
পাগলা কানাই ৬৯
পাঞ্জু শাহ ২৩, ৭৯, ১৪১
পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৭৩
'পাষণ্ডীদলন' ৬৬
পির মুর্শিদ ২১৮
পুরুলিয়ার সাধুগান ২৫৩
পূর্ণদাস বাউল ২৪, ২৯, ৬০, ৯০, ১১১, ১১৩, ১৬১, ২১৬
পৌষমেলা ২৯
প্রণতি মুখোপাধ্যায় ১০৪, ১০৬
প্রমথ চৌধুরী ৫৬
প্রহ্লাদ দাস ৯০
প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী ২৪৭

'ফকিরালি' গান ১৯৪, ১৯৫
ফিকিরচাঁদ ৬০, ৬১, ১৯৩
ফুলবাসউদ্দীন ৫০, ৭৯
'ফুলবাসউদ্দীন ও নসরুদ্দীনের পদাবলী' ৬৭

'বঙ্গবীণা' ১০৫
'বঙ্গভাষায় বৌদ্ধস্মৃতি' ২৫৫
'বর্তমান' ৬৪
বলহরি দাস ৩১, ৯৪-৯৬
'বস্তুবাদী বাউল' ১৩৫-১৩৭
বাঁকুড়া সোনামুখির বাউল সমাবেশ ৬৪
বাউল চিত্রকলা ২৯
'বাউল ধ্বংস ফৎওয়া' ৯৯
বাউল-ফকির ৬৪
'বাউল-ফকির সংঘ' ৫৪
'বাউল-পরিচয়' ১০৫
'বাউল বিংশতি' ৯৯
বাউল মেলা
  অগ্রদ্বীপ ৩২
  কাটজুড়িডাঙা ৪১, ৪২, ৭৩
  ঘোষপাড়া ৩২
'বাউলা' গান ১৯৫
'বাউলিয়া' গান ১৯৪
'বাংলার লোকজীবনে বাউল' ৮২
'বাংলার বাউল' ৮২, ১০৪
বিকাশ চক্রবর্তী ১০৯
'বিচার গান' ১৯৪
বিজয় সরকার ১৪২
বিজয়কৃষ্ণ ৭১
বিনয় মহান্ত ৯৫
বিশা ভুঁইমালি ৮০
'বিশ্বকোষ' ২০১
বিশ্বনাথ দাস ২৬, ৮৬
বিহারীলাল ৯৯
'বীণাবাদিনী' ১০১
বীরভূমের বাউল ২৯-৩১, ১৩৬
'বৈষ্ণব ব্রতদিন নির্ণয়' ১২০

ভবা পাগল ৬৯
ভবানন্দ ৬৯
'ভাব' ১৯৫
'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' ৭৬, ৭৮
ভেজ্জাল ২৩, ২৪

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মদন ৮০
মনসুরউদ্দীন ১১০
মনোহর খ্যাপা ৬৪
মনোহর দাস ২৯
মহম্মদ কুতুব আলি ৯৫
মহম্মদ জালাল শাহ *দ্রঃ* জালাল শাহ
মহম্মদ শা ২৮, ২১৭, ২১৯
মহিন শাহ ৬৯
মাকি কাজুমি ১৫৩-১৫৬, ১৬০
মাধবদাস বাউল ৯৬
মানস রায় ১২২-১২৩, ১২৫, ১২৬
'মারিফতের কিস্তি' ২০৭
মিনতি দাসী ১৫১-১৫৩, ১৬১
মিনহাজ ৬৮
মিমলু সেন ৮৩
মীরা মোহান্ত ১৬৩
মুর্শিদতত্ত্ব ২২৭, ২২৮
মুর্শেদ ১৮৪
মেছেলচাঁদ ৮০
মৌলবী আবদুল ওয়ালী *দ্রঃ* আবদুল ওয়ালী
মৌলবী রেয়াজউদ্দিন আহমদ ৭৬
মৌলানা মাজাহারউদ্দিন ২৪৯

যতীন হাজরা ২৩০-২৫২
যাদুবিন্দু ৭৯
যুগলকিশোরের মেলা ১৫০
যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ৯৮
যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ৬৪, ৬৬, ৭৬, ১০১

রঘুনাথ দাস ১১৮
রঘুনাথ ভট্ট ১১৮
রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১
রণজিৎকুমার ভট্টাচার্য ১৯৯
রফিউদ্দিন ১৯৭
রবীন্দ্রনাথ ২১, ২২, ৩০, ৭১, ৭২, ৭৯, ৮০, ৮৬, ১০০, ১০২-১০৪, ১০৭, ১১০, ১১৪, ১৪৭, ১৪৮
রমাকান্ত চক্রবর্তী ১০১, ১০৩, ১২১
রমেশচন্দ্র বসু ২৫৫
রশীদ ৭৯, ১৪২
'রাইকমল' ৬৩
রাধাকান্ত গোঁসাই ১২৭-১২৯
রাধাময় গোস্বামী ৯৩, ৯৪
রাধাময় দাস ৯৩
রাধারমণ ৬৯, ৭৯
রাধেশ্যাম ২৯
রামকৃষ্ণ পরমহংস *দ্রঃ* শ্রীরামকৃষ্ণ
রামচন্দ্র কবিরাজ ১১৯
রামপ্রসাদ ৩৬
রামমোহন ৭১
রামলাল শর্মা ৬৬
রামানন্দ গোঁসাই ১২৫
রেয়াজউদ্দিন ৬৬, ৯৯, ১০১, ১৯৩, ২০৩
রূপ গোস্বামী ১১৮

লক্ষ্মণদাস বাউল ৯০, ১১১-১১৩
লালন ফকির ২৩, ৬৬, ৭৫, ৭৯, ৯৮-১০০, ১০৩, ১০৬-১০৭, ১৪১, ১৪২, ১৫০, ১৮৫, ১৮৬, ১৯৯-২০১, ২০৪-২০৭, ২১০
লালন মেলা ৩৯
লালশশী ৭৯
লিয়াকত আলি ২৫, ৫৪, ৫৫, ৫৮-৬০, ৭৪, ৭৫, ১৭৩-১৭৮
লুইপাদ ২৫৫

শক্তিনাথ ঝা ২৪, ২৬, ১৩৫-১৩৮, ১৪০
'শব্দগান' ১৯৫
শলাবৎ মাহাতো ২৫৩
শাহনাল ৮০
শাহনূর ৬৯
শীতলাং শাহ ৬৯, ৭৯, ১৪২
শেখ ভানু ৬৯
শ্রীনিবাস আচার্য ১১৯
শ্রীরামকৃষ্ণ ৩৬, ৬৬, ৭১, ৯৯, ১০১

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' ৩৬
শ্যামাদাস ১১৮
শ্যামানন্দ ১১৯
শ্যামাপ্রসাদ বসু ২৫৩

ষড়গোস্বামী ১১৮

সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯
সত্যেন্দ্রনাথ ১০৪
সনাতন গোস্বামী ১১৮
সনাতনদাস বাউল ৩০, ৩১, ৫৩, ৯০, ১২৬
সমীর রায় ৯০-৯২
সাদব শাহ ২১৭
সাধন দাস ৩২, ৮৮, ১৫৩-১৫৬, ১৬০
সাধুগান ২৭
সামা ১৮২
সুধন্যদাস ১৫৯, ১৬০
সুধাময় দাস ১৫১, ১৬১
সুধীর খাস্তগীর ২৯
সুধীর বাবা ২৯
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৮৪, ৮৫
সুফি ১৮০
সুবলসখা ৩৩, ৩৪
সুভাষগঞ্জের বাউল উৎসব ৫০
সিরাজ সাঁই ২৪
সীতাদেবী ১১৮
সোমনাথ হোর ২৯
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ৭৮

হজরত মহম্মদ ২২২
হরিদাস মহান্ত ৮৫
হরিপদ গোঁসাই ৩১, ৫২, ১৬৪-১৬৬
হরিপদ বাউল দ্রঃ হরিপদ গোঁসাই
'হরিভক্তিবিলাস' ১১৮, ১১৯
হাউড়ে গোঁসাই ৭৯
হাবিবুর রহমান ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫
'হারামণি' ১০৩
হাসন রজা ২৩, ৭৯, ১৪২
'হিতকরী' ৯৯

(The) Bauls of Birbhum ১২২, ১২৩
'Hindu castes and sects' ৬৪
'Origin of the Mussalmans of Bengal 1895' ২০২
'On some curious tenets and practices of a certain class of Fakirs of Bengal' ১৯১

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~